مجموعة الفتاوى

মাজমাউল ফাতওয়া

শাইখুল ইসলাম
ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ্

প্রথম খন্ড

অনুবাদঃ
মুহারিব আল উসামা

مجموعة الفتاوى

লেখক :

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ্‌ (মৃত্যু: ৭২৮ হি.)
অষ্টম হিজরি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত।

সংকলনঃ

গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ আবদুর ররহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম রাহিমাহুল্লাহ্‌ (মৃত্যু: ১৩৯২ হি.)

বাংলা অনুবাদকঃ

মুহারিব আল উসামা
একজন নগন্য ত্বালিবুল ইলম

সংস্করণ: প্রথম [২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ । ১৪৪৬ হিজরি]
এটি ২০০৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে, যা প্রকাশ করেন দুই পবিত্র হারামের খাদেম বাদশাহ ফাহাদ ইবন ‘আবদুল-‘আযীয আল সৌদ।

টাইপিং, সম্পাদনা, বিন্যাস, নকশা, চূড়ান্তকরণ প্রভৃতি সব কাজ অনুবাদক একাই সম্পন্ন করেছেন।
আমার কাজে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রবল। অনুগ্রহ করে যে কোনো ধরনের ভুল আমাকে জানিয়ে দিন যাতে আমি তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করতে পারি।
আল্লাহ আপনাকে বারাকাহ দিন। যারা আমার কাজ প্রুফ রিড করে সংশোধনে সহযোগিতা করেন, আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পিডিএফ সংস্করণ অ্যাক্সেস করতে ভিজিট করুন (এবং যুক্ত হোন):
t.me/Uarchiveee

যেকোনো যোগাযোগের জন্য:
ফেসবুক: www.facebook.com/MuharibAlUsama
ইমেইল: muharibusama@instaddr.ch

সূচিপত্র

ভূমিকা

আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নবী-প্রেরণহীন প্রতিটি যুগে এমন কিছু জ্ঞানীদের রেখে দেন, যারা ভ্রান্তদের হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেন এবং তাদের পক্ষ থেকে আসা কষ্ট সহ্য করে থাকেন। তারা আল্লাহর কিতাব দ্বারা মৃত হৃদয়সমূহকে জীবিত করেন এবং অন্ধ হৃদয়সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহর কিতাব দ্বারা দৃষ্টিশক্তি দান করেন। তারা কত-না ইবলীসের শিকারকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, এবং কত-না পথভ্রষ্টকে হিদায়াতের পথে এনেছেন! তারা আল্লাহর কিতাব থেকে চরমপন্থীদের বিকৃতি, বাতিলকারীদের মিথ্যা দাবি, এবং অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যাগুলো দূর করে দেন। মানুষদের উপর তাদের প্রভাব কতই না কল্যাণকর, আর তাদের উপর মানুষের প্রভাব কতই না নিকৃষ্ট!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—যিনি ছিলেন ওলামাদের নেতা এবং গোপনে আল্লাহভীরুদের নেতা—তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবার, সাহাবাগণ এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করবে, তাদের উপর আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আম্মা বাদ:

এটি এমন একটি সংগ্রহ, যাতে ইমাম, মহান আলিম, শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল হালিম ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী আদ-দিমাশকী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর ফাতওয়া ও লিখিত বক্তব্যসমূহ সংকলিত হয়েছে।

শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম—যিনি সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি, সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আলে শাইখ (রহিমাহুমাল্লাহ) এর নির্দেশনায়—এই ফাতওয়াগুলো সংকলন করেছেন। তিনি এই কাজের জন্য বহু শ্রম ও সময় ব্যয় করেন; বহু উৎস থেকে যোগাযোগ করেন; এমন সব পাণ্ডুলিপি, রিসালা ও ফাতওয়া সংগ্রহ করেন যা পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। তিনি সেগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে, সুন্দরভাবে বিন্যাস করে, বিস্তারিত সূচিপত্র তৈরি করেন। এই কাজে তাঁকে তাঁর পুত্র শাইখ মুহাম্মাদ সাহায্য

করেন। ফলস্বরূপ এই পরিপূর্ণ, উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ সংকলনটি আলোর মুখ দেখে।

এই সংকলনে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা স্থান পেয়েছে—ফিকহের মূলনীতি ও শাখা, তাফসীর, হাদীস, ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও পাঠক এতে এমন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, মতামতের উৎস, মতভেদ ও সঠিক মত নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন নিখুঁততা, যাচাই ও দৃঢ়তা দেখতে পাবেন যা এমনকি এই বিষয়ে এককভাবে রচিত কিতাব সমূহেও বিরল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই; কেননা শাইখুল ইসলামের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল—তিনি এমন কোনো শাস্ত্রে কথা বলেননি যাতে তিনি তাঁর যুগের সকলকে অতিক্রম না করে থাকেন। হাফিয আবুল ফাতহ ইবনে সাইয়্যিদ আন-নাস বলেন, "আমি তাঁকে এমন এক জ্ঞানী হিসেবে পেয়েছি, যিনি সুন্নাহ ও আথারের অধিকাংশই মুখস্থ রেখেছিলেন। তিনি যখন তাফসীর বলতেন, তখন তিনিই ছিলেন তাফসীরের পতাকাবাহক। যখন তিনি ফিকহে ফাতওয়া দিতেন, তখন তিনি তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন। তিনি যখন হাদীস আলোচনা করতেন, তখন তিনি হাদীস ও রাওয়ায়াতের মাস্টার হতেন। যখন তিনি আকীদাহ ও ফির্কা আলোচনা করতেন, তখন তাঁর চেয়ে অধিক বিস্তৃত জ্ঞান আর কেউ রাখতো না। তিনি প্রতিটি শাস্ত্রে তাঁর সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে গেছেন। যে চক্ষু তাঁকে দেখেছে, সে তাঁর সমতুল্য আর কাউকে দেখেনি এবং তাঁর নিজের চোখেও তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। তিনি তাফসীর আলোচনা করতেন, এবং অসংখ্য জনতা তাঁর জলধারাসম জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে একত্র হতো..."—এ কারণে এই সংকলনের পাঠক এতে উচ্চতর জ্ঞান, বহুসংখ্যক যাচাই ও এমনসব অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পাবেন যা অন্যত্র দুর্লভ।

এই ইমামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি অতুলনীয় সম্মান। তিনি আল্লাহর বাণী ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ছাড়া কিছুই অগ্রাধিকার দিতেন না। তাই যখন তাঁকে "আকীদাহ আস্‌ফাহানিয়্যাহ" ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, তখন তিনি সম্মতি প্রদান করেন; কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা করেন এই বলে যে, ব্যাখ্যার সময় তিনি লেখকের উদ্দেশ্য হতে ভিন্ন পথে যেতে পারেন, কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল শুধুই ইসলামের মূলনীতিকে তুলে ধরা।

অতঃপর সত্য পরিস্কার হয়ে যায়, যার অনুসরণ আবশ্যক: "আর আল্লাহ সত্য বলেন, এবং তিনিই সঠিক পথে পথনির্দেশ করেন" (আল-আহ্‌যাব: ৪), "আর রাসুল যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো" (আল-হাশর: ৭), "তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করো, তবে তা

আল্লাহ ও রাসুলের নিকট ফিরে নাও—যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখো; এটি উত্তম এবং পরিণামে অধিক উত্তম ব্যাখ্যা" (আন-নিসা: ৫৯)। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল সত্য এবং তাঁর সর্বোচ্চ কাম্য বস্তুও ছিল সত্য। তিনি কোনো ইমামের বাণীর কারণে সত্য পরিত্যাগ করতেন না, কিংবা যুগের লোকদের অস্বীকৃতির কারণে তা থেকে পিছিয়ে যেতেন না। এ কারণেই তিনি সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে, সুন্নাহকে উচ্চে তুলে ধরতে এবং তার পক্ষে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি সুন্নাহর সমর্থনে দীর্ঘ দীর্ঘ রচনা লিখেছেন, সত্যের বিশ্লেষণ দিয়েছেন এবং মুজাসসিমা ও বিদআতিদের খণ্ডন করেছেন। তিনি প্রমাণ বিশ্লেষণ করেছেন, সঠিক পথের প্রতি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং বিরোধীদের ভিত্তি ভেঙে দিয়েছেন। তিনি নাস্তিক, যুক্তিবাদী, দার্শনিক, কালামবিদ ও রাফেজি ও সুফিদের মতবাদ ধ্বংস করেছেন।

তিনি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন ফিকহি শাখাগত বিষয়ে, যদিও তা কোন প্রচলিত মত, মাযহাব বা ইমামের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায়। তিনি ন্যায়পরায়ণতার পতাকা উত্তোলন করেছেন এবং পক্ষপাতিত্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কোনো মত, মাযহাব বা ইমামের প্রতি পক্ষপাত দেখাননি। তিনি দুর্বল মতগুলো দুর্বল বলে প্রমাণ করেছেন এবং প্রমাণ-তর্কের ভিত্তিতে প্রবল মত নির্ধারণ করেছেন। তবুও তিনি পূর্বসূরি ও পরবর্তী আলেমদের ব্যাপারে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাঁদের মর্যাদা ও গুণাগুণ স্বীকার করেছেন। এজন্যই তিনি অনেক স্থানে তাঁদের ভালবাসা, সহানুভূতি, মর্যাদা চেনা এবং তাঁদের মান-সম্মান রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের সম্মানে আঘাত, অপমান, মর্যাদা উপেক্ষা, বিরোধিতা ও শত্রুতা করা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তাই তাঁকে দেখা যায়, যেখানে সম্ভব, সেখানে তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করে থাকেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, ইসলাম পরিপূর্ণ হয় কেবলমাত্র তখনই, যখন ইমামদের মর্যাদা, অধিকার ও গুণাগুণ চেনা হয় এবং যেসব কাজ তাঁদের সমালোচনার দিকে নিয়ে যায় সেগুলো পরিত্যাগ করা হয়। এ বিষয়ে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব হলো: "**রাফ‘ উল-মালাম আনিল আ’ইম্মাতিল আ’লাম**" (উজ্জ্বল ইমামদের উপর দোষারোপ অপসারণ)।

এই সংকলনকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করে—শাইখুল ইসলামের মাযহাবসমূহ ও তাঁদের মতামতের প্রতি অতুলনীয় যত্ন। আপনি দেখবেন, তিনি আহমদের মাযহাবে থাকা বর্ণনা ও মতসমূহকে বিস্তারিতভাবে আত্মস্থ করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দলের মতসমূহ নির্ভুলভাবে সীমারেখাসহ উপস্থাপন করেছেন। তিনি আবু হানিফা ও তাঁর দুই সাথী, যুফার এবং পরবর্তী হানাফীদের মতসমূহও মুখস্থ রেখেছেন। তিনি মালিক, ইবনেল কাসিম, সহনূন, ইবনে মাজিশূন এবং কাদি আব্দুল ওহহাবের বর্ণিত

মতসমূহও জানতেন। তিনি ইমাম শাফিইর প্রাচীন ও আধুনিক মতসমূহ, মুযানী, ইবনে সুরাইজ, যাহিরিয়্যাহ এবং অন্যান্যদের মতামতও প্রমাণসহ জানতেন—প্রত্যেকটির দলীল, কিয়াস এবং তাদের মূলনীতিসমূহের আলোকে প্রয়োগসহ। এখানেই তিনি থেমে যাননি; বরং সাহাবা, তাবিঈন, সালাফ ও খলাফের মতামতও সংকলন করেছেন। ফলে তাঁর মধ্যে বিস্তৃত জ্ঞান, তথ্যের আধিক্য, যাচাই ও গভীরতা একত্রিত হয়েছে। তিনি যেন এক বিশাল সাগর, যার কোনো তীর নেই। এজন্যই তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল, যখন তিনি কোনো বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তির সাথে আলোচনা করতেন, তখন তাকে এমন কিছু জানাতেন যা সে জানত না। তিনি ফুকাহার সাথে আলোচনায় উপকার দিতেন; কালামবিদ, সুফি, এমনকি ব্যাকরণবিদদের সাথে আলোচনা করেও তাঁদের উপকৃত করতেন।

শাইখুল ইসলাম এসবের সাথে শাস্ত্রসমূহের বিকাশ, প্রক্রিয়া, ঐতিহাসিক পটভূমি ও সাহিত্যের জ্ঞানও অর্জন করেছেন—এমনকি শরঈ নয় এমন শাস্ত্র যেমন দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতেও। ফলে তাঁর বিশ্লেষণ আরো সূক্ষ্ম, দৃষ্টিভঙ্গি আরো গভীর, এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ আরো বাস্তবসম্মত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় তাঁর যুক্তিবিদদের সঙ্গে আলোচনায় এবং আরো পরিষ্কারভাবে ফুকাহাদের মতামতের বিশ্লেষণে। তিনি কতবার কোনো মতামতকে তাঁর ইমামের মূলনীতিতে ফিরিয়ে এনেছেন কিংবা তাঁরই মূলনীতির ভিত্তিতে খণ্ডন করেছেন। এটি জ্ঞানে এক উচ্চ স্তর এবং ফিকহে এক মহান মর্যাদা।

নিশ্চয়ই, শাইখুল ইসলামের রচনাসমূহ ও ফাতওয়াসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি প্রচুর পরিমাণে দলীল পেশ করেন এবং কুরআন থেকে দলীল আনার ক্ষেত্রে তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। কখনো কখনো কোনো কিরআত উল্লেখ করে দলীলকে আরো স্পষ্ট করেন। তিনি সুন্নাহ থেকেও দলীল আনেন—সহীহ, সুনান, ও মুসনাদসমূহ থেকে, কখনো স্পষ্টভাবে কখনো সূক্ষ্ম উপায়ে, যা তিনি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। কখনো এমনও হয় যে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কোনো বিশেষ দলীল ঐ বিষয়ে ব্যবহার করেছেন। সুন্নাহ থেকে দলীল প্রদানকালে তিনি হাদীসসমূহের সহীহতা যাচাই করেন, সনদ বিশ্লেষণ করেন, রাবীদের অবস্থা আলোচনা করেন এবং নসের ত্রুটি ব্যাখ্যা করেন একজন দক্ষ, স্বাধীন মুজতাহিদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

শাইখুল ইসলাম তাঁর যুক্তিগুলোকে আরো শক্তিশালী করেছেন শরীয়তের উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) বিশ্লেষণ করে, দলীল প্রমাণে এগুলোকে ভিত্তি বানিয়ে, সেগুলোর প্রজ্ঞা বিশ্লেষণ করে এবং প্রবল মত নির্ধারণে এই

মাকাসিদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি এ ক্ষেত্রে সালাফের পথ অনুসরণ করেছেন। এটি এমন এক কঠিন স্তর, যা গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও শরীয়তের দলীল ও মাসআলাগুলোর ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে অর্জনীয়। এর দ্বারা শরীয়তের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় এবং দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দূর হয়। এটি এই ইমামের রচনাসমূহের একটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য।

শাইখুল ইসলাম ফিকহের মূলনীতি নিয়েও গভীর গবেষণা করেছেন এবং তাঁর রায়সমূহের ভিত্তি এগুলোর উপর স্থাপন করেছেন। তিনি কুরআনের মুহকাম-মুতাশাবিহ, মুতলাক-মুকাইয়্যাদ, আম-খাস ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি স্বতন্ত্র মতামত ও উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। আর ফিকহি বিধান প্রতিষ্ঠায় কুল্লিয়াত (ফিকহি মূলনীতিসমূহ)—যা কখনো মাযহাবসমূহের মধ্যে সাধারণ কিংবা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের বিশেষ—তাও তাঁর ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তসমূহে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহে ঐক্য ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং পরস্পর বিরোধীতা থাকে না। এজন্যই তিনি তাঁর নির্ধারিত বিধানকে এমন অনুরূপ বিষয়ে প্রয়োগ করেন যা ঐ মূলনীতির অধীন, যা কখনো কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে বিশদভাবে উপস্থাপন করেন।

শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর কিতাব সমূহে যে বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো তাঁর অনুষঙ্গী বিদ্যাগুলোর উপর পূর্ণ দক্ষতা এবং তা দ্বারা দলীল স্পষ্ট করা, প্রতিপক্ষের খণ্ডন করা কিংবা কোনো মতের সমর্থন প্রদান করা। যেমন: তিনি ব্যাকরণবিদ্যার বিভিন্ন দিক, যুক্তিবিদদের মৌলিক সিদ্ধান্তাবলী, বাগবিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করার সময় তিনি সেই বিষয়ে পারদর্শীদের পরিভাষা ব্যবহার করতেন, যাকে আলেমগণ বলেন “প্রচলিত ভাষা”। তিনি যখন কোনো ফিকহি বিষয় আলোচনা করতেন, তখন ফুকাহাগণের ভাষায় বলতেন; যখন আকীদাগত কোনো বিষয় আলোচনা করতেন, তখন সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরিভাষা ব্যবহার করতেন; এবং যখন আধ্যাত্মিক আচরণ ও তাসাওউফপন্থীদের সাথে বিতর্ক করতেন, তখন তাঁদের ভাষায় বলতেন। এর দ্বারা একজন আলেম বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পান, কারণ প্রতিটি শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব পরিভাষা থাকে।

তাই যখন শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ্) কোনো সন্দেহপূর্ণ বক্তব্য, একাধিক অর্থবোধক শব্দ, বা বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের মুখোমুখি হতেন, তখন আপনি দেখবেন তিনি সে শব্দের উদ্দেশ্যপূর্ণ অর্থ সুস্পষ্ট করে

ব্যাখ্যা করতেন, যেমনটি অনেকেই করেন না। তিনি বলতেন: “এই শব্দটির অর্থ হতে পারে অমুক, কিংবা অমুক। যদি অমুক অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে তা সঠিক...”। এভাবে তিনি আরেকটি দিক থেকে বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন, তা হলো: প্রচুর দলীল পেশ করা এবং জ্ঞানীদের কাছ থেকে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি প্রদান করা। এই ব্যাপক উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, তিনি যে মত পেশ করেছেন তা এককভাবে তাঁর নিজস্ব ছিল না, বরং তা প্রথাগত ও গ্রহণযোগ্য ছিল। যেমনটি তিনি তাঁর “হিসবাহ”-বিষয়ক গ্রন্থে করেছেন, “দার' তাকাআরুদ আল-আক্ল ওয়ান-নাক্ল”-এ বিভিন্ন স্থানে করেছেন, এবং ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযীর খণ্ডনে করেছেন—তাঁর অন্যান্য বহু কিতাবে যেমনটি পরিলক্ষিত হয়—আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

নিঃসন্দেহে, এই ইমামের রচনাসমূহে শরিয়তের দলীলসমূহের উপর ভিত্তি করে যে সহজতা ও সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়, তা তাঁর কিতাবসমূহ অধ্যয়নকারীর নিকট স্পষ্ট। আপনি দেখবেন না যে, শরিয়ত যেখানে সহজতা রেখেছে, সেখানে তিনি কঠোরতা আরোপ করেছেন; যেমনটি আপনি দেখবেন না যে, যেখানে শরিয়ত নিষেধ করেছে, তিনি তা অতিক্রম করেছেন। তাই, শরয়ি বিধি-বিধান নির্ধারণ ও মাসআলা বাছাইয়ে এই ইমামের মধ্যে সহজতার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ; যার মাধ্যমে তিনি কতিপয় কঠোর মাযহাবপন্থী ও অন্ধ অনুসারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। এটি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় লেনদেন, সুদ, অনিশ্চয়তার সংজ্ঞা, জুয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে; এবং এমন বহু শর্ত ও সীমাবদ্ধতার সমালোচনায়, যা কেউ কেউ লাগামহীনভাবে উল্লেখ করেছেন—যা কেবল কষ্টসাধ্যতা সৃষ্টি করে।

এই মূল্যবান সংকলন নিঃসন্দেহে যত্ন ও গুরুত্বের দাবি রাখে এবং ছাপানো ও প্রচারের উপযুক্ত।

এই পবিত্র রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা, যা জ্ঞানের প্রতি সম্মান, আলেমদেরকে মূল্যায়ন, এবং জ্ঞানের প্রসার ও প্রচার নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সংকলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৩৮০ হিজরি সনে (অনুমানিক ১৯৬০/৬১ খ্রিষ্টাব্দে) রাজকীয় উদ্যোগে প্রথম সংস্করণটি কিং সৌদ ইবনে আবদুল আজীয আলে সৌদের খরচে মুদ্রণ করা হয়। এই দেশের শাসকগণ বরাবরই এই সংকলনের প্রতি যত্নবান থেকেছেন এবং প্রয়োজনে তা পুনরায় মুদ্রণ করে গেছেন। এমনকি এই বর্তমান সংস্করণটি এসেছে দুই পবিত্র হারামের খাদেম, বাদশাহ ফাহদ ইবনে আবদুল আজীয আলে সৌদের পরামর্শক্রমে—আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

আল্লাহ্ যেন এই সংকলনের মাধ্যমে উপকার সাধন করেন, এবং আল্লাহ্ যেন এই দেশের শাসকদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন—তাঁরা সালাফি আক্বীদার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তার সংরক্ষণ করেছেন, এবং ইমামগণের ফিকহ ও দ্বীনের জ্ঞান প্রচার করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্-ই তাওফিকদাতা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের উপর আল্লাহ্র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

সম্মানিত শাইখ সালেহ ইবনে আবদুল আজীয ইবনে মুহাম্মাদ আলে আশ-শাইখ

ইসলামী বিষয়ক, ওকাফ, দাওয়াহ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পবিত্র কুরআন ছাপার জন্য প্রতিষ্ঠিত বাদশাহ ফাহদ কমপ্লেক্সের সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক

প্রারম্ভিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের প্রতি অনন্য এক নিয়ামত হলো—তিনি আলেমগণকে নবীদের উত্তরাধিকারী করেছেন। তাঁরা মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেন, সত্যের পথ ও হিদায়াতের তরীকা প্রচার করেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করেন, মানুষের সামনে হালাল ও হারাম, সত্য ও মিথ্যা, সুন্নাহ ও বিদ'আতের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট করেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ্)—আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর মর্যাদা 'ইল্লিয়ীন-এ উন্নীত করুন—এমনই একজন আলেম ছিলেন যিনি আল্লাহর কিতাব রক্ষা করতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন; চরমপন্থীদের বিকৃতি, প্রতারকদের ভুয়া কৃতিত্ব এবং অজ্ঞদের বিকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর যুগে তাঁর জ্ঞানে বরকত দান করেছেন এবং তাঁর জীবনকালের পরেও মানুষ তাঁর জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তিনি বিশাল পরিমাণে ইলম রেখে গেছেন, যেখান থেকে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হয়েছে এবং যেটিকে মানুষেরা গ্রহণ করেছে। তাঁর ইলম এক সুপেয় ঝরণা, এক পবিত্র উৎস, এবং উলামা ও গবেষকদের জন্য এক নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ এমন কিছু আলেমকে সামনে এনেছেন যাঁরা তাঁর স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে বিস্ময়কর কথা বলেছেন, যার বিশদ আলোচনা এ পরিসরে সম্ভব নয়। তবে আমরা তাঁর ছাত্রদের বর্ণিত কিছু সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত ও সূক্ষ্ম ঘটনা উল্লেখ করব। বলা হয়, তিনি কোনো একটি কিতাব একবার পড়তেন, আর তা তাঁর মনে গেঁথে যেত এবং তিনি তা হুবহু শব্দ ও অর্থসহ নিজের লেখায় উল্লেখ করতেন।

আল-হাফিজ আবু হাফস আল-বাদ্দজার তাঁর "আল-আ'লাম আল-'উলইয়্যাহ ফি মানাকিব শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ" নামক কিতাবে বলেন, যখন তাঁকে গ্রেফতার করে মিশরে বন্দি রাখা হয় এবং তিনি তাঁর কিতাবাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হন, তখনও তিনি ছোট-বড় বহু কিতাব রচনা করেন। এতে তিনি হাদীস, আছার,

আলেমদের বাণী, হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম, গ্রন্থকারদের নাম, তাঁদের কিতাবের নাম এবং কোন জায়গায় কোন কথা বলা হয়েছে—সবই উল্লেখ করেন; এবং এ সবই তাঁর স্মৃতি থেকে। কারণ, তখন তাঁর কাছে কোনো কিতাব ছিল না। তাঁর এ সমস্ত কিতাবসমূহ পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, তাতে কোনো ভুল কিংবা বিকৃতি পাওয়া যায়নি। এসব কিতাবের মধ্যে "আস-সারিমুল মাসলুল 'আলা শাতিমির রাসুল" অন্যতম। তিনি এক বৈঠকে "আল-'আকীদাহ আল-হামাওইয়্যাহ" রচনাও শেষ করেন।

আয-যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেন: "তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় কুরআন ও ফিকহ পড়েছেন, বিতর্ক করেছেন ও দলিল পেশ করেছেন। বিশ বছর হওয়ার আগেই ইলম, তাফসীর, ফাতওয়া প্রদান এবং শিক্ষা প্রদানে পাকা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লেখালেখি করেছেন এবং নিজের শাইখদের জীবদ্দশায়ই বড় বড় আলেমদের একজন হয়ে ওঠেন। তাঁর রচনাবলির পরিমাণ চার হাজার খণ্ড বা তার চেয়েও বেশি।"

আশ-শাওকানী বলেন: "তিনি তাঁর যুগের লোকদের সঙ্গে বহু ঝামেলা ও ফিতনার সম্মুখীন হন, বারবার পরীক্ষা দেওয়া লাগে, বারবার বন্দি হন…।" তারপর বলেন: "এই অবস্থা প্রায় প্রতিটি বড় আলেমের সঙ্গেই ঘটে থাকে, যিনি তাঁর যুগের লোকদের ছাপিয়ে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর উপর অটল থাকেন; তখন তাঁর সমসাময়িকদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষের শিকার হন। তারপর তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর মর্যাদা উঁচু হয়ে যায় এবং পরবর্তীদের মাঝে তাঁর স্মরণ সুন্দরভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর ইলম এমন অবস্থানে পৌঁছে যায় যা অন্যদের ইলম পৌঁছায় না। এই ছিল এই ইমামের অবস্থা। মৃত্যুর পর তাঁর মর্যাদা স্বীকৃত হয় এবং সকলের মুখে তাঁর প্রশংসা উচ্চারিত হয়—তবে তারা নয়, যাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই। তাঁর কিতাবসমূহ বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তাঁর বক্তব্যসমূহ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।" তিনি (রাহিমাহুল্লাহ্) দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং আখিরাতমুখী মানুষ ছিলেন।

তাঁর ছাত্র আল-বাদ্দজার বলেন: "তাঁকে কখনো কোনো সুন্দরী স্ত্রী, কিংবা দাসী, চমৎকার বাড়ি, চাকর-বাকর, বাগান-বাগিচা বা সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করতে দেখা যায়নি। তিনি ঘরবাড়ি, টাকা-পয়সা, বাহন, পশুপাখি, দামী পোশাক কিংবা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার পেছনে কখনো দৌড়াননি। নেতৃত্ব চাওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি এবং দুনিয়াবি কিছু অর্জনের চেষ্টা তাঁকে করতে দেখা যায়নি।"

তিনি আরও বলেন: "আমরা কখনো দেখিনি যে, তিনি দুনিয়ার কোনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে কথা বলেছেন, না

তা নিয়ে আলোচনা করেছেন, না তাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বরং তাঁর পুরো মনোযোগ ও আলোচনা ছিল আখিরাত ও আল্লাহর সান্নিধ্যের পথ নিয়ে।"

তাঁর ছাত্র ইবনে কাইয়্যিম বলেন: আমি তাঁকে (ইবনে তাইমিয়্যাহকে)—আল্লাহ তাঁর আত্মাকে পবিত্র করুন এবং তাঁর কবরকে আলোকিত করুন—বন্দিজীবনে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই দুনিয়াতেও একটি জান্নাত রয়েছে; যে এতে প্রবেশ করতে পারবে না, সে আখিরাতের জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।"

তিনি একবার আমাকে বলেন: "আমার শত্রুরা আমার সঙ্গে কী করতে পারবে? আমার জান্নাত আমার হৃদয়ে, আমার বাগান আমার বুকের মধ্যে। আমি যেখানে যাই, তা আমার সঙ্গে থাকে। আমার জন্য বন্দিত্ব হলো—খলওয়াত (নির্জনতা), হত্যাকাণ্ড হলো—শাহাদাত, আর দেশ থেকে বহিষ্কার হলো—ভ্রমণ।"

তিনি বন্দিত্ব অবস্থায় বলতেন: "যদি আমাকে এই দুর্গ ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হতো, তবুও আমি এই নিয়ামতের বদলা দিতে পারতাম না।" অথবা বলতেন: "আমি তাঁদের প্রতিদান দিতে পারতাম না, কারণ তাঁরা আমাকে যে কল্যাণ দিয়েছে তা অশেষ।"

তিনি আরেকবার বলেন: "আসল বন্দী সে, যার হৃদয় আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, আর আসল বন্দী সে, যে নিজ খেয়াল-খুশির বন্দী।"

তিনি যখন দুর্গে প্রবেশ করেন এবং তার দেওয়ালের ভেতরে পৌঁছান, তখন তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন: "তারপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভেতরে রয়েছে রহমত, আর বাইরে রয়েছে শাস্তি।" (সূরা আল-হাদীদ: ১৩)

তাঁর প্রচেষ্টা—আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন—সুন্নাহ প্রচারে, বিদ'আতের দমন, বাতিলের লোকদের সঙ্গে বিতর্ক, তাদের সন্দেহ দূর করা, প্রতারণা ও বিরোধিতা উন্মোচনে—সর্বজনবিদিত।

আল-বাদ্জ্জার বলেন: আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি উপকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে, তার প্রশ্ন

আমার কাছে গুরুত্ব পায়, আমি তার উত্তর বিশ্লেষণ করে দিই, যেন সে শিগগিরই আমার কাছে তার সংশয় নিরসন পায়।”

যে কেউ শাইখুল ইসলামের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে, সে দেখতে পাবে যে তাঁর অধিকাংশ লেখা হলো বিদ‘আত ও বিভ্রান্তির অনুসারীদের খণ্ডন—যেমন দাহরিয়্যাহ (নাস্তিক), কাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, মু‘তাযিলাহ, ওহদাতুল উজূদপন্থী, দার্শনিক, এবং অন্যান্য ফেরকা ও মতবাদের অনুসারীদের খণ্ডন।

আল-হাফিজ আবু হাফস ‘উমর আল-বাদ্দজার বলেন: আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এমন একটি ফিকহ বিষয়ক মূল কিতাব সম্পর্কে, যাতে তাঁর নির্বাচিত মতামত ও তার দলিলসমূহ সংকলিত থাকবে, এবং যেটি ফাতওয়ার রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তিনি এর উত্তরে মূলত বললেন:

“ফর‘ঈ মাসআলা তেমন কঠিন নয়। যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট ইমামের অনুসারী না হয়, তবে স্পষ্ট ভুল না থাকলে সে তাঁর কোনো মতামত অনুযায়ী আমল করতে পারে। কিন্তু উসূল বা মূলনীতি প্রসঙ্গে, আমি দেখেছি যে, বিদ‘আত, বিভ্রান্তি ও খেয়াল-খুশির অনুসারীরা—যেমন দার্শনিক, বাতিনিয়্যাহ, মুলহিদ, ওহদাতুল উজূদপন্থী, দাহরিয়্যাহ, কাদারিয়্যাহ, নুসাইরিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, হুলুলিয়্যাহ, মুজাসসিমাহ, মুশাব্বিহাহ, রাওয়ান্দিয়্যাহ, কুল্লাবিয়্যাহ, সালিমিয়্যাহ ও অন্যান্য বিদ‘আতিদের—তাঁরা মিথ্যা দাবির ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করেছে। আমার কাছে এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তাঁদের অধিকাংশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মহান মুহাম্মদী শরিয়াহকে লুপ্ত করে দেওয়া, যেটি সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী। তাঁদের অধিকাংশ মানুষকে তাঁদের দ্বীনের মূল বিষয়ে সন্দেহে ফেলে দেয়। আমি দেখেছি যে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের বুদ্ধিভিত্তিক তত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাঁদের অধিকাংশই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে বা দ্বীনের বিষয়ে নিশ্চিততা হারিয়েছে। তাই আমার কাছে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, যিনি এর প্রতিবাদ করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এদের যুক্তির খণ্ডন করা, তাদের প্রমাণ বাতিল করা, তাদের প্রতারণা ও বিভ্রান্তি উন্মোচন করা ফরজ। আল্লাহর কসম, আমি এদের মধ্যে কাউকে দেখিনি, যে এ বিষয়ে লিখেছে এবং উচ্চ মর্যাদা দাবি করেছে, অথচ তার লেখা ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়নি। এর মূল কারণ হলো—তাঁদের স্পষ্ট সত্য ও রাসুলদের আনীত ওহির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং তথাকথিত ‘রিওয়ায়াত’ ও ‘আকাল’ নামে প্রচলিত ভুল দার্শনিক পরিভাষা গ্রহণ করা, যা আদতে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।

এই ধরনের ব্যাপারই আমাকে উসূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করেছে এবং তাদের সন্দেহ ও যুক্তিগুলো তুলে ধরে কুরআন ও সুন্নাহ এবং যুক্তিপূর্ণ জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে, যা আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।"

একজন ইহুদি তাকদির সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন কবিতা আকারে আট লাইনে রচনা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, যার মধ্যে ছিল:

হে দ্বীনের আলেমগণ! আমাদের মাঝে রয়েছে এক চুক্তি,

এ ব্যাখ্যার ডোলটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ নিয়ে এসেছে।

যদি আমার রবই আমার কুফর নির্ধারণ করে থাকেন, যেমন তোমাদের দাবি,

আর তিনি তা আমার পক্ষ থেকে পছন্দ করেন না, তবে আমার কী দোষ?

শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ্) এ কবিতাটি দেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন এবং তাঁর আসরে এর উত্তর লিখতে শুরু করেন, তাঁর ছাত্ররা ভাবছিলেন, তিনি হয়তো শুধু নোট নিচ্ছেন। কিন্তু লেখা শেষ হলে তাঁরা দেখলেন—এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কাসিদা, যেখানে প্রশ্নটির বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হয়েছে, এবং যা প্রায় ১৮৪ পঙক্তি বিশিষ্ট, শুরু হয়েছে এই বলে:

তোমার প্রশ্ন এক জিদ্দি বিতর্ককারীর প্রশ্ন,

যে আরশের মালিক, সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টার সঙ্গে বিতর্ক করে।

এই কাসিদাতে এমন জ্ঞান তুলে ধরা হয়েছে, যা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলে দুইটি বড় খণ্ড পূর্ণ হয়ে যাবে।

সুতরাং, আপনি এই ফাতওয়াগুলোর মধ্যে হুলূল (আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির মিলন) ও ইত্তিহাদ (ঐক্যবাদ/প্যান্থেইজম)-এর খণ্ডন দ্বারা দেখতে পাবেন, যেখানে এসব মতবাদের বিরোধিতা ও তাদের জ্ঞানের দৈন্যতা উন্মোচন করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে তাদের পথের ভ্রান্ততা প্রকাশ পায়, এবং শাইখের চেষ্টা-সাধনার উল্লেখ রয়েছে—তাদের দাবিগুলোর খণ্ডন এবং কপট যুক্তিগুলোর অপনোদনে, এবং যেন বুঝা যায় যে, তাদের ভ্রান্তি কত গভীর এবং মিথ্যাচার কত ব্যাপক।

উদাহরণস্বরূপ (২/৩৪২)-এ, ইবনে আরাবী সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে: তিনি তাঁর একজন মুরিদ যিনি খালওয়াতে ছিলেন, তাঁর কাছে প্রবেশ করেন, যিনি তখন প্রশ্রাব করার প্রয়োজনে ছিলেন। ওই মুরিদ বলল: "আমি তাঁর চেয়ে উপযুক্ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যার উপর আমি নিজেকে হালকা করবো।" তখন তাঁর শাইখ তাকে বললেন: "তবে তা যে তোমার পেট থেকে বের হলো, তা কোথা থেকে এলো?" সে বলল: "আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন (বিভ্রান্তি থেকে)।"

উল্লেখ আছে যে, তিলিমসানী ও শীরাযী একটি মৃত, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। শীরাযী তিলিমসানীকে বলল: "এটাও তো তাঁর সত্তারই অংশ।" তিলিমসানী বলল: "তাহলে কি এর বাইরে কিছু আছে?"

তাদের উক্তিগুলোর মধ্যে (৫/৩৬২)-এ আরও বলা হয়েছে: মূর্তির অস্তিত্বই আল্লাহর অস্তিত্ব, এবং যারা মূর্তি পূজা করেছিল তারা মূলত আল্লাহকেই পূজা করেছিল।

তারা বলে: "আস্-সত্য (আল্লাহ) সকল অপূর্ণতা ও অনুশোচনার গুণে বর্ণিত হতে পারেন, যেমনটি সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায়।"

তারা বলে: "বাছুর পূজাকারীরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে পূজা করেনি, এবং ফির'আউনও সত্য বলেছিল যখন সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক।'"

তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'সত্য-অন্বেষক' বলে: "সম্পূর্ণ কুরআন শির্ক, কারণ এতে রব ও বান্দার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে; আর প্রকৃত তাওহীদ শুধুমাত্র আমাদের বাণীতে বিদ্যমান।"

শাইখ এই ফাতওয়াগুলোর মধ্যে, এসব ও তাদের মতদের খণ্ডনের প্রেক্ষিতে বলেন: "তাদের নেতারা কুফরীর ইমাম, যাদের হত্যা করা আবশ্যক; আর তাদের কেউ তাওবা করার আগেই ধরা পড়লে, তার তাওবাও গ্রহণযোগ্য নয়।"

কারণ, সে বড় জিন্দীকদের একজন, যারা বাহ্যত ইসলাম প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে... যতক্ষণ না তিনি বলেন: "এমন প্রত্যেককে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক, যারা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, অথবা তাদের পক্ষে ওকালতি করে, অথবা তাদের প্রশংসা করে, অথবা তাদের কিতাবগুলোর মহিমা করে, অথবা তাদের সাহায্য ও সমর্থন করতে পরিচিত, অথবা যারা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলাকে অপছন্দ করে, অথবা অজুহাত দেয়—যেমন, 'এই কথার অর্থ জানা যায় না', অথবা বলে, 'এই কিতাবটি সে লিখেছে...' ইত্যাদি অজুহাত—যা কেবল একজন মূর্খ বা মুনাফিকই দিতে পারে।"

বরং, প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক, যে তাদের অবস্থা জানে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করে না। কারণ, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সবচেয়ে বড় ফরযগুলোর একটি; কেননা তারা বহু শাইখ, আলিম, বাদশাহ ও আমিরদের বুদ্ধি ও দ্বীনকে ধ্বংস করেছে। তারা জমিনে ফাসাদ ছড়াতে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে।

তাদের দ্বারা দ্বীনের ওপর হওয়া ক্ষতি, তাদের তুলনায় বেশি যারা কেবল দুনিয়াবী বিষয়গুলোর ক্ষতি করে কিন্তু মুসলিমদের দ্বীনের ওপর আঘাত করে না—যেমন ডাকাতেরা। তারা ধনসম্পদ নিয়ে যায়, কিন্তু দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

তাদের প্রকৃত অবস্থাকে কেবল সেই ব্যক্তি বুঝতে পারে যে সত্যিকারের জ্ঞান রাখে; তাদের ভ্রান্তির বর্ণনা দেয়ার ক্ষমতা নেই। তারা বাতিনী তাফসীরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ।

তিনি তাঁর অন্য এক ফাতওয়ায় বলেন: "যদি না তাদের অনুসারীরা সংখ্যায় এত বেশি, প্রভাবশালী ও প্রসিদ্ধ হতো—আর তারা অনেকের দৃষ্টিতে মানবজাতির সেরা, ইসলামের আদর্শ, তাওহীদের লোক, তদন্তকারী এবং সর্বোত্তম পথের পথিক—এমনকি তাদের নবী-রাসূল এবং দ্বীনের বড় শাইখদের চেয়েও উত্তম মনে করা হতো—তাহলে আমাদের এসব বক্তব্যের ভ্রান্ততা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো না।"

তবে জেনে রাখো, ভ্রান্তির কোনো সীমা নেই, এবং যখন বুদ্ধি বিকৃত হয়ে যায়, তখন তাদের বিভ্রান্তির আর সীমা থাকে না। অতএব, মহিমা তাঁরই যিনি মানবজাতির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন—কাউকে করেছেন

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আর কাউকে করেছেন শয়তানের চেয়েও অধম।

এই কারণেই এই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক, যারা আল্লাহ ও তাঁর আওলিয়াদের পাত্রে কুফর ও জিন্দীকির পানীয় পরিবেশন করে, যারা বাহ্যিকভাবে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের পোশাক পরে কিন্তু অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু, এবং যারা কাফের ও মুনাফিকদের কথাগুলোকে সত্য-অন্বেষী আওলিয়াদের শব্দে সাজিয়ে উপস্থাপন করে।

ফলে কেউ তাদের সাথে যুক্ত হয়, আল্লাহর একজন মুমিন ও ওলী হওয়ার আশায়, কিন্তু পরিণামে সে হয়ে যায় একজন মুনাফিক ও আল্লাহর শত্রু।

এটি তাঁর জীবনী থেকে একটি ঝলক, যা তাঁর মর্যাদা, জ্ঞানের বিশালতা, এবং তিনি যেভাবে কল্পনাপ্রবণদের ও বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর খণ্ডন করেছেন তার পরিচয় বহন করে।

তাঁর গুণাবলি ও ফজীলতের উপর পৃথক গ্রন্থ ও বিস্তৃত জীবনী রচিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

এখন আমরা উপস্থাপন করছি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহর ফাতওয়াসমূহের এই বৃহৎ বিশ্বকোষ, যা সৌদি আরবের বাদশাহ খালিদ ইবনে আবদুল আজীজ আলে সৌদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ফাতওয়াগুলোর ব্যাপক চাহিদা ছিল বিশ্বের মুসলিম আলিমদের মাঝে, লেখকের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে—আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন।

তিনি আল্লাহর কিতাবের গভীর উপলব্ধি লাভ করেছিলেন, কুরআনের সূক্ষ্মতা অনুধাবন করতেন, নাসিখ-মানসুখ, মুহকম-মুতাশাবিহ, আম ও খাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর বোধ ও হাদীসের ইলাল (দোষত্রুটি)-এর পূর্ণ জ্ঞান রাখতেন—এমনকি বলা হতো: “যে হাদীস ইবনে তাইমিয়্যাহ জানেন না, সেটি হাদীসই নয়।”

এই ফাতওয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচুর জ্ঞান ও দুষ্প্রাপ্য ফায়দা—যেমন: নাস্তিক, জাহমিয়্যাহ, ফালাসিফা এবং অন্যান্যদের খণ্ডন; সাহাবা, তাবেঈন ও অন্যান্য মুসলিম ইমামদের আকীদা স্পষ্টকরণ;

এছাড়া রয়েছে উসূলুল ফিকহের বহু দিক, এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত বহু গভীর মাসআলা—ইবাদত, লেনদেন, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে।

সারসংক্ষেপে, এই বিশ্বকোষটি নিজ ক্ষেত্রে অনন্য, জ্ঞানে ও উপকারে অপরিসীম, এবং যারা সত্যকে পরিষ্কারভাবে জানতে চায় তাদের সকলের জন্য অপরিহার্য।

আমরা বাদশাহ খালিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই, যিনি এই ফাতওয়াগুলোর মুদ্রণ নিজের খরচে করার আদেশ দিয়ে এর মূল্য ও ইসলামী বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। এটি তাঁর সদা-চলমান অভ্যাসেরই অংশ—উপকারী কিতাব ছাপাতে এগিয়ে আসা, সাওয়াবের আশায় এবং এই আলেমি ও শরঈ ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী থাকা। তিনি বহু উপকারী কিতাব মুদ্রণ করেছেন।

আল্লাহ তাঁকে সকল ভালো কাজে তাওফীক দিন, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য যা কল্যাণকর তার দিকে তাঁর হাত পরিচালিত করুন, এবং তাঁকে নেক পরামর্শদাতা ও সত্যিকার সাহায্যকারীদের দ্বারা সাহায্য করুন।

আমি আল্লাহর কাছে দো'আ করি যেন এই ফাতওয়াগুলো উপকারী হয়, এবং যাঁরা এগুলোর পুনর্মুদ্রণের কারণ হয়েছেন তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের উপর আল্লাহর দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়দ

প্রধান, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

সংকলকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি প্রত্যেক ওহীর বন্ধের যুগে জ্ঞানীদের একটি দল রেখে দেন, যারা চরমপন্থীদের বিকৃতি, মিথ্যাবাদীদের চুরি, এবং বিদআতীদের নতুন উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে কিতাব ও সুন্নাহর রক্ষা করে থাকেন এবং প্রমাণ দ্বারা সত্যকে স্পষ্ট করে দেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, চিরস্থায়ী আশ্রয়দাতা, পরম করুনাময়, চিরন্তন সত্য, সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত।

এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন তাঁর বান্দা ও রাসুল, সত্যবাদী, আমানতদার।

আল্লাহ তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার, সাহাবাগণ ও তাবিঈনদের ওপর দোয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন, এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদেরকে পরিপূর্ণ শান্তি দান করুন।

আম্মা বাদঃ নিঃসন্দেহে, “শাইখুল ইসলাম” তাকীউদ্দীন আহমাদ ইবনে ‘আব্দুল হালীম ইবনে ‘আবদুস সালাম ইবনে আবি আল-কাসিম ইবনে আল-খিদর ইবনে তায়মিয়্যাহ আল-হাররানী, একজন রাব্বানী আলেম, হাফিযদের ইমাম, জ্ঞানের মহাসমুদ্র, উম্মাহর মুফতি, যুগের অনন্য, সময়ের বিস্ময়, আল্লাহর বান্দাদের জন্য প্রমাণরূপে প্রেরিত—তিনি নকলি ও আকলি সকল প্রকার জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন, বিভিন্ন ধর্ম ও ফিরকার মতবাদ, চার মাজহাবের মতামত ও মতপার্থক্যসমূহ—এসবের এমন গভীর জ্ঞান অর্জন করেন, যা পৃথিবীর অন্য কোনো আলেমের মধ্যে, না তাঁর পূর্বে, না তাঁর পরে দেখা যায়নি।

তিনি বিশুদ্ধ শরীআতের বাস্তবতা সঠিকভাবে বর্ণনা করেন, এবং সঠিক ফয়সালা প্রদানে, মিথ্যার প্রতিবাদে ছিলো তাঁর অটল ক্ষমতা। তাঁর দলীল ও যুক্তি মিথ্যাবাদীদের সাজসজ্জাকে কাঁপিয়ে তোলে। তাঁর মাধ্যমে

প্রকাশিত জ্ঞান ছিলো এমন, যা আর কারো মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি। এমন সৌভাগ্য, অনুধাবন এবং বুদ্ধিমত্তা কারো ভাগ্যে জোটেনি।

তাঁর যুগের আলেমগণ লিখেছেন:

“নিঃসন্দেহে, এই মহান শাইখ, সম্মানিত ইমাম, যুগের অনন্য, সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তি—যদি তিনি শপথ করতেন (আর আমি মহান, পরাক্রমশালী আল্লাহর নামে শপথ করছি), তাহলে এই মহান ইমামের সমসাময়িক সময়ে তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই—তাঁর শপথ সত্য হতো এবং কাফফারার প্রয়োজন হতো না। সাত ভূখণ্ডই তাঁর অনুরূপ খুঁজে পেতে ব্যর্থ। প্রত্যেক বিবেকবান ও সুস্থ স্বভাবের ব্যক্তি এতে একমত। আমি তাঁর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করছি না। বরং যদি আমি দীর্ঘ ব্যাখ্যায় তাঁর প্রশংসা করতাম, তবুও আমি তাঁর গুণাবলীর কিছু অংশই কেবল বলতে পারতাম।”

... অবশেষে তিনি বলেন: “তাঁর অনুরূপ পাওয়ার সকল আশা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তিনি নিজ নিজ মতাবলম্বীদের থেকেও তাদের মাজহাব, ফেরকা ও পথসমূহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন; তিনি বিশাল সমুদ্র থেকে আহরণ করতেন, যখন অন্যরা ক্ষুদ্র ঝরনা থেকে আহরণ করত। তাঁর ফজিলত, জ্ঞানের বিশালতা, এবং তাঁর উত্তরসমূহের যথার্থতা ছিলো এক ঐশী বিষয়।”

তাঁর যুগের আলেমগণ তাঁর ব্যাপারে প্রচুর প্রশংসাসূচক বর্ণনা করেছেন, যা তিনি যথার্থভাবেই অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত কিতাব, ফাতওয়া ও বিতর্কসমূহ তার সাক্ষ্য বহন করে।

তাঁর জীবনী নিয়ে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, যার সংখ্যা বর্ণনা করা কঠিন।

আল-বিরযালী বর্ণনা করেন যে, তাঁর শায়খের সংখ্যা ছিলো “একশতরও অধিক।”

তাঁর রচনাগুলোর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে “হাজারেরও অধিক খণ্ড”।

তাঁর এক সাথী বলেন: “শাইখ বা অন্য কেউ যদি তাঁর রচনার সংখ্যা নির্ধারণ করতে চায়, তাহলে পারবে না।”

আয-যাহাবী বলেন: “সম্ভবত তাঁর ফাতওয়াগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনশত খণ্ড অতিক্রম করে, বরং তার চেয়েও বেশি হতে পারে।” তিনি আরও বলেন: “তাঁর ব্যাপারে আশ্চর্যজনক ছিলো—যখন তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা হতো... তখন মনে হতো সুন্নাহ যেন তার চোখের সামনে এবং তাঁর জিভের ডগায়।”

আত্ব-তূফী বলেন: “মনে হতো, সমস্ত জ্ঞান যেন তাঁর চোখের সামনে; তিনি যা ইচ্ছা গ্রহণ করতেন এবং যা ইচ্ছা পরিত্যাগ করতেন।” এবং “তাঁর সামনে আয়াত উপস্থাপন করা হতো... তিনি সেগুলোর ব্যাখ্যা করতেন এবং ১০৯টি আয়াত দ্বারা উত্তর দিতেন।” এবং “তিনি এক বসাতেই অনেক খণ্ড রচনা করে দিতেন।”

জামালুদ্দীন তাঁর ‘আমালী’-তে বলেন: “স্মৃতিশক্তির বিষয়ে এক বিস্ময়কর ঘটনা ছিলো: ইবনে তায়মিয়্যাহ কোনো কিতাবের পাশ দিয়ে যেতেন, তা পড়তেন এবং তা তাঁর মনে স্থায়ীভাবে অংকিত হয়ে যেত, এবং তিনি তা তাঁর নিজের রচনায় শব্দে অথবা অর্থে উদ্ধৃত করতেন।”

তাঁর এক ছাত্র বলেন: “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা এই বান্দাকে এমনভাবে গঠন করেছেন যে, মিশরে তাঁর অবস্থান, তাঁর পরীক্ষাগুলো এবং তাঁর মুক্তি ছিলো মাগরিবের ভূমিতে তাঁর জ্ঞানের বিস্তারের একটি প্রধান কারণ। কেননা, মিশর, এর প্রকৃতি অনুযায়ী, ঐ বিশাল ভূমির জন্য একটি প্রবেশদ্বার, যেমন শাম পূর্ব দিকের ভূমির জন্য হজের কারণে একটি প্রবেশদ্বার। আল্লাহ তাআলা এই ইমামের—যিনি একজন সত্য যাচাইকরণকারী, সমালোচক, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি—বাণীকে উচ্চ করার এবং তাঁর খ্যাতি ও জ্ঞানের বিস্তারের ইচ্ছা করেন পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে। অতঃপর তিনি, সুবহানাহু ওয়া তাআলা, এর জন্য কারণ সৃষ্টি করেন এবং দরজা খুলে দেন। সেই কিতাবগুলো যা মিশর থেকে মাগরিবে পৌঁছেছে জ্ঞানের ছাত্র ও দ্বীনদারদের মাধ্যমে—তাদের সংখ্যার হিসাব আমি দিতে পারি না, অতিশয়তার কারণে। আমি তাঁদের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি চৌদ্দটি কিতাব নিয়ে গিয়েছিলেন,[1] এবং অপরজন তার চেয়েও বেশি এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেগুলো তাদের ভূমিতে প্রচার করেন, অতঃপর আবার অন্য ভাগ

[1] আমাদের শাইখ (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) সম্পর্কে একটি ইশারা: যখন এই দাওয়াহর (আহ্বানের) আলেমদের ফাতওয়াগুলো সংকলিত হচ্ছিল, এবং তার মধ্যে শাইখুল ইসলামের একটি বিশাল সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন তিনি ইঙ্গিত দেন যে আমি সেগুলোকে এমনভাবে সাজাই যাতে তা রেফারেন্সের জন্য সহজ হয়। আমি তা-ই করলাম এবং জটিল বিষয়গুলোতে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলাম। এরপর আমি নজদ ও হিজাজ থেকে কিছু খণ্ড সংগ্রহ করে সেগুলো সাজালাম। যখন চিকিৎসার জন্য সফরে যাই, তখন যেটুকু সম্ভব ছিল তা সংগ্রহ করি, এবং আমার পুত্র মুহাম্মদ (আল্লাহ তাকে সাফল্য দান করুন) এতে আমাকে সহায়তা করে। সে যা সংগ্রহ করেছিল, তা আমার সংকলনের সাথে সংযুক্ত করে। আমার সাফল্য তো কেবল আল্লাহরই মাধ্যমে।

নিতে ফিরে আসেন। আর যেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেগুলোর পরিমাণ অতিশয়। আল্লাহ তাআলার হুকুমই তাঁর সৃষ্টিতে কার্যকর হয়।”

তাঁর ফাতওয়াগুলোর অপার উপকারিতা, সেগুলোর ওপর নির্ভরতা, সেগুলোর পরিশ্রম এবং সঠিক পথের ব্যাখ্যার কারণে, আমি মক্কা, নজদ, হিজাজ, শাম ও অন্যান্য স্থানের কিছু কুতুবখানায় এগুলোর পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান করি। আমি এগুলো থেকে ত্রিশের অধিক খণ্ড সংগ্রহ করি এবং সেগুলোর সংকলন করি। এটি একটি সূচনা মাত্র; সম্ভবত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন কাউকে মনোনীত করবেন, যিনি এই ফাতওয়াগুলো পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম থেকে এবং এমন কুতুবখানা থেকে যা আমরা পৌঁছতে পারিনি, তা সংগ্রহ করবেন এবং আমাদের সংকলনের সাথে সংযুক্ত করবেন। তিনি, সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তিনিই একমাত্র যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।[2]

আমি কিতাব তাওহীদ আল-উলুহিয়্যা (উপাসনার একত্বের গ্রন্থ) দ্বারা শুরু করি, এরপর কিতাব তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যা (প্রভুত্বের একত্বের গ্রন্থ), এরপর কিতাব মজমূ‘ ই‘তিকাদ আস-সালাফ (সালাফদের সংকলিত আকীদার গ্রন্থ), এরপর কিতাব মুফাসসাল আল-ই‘তিকাদ (বিস্তারিত আকীদার গ্রন্থ), এরপর কিতাব আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর গ্রন্থ), এরপর কিতাব আল-ঈমান (ঈমানের গ্রন্থ), এরপর কিতাব আল-কাদার (তাকদীরের গ্রন্থ), এরপর কিতাব আল-মান্তিক (যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ), এরপর কিতাব ‘ইলম আস-সুলূক (তাসাওউফের পথচলার বিদ্যার গ্রন্থ), এরপর কিতাব আত-তাসাওউফ (তাসাওউফের গ্রন্থ), এরপর কিতাব আল-কুরআন কালামুল্লাহ হাকীকাতান (গ্রন্থ: কুরআন সত্যিকারার্থে আল্লাহর বাক্য), এরপর কিতাব মুকাদ্দিমাত আত-তাফসীর (গ্রন্থ: তাফসীরের ভূমিকা), এরপর কিতাব মা ফুসসিরা মিন আওয়াল আল-কুরআন ইলা আর-রুসুল (গ্রন্থ: কুরআনের শুরু থেকে সূরা আম্বিয়া পর্যন্ত তাফসীর), এরপর কিতাব মা ফুসসিরা মিন আর-রুসুল ইলা আল-ইখলাস (গ্রন্থ: সূরা আম্বিয়া থেকে সূরা ইখলাস পর্যন্ত তাফসীর), এরপর কিতাব তাফসীর সূরাতুল-ইখলাস ওয়াল-মু‘আউইযাতাইন (গ্রন্থ: সূরাতুল-ইখলাস এবং দুই আশ্রয় প্রার্থনার সূরার তাফসীর), এরপর কিতাব আল-হাদীস (হাদীসের গ্রন্থ), এরপর কিতাব উসূল আল-ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি), এরপর কিতাব আল-ইত্তিবা‘ (সুন্নাহ অনুসরণের গ্রন্থ)।

---

[2] যিনি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁর কর্তব্য হলো এর মর্যাদা জানা, কেননা এটি মিশরের কিছু লোকের কথিত তাহকীক (তথ্য যাচাই) থেকে মুক্ত, যারা শায়খের স্তরে পৌঁছেনি। এটি তাদের শিরোনাম নির্ধারণ, বক্তব্য পরিবর্তন এবং তাদের টীকাভাষ্য থেকেও মুক্ত। তারা যেন সতর্ক থাকে এমন আপত্তি ও ভুল থেকে, যা একজন বিচক্ষণ সমালোচকের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এরপর কিতাব আত-তামাযযুব (একটি মাযহাব অনুসরণের গ্রন্থ), এরপর কিতাব আত-তাহারাহ (পবিত্রতার গ্রন্থ), এরপর কিতাব আস-সালাহ (সালাতের গ্রন্থ), এরপর কিতাব সুজূদ আস-সহু ইলা সালাত আহল আল-আ'যার (গ্রন্থ: ভুলে যাওয়া সেজদা থেকে ওযরপ্রাপ্তদের সালাত পর্যন্ত), এরপর কিতাব সালাত আহল আল-আ'যার ইলা আয-যাকাহ (গ্রন্থ: ওযরপ্রাপ্তদের সালাত থেকে যাকাত পর্যন্ত), এরপর কিতাব আয-যাকাহ ফাস-সাওম (যাকাত ও রোযার গ্রন্থ), এরপর কিতাব আল-হজ্জ (হজের গ্রন্থ), এরপর কিতাব আল-জিহাদ (জিহাদের গ্রন্থ), এরপর কিতাব আল-ব্যয় ইলা আস-সুলহ (গ্রন্থ: ক্রয়-বিক্রয় থেকে মীমাংসা পর্যন্ত), এরপর কিতাব আস-সুলহ ইলা আল-ওয়াকফ (গ্রন্থ: মীমাংসা থেকে ওয়াকফ পর্যন্ত), এরপর কিতাব আল-ওয়াকফ ইলা আন-নিকাহ (গ্রন্থ: ওয়াকফ থেকে বিবাহ পর্যন্ত), এরপর কিতাব আন-নিকাহ (বিবাহের গ্রন্থ), এরপর কিতাব আত-তালাক (তালাকের গ্রন্থ), এরপর কিতাব আত-তালাক ইলা আয-জিহার ইলা কিতাল আহল আল-বাগি (গ্রন্থ: তালাক থেকে যিহার, এরপর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত), এরপর কিতাব কিতাল আহল আল-বাগি ইলা আল-ইকরার (গ্রন্থ: বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে স্বীকারোক্তি পর্যন্ত), এরপর শাইখুল ইসলাম -এর জীবনী এবং তাঁর যে সকল গ্রন্থ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেগুলোর উল্লেখ, এবং আমি যে সকল ফতোয়া সংগ্রহ করেছি তার একটি সূচি, উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর ও তাদের অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত।

যেহেতু অনেক বিষয় এমন রয়েছে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে, মৌলিকভাবে, উদাহরণস্বরূপ, পার্শ্বভাবে অথবা অন্য যেকোনোভাবে একাধিক শাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই প্রতিটি বিষয়কে আলাদা করে গ্রন্থ অনুযায়ী বিভাজন করা যথাযথ হবে না। বরং এসব বিষয়কে তাদের অনুরূপ বিষয়ের সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে রাখলে তার ফতোয়াগুলোর প্রতিটি বিষয়ে সঠিক রেফারেন্স পাওয়া সহজ হবে। এই বিস্তৃত সূচির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রন্থ ও তার অন্যত্র উল্লেখিত আলাপ থেকে সকল ফতোয়াতে প্রবেশের পথ সহজ হবে। আল্লাহই সফলতা দানকারী; তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং তাঁর ছাড়া কোনো রব নেই।

আবদুর রহমান ইবনে কাসিম

সম্পাদকের ভূমিকা

আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম দয়ালু, অতি দয়াবান।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রতি ঈমান ও তাঁর উদ্দেশ্যে কাজের একনিষ্ঠতাকে সুখের কেন্দ্রবিন্দু করেছেন, যিনি তাঁর একত্বের প্রমাণ এই সৃষ্টিজগতের উদ্ভব ও পরিচালনার মধ্যে উপস্থাপন করেছেন পরিপূর্ণ জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছার মাধ্যমে; এবং আমাদের অবহিত করেছেন যে এই সৃষ্টিজগত একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সৃজিত হবে।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই—তাঁর সুন্দর নামসমূহ, গুণাবলী ও যাবতীয় শরীয়তের ক্ষেত্রে।

এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসুল, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, যাকে তিনি সকল মানবজাতির জন্য সকল পথ ও পন্থা সহকারে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ যেন তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি দরূদ পাঠ করেন—যারা শরীয়াহ্ ও ভূমি উন্মুক্ত করেছেন, আকীদাহ, ফরয ও সুন্নাহ্ পরিপূর্ণ করেছেন, শরীয়াহ্‌র গভীর উপলব্ধি লাভ করেছেন এবং মর্যাদা ও উচ্চ স্তরের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন—এবং তাদের প্রতি সালাম পৌঁছান কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

এরপর বলি: আমি মনে করি, এই মূল্যবান সংকলন এবং মহান ইমাম, প্রজ্ঞাবান আলিম, রাসূলগণের সুন্নাহ্‌র পুনরুজ্জীবনকারী এবং গোমরাহ ও বিদআতিদের দলকে দমনকারী, দুনিয়া ও দ্বীনের তাজকী-মূলক ব্যক্তি শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী রহিমাহুল্লাহ—তাঁর এই বিশাল ও মহৎ জ্ঞানভাণ্ডার উপস্থাপনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে, পাঠক ও গবেষকদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করা আমার কর্তব্য। যাতে ব্যাখ্যা করা হয় এই সম্পূর্ণ সংকলন-এর বিষয়বস্তু, এর সংকলনের কাহিনী ও ব্যবস্থাপনার ধরন, এবং এই কাজে আমার সম্মানিত পিতা—যিনি তাওফীকপ্রাপ্ত—যে পরিশ্রম করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়; সেইসাথে গ্রন্থাগারসমূহ যেগুলো এই পাণ্ডুলিপিসমূহ সংরক্ষণ করেছিল, যেখান থেকে কপি

করা হয়েছে বা ছবি তোলা হয়েছে, সেসবের পাণ্ডুলিপির নম্বর, সংশোধনের পদ্ধতি ও সূচিপত্র, এবং এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রধান মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ, ও সেই উদার ব্যক্তিবর্গ যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই মহান, কালজয়ী ইসলামী ঐতিহ্যকে বাস্তব রূপ দানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

তাই আমি বলছি:

নতুন সংকলনের উপাদানসমূহ

এই মূল্যবান সংকলন—অথবা এই মাজমুআ (সংকলন)—মূলত ফাতওয়া (ধার্মিক মতামত)-সমূহ নিয়ে গঠিত, যার সংখ্যা সর্বাধিক; এবং এতে কিতাব, পত্র, ও প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত আছে। এর খণ্ড সংখ্যা চৌত্রিশ—আংশিক মুদ্রিত, যার মুদ্রিত অংশে আনুমানিক (৭০০০) পৃষ্ঠা রয়েছে, এবং একটি বিভাগ যা আগে কখনো মুদ্রিত হয়নি, বরং সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারের কোণায় কোণায় লুকিয়ে ছিল। এই সংকলনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি অংশ—যা পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল—কখনো প্রকাশিত হয়নি।

সংগ্রহের সূচনা — নাজদ থেকে

আমার সম্মানিত পিতা—আল্লাহ্ যেন তাঁর সময়কে বরকত দান করেন এবং তাঁর এই সংকলন ও রচনার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের উপকৃত করেন—এই ফাতওয়াগুলো সংগ্রহ শুরু করেন সেই সময়ে যখন নাজদ-এ সংকলন ও রচনার আন্দোলন বিকশিত হচ্ছিল: ১৩৪০ হিজরির পর থেকে। নাজদের আলেমদের ফাতওয়া অনুসন্ধান করতে গিয়ে, তিনি শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল লতীফ (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর কাছে প্রায় তিন খণ্ড ফাতওয়া পান—তাঁর কাছেই সবচেয়ে বেশি ফাতওয়া পাওয়া যায়। তিনি (রাহিমাহুল্লাহ্) শাইখুল ইসলাম এবং দাওয়াতের ইমামদের কাজের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন, এবং তাঁর গ্রন্থাগার আজও বিদ্যমান। আমার পিতা শাইখ ও তলবায়ে ইলমদের নিকট থাকা পাণ্ডুলিপিসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্ত করেন এবং যাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব ছিল, তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। নাজদ ছিল এবং এখনো—আলহামদুলিল্লাহ্—শাইখুল ইসলামের কাজ থেকে সর্বাধিক উপকৃত অঞ্চল, সেগুলো প্রচার ও পাঠদানে অগ্রগণ্য।

হিজাযে

তিনি যখন নাজদি দাওয়াহর ইমামদের ফাতওয়া সংশোধনের কাজ করেন—মক্কা মুকাররামায়—তখন তিনি হারাম শরীফের গ্রন্থাগারে থাকা পান্ডুলিপিসমূহ অনুসন্ধান করেন। সেখান থেকে তিনি বেশ কিছু মাসআলা সংগ্রহ করেন, এবং কিছু সম্মানিত আলেম থেকেও মাসআলা সংগ্রহ করেন।

সংকলন ব্যবস্থা শুরু

যখন তিনি তাঁর হাতে থাকা পান্ডুলিপিসমূহ সংগ্রহ করেন, তখন সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতী, শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম তাঁকে পরামর্শ দেন, যেন তিনি বিদ্যমান পান্ডুলিপি ও মুদ্রিত ফাতওয়াগুলোকে একত্র করে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজান, যেমনটি সাধারণত আলেম ও ছাত্ররা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন, যাতে করে গবেষণার সুবিধা হয়।

তিনি এই দিকনির্দেশনা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং সাজানোর কাজ শুরু করেন। তিনি একটি ফিকহ বিভাগ তৈরি করেন—যা পরবর্তী হাম্বলি আলেমদের কিতাব যেমন: যাদুল মুস্তাকনি' ও তার ব্যাখ্যার অনুক্রম অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে; একটি উসূলুদ্দীন বিভাগ—যাতে আকীদা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত; একটি তাফসীর বিভাগ; একটি হাদীস বিভাগ; এবং একটি মন্তিক (যুক্তিবিদ্যা) বিভাগ তৈরি করেন।

যখন তিনি দেখতেন কোনো মাসআলা দুইটি বিষয়ে বা একটি বিষয়ের দুইটি অধ্যায়ে আলোচনা করছে—যেখানে একটিকে আলাদা করা যায় অপরটির অর্থ ব্যাহত না করে—তখন তিনি তা আলাদা করে আলাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করে যথাযথ স্থানে রাখতেন। তিনি বহু মাসআলা নিজ হাতে কপি করেন এবং কিছু অন্যদের দিয়ে করান। এই পান্ডুলিপি ও মুদ্রিত কাজসমূহের সংকলন, ব্যবস্থাপনার পর প্রায় বিশ খণ্ডে পৌঁছে যায়। এরপর যখনই কোনো ফাতওয়া মুদ্রিত হতো, তিনি তা সংযোজন করতেন। তিনি এই সংকলন থেকে শাইখুল ইসলামের জীবনী, তাঁর দলীল ব্যবহারের পদ্ধতি, ইজমা ও ইখতিলাফ উদ্ধৃতির পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। এই জ্ঞান তিনি তাঁর নিজের লেখায় অন্তর্ভুক্ত করেন, যা তাঁর লেখাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও যাচাইপ্রাপ্ত করেছে।

শাইখ জানতে পারেন—কিছু গ্রন্থাগার পরিদর্শনকারীর মাধ্যমে—যে, শাইখুল ইসলামের কিছু মাসআলা মিশরের জাতীয় গ্রন্থাগারে (দারুল কুতুব আল-মিশরিয়া) সংরক্ষিত আছে।

এটি ছাপানোর কাজ বিলম্বিত করে; যতদিন আল্লাহ্ চেয়েছেন, ততদিন তা স্থগিত থাকে। এরপর তিনি ১৩৬৫ হিজরিতে মিশর সফরের ইচ্ছা করেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

ফাতওয়া সংগ্রহের প্রথম সফর

১৩৭২ হিজরিতে, আমার পিতা চিকিৎসার জন্য বৈরুত সফর করেন। চিকিৎসা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে এবং কিছু অপারেশন করানোর পর—যেগুলো সফল হয়নি—তিনি বৈরুত পাবলিক লাইব্রেরির দিকে রওনা হন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী; সঙ্গে করে পূর্বে সংগ্রহ করা ফাতওয়াগুলো এবং সেগুলোর একটি বিশেষ সূচি নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি এই সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলাম। আমরা সেখানে অনুসন্ধান করি, কিন্তু শাইখুল ইসলাম -এর কোনো ফাতওয়া খুঁজে পাইনি। বলা হয়েছিল, সেখানকার পাণ্ডুলিপিগুলো অনেক আগে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত-এর লাইব্রেরিতেও অনুসন্ধান করেন, কিন্তু সেখানেও কিছুই পাননি।

শামে ফাতওয়া ও কিতাব সংগ্রহের ঘটনা

আমার পিতার কাছে একটি কাগজ ছিল, যাতে আয-যাহিরিয়্যাহ লাইব্রেরি (দামেস্ক)-তে থাকা তিনটি বিষয়ের নম্বর লেখা ছিল, যা তাঁকে কিছু সদ্বংশজ আলিম জানিয়েছিলেন, যাঁরা ওই লাইব্রেরি সফর করেছিলেন। তিনি আমাকে আদেশ করেন যে, আমি দামেস্ক সফর করে এগুলো কপি করে আনব—যদিও তিনি তীব্র অসুস্থতায় ভুগছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসা চলছিল। আমি দামেস্ক পৌঁছে কপি করা শুরু করি। যখন আমি আল-কাওকাব আদ-দুরারী নামক কিতাব থেকে নকল করছিলাম, আমি একটি খণ্ড খুললে তার মধ্যে শাইখুল ইসলামের নামে সংযুক্ত কিছু ফাতওয়া ও প্রতিবেদন পেতে শুরু করি—যেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি পূর্বে জ্ঞাত ছিলাম না। আমি পাঠ ও অনুসন্ধান চালিয়ে যাই, আল-কাওকাব আদ-দুরারী-এর সব উপলব্ধ খণ্ড—যার সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি—ব্রাউজ করি, এবং হঠাৎ একসঙ্গে বহু মূল্যবান বিষয়ে পৌঁছে যাই। আমি এসব বিদ্যাপ্রাচুর্যে অত্যন্ত আনন্দিত হই, এবং এই সফলতা আমাকে অনুসন্ধানে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। কখনো কখনো সন্দেহ হতো যে, কিছু বিষয় হয়তো বাদ পড়েছে, তখন আমি আমার পিতার সংগ্রহ করা সূচির সাথে মিলিয়ে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়গুলো সংযুক্ত করতাম এবং পূর্বে সংগৃহীতগুলোর নম্বর ঠিক রাখতাম, আশা করতাম একদিন হয়তো এই পাণ্ডুলিপিগুলোর সঙ্গে বিদ্যমান কপিগুলোর তুলনা করা সম্ভব হবে।

তারপর আমি জাওয়ামি‘ (সংকলন)-সমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করি, যার সংখ্যা ছিল ১৫০-এর অধিক। এসবের মধ্যে এমন বহু বিষয়ে ছিল যা অন্য কোথাও ছিল না, এবং পুরনো হস্তলিপিতে লেখা। এর মধ্যে শাইখুল ইসলাম-এর নিজ হাতে লিখিত (৮৫০)-এর অধিক পৃষ্ঠা ছিল।

এসব সংকলনের মধ্যে একটি ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে লেখা খসড়া সংকলন, যার কোন অনুলিপি কোথাও নেই। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল (৬৬৪)। প্রতি পৃষ্ঠায় সর্বনিম্ন (২০) লাইন, গড়ে (২৭) লাইন, এবং কিছু পৃষ্ঠায় (৭০) লাইন ছিল। প্রতিটি লাইনে সাধারণত পনেরো থেকে বিশটি শব্দ থাকত। অনেক পৃষ্ঠায় এক বা একাধিক মার্জিন থেকে লেখকের হস্তলিপি বেঁকে গেছে। আলাদা করে ছাপা হলে এটি চার বা পাঁচ খণ্ডে পরিণত হতো। এতে কিছু ফাঁকা স্থান ছিল—কিছুতে অর্থ পূর্ণ, কিছু ফাঁকা থাকলেও ক্ষতিকর নয়। বাঁধাইকারি এটি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে; অধিকাংশ পৃষ্ঠার পাঠ্য অংশের বাইরে কেটে ফেলেছে, ফলে অনেক মার্জিনাল নোট, লাইনের শেষভাগ, এবং পৃষ্ঠার উপরের-নিচের অংশ কেটে গেছে। কপি-কারি সেগুলো হুবহু লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই সংকলনের বৈশিষ্ট্য হলো এর গভীর অর্থবোধ এবং কিছু আলোচনার স্বকীয়তা যা তাঁর অন্যান্য কিতাবে নেই। এতে বহু শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি তাঁর সেরা হস্তলিপির নিদর্শন (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন)।

অন্য কিছু জাওয়ামিতে তাঁর হস্তলিপিতে লেখা পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে—কিছু ধারাবাহিক, কিছু বিচ্ছিন্ন।

জাওয়ামি সম্পন্ন করার পর, আমি প্রত্যেক কিতাব তালাশ করি যার লেখকের নাম উল্লিখিত ছিল না বা যেগুলোতে নোট ছিল; সেগুলোতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিষয় পেয়েছি। অতঃপর আমি লাইব্রেরির দুসূত (ফাইলসমূহ)-এ অনুসন্ধান করি এবং সেখানে কিছু ফাতওয়া ও তাঁদের জবাব পাই। অনুসন্ধান ও ব্রাউজিং-এর সময়কাল ছিল ছয় মাস, যাতে প্রায় (১২০০) হস্তলিখিত খণ্ডের মধ্যে (৯০০) খণ্ড পর্যালোচনা করা হয়।

সারসংক্ষেপে, সেখানে পাওয়া গিয়েছে (৮৫০) পৃষ্ঠা—যা পূর্বে উল্লেখিত—শাইখুল ইসলামের নিজের হাতে লেখা, এবং (৩৫৩)-এর বেশি বিষয়—যার মধ্যে রয়েছে ফাতওয়া, উদ্ধৃতি, ও প্রতিবেদন—যেগুলো তাঁর পূর্বে মুদ্রিত ফাতওয়া ও কিতাবে ছিল না, এবং সংশোধনের জন্য সহায়ক সহস্রাধিক পৃষ্ঠা।

যাহিরিয়া লাইব্রেরির পান্ডুলিপির নম্বরসমূহ

আল-কাওকাবের নম্বরসমূহ

(৬৪৫, ৪২৫, ৫৫৩, ৪৪৩, ৪৯৬, ৩৬১, ১৮২, ২০৪)

(১৫১/৫৮০, ১৫১/৩৭২, ১৫১/৫২৫, ১৫১/৫৩৪, ১৫১/৫৩৪, ১৫১/৫৬২, ১৫১/৫৬৮, ১৫১/৫৬৯, ১৫১/৫৫২, ১৫১/৫৬৩, ১৫১/৫৩৭, ১৫১/৫৬৩, ১৫১/১৮১, ১৫১/৫৫৩, ১৫১/৫৭১, ১৫১/৫৪৮, ১৫১/৫৬০, ১৫১/৫৬২, ১৫১/৫৩৪, ১৫১/৫৫৪, ১৫১/৫৬৫, ১৫১/৫৬৪, ১৫১/৫৮৭)

জাওয়ামি'র ও অন্যান্যর নম্বরসমূহ

(৬৩, ৯১, ১৩১, ১০৯, ৯৯, ৩, ৫, ১৮, ৩৩, ৩৪, ৪৭, ৬১, ৭২, ১৩৮, ১৩৯, ৬৯, ৪০, ৩৭৪, ৬৩৩৭, ৫৯৪৩, ৫৪৪৩, ৪৪২৪, ১০, ৩, ৪, ৬৮, ৬৯, ৬৭ (শাফেয়ী ফিকহ), (সাধারণ ফিকহ))

দামেস্কের জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে যা স্থানান্তরিত হয়েছিল

আমি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্ত চালিয়ে যাই। আমি শাইখ হাসান আশ-শাত্তীর কাছে দুটি ওয়াক্ফ (সম্পত্তি দান) সম্পর্কিত কিতাব পাই—যা শাইখুল ইসলাম ও অন্যদের সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মদ হামদী সফরজালানীর কাছে তারাওয়ীহ নামায, ইমামতি ও অন্যান্য বিষয়ে মাসআলা পাই—যেগুলোর হস্তলিপি ছিল অত্যন্ত পুরনো। তাঁর এক ভাইয়ের কাছেও কিছু মাসআলা পাই। আমি এগুলো আলোকচিত্রে ধারণ করি। অন্যান্য লাইব্রেরিও ছিল, কিন্তু সেগুলোতে আমাদের উদ্দেশ্যসংশ্লিষ্ট কিছুই ছিল না।

হালব ও হামা শহরে

হালবের আওকাফ লাইব্রেরিতে কিছু মাসআলা ছিল, যেগুলো আমি আলোকচিত্রে ধারণ করি। সেখানে অনেক পান্ডুলিপিই আমার সফরের সময় তালিকাভুক্ত ছিল না। হামা শহরে কিছুই প্রাসঙ্গিক পাওয়া যায়নি।

বাগদাদে

শামের অঞ্চল—যা শাইখুল ইসলামের জন্মভূমি ও কর্মভূমি—থেকে যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল, তা নিশ্চিত হওয়ার পর আমি ইরাক সফরের ইচ্ছা পোষণ করি, যেন সে অঞ্চল থেকেও ফাতওয়া সংগ্রহ করা যায়। অনুসন্ধানের পর আমি বাগদাদের আওকাফ লাইব্রেরি থেকে এত পরিমাণ মাসআলা পাই যে একটি খণ্ড পূর্ণ করা যায়।[3] এর মধ্যে সম্পূর্ণ তাদমুরীয় রিসালা ছিল, যা নু'মান আল-আলূসীর হস্তাক্ষরে লেখা ছিল; এতে যা অতিরিক্ত ছিল তা ছাপা সংস্করণে সংযুক্ত করেছি। আলূসীদের লাইব্রেরিতে শাইখুল ইসলামের রচিত কিছু কিতাব ও পত্র ছিল, এর মধ্যে ছিল আদ-দুরারুল মাদীয়্যার চতুর্থ খণ্ড—যা মিশরের ফাতাওয়ার সারসংক্ষেপ। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০১। এটি আমরা অনুসন্ধান করা অঞ্চলগুলোতে পাওয়া যায়নি—যদিও এর অনুলিপিকারক ছিলেন নাজদের অধিবাসী। এতে হাজ্জ অধ্যায় থেকে শুরু করে ইকরার অধ্যায় পর্যন্ত ৪৭৩টি মাসআলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি বাগদাদের ইরাকি জাদুঘরের গ্রন্থাগারেও অনুসন্ধান করি এবং সেখানে সৎ আলেমদের একটি দলের সাথেও মিলিত হই।

আওকাফ লাইব্রেরিতে পাওয়া জাওয়ামি'র নম্বরসমূহ

(৬৪৫৪, ৬৬৮৫, ৪৭১৫, ৭০৭৩, ৪৮৬২, ৩৫৪৪, ৮৪৮৩, ৬৯০২, ৭১২৩, ৭০০২, ৬৮৯৮, ৪২৬৭)

আমি বসরা, এরপর কুয়েত ও পরে তুরস্ক সফরের সংকল্প করেছিলাম, কিন্তু আমার আব্বার স্বাস্থ্যের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ ছিল, আর তিনি ইতোমধ্যে বৈরুতে আট মাস কাটিয়েছিলেন, ফলে আমি বাধ্য হই তাঁর কাছে ফিরে যেতে। এরপর আমরা আমাদের দেশে ফিরে আসি।

কায়রো ও প্যারিসের দ্বিতীয় সফর

আল্লাহ তায়ালা শাইখুল ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডারকে বিদেশি লাইব্রেরিগুলোর গোপন সংগ্রহে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, এবং আল্লাহ আমাদের আব্বাকে সেই ফাতওয়াগুলো সম্পূর্ণরূপে সংকলনের তাওফিক দান করেন। দীর্ঘ অসুস্থতা সহ্য করার বিনিময়ে উপকারি সফরের সওয়াব দান করেন। অতঃপর তিনি কায়রো হয়ে প্যারিস সফর করেন। আমরা কায়রো পৌঁছাই এবং মিশরের জাতীয় গ্রন্থাগারে পৌঁছার তাওফিক লাভ করি। আমরা সেখানে জাওয়ামি ও আল-কাওকাব আদ-দারারীর খণ্ডগুলো পর্যালোচনা করি। এ সংগ্রহ থেকে

---

[3] যার মধ্যে একটি পাণ্ডুলিপি ছিল 'আনুমতি ও বাস্তবতা' (আল-জায়িয ওয়াল-হাকীকাহ) বিষয়ক—যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল (১২)। এছাড়া তাকদীর, বান্দার কার্যকলাপ (আফ'আলুল 'ইবাদ) এবং অন্যান্য বিষয়ে রচিত আরও কিছু রিসালাও সেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা একটি মধ্যম আকৃতির খণ্ড সংগ্রহ করি, যা আমাদের আগে ছিল না।

আল-কাওকাব ও জাওয়ামি'র নম্বরসমূহ

(৬৪৫, ৪২৫, ৫৫৩, ৪৪৩, ৪৯৬, ৩৬১, ১৮২, ২০৪)

প্যারিসে

অপারেশন হওয়ার পর এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করার পর—আলহামদুলিল্লাহ—আমরা পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার (বিবলিওথেক ন্যাশনাল)-এ রওয়ানা দিলাম। আমরা সেখানে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহের জন্য ছাপানো আরবি ভাষার সূচিপত্রসমূহ অনুসন্ধান করতে থাকি—যেগুলোতে প্যারিস, লন্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা এবং তুরস্ক ও অন্যান্য দেশের কিছু পাণ্ডুলিপির সূচিপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উক্ত সূচিপত্রসমূহে (১৩)টি মাসআলা ছিল, যা ঐ সফরে আলোকচিত্রে ধারণ করা হয়েছিল, এবং যা আমরা আরব দেশসমূহে খুঁজে পাইনি।

বার্লিন ও ভিয়েনায় হস্তলিখিত মাসআলার সংখ্যা

(নম্বরসমূহ: ৬৫৭, ৩৩০৯, ৬৫৭৪, ৩০৭৫, ৬৫৭০, ৬৫৭১, ৬৫৭২, ৪০৪৭, ৬৫৭৩, ৬৫৭৭, ৯৬৬৪, ৩৫৭০, ৬৫৭০, ৬৫৭১, ৬৫৭৩)

প্যারিস থেকে কায়রো হয়ে দামেশকে ফিরে এসে আমরা দারুল কুতুব আল-মিশরিয়্যাহ-এর সূচিপত্র পুনরায় পর্যালোচনা সম্পন্ন করি। লেখকগণ মাসআলাগুলোর অনুলিপি তৈরি শুরু করেন, আর আমি আল-যাহিরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে যা ছিল তা—শাইখুল ইসলাম-এর নিজের হস্তলিপিতে—আলোকচিত্রে ধারণ করি। যদিও কিছু ছবি অস্পষ্ট ছিল এবং বইটি ছিল পুরাতন; তা লেখকের সময়ে কেবল তাঁর নিকটতম ছাত্রগণই পড়তে পারতেন। কপি বা তুলনার জন্য আমাদের সময় ছিল না, কেবল কিছু মাসআলা ব্যতীত।

তৃতীয় সফর

১৩৮০ হিজরিতে মহামান্য সম্মানিত বাদশাহ (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন ও পুরস্কৃত করুন) এই ফতোয়াগুলো মুদ্রণের নির্দেশ দেন। তিনি এ মুদ্রণের প্রস্তুতি ও সংশোধন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করেন। এরপর আমি বাগদাদ-এ গমন করি আদ-দুরার আল-মাদিইয়্যাহ-এর চতুর্থ খণ্ড ক্রয় করার জন্য এবং আওকাফ লাইব্রেরি-তে থাকা মাসআলাগুলো কপি করানোর জন্য; এবং দামেশক-এ যাই দক্ষ অনুলিপিকারদের সাথে সমন্বয় করার জন্য—যাঁরা পুরনো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি কপি করতে পারদর্শী—যাতে শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর হস্তলিপির আলোকচিত্রের অনুলিপি তৈরি করা যায়, এবং আল-যাহিরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে যা কিছু ছিল, তার পুরোটাই আলোকচিত্রে ধারণ করা যায়, যাতে ছাপা ফতোয়া ও হস্তলিপি পরস্পরের সাথে তুলনা করা যায় এবং পূর্বে যা কপি করা হয়নি, তা আলোকচিত্রে ধারণ করা যায়। সব কিছুই আলোকচিত্রে ধারণ করা হয়, এবং হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো আলোকচিত্রে ধারণ করতে ব্যবহৃত ফিল্ম-এর সংখ্যা (১০)টি ছাড়িয়ে যায়; প্রত্যেক ফিল্মে বারোশত পৃষ্ঠা ধারণ করা সম্ভব। আমরা আশ-শাত্তী-র কাছে থাকা দুটি বইও আলোকচিত্রে ধারণে সফল হই। আমরা শাম অঞ্চলে শাইখুল ইসলামের সম্পূর্ণ হস্তলিপি আলোকচিত্রে ধারণ করতে পারিনি। আমি অনুলিপিকারকে সাহায্য করি তিনি যা কঠিন মনে করেন তাতে, এবং আমি আশা করি, তাঁর কোনো হস্তলিপি আমাদের জন্য দুর্ভেদ্য হয়ে থাকবে না।

আমাদের সংশোধন ও সূচিপত্র প্রণয়নের পদ্ধতি

আল-যাহিরিয়্যাহ-এর হস্তলিখিত মূল পাণ্ডুলিপিসমূহই ছিল আমাদের প্রধান সূত্র, যার ভিত্তিতে তুলনা করা হয়।

এসবই ছিল সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। যা কিছু আমার পিতা নাজদ ও হিজাজ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন, তার মধ্যে ছিল হাতে লেখা অনুলিপি এবং কিছু মুদ্রিত সংস্করণ, যা একাধিক অনুলিপির ভিত্তিতে মুদ্রিত হয়েছিল। তুলনা করা হয় উপরে উল্লিখিত মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এসব মূল পাণ্ডুলিপি অনেক মুদ্রিত সংস্করণ ও পুরনো হস্তলিপিতে যে পাঠগত বিকৃতি এসেছে, তা প্রকাশ করে; যা এসেছে বারবার কপি করার কারণে অথবা কোনো কোনো লিপিকারের কিছু শব্দের অর্থ না বোঝার কারণে বা প্রাচীন লিখনশৈলী না বোঝার কারণে। এটি কিছু জায়গায় ছোট ছোট বাদ পড়ার বিষয় নির্দেশ করে, আবার অন্য জায়গায় বড় ধরনের বাদ পড়ার বিষয়ও তুলে ধরে—যেমন শব্দ, অক্ষর, লাইন, এমনকি পৃষ্ঠা পর্যন্ত। কখনো কখনো লেখক পূর্বে যা লিখেছিলেন, তার সাথে কিছু সংযোজনও করে থাকেন, এমনটাও এতে ধরা পড়ে।

আমি এই মূল পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে সংশোধনের কাজ করি, আর আমার পিতা এ কাজের তত্ত্বাবধান করেন। আমার পিতা পূর্বেও কিছু মাসআলার তুলনা করে গিয়েছেন।

আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী—আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়—এই সংস্করণ হবে পূর্বে ছাপা যেসব সংস্করণ রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য; এবং যে হস্তলিপিসমূহ আমরা আজ মুদ্রণের জন্য উপস্থাপন করছি, তারাই হবে সর্বোত্তম নির্ভরযোগ্য হস্তলিপি। কারণ, আমাদের হাতে মূল হস্তলিপি ছিল তুলনার জন্য এবং কঠিন কোনো বিষয়ে শাইখুল ইসলামের অন্যান্য রচনার পর্যালোচনাও আমরা করেছি। আমি এই কাজে সাহায্য পেয়েছি পূর্ববর্তীভাবে শাইখুল ইসলামের রচনার পুনরাবৃত্ত অধ্যয়ন এবং শাইখ, সংকলক, আলিম ও বিশারদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহিম-এর কাছে অধ্যয়নের মাধ্যমে—যিনি এই সংকলনের মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং সুদৃঢ় ফয়সালার অধিকারী এবং বিপুল কল্যাণকর জ্ঞানের মালিক। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

আমরা পাঠকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি—আমাদের সীমিত সামর্থ্যের কারণে—কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, যা হয়তো পাঠকদের কাছে দুরূহ মনে হবে; কিছু হাদীসের সূত্র (তাখরীজ) দেওয়া হয়নি; এবং প্রতিটি ফতোয়া ও কিতাবের পৃষ্ঠায় হস্তলিপি ও মুদ্রিত সংস্করণের রেফারেন্স নম্বর উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতিটি খণ্ডের সূচিপত্রে আমি উল্লেখ করেছি: ফাতওয়া, কিতাব, মাসআলা বা বিবৃতির শিরোনাম; তার শুরু ও শেষ—পৃষ্ঠা নম্বরসহ; তারপর সেখানে অন্তর্ভুক্ত গবেষণার বিষয়সমূহ—এমন ভাষায় উপস্থাপন করেছি যা পাঠকের জন্য গবেষণাকে সহজে বোঝার উপযোগী করে তোলে, যেন কেউ সূচিপত্র দেখে সহজেই ঐ খণ্ডে মূল গবেষণাগুলো ও সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত পার্শ্ব আলোচনাগুলো চিনে নিতে পারেন। সূচিপত্র খণ্ডসমূহের মুদ্রণ শেষ হওয়ার পর সংযুক্ত করা হবে: প্রত্যেক মাসআলার সাথে ঐ খণ্ডের পৃষ্ঠা নম্বর থাকবে, এবং ঐ মাসআলার সাথে সম্পর্কিত আলোচনার পৃষ্ঠা নম্বর, যা অন্য খণ্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—সেগুলোও উল্লেখ থাকবে। এতে পাঠকের জন্য একত্রে ও বিচ্ছিন্নভাবে থাকা গবেষণা—এই ফতোয়াসমূহের মধ্যে—এক জায়গায় খুঁজে পাওয়া সহজ হবে, চূড়ান্ত পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্রের মাধ্যমে।

পূর্বে মুদ্রিত কিতাব, সংকলন ও ফাতওয়ার নামসমূহ

আত-তাওয়াসসুল ওয়াল-ওয়াসীলাহ, আত-তাদমুরিয়্যাহ, আল-ওয়াসিতিয়্যাহ, আল-ফাতওয়া আল-

হামাবিয়্যাহ, আল-মাদানিয়্যাহ, মজমূআতুর রসায়িল ওয়াল-মাসায়িল আল-মুনীরিয়্যাহ, মজমূআতুর রসায়িল ওয়াল-মাসায়িল, রা'সুল হুসাইন, আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, আল-জাওয়াব আল-বাদির, তাফসীর সূরাত সাবা, আল-কাওয়াইদ আন-নূরানিয়্যাহ, নাযারিয়্যাতুল আকদ, মজমূ' ইবনে রাবী', নকদুল মানতিক, মুখতাসার নাসীহাতুল ইখওয়ান মিন মানতিক আল-ইউনান, আল-মারদিনিয়্যাত, কিতাবুল ঈমান, শারহ হাদীস আবি যর, শারহ হাদীস আন-নুযূল, বায়ানুল হুদা মিন আদ-দালাল ফী আমরিল হিলাল, আল-ফাতাওয়া আল-মিশরিয়্যাহ, মানাসিকুল হজ্জ, আরবাঊন হাদীসান, বাদ শাযারাত আল-লা'আলিআতাইন, আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়া আর-রহমান ওয়া আওলিয়া আশ-শাইতান, মজমূআতুর রসায়িল ওয়াল-ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম, তাফসীর সূরাতুল ইখলাস, জাওয়াব আহলুল ইলম ওয়াল ঈমান, মিন ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম, আত-তুহফাহ আল-ইরাকিয়্যাহ, মুখাদ্দিমাতুত তাফসীর, তাফসীর সূরাত আন-নূর, তাফদীল মাযহাব আহলুল মাদীনাহ, আল-কুবরুসিয়্যাহ, কাসীদাতুল কাদার, নকদ মারাতিব আল-ইজমা', আল-আফ'আল আল-ইখতিয়ারিয়্যাহ।

এছাড়াও এই সংকলনে এমন কিছু মুদ্রিত ফাতওয়া ও নির্বাচিত অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো নির্দিষ্ট নামে পরিচিত নয়, যা পাঠক ইনশাআল্লাহ এই সংকলনে খুঁজে পাবেন।

প্রখ্যাত আলেম ইবনেল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর একটি মুদ্রিত রিসালাহ রয়েছে, যাতে শাইখুল ইসলামের (রাহিমাহুল্লাহ্) রচনাবলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

বাদশাহর মহান দানশীলতা

একটি প্রকল্প বা বিশ্বকোষের মতো এই "বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার" কেবল বিপুল পরিশ্রমের মাধ্যমেই বাস্তবায়নযোগ্য, এবং এর মুদ্রণ কেবল বিপুল সম্পদ কিংবা একটি রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

সম্মানিত বাদশাহ সৌদ (হাফিযাহুল্লাহ)-এর জ্ঞাত ছিল এই বিষয়টি; তিনি শাইখুল ইসলামের রচনাবলির

গুরুত্ব ও মুল্য অনুধাবন করেছিলেন, এবং তিনি হাক্ক গ্রহণকারী আলেমদের রচনাবলি ছাপাতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ১৩৭৪ হিজরী সনে এই সংকলন মুদ্রণের নির্দেশ জারি করেন—যখন আমার পিতা সম্মানিত বাদশাহর কাছে এই মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও উপকারী বিন্যাসের কথা উল্লেখ করেন। তবে আমার পিতা মুদ্রণের জন্য উপস্থাপন বিলম্ব করেন, কারণ মিশরে তখনও কিছু বিষয় সংগৃহীত হয়নি—যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে যখন মিশর ও ইউরোপে যা কিছু ছিল তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়—এবং বাদশাহ মুদ্রণের সংকল্প জানতে পারেন—তখন তিনি পুনরায় মুদ্রণের নির্দেশ দেন। পাঁচ হাজার কপি করে প্রতিটি খণ্ড মুদ্রণের খরচ এবং প্রেসে প্রস্তুতির আনুমানিক ব্যয় এক মিলিয়নের বেশি রিয়াল নির্ধারিত হয়। তিনি সেই অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই মহান দানশীলতা ও ইসলামী জ্ঞান প্রচারের এই মহান কর্মের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে শেখা অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে রহমত বর্ষণ করেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম অনুগ্রহশীল।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম, মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি শান্তি ও দরুদ বর্ষণ করুন।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম

মা'হাদ ইমাম আদ-দাওয়াহ, রিয়াদ-এর অধ্যাপক

প্রকাশকের মন্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের ইসলাম গ্রহণে পথ দেখিয়েছেন, তাঁদের অন্তরকে আলোকিত করেছেন যাঁদের জন্য তিনি সৌভাগ্য নির্ধারণ করেছেন; ফলে তাঁরা কুরআনের পথনির্দেশনা দ্বারা পথপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং মানবজাতির শ্রেষ্ঠতমের সুন্নাহ অনুসরণ করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতি, যিনি জগতসমূহের জন্য হিদায়তের বাতি প্রজ্বলন করেছেন এবং আমাদের কাছে সুস্পষ্ট আলো এনেছেন। তিনি প্রমাণ স্পষ্ট করেছেন, পথকে সুস্পষ্ট করেছেন, আমাদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ, সাদা এবং দীপ্তিময় শরীআহ রেখে গেছেন—যার রাত তার দিনের মতোই স্পষ্ট; কেউ তা থেকে বিচ্যুত হয় না, শুধু সেই বিভ্রান্ত ব্যক্তি যার অন্তরচক্ষুকে আল্লাহ অন্ধ করে দিয়েছেন এবং যাকে তিনি হক ও সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

পরবর্তীতে বলা যায়: এটি একটি সামগ্রিক কিতাব (জামি), যা রচনা করেছেন এক জ্ঞানী ও আমলদার আলেম, পূর্ণজ্ঞ পণ্ডিত, ‘শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যাহ’। এটিকে সংকলন করেছেন সদ্বাচারী আলেম ও গবেষক ‘শাইখ আবদুর রহমান ইবনে কাসিম’, তাঁর পুত্র ‘মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে কাসিম’-এর সহায়তায়, ‘ইবনে তাইমিয়্যাহ’ (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর লেখনি থেকে। ‘শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ’ (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি এমন এক যুগে জীবন যাপন করেছিলেন, যা ছিল ঘটনাবহুল; ইসলামি নিদর্শন মুছে ফেলার অপপ্রয়াসে বিভ্রান্ত ও বিদআতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের এই বিচ্যুতিকে কিছু শক্তি সমর্থন দিচ্ছিল। আল্লাহ এই উম্মাহর জন্য মনোনীত করেছিলেন এই একক ব্যক্তিকে, যিনি ইসলামকে বুঝেছিলেন এবং জানতেন। তিনি তাওহীদের বাস্তবতা যেমন গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন, তেমনি ইসলাম যা নিয়ে এসেছে তার সকল বড় ও ছোট দিকও জানতেন। আল্লাহ তাঁকে বিভ্রান্ত সম্প্রদায় ও বিদআতিদের অবস্থাও জানার তাওফিক দিয়েছিলেন। তিনি ইসলামি দ্বীনের সত্যতা ও মুহাম্মাদী শরীআহকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি যুক্তি ও দলিলের মাধ্যমে বাতিলকে মুখোমুখি করেছেন, অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে বাতিলের ভিত্তি

ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং হক ও তার অনুসারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

যে কেউ এই মহান ইমামের জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত, সে জানে যে, তিনি তাঁর আকীদা স্পষ্ট করার পথে কত বিপদ-আপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন—হিংসুকদের ঈর্ষা এবং ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত থেকে। ফলে তাঁর লেখনিসমূহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যায়। যখন আল্লাহ এই মহান আলেমের ফজিলতকে ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন এই আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থল থেকে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহহাব আবির্ভূত হন, যিনি মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করে শুধু আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাক দেন। মুহাম্মাদী আহ্বানে 'আলে সৌদ' পরিবার সমর্থন করে এবং তার পক্ষে সংগ্রাম করে।

যেহেতু শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ছিলেন সেই পূর্বসূরিদের অন্যতম, যিনি এই বরকতময় আহ্বানকে সমর্থন করেছেন, মানুষ তাঁর রচনার প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করে (আল্লাহ তাঁর রূহকে পবিত্র করুন)। তাঁরা তাঁর জ্ঞানের বিশাল সাগর থেকে রত্ন আহরণের চেষ্টা করতে থাকেন। এ পর্যন্ত তাঁর অনেক রচনাই ছাপা হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছুই এখনো গোপন কোষাগারে রয়ে গেছে। আল্লাহ নিযুক্ত করেছেন—যেমনটি আমরা বলেছি—শাইখ আবদুর রহমান ইবনে কাসিম ও তাঁর পুত্র মুহাম্মাদকে, যারা এই ঐতিহ্যকে সংকলিত করেছেন। তাঁরা প্রায় পৃথিবীর সব গ্রন্থাগার সফর করে যা কেউই একত্র করতে পারেননি, তা সংগ্রহ করেন। যখন এ সংবাদ সম্মানিত বাদশাহ সৌদ (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন, রক্ষা করুন ও তাঁর আনুগত্যে সাহায্য করুন)-এর কাছে পৌঁছায়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই সংকলিত রচনাসমূহ তাঁর ব্যক্তিগত খরচে মুদ্রণের নির্দেশ দেন এবং এক মিলিয়ন রিয়াল এ উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করেন। যখন এই অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তিনি প্রয়োজনীয় সকল খরচ প্রদান করেন যেন এই মূল্যবান সংগ্রহ মানুষকে উপকৃত করতে পারে—তাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণে উপযোগী হয়।

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমি ছেড়ে দিচ্ছি সংকলক শাইখ আবদুর রহমান ইবনে কাসিমের জন্য, যিনি এই মূল্যবান সংকলন একত্র করেছেন, যেন তিনি এর প্রকৃত অবস্থা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারেন। তবে আমি এই সুযোগে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রাখতে চাই তাঁদের জন্য, যারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদার সাথে পরিচিত নন।

আমি স্বীকার করি যে, আমার জ্ঞান ও উপলব্ধি এই মহান আলেমের পূর্ণ বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট নয়, এবং সময় ও পরিবেশও তা অনুমতি দেয় না। তবে, যে কেউ এই মহৎ কিতাব অধ্যয়নের সুযোগ পাবে, সে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে চিনে নেবে!

আল্লাহ ইবনে তাইমিয়্যাহকে স্মরণশক্তি ও বোধশক্তির এমন ক্ষমতা দান করেছিলেন, যা আমরা আর কারো মধ্যে দেখিনি বা শুনিনি। আমাদের উস্তাদ, সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ রশীদ রিদা (রাহিমাহুল্লাহ্), রাজা আব্দুল আজিজের (আল্লাহ তাঁর কবরকে সুগন্ধিত করুন) তহবিলে ছাপা হওয়া শাইখুল ইসলামের বহু রচনার একটি পুস্তিকার শেষে নিম্নলিখিত কথা লিখেছেন: “এই সংকলনের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত মূল্য অপরিমেয়। এতে পুনরাবৃত্তি উপকারী, কারণ এই বিস্তৃত যাচাইসমূহ খুব কমই এমন কেউ সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারে, যতক্ষণ না তা বহুবার মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করে।

বিস্ময়কর বিষয় হলো, শাইখুল ইসলাম (আল্লাহ তাঁর আত্মাকে পবিত্র করুন) এই বিষয়গুলো তাৎক্ষণিকভাবে লিখতেন, কোনো কিতাব দেখতেন না। এটি তাঁর মহানতা ও আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। আল্লাহ তাঁকে তাঁর কিতাব—যা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "এটি এমন কিছুর দিকে পথনির্দেশ করে যা সর্বোত্তম", রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, এবং পূর্বসূরিদের (সালাফে সালেহীন) বোধ ও অনুশীলনের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।”

এই সংকলনের প্রতিটি অংশ থেকে স্পষ্ট যে, তিনি (রাহিমাহুল্লাহ্) জ্ঞান—নকলে ও আকলে, শরীয়াহতে, ইতিহাস, দর্শন, বিভিন্ন ধর্ম ও ফিরকার মতবাদ, মাজহাবসমূহের মত, দলসমূহের বক্তব্য—স্মরণ ও বোধে এমনভাবে সংকলন করেছেন, যা তার আগে বা পরে কোনো আলেমের ক্ষেত্রে জানা যায় না। তাঁর স্মরণশক্তির চেয়েও বিস্ময়কর ছিল, তা তাৎক্ষণিকভাবে স্মরণ করে বলা, ডিকটেশন ও লেখার ক্ষমতা। তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর ছিল, হকের প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের খণ্ডনে তাঁর বিচারক্ষমতা—নস ও যুক্তির মাধ্যমে—এবং কুরআন ও সুন্নাহর বোধ ও অনুশীলনে সালাফের পন্থাকে প্রতিষ্ঠা করা, সমস্ত ভিন্নমতাবলম্বী মুতাকাল্লিম, দার্শনিক ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে। “এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।” (সূরা আল-জুমু'আ: ৪)

আমাদের উস্তাদ সাইয়্যিদ রশীদ রিদা (রাহিমাহুল্লাহ্) শাইখুল ইসলামের একটি রচনার মুদ্রণের পর আরেক

স্থানে বলেন: "আল্লাহ শাইখুল ইসলামকে রহম করুন এবং ইসলামের ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে যে বিশুদ্ধ আকীদাহ ও ধর্মের বাস্তবতা এবং যুক্তির সাথে তার সামঞ্জস্যতার যে ব্যাখ্যা আমাদের কাছে তাঁর মাধ্যমে এসেছে, তা অন্য কোনো আলেমের কাছ থেকে আসেনি। আমরা এমন কাউকে জানি না যাকে আল্লাহ এইভাবে সকল নকল ও আকলি ইলম, যুক্তি, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানে—তাক্বলিদ বা অন্ধ অনুসরণের বাইরে—প্রতিভা দিয়েছেন।"

আমি যখন এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখছি, তখন আমার সামনে রয়েছে ইমাম ইবনে তায়মিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর কিতাব **আর-রাদ্দু 'আলাল মান্তিকিয়্যীন** (যুক্তিবিদদের খণ্ডন); এটি পাঁচ শত ছিয়াল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী। এই মহামানবের ওপর আল্লাহ তা'আলার দানকৃত জ্ঞানের পরিধি বোঝাতে আমি তাঁর নিজের বর্ণনা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করব, যেখানে তিনি বলেন: "আমার জানা ছিল যে গ্রিক যুক্তিবিদ্যা বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় নয়, আর মূর্খ ব্যক্তি এতে উপকৃত হয় না। তবে আমি মনে করতাম এর উপপাদ্যগুলো সত্য, কারণ অনেকের সত্যতা আমি দেখেছি। কিন্তু পরে এর কিছু উপপাদ্যের ভুল আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, এবং আমি সে সম্পর্কে কিছু লিখি। তারপর আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানকালে—এটি ছিল ৭০৯ হিজরী সালে, যখন শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ্) আলেকজান্দ্রিয়ায় বন্দী ছিলেন—আমি এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, যাকে দেখলাম সে দার্শনিকদের প্রতি সম্মান ও ভক্তি দেখাচ্ছে। আমি তাকে তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির কিছু দিক তুলে ধরি। এতে আমাকে এক বৈঠকে, যোহর ও আছরের মাঝখানে, যুক্তিবিদ্যার ওপর কিছু আলোচনা লিখতে হয়, যা তখন আমি নোট করে রাখি। এরপর পরবর্তী বৈঠকগুলোতে আমি তা সম্পূর্ণ করি। এটি ছিল না আমার মূল উদ্দেশ্য; বরং আমার আগ্রহ ছিল তাওহীদ বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে যা কিছু আমি লিখেছিলাম, সেটিতে। আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাওহীদ ও যুক্তিবিদ্যার মূলনীতিসমূহে তারা যা বলেছে, তার অনেকাংশই তাদের আকীদাগত ভ্রান্তির উৎস। যেমন: তারা 'আবশ্যকীয়' বলে যে গুণাবলীর মাধ্যমে সত্তা গঠিত হয় বলে মনে করে, তারা যে সংজ্ঞা ও প্রমাণমূলক কিয়াসের কথা বলে, এমনকি ধারণাগুলোকে চিহ্নিত করতে যেসব সংজ্ঞা দেয়, এবং কিয়াসের কাঠামো ও এর নিশ্চিত পূর্বধারণাসমূহ—এসব সবই সেই ভ্রান্তির উৎস।

কিছু লোক তখন আমার কাছ থেকে যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আমি যা লিখেছিলাম, তা লিপিবদ্ধ করতে চায়। আমি এতে অনুমতি দিই, কারণ এটি সত্য জানার দরজা খুলে দেয়, যদিও এই দরজা দিয়ে

প্রবেশ করে তাদের যে খণ্ডন করা সম্ভব, তা আমি তখন যতটুকু লিখেছিলাম, তার চেয়ে বহু গুণ বেশি হতে পারে।" - তাঁর উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় (রাহিমাহুল্লাহ্) তিনি এই কথা বলেছেন। যে ব্যক্তি এই কিতাব অধ্যয়ন করবে এবং গভীর মনোযোগ ও অনুধাবনের সাথে পাঠ করবে, সে দেখবে—শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ্) যেই কয়েক পৃষ্ঠা যোহর ও আছরের মাঝখানে রচনা করেছিলেন, তা বুঝতে তার এক বৈঠক নয়, বরং অনেক বৈঠকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।"

শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ্) নিছক একটি গভীর জ্ঞানের সাগর থেকে আহরণ করছিলেন। তিনি গ্রিক যুক্তিবিদদের মতামত সঠিকভাবে উদ্ধৃত করেছেন, এগুলো পরিশীলিত সমালোচনার মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন, এবং আর-রাযী, আবু হামিদ আল-গাযালী, ইবনে সিনা এবং অন্যান্য চিন্তাবিদগণ যে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেগুলোকে অনুসরণ করেছেন—তাদের যেটা সঠিক ছিল, তা সমর্থন করেছেন এবং ভুলকে যুক্তি ও ওহীর আলোকে স্পষ্টভাবে সমালোচনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়্যাহ কেবল একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং তিনি তাঁর সময় এবং পরবর্তী যুগের সকল জ্ঞানের শাখায়, যা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত, তাতে বিশাল সমুদ্রস্বরূপ ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সে যুগে প্রচলিত অন্যান্য বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তিনি জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করতেন, আর বাতিলপন্থীদের আকীদা সম্পর্কে তিনি তাদের নিজেদের চেয়েও ভালো জানতেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদের দাবির মূলভিত্তি অনুধাবন করতে পারতেন এবং তা যুক্তি ও ওহীর মাধ্যমে খণ্ডন করতেন।

আল-হাফিয আল-মিযযী বলেন: "আমি তাঁর মতো কাউকে দেখিনি, তিনিও নিজ সমতুল্য কাউকে দেখেননি। আমি এমন কাউকে দেখিনি, যিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন এবং তা অনুসরণে তাঁর চেয়ে অধিক অটল।"

আল-ক্বাযী আবুল ফাতহ ইবনে দাকীক আল-ঈদ বলেন: "আমি যখন ইবনে তায়মিয়্যাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন দেখলাম, তাঁর চোখের সামনে সব জ্ঞান একত্রে উপস্থাপিত; তিনি যা চান তা গ্রহণ করেন, আর যা চান না তা ছেড়ে দেন।"

শাইখ ইবরাহীম আল-মুসক্কী বলেন: "নিশ্চয়ই তাকীউদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁকে জ্ঞানসূত্রে গ্রহণযোগ্য মানা উচিত। যদি তাঁর আয়ু দীর্ঘ হয়, তিনি পৃথিবীকে জ্ঞান দিয়ে ভরিয়ে তুলবেন, এবং তিনি সত্যের ওপর অবিচল। মানুষ তাকে অবশ্যই বিরোধিতা করবে, কেননা তিনি নবুওয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী।"

আমি বলি... শাইখ আল-ঈদ তাঁর জন্য যে কষ্ট ও বিরোধিতার আশঙ্কা করেছিলেন, তা তিনি বাস্তবে ভোগ করেছেন। ইবনে তায়মিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ্) সত্যের পথে কষ্ট সহ্য ও ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর কারাগার হয়ে উঠেছিল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে অপরাধীদের একত্র করা হতো, কিন্তু তারা সেই কারাগারে তাদের অপরাধ থেকে ফিরে আসে, আল্লাহর পথে তওবাকারী ও আহ্বানকারী হয়ে ওঠে।

প্রধান বিচারপতি ইবনেল হারীরী বলেন: "যদি ইবনে তায়মিয়্যাহ শাইখুল ইসলাম না হন, তবে কে?" ভাষাবিদদের ইমাম আবু হাইয়্যান তাঁর সম্পর্কে বলেন: "আমার চোখ এমন কাউকে দেখেনি, যিনি তাঁর সমতুল্য।"

আল-হাফিয আজ-জারকানী বলেন: "ইবনে তায়মিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ্) সূক্ষ্ম রচনা, বাক্য-প্রকাশের উৎকর্ষ, বিন্যাস, বিভাগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়। আল্লাহ তাঁর জন্য জ্ঞানের শাখাসমূহকে ততটাই নমনীয় করে দিয়েছেন, যতটা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য লোহাকে করেছিলেন। যখন তাঁকে কোনো বিশেষ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন শ্রোতা মনে করত, তিনি যেন অন্য কোনো বিষয় জানেন না—অর্থাৎ তিনি এতটাই সেই বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।"

প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান আস-সুবকী তাঁর এক পত্রে আল-হাফিয আয-যাহাবীর নিকট শাইখ তাকীউদ্দীনের (রাহিমাহুল্লাহ্) বিষয়ে লিখেন:

"আমার উস্তাদের উক্তি অনুযায়ী আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তিনি (ইবনে তায়মিয়্যাহ) মহান মর্যাদার অধিকারী, তাঁর জ্ঞানের সমুদ্র বিশাল, দ্বীনি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক, অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান ও সাধক, এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর যে স্তর, তা বর্ণনার অতীত। আমি এই কথাগুলো সবসময় বলে থাকি, আর

তাঁর প্রতি আমার সম্মান ও মর্যাদার ধারণা আরও বেশি ও আরও মহান। পাশাপাশি আল্লাহ তাঁকে যে তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, ধর্মপরায়ণতা, সত্যের পক্ষে সমর্থন এবং শুধুমাত্র সত্যের জন্যই অবিচল থাকা, এবং তাঁর যুগে এমনকি বহু যুগেও যাঁর তুলনা বিরল—এসব গুণ দ্বারা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছেন।”

আমি বলি... এটি হচ্ছে সেই সকল মহান আলিমের কিছু উক্তির সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি, যারা এই অনন্য ব্যক্তিত্ব ও অকাট্য প্রমাণের সম্পর্কে বলেছিলেন। আমি তা এজন্য উল্লেখ করছি, যাতে যারা এই ইমাম সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা অন্তত কিছু জানতে পারে; এবং এজন্যও যে এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা আজ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে—বরং এটি আমাদের দায়িত্বগুলোর একটি—এই সময়ে, যখন আমাদের দেশীয় ভূখণ্ডে নীতিমালা ও মতাদর্শ অনুপ্রবেশ করেছে, আমাদেরকে ইবরাহীম, মূসা, ‘ঈসা ও আমাদের নবী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীন থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

কারণ, ইসলাম যা নিয়ে এসেছে—তার আকীদা, মূলনীতি, ব্যবস্থা ও বিধান—তার প্রকৃত সত্য কিছু লোক ও আমাদের যুবসমাজের নিকট গোপন হয়ে গেছে। তাদের কাছে এর হিকমত, কারণ ও প্রভাব অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। বাতিলপন্থীরা এমন কিছু নীতিমালা নিয়ে এসেছে, যা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, শোভন করে সাজিয়েছে এবং মিথ্যা উপস্থাপন করেছে। আমাদের ইসলামী বিশ্বে যুবসমাজ ইসলামের প্রকৃত বার্তা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তারা সেই উজ্জ্বল দলিলগুলো হারিয়ে ফেলেছে, এবং দুনিয়ার কিছু অংশে একদল অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোক আধিপত্য লাভ করেছে, যারা ক্বিৎ বা ক্বিত্মীরও জ্ঞান রাখে না।

মানুষের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য তারা তাদের জাহিল আলেমদের মধ্য থেকে মূর্খদেরকে সামনে এনেছে, তারপর তাদের কর্মকাণ্ডকে অলংকৃত করে উপস্থাপন করেছে, একে তারা মানব সমতার নতুন নীতিমালা ও ধনীদের থেকে গরিবদের ন্যায়বিচার নামে প্রচার করেছে... তবে লোকেরা সেই প্রকৃত মূলনীতি থেকে দূরে সরে গেছে, যা পবিত্র ইসলামী শরীয়াহ নিয়ে এসেছে—এই নীতিমালা ও ভিত্তিসমূহই মানব চিন্তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে, যা সত্য, ন্যায়বিচার ও মানব মর্যাদার প্রকৃত মানদণ্ড। এই মূলনীতি ও ভিত্তির মধ্যে রয়েছে মানব আত্মার উৎকর্ষতা, যা তাকে নীচতা থেকে উচ্চতায় উত্তোলন করে। এর মধ্যেই রয়েছে সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিপূর্ণ সাম্য, যাতে পক্ষপাত, আক্রমণ কিংবা বিচিত্রতা নেই।

এটা বিস্ময়ের বিষয় নয়, কেননা এটি সেই শরীয়াহ, যা আসমান ও যমীনের রব তাঁর বান্দাদের পার্থিব ও

পরকালীন কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। ইসলামী শরীয়াহর এই সত্য চিত্র—আল্লাহ্ তা'আলা বহু মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে তা দেখার ক্ষমতা থেকে অন্ধ করে দিয়েছেন। মানবজাতির শয়তানরা এই গাফিলতার সুযোগে আমাদের ইসলামী ভূখণ্ডে এইসব নীতিমালা ও উদ্ভাবন নিয়ে হামলা চালিয়েছে, ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের নামে।

যে কেউ সেই অঞ্চলগুলো ভ্রমণ করবে, যেখানে এই নতুন ধাঁচের নীতিমালা প্রবেশ করেছে, সে দেখতে পাবে, লোকেরা সেখানে অন্তরে ব্যথিত, তারা তা সমালোচনা করতে পারে না, এমনকি তাদের পক্ষে তা থেকে বাঁচার কোনো উপায় বা আশ্রয়ও নেই। তারা দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করছে, তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত, অধিকার হরণ করা হচ্ছে, মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বাতিলের ঢাক-ঢোল বেজে উঠছে, ভাড়াটে জনতা করতালি দিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে রয়েছে অসন্তুষ্ট বা প্রতিবাদকারী এমন ব্যক্তির গলায় ঝুলানো তরবারি।

হায়! যদি সেই লোকেরা, যারা এই ঢাক-ঢোলের শব্দ শুনে মুগ্ধ, তারা সেই ভূমিতে সফর করত, যেখানে আল্লাহর অনুগ্রহের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করা হয়েছে, এবং নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের গৃহে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তাহলে তারা দেখত কিভাবে তারা জীবনযাপন করছে, কিভাবে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করছে—যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত এবং আল্লাহর নিকট এ ধরনের ধ্বংস থেকে মুক্তি প্রার্থনা করত।

আমি বলি... ইসলামের শত্রুরা কেবল তখনই মুসলিমদের অন্তর থেকে ইসলামের ছাপ মুছে ফেলার চেষ্টা সফল করতে পেরেছে, যখন মুসলিমরা ইসলামের প্রকৃত উপলব্ধি, তার বিধান, শরীয়াহ ও মূলনীতিসমূহ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আমাদের এই যুগে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহর মত ব্যক্তিত্বের কী প্রবল প্রয়োজন—যিনি এই সকল বাতিল মতবাদকে প্রতিহত করবেন, মানুষকে তাদের রবের পক্ষ থেকে আগত সত্যের বাস্তবতা জানিয়ে দেবেন, এবং তাদের সেই পরিপূর্ণ নিয়ামতের ব্যাখ্যা করবেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পন্ন করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৩)

আমাদের যুবসমাজের অনেকে এবং আমাদের মধ্যে যারা জ্ঞান দাবি করে, তাদের এক বিরাট অংশও আল্লাহ্

ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে আগত সেই মূলনীতি ও মতবাদগুলোর প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে, কুফরপন্থীদের রঙিন বাক্য ও বিভ্রান্তিকর মতবাদ তাদের আকৃষ্ট করেছে, তারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং পথ হারিয়েছে।

আমাদের যুগে ইসলাম ও তার সঠিক মূলনীতি যথার্থ ও সুস্পষ্টভাবে অধ্যয়ন করা হয়নি। ইসলামী শরীয়াহর হিকমত এবং প্রতিটি বিধানের ভিত্তি জনগণের মাঝে প্রচার করা হয়নি, যাতে তারা বুঝতে পারে সেই উজ্জ্বল আলো ও অন্ধকারে বিভ্রান্তিকর ঝলকের পার্থক্য। মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ের সমাধান ইসলাম এমনভাবে প্রদান করেছে, যা সকলের জন্য সুখ ও শান্তি নিশ্চিত করে। ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন পন্থা নেই, যা দুনিয়া ও আখিরাতে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করে। এ কথা সে-ই বলে, যে ইসলাম ও তার বিধানের বাস্তবতা বোঝে, আর অস্বীকার করে সে-ই, যে ইসলাম ও তার মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ—"যে কিছু জানে না, সে তার বিরুদ্ধাচরণ করে।"

ইসলামী জ্ঞানের ইতিহাসে আমরা এমন আর কোন ব্যক্তিকে চিনি না, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামের মূলনীতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে এমন উপলব্ধি দিয়েছেন, যেমনটি তিনি ইবনে তাইমিয়্যাহকে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের সকল শিক্ষার মতোই নিজ যুগের বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানও আয়ত্ত করেছিলেন। তাই তাঁর অসংখ্য রচনায় এমন জ্ঞান, ব্যাখ্যা ও সত্য প্রতিফলিত হয়, যা অন্য আলিমদের বইয়ে পাওয়া যায় না।

আমাদের বর্তমান দায়িত্ব হলো, এই মহান ব্যক্তি যেসব বিষয়ে লিখেছেন, সেসব অধ্যয়ন করা, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা উপস্থাপন করা এবং বোঝার উপযোগীভাবে তা পরিবেশন করা, যাতে আমাদের যুবসমাজ সেসব মূলনীতি অধ্যয়ন করে, এবং সেগুলোকেই রক্ষাকবচ হিসেবে গ্রহণ করে সকল বিভ্রান্তিকর মতবাদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে—যা তাদের জন্য দুনিয়াতে কেবল বিষ ও দুর্ভোগ বয়ে আনে এবং আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি তো আরও কঠিন ও স্থায়ী।

আল্লাহ্ এই পবিত্র ভূমিতে নিয়োগ করেছেন সৌদি আরবের বাদশাহ, মাহামান্য বাদশাহ সাঊদ ইবনে আবদুল আজীযকে—যিনি ইসলামের খেদমতে এবং দাওয়াত প্রচারে সর্বদা সচেষ্ট। তাঁর মাহামান্য (আল্লাহ্ তাঁকে হেফাজত করুন) মদীনা মুনাওয়ারায় একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন, যাতে মানুষ ইসলাম শিক্ষা লাভ করে এবং তা বিশ্বের নানা স্থানে ছড়িয়ে দেয়।

তাঁর মহৎ কর্মের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই, যে তিনি ইবনে তাইমিয়্যাহর (রাহিমাহুল্লাহ্) রচনাবলি সংগ্রহ করে এই মূল্যবান সংকলনে তা সংকলিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, এই উপযুক্ত সুযোগকে কাজে লাগানো আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ কমিটি নির্ধারণ করা, যারা ইবনে তাইমিয়্যাহ যেসব বিষয়ে লিখেছেন, তা নিয়ে অধ্যয়ন করবে, প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নির্ধারণ করবে, সেখানে উদাহরণমূলক বৈঠকে বক্তৃতা করবে এবং তা প্রকাশে মনোনিবেশ করবে, যাতে মানুষ ইসলামের আনা মূলনীতিসমূহের বাস্তবতা জানতে পারে। কেননা, এই মহান আলিম যা লিখে গেছেন, তার মধ্যে রয়েছে এমন জ্ঞান ও কল্যাণ, যার পরিমাণ গোনার অযোগ্য।

একটি উদাহরণ হলো... এটি তার সেই কিতাব, যার নাম তিনি রেখেছেন "ইকতিদা আস-সিরাত আল-মুস্তাকীম ফি মুখলিফাতু আসহাবিল জাহীম" (জাহান্নামবাসীদের বিরোধিতা করাই সরল পথের দাবি)। তিনি এতে মুসলমানের জন্য এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করেছেন যা মানবতার পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে তাকে সর্বোচ্চ আদর্শে উন্নীত করে। ইসলাম যা তাকে দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করেছে এবং যা অধিকার তাকে দিয়েছে, তার দ্বারা তিনি মুসলিমকে এমন উচ্চতর স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন, যেখানে কেবল তার পথের অনুসারীরাই পৌঁছতে পারে। যদি আপনি এই কিতাবটি গভীরতা ও অনুধাবন সহকারে পাঠ করেন, তবে আপনি দেখতে পাবেন, হিটলার তার 'মাইন ক্যাম্পফ' গ্রন্থে 'আর্য মানব' নিয়ে যা চেয়েছিল, তা ইসলামে মুসলমানের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিত্বের তুলনায় কিছুই নয়—যা ইবনে তাইমিয়্যাহ তাঁর "ইকতিদা আস-সিরাত আল-মুস্তাকীম" গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি এমন ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে যা কেবল জাতিগত নাম ও নীতির মাধ্যমে আলাদা করা হয় যেন একটি বোবা যন্ত্র, আর অন্যটি এমন ব্যক্তিত্ব যা চরিত্রের পূর্ণতা ও আত্মার উচ্চতায় উন্নীত, যা তাকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় (ইল্লিয়্যীন) পৌঁছে দেয়।

এই ইসলামি বিশ্বাস, ঈমান, একমাত্র আল্লাহর প্রতি ইখলাসপূর্ণ ইবাদত, এবং সেই সমস্ত নীতি ও শরিয়াহ্—যার প্রতিটি মূলনীতি ইবনে তাইমিয়্যাহ স্পষ্ট করেছেন এবং প্রতিটি শাখা ব্যাখ্যা করেছেন—এগুলোই আমরা অধ্যয়ন করব, বুঝব এবং নিজেদের মধ্যে প্রচার করব। আমাদের উচিত এসবের মাধ্যমে নিজেদেরকে মজবুত করে তোলা, এগুলোকে ঢাল বানিয়ে সেই লড়াইয়ে প্রবেশ করা, যেখানে শত্রুরা আমাদের মাতৃভূমির কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে—রাস্তা-ঘাটে ও গলিতে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে

এবং আমাদের ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। যদি আমরা একক সত্তায় রূপ নিয়ে এই বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য উঠেপড়ে না লাগি এবং সেই সুস্পষ্ট দলিলকে হাতিয়ার না বানাই—যা আমাদের সামনে বিদ্যমান—তাহলে আমরা এক ধ্বংসে পতিত হব, যার আর উত্তরণ হবে না।

এই সব কারণেই আমি এই উম্মাহর প্রত্যেক মুসলিম, আলেম এবং অনুসারীর প্রতি আহ্বান জানাই—আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে পৌঁছানো এই ঐতিহ্যের দিকে দ্রুত ছুটে আসুন, যেন আমরা তা প্রকৃতভাবে বুঝে নিতে পারি এবং তার চরিত্রকে নিজেদের মাঝে ধারণ করতে পারি। হয়তো আমরা যা কিছু আমাদের মাঝে অবশিষ্ট আছে তা সংরক্ষণ করতে পারব, এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারব, যাতে তারা এই পবিত্র শরিয়াহর সাগর থেকে আহরণ করতে পারে। এই নীতিসমূহ চিরকাল মানব কল্যাণের প্রকৃত প্রদীপ হয়ে থাকবে।

তিনি—পরম পবিত্র ও মহান—বলেছেন: "তাহলে সে ব্যক্তি কি তার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সমান যে ব্যক্তি যার মন্দ কাজ তার চোখে শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?" (মুহাম্মদ: ১৪)

আর তিনি—যার নামসমূহ পবিত্র—বলেছেন: "যারা কুফর করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রেখেছে—তিনি তাদের কার্যসমূহকে নিষ্ফল করে দিবেন। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং যা মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করেছে—এবং তা তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য—তিনি তাদের গোনাহসমূহ দূর করে দিবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন।" (মুহাম্মদ: ১-২)

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (আল-বাকারাহ: ২০১)

ইউসুফ ইয়াসীন

খন্ড ১

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

(ইবাদতে আল্লাহর একত্ববাদ)

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন:

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু।

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন, তবুও কাফিররা তাদের রবের সাথে অন্যকে সমকক্ষ স্থির করে..." (সূরা আন'আম: ১)

তিনি জানেন যা অতীতে হয়েছে, যা বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে; তিনি, যাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে: "তাঁর আদেশ তো কেবল তখনই হয় যখন তিনি কোন কিছুকে ইচ্ছা করেন, তিনি বলেন: 'হও', আর তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন: ৮২)

তিনি যিনি "যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচিত করেন; তাদের কোনো পছন্দ নেই। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান, তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।" (সূরা আল-কাসাস: ৬৮)

"তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনিই সকল প্রশংসার উপযুক্ত প্রথম জীবনেও এবং পরকালেও। তাঁরই আদেশ চলে, এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আল-কাসাস: ৭০)

তাঁর একত্ববাদ প্রমাণ করে সকল প্রকার নিদর্শনের শাখা-প্রশাখা, এবং সৃষ্টজগতে পরিপূর্ণতার যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছেন তা তাঁর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের ওপর তাঁর কুদরত প্রকাশ করেছেন এমন সব বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির মাধ্যমে যা তিনি অসাধারণরূপে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার ভিন্নতা নির্দেশ করে তাঁর সুন্নাহ ও কার্যধারার প্রতি। তাঁর দয়ায় তিনি বান্দাদের তাঁর নেয়ামতের দিকে পথ দেখিয়েছেন, যার হিসাব একমাত্র আসমানের রব ছাড়া কেউ করতে পারবে না। তাঁর গভীর হিকমাতে তিনি বান্দাদের মাঝে তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলির প্রমাণ সুস্পষ্ট করেছেন, যা তিনি সকল অবস্থায় প্রাপ্য।

বান্দারা তাঁর যথার্থ প্রশংসা করতে অপারগ; বরং তিনি যেমন নিজেকে প্রশংসা করেছেন, তেমনই তিনি। তিনি পরিপূর্ণ গুণাবলির অধিকারী এবং মহত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বর্ণিত, যার সাথে সৃষ্ট জগতের কিছুই তুলনীয় নয়। তিনি পবিত্র, শান্তির উৎস, তিনি এমন যে পরিপূর্ণ গুণে কেউ তাঁর সমতুল্য নয়, এবং কোন ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করে না। অতএব, তিনি পবিত্র, এবং তিনি অত্যন্ত ঊর্ধ্বে, যালেমরা যা বলে তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে!

তিনি যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন পরিপূর্ণ নির্ধারণে।

তিনি নবীদের প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যেন মানুষ নবীদের প্রেরণের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অজুহাত না দাঁড় করাতে পারে। আর আল্লাহ চিরশক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। যারা তাদের অনুসরণ করে, তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন, যা প্রত্যেক প্রাণের কাম্য ও প্রিয়; আর যারা তাদের অবাধ্যতা করে, তাদের জন্য রয়েছে ধিক্কার ও দূরত্ব এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তিনি তাঁদেরকে আদেশ করেছেন যেন সৃষ্টিকে কেবল তাঁরই ইবাদতের দিকে আহ্বান করে, তাঁর সাথে কোন অংশীদার না করে, তাঁর দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। যেমন তিনি বলেছেন: "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র রিযিক ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর; আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জানি। এবং নিশ্চয়ই এই তোমাদের দ্বীন একমাত্র দ্বীন, আর আমিই তোমাদের রব; অতএব, আমাকে ভয় কর।" (সূরা আল-মু'মিনূন: ৫১-৫২)

তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য এক শরীআহ ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছেন, যাতে তারা তা অনুসরণ করে সোজা পথে চলে এবং তাতে কোনো বক্রতা অনুসন্ধান না করে। এবং তিনি তাদের মধ্যে শেষ নবী হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পাঠিয়েছেন—সর্বপ্রথম ও সর্বশেষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টিজগতের রব কর্তৃক মনোনীত, সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, পথপ্রদর্শক, আলোকবর্তিকা—যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন এবং শক্তিশালী, প্রশংসিত রবের পথের দিকে পরিচালিত করেছেন।

"আল্লাহ—যার জন্য আসমানসমূহ ও জমিনের সবকিছু রয়েছে—আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি!"

(সূরা ইবরাহীম: ১-২)

তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সর্বোত্তম শরীআহ ও বিধানসহ, আর তাঁর মাধ্যমে সমস্ত কুফরি ও বিদআত বাতিল করেছেন। তাঁর ওপর নাযিল করেছেন সর্বোত্তম কিতাব ও সংবাদসমূহ এবং এটিকে আগত সকল আসমানী কিতাবের রক্ষক করেছেন।

তিনি তাঁর উম্মতকে করেছেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ উম্মত—তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে। তারা সত্তর জাতির পূর্ণতা লাভ করেছে; তারা তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত। তিনি তাদের উপর সাক্ষী, এবং তারা মানবজাতির উপর সাক্ষী এ দুনিয়া ও আখিরাতে—তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতের কারণে।

তিনি তাদেরকে ভ্রান্তির উপর একমত হওয়া থেকে হেফাজত করেছেন, কেননা তাঁর পরে আর কোন নবী আসেননি যিনি কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি দূর করতে পারেন। তিনি তাদের দ্বীন পূর্ণ করেছেন, তাঁদের উপর তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন, ইসলামকে তাঁদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করেছেন এবং একে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেছেন—বিজয় দিয়েছেন শক্তির মাধ্যমে এবং বিজয় দিয়েছেন প্রমাণ ও বর্ণনার মাধ্যমে।

তিনি তাদের মাঝে রেখেছেন আলেমদের, যাঁরা নবীদের উত্তরসূরি, কিতাবের বার্তা পৌঁছাতে নবীদের স্থানে দাঁড়ান। রেখেছেন এমন একটি বিজয়ী দল, যারা সর্বদা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরোধীদের দ্বারা বা যারা তাদের পরিত্যাগ করে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কিয়ামত পর্যন্ত।

তিনি তাদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন 'যিকর' (কুরআন), যা তিনি সংরক্ষিত লাওহে মাহফূজ থেকে অবতীর্ণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আমিই 'যিকর' অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই একে রক্ষা করবো।" (সূরা হিজর: ৯)

অতএব, তাদের কিতাবে কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটেনি, যেমনটি ঘটেছিল তাওরাত ও ইনজিলের অনুসারীদের মধ্যে। তিনি তাদেরকে দান করেছেন বর্ণনা ও সনদের মাধ্যম, যার দ্বারা বিশারদ সমালোচকরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

এই ইলম এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে গ্রহণ করেছে ন্যায়পরায়ণ আলেমগণ—ইলম ও দ্বীনের লোকেরা—যাঁরা এই দ্বীনের মধ্য থেকে দূর করেন অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি, মিথ্যাবাদীদের গাঁথা এবং

অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা—যাতে উম্মতের ওপর আল্লাহর নেয়ামত অব্যাহত থাকে, আলোর ঝলক ছড়িয়ে পড়ে, এবং সেই দ্বীন পুনরুজ্জীবিত হয় যা নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর পথ মানুষদের জন্য স্পষ্ট করে দেন।

সুতরাং, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেন এই মহান নবীর অনুসারীরা, যাঁদেরকে আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই এক রাসুল; তোমাদের কষ্ট তাঁকে দুঃখ দেয়; তিনি তোমাদের ব্যাপারে আগ্রহী; মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও মেহেরবান।" (সূরা তাওবা: ১২৮)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই; তিনি সকল সৃষ্টি জগতের রব, নবীদের ইলাহ, এবং বিচার দিনের মালিক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল, যাঁকে তিনি সকল মানুষের প্রতি প্রেরণ করেছেন।

তিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তখন, যখন মানুষ ছিল চরম ধ্বংস ও সবচেয়ে ভয়াবহ কুফরি, জাহেলিয়্যাহ এবং ভ্রান্তির মধ্যে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একনাগাড়ে দ্বীনের দাওয়াতে, জগতবাসীকে হিদায়াতে, এবং কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন—যতক্ষণ না ঈমানের সূর্য উদিত হয়, বাতিলের রাত বিলীন হয়, রহমানের বাহিনী শক্তিশালী হয়, শয়তানের দল লাঞ্ছিত হয়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী আলোর ঝলক স্পষ্ট হয়, কুরআনের তিলাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে, আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়, মরুভূমি ও জনপদ আল্লাহর নূরে আলোকিত হয় এবং আল্লাহর হুজ্জত মানুষ ও জিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়—যখন মা'আদ ইবনে আদনান-এর উত্তরসূরী জেগে ওঠে।

আল্লাহ তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাগণ এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করে উত্তমরূপে, তাঁদের সকলের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন—একটি দরুদ যা সন্তুষ্টি নিয়ে আসে এবং শান্তির সালাম যা সন্তুষ্টির সাথে জড়িত থাকে।

এর পর বলি, নিশ্চয়ই বান্দাদের জন্য প্রকৃত সুখ এবং আখিরাতে মুক্তি কেবল রাসুলের অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আন

-নিসা: ১৩) এবং বলেন, "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে ও তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তিনি তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এবং তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।" (সূরা আন-নিসা: ১৪)

অতএব, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যই হলো সেই মূল স্তম্ভ, যার উপর সুখ নির্ভরশীল এবং যার মাধ্যমেই মুক্তি অর্জিত হয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য, যেমন তিনি বলেন, "আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র যেন তারা আমার ইবাদত করে।" (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

আর তিনি তাদের উপর ইবাদত ফরজ করেছেন কেবল তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে। অতএব, ইবাদত কেবল সেটাকেই বলা হবে, যা আল্লাহর দ্বীনে ফরজ অথবা মুস্তাহাব হিসেবে বর্নিত; এর বাইরে সবকিছুই তাঁর পথ থেকে বিচ্যুতি। এই কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে আমাদের শরীয়াহ্'য় নেই এমন কোনো কাজ করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আর আল-'ইর্বাদ ইবনে সারিয়ার হাদীসে তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতপার্থক্য দেখতে পাবে। অতএব, আমার সুন্নাহ ও আমার পরে খোলাফায়ে রাশিদিনদের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো। তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, এমনকি পেছনের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো। আর নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, কেননা প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহি।" (সহীহ, সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত, তিরমিযি হাসান করেছেন)

তিনি আরও বলেন, "শ্রেষ্ঠ কথা হলো আল্লাহর বাণী, শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ হলো মুহাম্মদের পথনির্দেশ, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব উদ্ভাবিত কাজ, আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহি।" (সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে প্রায় চল্লিশ স্থানে রাসুলের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেন, "যে রাসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে।" (সূরা আন-নিসা: ৮০) এবং বলেন,

"আর আমি কোনো রাসুলকে পাঠাইনি, যাতে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য না করা হয়। আর যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি তোমার (হে মুহাম্মদ) নিকট আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, আর রাসুল তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তাহলে তারা দেখতে পেত যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কিন্তু না, তোমার রবের কসম, তারা কখনোই ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তারা তোমাকে তাদের বিরোধের ফয়সালাকারী মানে এবং তোমার রায় সম্পর্কে তাদের মনে কোন সংকীর্ণতা না থাকে এবং তারা পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করে।" (সূরা আন-নিসা: ৬৪-৬৫)

তিনি বলেন, "বল, 'আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে ইমরান: ৩২) এবং বলেন, "বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তখন আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ও তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

অতএব, বান্দার আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বর্নিত হয় রাসুলের অনুসরণের মাধ্যমে, এবং আল্লাহর ভালোবাসা লাভের মাধ্যমও এটাই।

তিনি বলেন, "এভাবেই আমি তোমার নিকট আমার আদেশ থেকে এক রূহ (ওহী) নাজিল করেছি। তুমি জানতেও না কিতাব কী এবং ঈমান কী, কিন্তু আমি তা এক আলো বানিয়ে দিয়েছি যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি।" (সূরা আশ-শূরা: ৫২) যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ ওহীর মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, "বল, আমি যদি পথভ্রষ্ট হই, তবে আমার নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হবো। আর যদি আমি সঠিক পথ পাই, তবে তা আমার রব যেটা ওহী করেছেন তার মাধ্যমে।" (সূরা সাবা: ৫০) এবং তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি আলো ও এক স্পষ্ট কিতাব, যার দ্বারা আল্লাহ তাকে পথপ্রদর্শন করেন, যে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে; তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন, এবং সোজা পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ১৫-১৬)

এইভাবেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে কুফর ও ঈমান, লাভ ও ক্ষতি, হেদায়াত ও গোমরাহি, মুক্তি ও ধ্বংস, সোজা পথ ও বক্রপথ, জান্নাতি ও জাহান্নামি, নেককার ও পাপী—সব আলাদা করা

হয়েছে। এবং তাঁর মাধ্যমেই সে পথ চিহ্নিত হয়েছে যেটাতে আল্লাহ নি'আমত দান করেছেন—যেমন নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎলোক—বিপরীতে যারা আল্লাহর গজবে পড়েছে ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব, মানুষের আত্মার প্রয়োজন রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা জানার ও তা অনুসরণের ক্ষেত্রে খাদ্য ও পানীয় থেকেও বেশি। কারণ এগুলোর অনুপস্থিতিতে দুনিয়াতে মৃত্যু হয়, কিন্তু রাসুলের আনুগত্য না করলে আখিরাতে শাস্তি অনিবার্য।

সুতরাং, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো তার সাধ্যানুযায়ী জানার চেষ্টা করা এবং রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্য করা—এটাই জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির এবং জান্নাতে অনন্ত সুখের একমাত্র পথ।

সেই পথে পৌঁছার উপায় হলো বর্ণনা ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা, কারণ কেবল বুদ্ধি তা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন চোখের আলো সামনে আলো না থাকলে কিছু দেখতে পারে না, তেমনি বুদ্ধির আলোও সঠিক পথে চলতে পারে না যতক্ষণ না রিসালতের সূর্য তার উপর উদিত হয়। এ কারণেই দ্বীন প্রচার করা ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বগুলোর অন্যতম। এবং আল্লাহ তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যা আদেশ করেছেন তা জানা সমগ্র মানবজাতির উপর আবশ্যক।

আল্লাহ, যিনি পবিত্র ও মহান, মুহাম্মাদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিতাব ও সুন্নাহ সহ প্রেরণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন। তিনি, মহিমান্বিত, বলেছেন:

"...এবং যাতে আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি এবং যাতে তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও। যেমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু শেখান যা তোমরা জানতে না। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হইও না..." (সূরা আল-বাকারা: ১৫০-১৫২)

তিনি, মহান, আরও বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন, এবং তাদেরকে কিতাব

ও হিকমাহ শিক্ষা দেন..." (সূরা আলে ইমরান: ১৬৪)

তিনি আরও বলেন:

"...এবং আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো, এবং যা তিনি তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিকমাহর মাধ্যমে নাজিল করেছেন যার দ্বারা তিনি তোমাদের উপদেশ দেন..." (সূরা আল-বাকারা: ২৩১)

তিনি বলেন:

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন..." (সূরা আল-জুমু'আ: ২)

তিনি ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন:

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন..." (সূরা আল-বাকারা: ১২৯)

তিনি বলেন:

"আর স্মরণ করো, তোমাদের গৃহে যা পাঠ করা হয়—আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং হিকমাহ..." (সূরা আল-আহযাব: ৩৪)

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর, কাতাদাহ, ইমাম আশ-শাফি'ই এবং আরও অনেকে বলেছেন: হিকমাহ মানে হলো সুন্নাহ। কারণ আল্লাহ তাঁর নবীর স্ত্রীদেরকে আদেশ করেছেন যেন তারা স্মরণ করে যা তাদের গৃহে পাঠ করা হয়—কিতাব ও হিকমাহ। কিতাব হলো কুরআন, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কুরআনের অতিরিক্ত পাঠ করতেন, তা-ই সুন্নাহ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু সনদে, আবু রাফি', আবু সা'লাবা এবং অন্যান্যদের সূত্রে

বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন:

"আমি যেন তোমাদের কাউকে না পাই যে তার চৌকিতে হেলান দিয়ে বসে আছে, আর যখন আমার কোন আদেশ বা নিষেধ তার কাছে পৌঁছায়, তখন সে বলে: 'আমাদের ও তোমাদের মাঝে কেবল কুরআন রয়েছে; আমরা কুরআনে যা হালাল পাই তা হালাল বলি এবং যা হারাম পাই তা হারাম বলি।' নিঃসন্দেহে, আমি কিতাব ও তার অনুরূপ আরেকটি বিষয় একসাথে পেয়েছি।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে:

"নিশ্চয়ই, এটা কিতাবের অনুরূপ।"

কারণ কুরআন নিজেই স্বতন্ত্র—আল্লাহ যেভাবে এটিকে মানুষের বাক্য থেকে আলাদা করে রেখেছেন তার অননুকরণীয়তার মাধ্যমে, যেমন তিনি বলেন:

"বলুন, যদি মানুষ ও জিন একত্র হয়ে এই কুরআনের মতো কিছু আনতে চায়, তারা তা আনতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সহায় হয়…" (সূরা আল-ইসরা: ৮৮)

আর যেহেতু এটি তাওয়াতুরের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, তাই কেউ এর শব্দ বা বর্ণে পরিবর্তন সাধনের সাহস করেনি। তবে শয়তান এর অর্থ বিকৃত করার, তাফসীরের মাধ্যমে মানে পরিবর্তন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে; হাদীসে সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানোর আশাও করেছে।

কিন্তু আল্লাহ, মহান ও পবিত্র, এর মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন রাবী ও সমালোচকদের, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের অনুসারীদের, যারা শয়তানের দলের বিরোধিতা করেছে, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করেছে, এবং কুরআনের অর্থ ও সুন্নাহকে সংযোজন-বিয়োজন থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে।

প্রত্যেক দ্বীনী আলিম, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর এবং মুসলিমদের প্রতি যা অনুগ্রহ, তার বরকতে—বিশেষ করে যারা কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবনকারী ফকীহগণ—তারা অতীত ও বর্তমানের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এসব ভুলের কিছু ছিল স্পষ্ট ও খোলামেলা—যেখান থেকে বিচ্যুতি হারাম; আর কিছু ছিল সূক্ষ্ম—যেখানে ন্যায়পরায়ণ আলিমদের জন্য ইজতিহাদ বৈধ।

রাবী ও সমালোচকগণ বর্ণনাশাস্ত্র ও সনদ বিশ্লেষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা এর জন্য দূর-দূরান্তে সফর করেছেন, রাত্রির আরামের ত্যাগ করেছেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তাদের পুরাতন ও নতুন সম্পদ ব্যয় করেছেন, বিপদ-আপদ সহ্য করেছেন, দুনিয়া থেকে সফরকারীর মতই অল্পে সন্তুষ্ট থেকেছেন।

এই বিষয়ে তাদের এমন বহু ঘটনা রয়েছে যা তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং যারা এগুলোর জ্ঞান রাখতে চায় তাদের জন্য সংরক্ষিত। যেমন তাদের কেউ মাটির বালিশ বানিয়ে শুয়েছে, সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় পরিহার করেছে, পরিবার ও সঙ্গীদের সাথে মিলন বর্জন করেছে, প্রবাসের তিক্ততা সহ্য করেছে এবং কঠিন কষ্ট ভোগ করেছে।

এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাদের হৃদয়ে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন, যেন তিনি এর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন সংরক্ষণ করেন। যেমন তিনি কা'বাকে মানুষের জন্য গমনস্থল ও নিরাপত্তাস্থল বানিয়েছেন, যার দিকে তারা দূরদূরান্ত থেকে যাত্রা করে, পথে অনেক কষ্ট ও ব্যথা সহ্য করে।

আর যেমন তিনি আত্মা ও সম্পদের মাধ্যমে জিহাদকে মুজাহিদদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন—এটি আল্লাহর এক হিকমাহ, যার মাধ্যমে তিনি দ্বীন সংরক্ষণ করেন, পথপ্রাপ্তদের পথ দেখান এবং সত্য ধর্ম ও হিদায়াতকে প্রকাশ করেন, যার সাথে তিনি তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

অতএব, যে ব্যক্তি দ্বীনের কাজগুলো একনিষ্ঠতার সঙ্গে আল্লাহর জন্য করে, সে আল্লাহর পরহেযগার ওলী, চিরস্থায়ী কল্যাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "সতর্ক থাকো! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর বাণীতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৪)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার এই সুসংবাদকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: প্রথমত: প্রশংসনীয়দের প্রশংসা, দ্বিতীয়ত: সেই সৎস্বপ্ন যা একজন সৎ ব্যক্তি দেখে বা তার জন্য দেখা হয়। একবার বলা হলো: "হে আল্লাহর রাসুল, একজন ব্যক্তি নিজে কোনো কাজ করে, অথচ মানুষ তাকে প্রশংসা করে?" তিনি বললেন: "এটাই হলো একজন মু'মিনের দুনিয়ার তাৎক্ষণিক সুসংবাদ।" এবং আল-বারা ইবনে আজিব বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আল্লাহর বাণী 'তাদের জন্য দুনিয়াতে সুসংবাদ আছে'—এটার অর্থ কী?" তিনি বললেন, "এটা সেই সৎ স্বপ্ন, যা একজন সৎ ব্যক্তি দেখে বা তার জন্য দেখা হয়।"

যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান সংরক্ষণে মনোনিবেশ করেছেন, সেই পরহেযগার, আলেম ব্যক্তিরা—যারা তা থেকে অতিরিক্ত বা হ্রাস হতে দেননি—তারা আল্লাহর সবচেয়ে বড় ওলীদের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর সফল দলের অংশ। প্রকৃতপক্ষে, তাদের ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের ওপর এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা অনেক ধাপে উন্নীত করবেন।" (সূরা মুজাদালা: ১১) ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ জ্ঞানপ্রাপ্ত মু'মিনদেরকে জ্ঞানপ্রাপ্ত নয় এমনদের ওপর অনেক ধাপে মর্যাদা দিয়েছেন।[4]

ইসনাদ (সনদের শৃঙ্খল) ও বর্ণনার জ্ঞান আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাহকে বিশেষভাবে দান করেছেন এবং এটাকে বুঝার সিঁড়ি বানিয়েছেন। আহলে কিতাবদের কাছে তাদের বর্ণিত কথাগুলোর কোনো সনদ নেই। একইভাবে, এই উম্মাহর বিদআতপন্থীদেরও নেই, যারা গোমরাহির পথ অবলম্বন করেছে। ইসনাদ শুধু তাদেরই জন্য, যাদের ওপর আল্লাহ সবচেয়ে বড় নিয়ামত

[4] মূল পাঠে এখানে একটি ফাঁকা অংশ রয়েছে। ইবনে আব্বাসের উক্তির পরিপূর্ণ অংশটি সংযোজিত হয়েছে ইমাম আল-হাকিমের তাফসীর (আল-মুস্তাদরাক, ২/৪৮১) থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন: "এটি সহীহ সনদের সহিত হাদীস, তবে বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি।" ইমাম আদ-ধাহাবী এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

বর্ষণ করেছেন—ইসলাম ও সুন্নাহর অনুসারীদের জন্য। তারা এর মাধ্যমেই বিশুদ্ধ ও দুর্বল, বক্র ও সোজা বর্ণনার পার্থক্য নির্ণয় করে। অন্যরা—বিদআতপন্থী ও কাফেররা—শুধু এমন বর্ণনার উপর নির্ভর করে, যেগুলোর কোনো সনদ নেই, অথচ তাদের দীন তাতে নির্ভরশীল। তারা এসবের মধ্যে সত্য-মিথ্যা বা বিশুদ্ধ-ত্রুটিপূর্ণ পার্থক্য করতে জানে না।

কিন্তু এই উম্মাহ, যাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়েছে, এবং এই উম্মাহর সাহাবাগণ, যাদের সম্মিলিতভাবে ভুল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে—তাদের মধ্যে জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তিরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত। সত্য তাদের কাছে মিথ্যার মতো পরিষ্কার, যেমন দুই চোখওয়ালা ব্যক্তি সকাল দেখেন। আল্লাহ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, তা হোক বুদ্ধির মাধ্যমে অথবা বর্ণনার মাধ্যমে।

তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, যদি কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হয়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে ফিরিয়ে দাও। যেমন আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল, তাদের। আর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতভেদ করো, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসুলের কাছে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনে বিশ্বাস করে থাকো। এটাই উত্তম এবং ফলাফলের দিক থেকে সর্বোত্তম।" (সূরা নিসা: ৫৯)

তাই, যদি ফিকহবিদরা কোনো হুকুমে একমত হন, তাহলে তা অবশ্যই সত্য। আর যদি মুহাদ্দিসরা কোনো হাদীসকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে তা অবশ্যই সত্য। এই দুই দলের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ লক্ষ্য পূরণে কিছু পদ্ধতি রয়েছে—স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম—যার মাধ্যমে এই বিষয়ে নিবেদিতদের চেনা যায়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের ইলহাম দেন, শরঈ প্রমাণসমূহের মাধ্যমে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা সাহায্য করেছেন, কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আন্তরিক ছিল এবং যারা আল্লাহ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের প্রতি শত্রুতা রেখেছিল। তিনি বলেন, "তুমি এমন কোনো জাতিকে পাবে না, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধকারীদের ভালোবাসে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা আত্মীয়-স্বজন হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের রূহ দ্বারা শক্তি দিয়েছেন।" (সূরা মুজাদালা: ২২)

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে বর্ণনা পরিবেশনকারী জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই মূলনীতিগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দা তাদের প্রভাবিত করতে পারে না, আর কোনো বড় বাধাও তাদেরকে আল্লাহর পথে চলা থেকে বিরত রাখতে পারে না। বরং তাদের একজন তার ওপর যা ফরয, সেই সত্য কথা বলেন— যদি তা তার প্রিয়তম ব্যক্তির বিরুদ্ধেও হয়—আল্লাহ তাআলার এই বাণীর আমল অনুসারে: "হে মুমিনগণ! ইনসাফের উপর দৃঢ় থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক বা গরীব—আল্লাহই তাদের অধিক হকদার। সুতরাং ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, যাতে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত না হও। আর যদি তোমরা কথাকে বিকৃত করো অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত।" (সূরা নিসা: ১৩৫)

আর আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকো, সাক্ষ্যদাতা হও এবং কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ইনসাফ না করতে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ করো; এটাই পরহেযগারির কাছাকাছি। আর আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত।" (সূরা মায়িদাহ: ৮)

তাদের মধ্যে তাহকীক (প্রমাণ প্রতিষ্ঠা), তাজরীহ (অগ্রাহ্য ঘোষণা), তাঈফ (দুর্বল ঘোষণা) ও তাসহীহ (সহীহ ঘোষণা)-এর ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় পরিশ্রম ও নেক আমল রয়েছে, যা দ্বীন সংরক্ষণের অন্যতম কারণ হয়েছে এবং বানানো মিথ্যাবাদীদের উদ্ভাবন থেকে তা রক্ষা করেছে। তারা এতে বিভিন্ন স্তরে রয়েছেন: তাদের মধ্যে কেউ শুধু বর্ণনা ও সংরক্ষণে সীমাবদ্ধ; কেউ কেউ হাদীস ও তার বোধগম্যতায় বিশেষজ্ঞ; আর কেউ কেউ তা থেকে ফিকহ আহরণে পারদর্শী ও তার অর্থের গভীর জ্ঞান রাখেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি আদেশ করেছিলেন, যারা উপস্থিত আছে তারা যেন তাঁর পক্ষ থেকে অনুপস্থিতদের কাছে বাণী পৌঁছে দেয়, এবং তিনি সেই বাণীবাহকদের জন্য কবুলকৃত দোআ করেছিলেন। সহীহ হাদীসে তিনি বলেন: "তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াতই হয়। বনী ইসরাঈলের কথা বর্ণনা কর, এতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার আসন গ্রহণ করে নেয়।" এবং বিদায় হজের খুতবায় তিনি আরও বলেন: "যিনি উপস্থিত, তিনি যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেন, কেননা হতে পারে, যার কাছে তা পৌঁছানো হয়েছে, সে সরাসরি শ্রোতার চেয়ে তা আরও ভালোভাবে বুঝে।" আর তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ

তাকে তাজা-উজ্জ্বলতা দান করুন, যে আমাদের কাছ থেকে একটি হাদীস শুনে, তারপর তা এমন একজনের কাছে পৌঁছে দেয়, যে তা শোনেনি। কেননা হতে পারে, জ্ঞানের বাহক নিজে ফকীহ নয়, আর হতে পারে, সে এমন কারও কাছে তা পৌঁছে দেয়, যে তার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখে।"

তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যা সম্পর্কে কোন মুসলিমের অন্তরে কখনো বিদ্বেষ থাকে না: আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ আমল করা, শাসকদের প্রতি সদুপদেশ প্রদান করা, এবং মুসলিম জামাআতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা; কেননা তাদের জন্য দোআ তাদের পশ্চাতে থেকে তাদের পরিবেষ্টন করে রাখে। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের জন্য দোআ রয়েছে, যদিও তিনি নিজে ফকীহ না হন; এবং দোআ রয়েছে এমন শ্রোতার জন্য, যিনি বর্ণনাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন, কেননা তাজা-উজ্জ্বলতা (নযরাহ) সেই বর্ণনাকারীদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এজন্য সুফিয়ান ইবনে উইয়নাহ বলেন: "তোমরা হাদীসের লোকদের মধ্যে এমন কাউকে পাবে না যার মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা নেই, এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোআর ফল।" বলা হয়: "নাযারাহ" ও "নাযুরাহ", তবে ফাতহাহ সহ (নাযারাহ) উচ্চারণই বেশি ফসীহ।

ইলমের লোকেরা পূর্বে ও বর্তমানে সর্বদাই হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্মান করে এসেছে, এমনকি ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "আমি যখন হাদীসের লোকদের কাউকে দেখি, তখন মনে হয় আমি যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীকে দেখছি।" ইমাম শাফেয়ী এ কথা বলেন এজন্য যে, তারা রাসুলের হাদীস পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহাবীদের অবস্থানে রয়েছে। তিনি আরও বলেন: "হাদীসের লোকেরা ইলম সংরক্ষণ করেছেন, সুতরাং তাদের আমাদের উপর উপকারিতা রয়েছে, কেননা তারা আমাদের জন্য তা সংরক্ষণ করেছেন।"

— সমাপ্ত —

একতা ও বিভক্তি সংক্রান্ত একটি মূলনীতি, তার কারণ ও পরিণতি

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তিনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীনের বিধান দিয়েছেন যা তিনি নূহকে দিয়েছেন, আর যা আমরা তোমার (হে মুহাম্মদ) প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, এবং যা আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার প্রতি নির্দেশ দিয়েছি—যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং এতে বিভক্ত হয়ো না..." (সূরা আশ-শূরা: ১৩)। তিনি, মহিমান্বিত তিনি, জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের জন্য সেই দ্বীনের বিধান দিয়েছেন যা তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী করেছিলেন এবং যা তিনি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। এঁরা হলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ, যাঁদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, যেমন তিনি বলেন: "স্মরণ করো (হে মুহাম্মদ), যখন আমি নবীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমার থেকেও, এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মারইয়াম থেকেও..." (সূরা আল-আহযাব: ৭)।

তিনি বলেন: "নূহকে যা নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমার প্রতি যা ওহী পাঠিয়েছি, এবং যাঁদের প্রতি আমরা নির্দেশ দিয়েছি..."—এখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে "যা" (الذي) শব্দের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে এবং "ওহী" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, আর অন্যান্য রাসূলদের জন্য "ওসিয়্যাত" (নির্দেশ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এরপর তিনি বলেন: "যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো..."—এটি সেই নির্দেশের ব্যাখ্যা। এখানে "আন"(أن) হলো ব্যাখ্যামূলক (المفسرة) এমন ক্রিয়ার পরে আসে যা কথা বলার অর্থ প্রকাশ করে, যদিও সেই শব্দমূল ব্যবহার করে না। যেমন আল্লাহ বলেন: "অতঃপর আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি (বলেছি): অনুসরণ করো)..." সূরা আন-নাহল: ১২৩), এবং: "আমি তাদেরকে এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা

আল্লাহকে ভয় করো (।সূরা আন-নিসা: ১৩১)। অর্থাৎ, আমি তাদের বলেছি: "আল্লাহকে ভয় করো"। তেমনি এখানেও: "যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো (أن أقيموا الدين) অর্থ: তিনি রাসূলদেরকে এবং আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন তা এই কথা বলে দিয়েছেন: "তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং এতে বিভক্ত হয়ো না"। সুতরাং যা আমাদের জন্য বিধান করা হয়েছে, যা রাসূলদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী করা হয়েছে, তা হলো: "তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো..."

এখানে বলা হতে পারে: "তোমরা প্রতিষ্ঠা করো।أقيموا)) —এই ক্রিয়াপদের সর্বনাম আমাদের (মুহাম্মদের উম্মত) দিকে ইঙ্গিত করে। অথবা বলা যেতে পারে, এটি রাসূলদের দিকে, কিংবা সবার দিকেই ইঙ্গিত করে। এই শেষ উক্তিই সবচেয়ে সঠিক। যেমন বলা হয়: "আমি তোমাদেরকে সেই আদেশ দিয়েছি যা আমি যায়েদকে দিয়েছি: আল্লাহর আনুগত্য করো।" অথবা: "আমি তোমাদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছি যা আমি অমুকদের সন্তানদেরকে দিয়েছি: এটা করো।" প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি হবে "যা" (ما) এর বদল, অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য যা বিধান করেছেন, তা হলো: "তোমরা প্রতিষ্ঠা করো..."। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায়: তিনি তাদেরকে যে কথাটি বলেছিলেন তা তোমাদের জন্য বিধান করেছেন, অর্থাৎ: "প্রতিষ্ঠা করো..."। তৃতীয় ব্যাখ্যায়: তিনি যা নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটাই বিধান করেছেন: "প্রতিষ্ঠা করো..."। যেহেতু তিনি "প্রতিষ্ঠা করো" এই বাক্যটি উভয় দলের উদ্দেশ্যে বলার পর উল্লেখ করেছেন, তাই এটি উভয় দলের প্রতি ইঙ্গিত করে—এটাই সবচেয়ে সঠিক মত, ইনশাআল্লাহ। প্রথম দুই ব্যাখ্যার অর্থও শেষ পর্যন্ত এই তৃতীয়টির প্রতিই ফিরে আসে। কারণ, আমাদের জন্য যা বিধান করা হয়েছে, তা হলো রাসূলদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা এবং এতে বিভক্ত না হওয়া। কিন্তু সংশয় কেবল এতটুকুতে যে, এই ক্রিয়ার সর্বনাম কাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে—রাসূলদের, আমাদের, না উভয়কেই।

যেহেতু আল্লাহ প্রথমদের ও শেষদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিভক্ত না হতে আদেশ দিয়েছেন, এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের জন্য সেই দ্বীন বিধান করেছেন যা তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং মুহাম্মদের প্রতি ওহী করেছিলেন—এটা দুইটি বিষয় বোঝায়:

প্রথমত: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যা ওহী করা হয়েছে, তার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা কেবল আমাদের জন্য নির্দিষ্ট শরীআত। কেননা যা কিছু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, তা আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী করেছেন—মৌলিক ও শাখাগত উভয় দিকেই। আর নূহ ও অন্যান্য

রাসূলদের ব্যাপারে যা আমাদের জন্য বিধান করা হয়েছে, তা হলো তাঁদের উপর যা নির্দেশ ছিল: দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং বিভক্তি বর্জন। যেটি সকলের উপর একমত, তা হলো দ্বীনের মূল ভিত্তিসমূহ।

অতএব, এই বাক্যে কয়েকটি দিক রয়েছে:

প্রথমত: তিনি আমাদের জন্য যে দ্বীন বিধান করেছেন তা হলো—যৌথ দ্বীন (সাধারণ ইসলাম ও ঈমান), এবং আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দ্বীন (বিশেষ ইসলাম ও ঈমান)।

দ্বিতীয়ত: তিনি আমাদেরকে এই পূর্ণ দ্বীন, যৌথ ও নির্দিষ্ট উভয়ই, প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাতে বিভক্তি থেকে নিষেধ করেছেন।

তৃতীয়ত: তিনি রাসূলদেরকেও যৌথ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন এবং তাতে বিভক্তি হতে নিষেধ করেছেন।

চতুর্থত: যখন তিনি বলেন: "এবং যা আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি..."—এটি তিনি রাখলেন "নূহকে যা নির্দেশ দিয়েছি..." এবং "ইবরাহীম, মূসা, ঈসাকে যা নির্দেশ দিয়েছি..."—এই দুইয়ের মাঝে; এটি ইঙ্গিত দেয় সেই নির্দিষ্টতার দিকে।

এরপর তিনি বলেন: "তারা বিভক্ত হয়নি জ্ঞান আসার পর, নিজেদের মধ্যকার অহংকার (বাগই) এর কারণে..." (সূরা আশ-শূরা: ১৪)। তিনি জানিয়ে দিলেন, বিভক্তি কেবল তখনই এসেছে যখন তাদের কাছে জ্ঞান এসেছে, যা তাদের জন্য স্পষ্ট করে দিয়েছে কী থেকে তারা বিরত থাকবে। কেননা আল্লাহ কোনো কওমকে পথনির্দেশ দেওয়ার পর গোমরাহ করেন না যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন তারা কী থেকে বাঁচবে। এবং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা বিভক্ত হয়নি, ব্যতীত অহংকারের কারণে। আর বাগই হলো সীমালঙ্ঘন, যেমন ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন—তা হলো অহংকার এবং হিংসা।[5] এটি সেই ভিন্নতার মতো নয়, যা ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হয়, যেখানে নিশ্চিত জ্ঞান নেই এবং সীমা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যও নেই—যেমন আলিমদের মধ্যে বৈধ মতবিরোধ। বাগই হলো হয় সত্যকে উপেক্ষা

[5] মূল লেখায় একটি ফাঁকা স্থান রয়েছে। শাইখ নাসির ইবনে হামাদ আল-ফাহদ (পৃষ্ঠা ১৪) বলেন: "প্রকৃতপক্ষে মনে হয়, উক্ত ফাঁকা স্থানের স্থলে ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক 'বাগই'-এর ব্যাখ্যা (তাফসীর) উদ্ধৃত হওয়ার কথা ছিল। ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর তাফসীরে (৩/২৩১) ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী: 'বাগইয়ান বাইনাহুম' (তাঁদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক জুলুম ও আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি) – সূরা আলে 'ইমরান – এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন: '(এর অর্থ হলো) পার্থিব স্বার্থের জন্য জুলুম, পার্থিব কর্তৃত্ব ও প্রভাবের সন্ধানে, এমনকি তারা একে অপরকে দুনিয়ার জন্য হত্যা করে বসে, যদিও তারা ছিল মানুষের মাঝে আলিম শ্রেণি।"

করা, নয়তো সীমা লঙ্ঘন করা; তাই এটি হয় কোনো ওয়াজিবকে ছেড়ে দেওয়া অথবা কোনো হারাম কাজ করা। সুতরাং এটা জানা গেল, বিভক্তির কারণ এগুলিই।

এটি তেমনই যেমন আল্লাহ তাআলা কিতাবধারীদের সম্পর্কে বলেছেন: “আর যারা বলে, ‘আমরা খ্রিষ্টান’, তাদের কাছ থেকেও আমরা অঙ্গীকার নিয়েছিলাম; কিন্তু তারা সে উপদেশের এক অংশ ভুলে গিয়েছিল, যা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব আমরা তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত…” (সূরা আল-মায়েদাহ: ১৪)। সুতরাং আল্লাহ আমাদের অবহিত করেছেন যে, তারা যে অংশবিশেষ ভুলে গিয়েছিল—যার অর্থ তারা যা আদিষ্ট হয়েছিল তার কিছু অংশের উপর আমল করা পরিত্যাগ করেছিল—এটাই ছিল তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ। এটাই আমাদের দ্বীনের অনুসারীদের মধ্যেও ঘটে, যেমনটি আমরা দেখি দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের ব্যাপারে মতভেদকারী দলগুলোর মধ্যে, আকীদা ও ফিকহের অনুসারীদের মধ্যে, আলেম ও ইবাদতকারীদের মধ্যে। যারা ‘মূসাবাদী’ (আলেহি সালাম) প্রবণতায় বাহ্যিক শরীআতের প্রতি প্রগাঢ় মনোযোগী, কিংবা ‘ঈসাবাদী’ (আলেহি সালাম) প্রবণতায় আত্মিক সাধনার প্রতি নিবিষ্ট, এমন লোকদের মধ্যেও পারস্পরিক বিদ্বেষ তৈরি হয়, এমনকি তারা দুই জাতির (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) মতো হয়ে যায়, যাদের প্রত্যেকে অপরকে বলে, সে কিছুই নয়। আমরা দেখি, একদিকে এমন ফকীহ রয়েছেন, যিনি দ্বীনের বাহ্যিক দিককে আঁকড়ে ধরেছেন, অপরদিকে এমন সুফী রয়েছেন, যিনি এর আত্মিক দিককে আঁকড়ে ধরেছেন—এদের প্রত্যেকেই অপরপক্ষের পথকে অস্বীকার করে এবং দাবী করে যে, সে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা তাকে উপেক্ষা করে, যেন সে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা হৃদয়ের পবিত্রতা এবং দেহের পবিত্রতা—উভয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এই দুই পবিত্রতাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজকৃত দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন: “আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্ট আরোপ করতে চান না, বরং তিনি চান যাতে তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন…” (সূরা আল-মায়েদাহ: ৬)। তিনি বলেন: “তাতে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা নিজেদের পবিত্র রাখতে ভালোবাসে; আর আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা নিজেদের পবিত্র রাখে” (সূরা আত-তাওবাহ: ১০৮)। তিনি বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন” (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২২)। তিনি বলেন: “তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, এর মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে…” (সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩)। তিনি বলেন: “তারা

এমন লোক, যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে আল্লাহ চান না” (সূরা আল-মায়েদাহ: ৪১)। তিনি বলেন: “মুশরিকগণ তো অপবিত্র” (সূরা আত-তাওবাহ: ২৮)। তিনি বলেন: “হে নবীর পরিবারবর্গ, আল্লাহ চান যেন তিনি তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ করে দেন” (সূরা আল-আহযাব: ৩৩)।

আমরা দেখি, বহু ফকীহ ও ইবাদতকারী রয়েছেন, যাদের চিন্তা কেবল দেহের পবিত্রতা নিয়ে। তারা এর প্রতি এমন মাত্রায় অতিরঞ্জন করে যে, তারা হৃদয়ের পবিত্রতা, যা ফরজ বা মুস্তাহাব—তা অবহেলা করে বসে। তাদের কাছে পবিত্রতার মানে কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা। আবার আমরা দেখি, বহু সুফী ও যাহিদ রয়েছেন, যাদের চিন্তা কেবল হৃদয়ের পবিত্রতা নিয়ে। তারা তাতে এমন মাত্রায় অতিক্রম করে যায় যে, তারা দেহের পবিত্রতা, যা ফরজ বা মুস্তাহাব—তা অবহেলা করে বসে। প্রথম দলটি বাড়াবাড়িতে পড়ে যায় পানির অতিরিক্ত ব্যবহার, অপবিত্র না হওয়া বস্তুকে অপবিত্র গণ্য করা, এবং এমন বস্তু এড়িয়ে চলায়, যেগুলো পরিত্যাগের নির্দেশ নেই। অথচ তাদের অন্তরে ভাইদের প্রতি হিংসা, অহংকার ও বিদ্বেষের মত জিনিস বিদ্যমান। এতে ইহুদিদের সাথে স্পষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় দলটি গাফেলতিতে পড়ে যায়। তারা অন্তরের পবিত্রতার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি করে যে, এমনকি যা জানা আবশ্যক এবং যার থেকে সতর্ক থাকা ফরজ—তা না জানাকে তারা ‘অন্তরের সুস্থতা’ মনে করে। তারা হৃদয়ের পবিত্রতা ও নিষিদ্ধতার ইচ্ছা থেকে মুক্ত থাকা, এবং আল্লাহর নির্দেশিতভাবে শত্রুতা চেনার মাঝে পার্থক্য করে না। এরপর এ অজ্ঞতা ও গাফেলতার পাশাপাশি, তারা অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকে না এবং ফরজ পবিত্রতা আদায় করে না—যা খ্রিষ্টানদের অনুসরণের মতো। এভাবে, তারা যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার একাংশ ত্যাগ করার কারণে এবং সীমালঙ্ঘন ও জুলুমের কারণে পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। সীমালঙ্ঘন হয় কখনো একজনের অপরের উপর, আবার কখনো তা আল্লাহর অধিকারে হয়—এবং এ দুটো একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যই তিনি বলেন: “তাদের নিজেদের মধ্যকার বিদ্বেষ ও হিংসার কারণে…” কেননা প্রত্যেক দল অপর দলের প্রতি সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের যে হক আছে তা স্বীকার করেনি, এবং তাদের উপর জুলুম করতে ছাড়েনি।

তিনি বলেন: “আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা বিভক্ত হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে” (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৪)। এবং তিনি বলেন: “মানবজাতি ছিল এক একক উম্মত, অতঃপর আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে নাযিল

করলেন কিতাব, সত্যসহ, যেন সে কিতাব মানুষের মাঝে বিচার করে তাদের ভিন্নমতের বিষয়ে। আর কেবল তারাই তাতে মতানৈক্য করেছে, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর—তাদের নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসার কারণে…" (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২১৩)। তিনি বলেন: "আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, বিচারক্ষমতা ও নবুওয়াত দিয়েছিলাম…" (সূরা আল-জাথিয়াহ: ১৬)। তিনি মূসা ইবনে 'ইমরান (আলেহিস সালাম) সম্পর্কেও এ জাতীয় অনেক কিছু বলেছেন। এবং তিনি বলেন: "তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল, স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে পৌঁছার পর…" (সূরা আলে 'ইমরান: ১০৫)। এবং তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে—তাদের সাথে তোমার (হে মুহাম্মাদ) কোনো সম্পর্ক নেই…" (সূরা আল-আন'আম: ১৫৯)। এবং তিনি বলেন: "তুমি তোমার মুখ ফিরিয়ে রাখো সোজা দ্বীনের দিকে, আল্লাহর প্রকৃতির প্রতি মনোনিবেশ করো, যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। সেটিই সোজা দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। তাঁর দিকে ফিরে আসো, তাঁকে ভয় করো, সালাত কায়েম করো, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দলই তাদের নিজেদের কাছে যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট…" (সূরা আর-রূম: ৩০-৩২)। কেননা প্রত্যেক মুশরিক তার প্রবৃত্তির অনুসারে কোনো না কোনো মাবূদকে উপাসনা করে। যেমন তিনি প্রথম আয়াতে বলেন: "তুমি যাদেরকে আহ্বান করছ, তা মুশরিকদের কাছে অত্যন্ত কঠিন…" এবং তিনি বলেন: "হে রাসুলগণ! পবিত্র বস্তু খাও এবং সৎকাজ করো। নিশ্চয়ই আমি যা তোমরা করো, সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। নিশ্চয়ই তোমাদের এই দ্বীন একটি একক দ্বীন, আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো। কিন্তু তারা নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে এবং দল উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, প্রত্যেক দল তাদের নিজের কাছে যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট…" (সূরা আল-মু'মিনূন: ৫১-৫৩)।

অতএব, পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের কারণ হলো দ্বীনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় থাকা এবং তার উপর আমল করা—যা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা, কোনো শরীক না রেখে, যেমনটি তিনি আদেশ করেছেন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে। আর বিভক্তির কারণ হলো, বান্দা যা আদিষ্ট হয়েছে, তা থেকে কিছু অংশ পরিত্যাগ করা এবং নিজেদের মাঝে সীমালঙ্ঘন করা। ঐক্যের পরিণতি হলো আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর বরকত, দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য, এবং মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা। আর বিভক্তির পরিণতি হলো আল্লাহর শাস্তি, তাঁর অভিশাপ, মুখমণ্ডলের অন্ধকার, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরাগভাজন হওয়া। এটি দলীল যে, ইজমা (সম্মিলিত ঐকমত্য) হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট দলীল। কেননা যখন

তারা একত্রিত হয়, তখন তারা আল্লাহর আনুগত্যে একত্রিত হয় এবং তাঁর রহমত লাভ করে। আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রহমত এমন কোনো বিশ্বাস, কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না, যা আল্লাহ আদেশ করেননি। সুতরাং, তারা যে কথা বা কাজের উপর একমত হয়েছে, যদি তা আল্লাহর আদিষ্ট না হয়ে থাকে, তবে তা আল্লাহর আনুগত্য হবে না, আর তা আল্লাহর রহমতের কারণও হবে না। আবূ বকর আব্দুল আযীয এটিকে 'আত-তানবীহ' গ্রন্থের শুরুতেই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এবং এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

অনুচ্ছেদ

তিনি বলেন:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই প্রসিদ্ধ হাদীসে বলেছেন, যা সুন্নানসমূহে সাহাবীগণের মধ্যে দুইজন ফকীহ—আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং যায়দ ইবনে থানিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে: "তিনটি বিষয় রয়েছে, যা সম্পর্কে একজন মুসলিমের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ থাকে না: আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমলের ইখলাস, শাসকগণের প্রতি আন্তরিক উপদেশ প্রদান, এবং মুসলিমদের জামা'আতের সঙ্গে লেগে থাকা; কেননা তাদের দোয়া তাদেরকে অন্তর থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে।"

এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন: যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না, এবং তোমাদের ওপর যাদেরকে আল্লাহ কর্তৃত্ব দিয়েছেন, তাদেরকে আন্তরিক উপদেশ প্রদান করো।"

এই দুই হাদীসে তিনি তিনটি গুণকে একত্র করেছেন: আল্লাহর জন্য আমলে ইখলাস, শাসকদের প্রতি আন্তরিক উপদেশ, এবং মুসলিমদের জামা'আতের সঙ্গে লেগে থাকা। এই তিনটি গুণ দ্বীনের মূলনীতি এবং তার ভিত্তিসমূহকে শামিল করে, এবং এগুলো আল্লাহর হক ও তাঁর বান্দাদের হক উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। পৃথিবী ও আখিরাতের কল্যাণ এই তিনটির মাধ্যমেই সংগঠিত হয়।

এর ব্যাখ্যা হলো, হক দুই প্রকার: আল্লাহর হক এবং বান্দার হক। আল্লাহর হক হলো আমরা তাঁর ইবাদত করি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করি, যেমনটি একটি হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে; এবং এটি অন্য হাদীসে "আল্লাহর জন্য আমলে ইখলাস" বলার অর্থ।

আর বান্দার হক দুই প্রকার: বিশেষ এবং সাধারণ। বিশেষ হকের উদাহরণ হলো: প্রত্যেক ব্যক্তির তার পিতা

-মাতার প্রতি সদাচরণ, স্ত্রীর অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার ইত্যাদি। এসব দ্বীনের শাখাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, কারণ কোন কোন সময় কোনো মুকাল্লাফ ব্যক্তি এগুলোর দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারে, এবং এগুলোর কল্যাণ সীমিত ও ব্যক্তিগত।

আর সাধারণ হকের ক্ষেত্রে মানুষ দুই শ্রেণির: শাসক এবং শাসিত। শাসকদের হক হলো—তাদেরকে আন্তরিক উপদেশ প্রদান; আর শাসিতদের হক হলো—তাদের জামা'আতের সঙ্গে থাকা; কেননা তাদের কল্যাণ তাদের ঐক্যের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হয়, এবং তারা বিভ্রান্তির ওপর একত্রিত হয় না। বরং তাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ তাদের ঐক্য এবং আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই নিহিত। সুতরাং এই গুণসমূহ দ্বীনের মূলনীতি সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এটি স্পষ্ট হয়েছে মুসলিমে বর্ণিত সেই হাদীসে, যা তামীম আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এসেছে, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দ্বীন হলো আন্তরিক উপদেশ। দ্বীন হলো আন্তরিক উপদেশ। দ্বীন হলো আন্তরিক উপদেশ।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহর রাসুল, কার জন্য?" তিনি বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিমদের নেতৃবর্গের জন্য, এবং তাদের সাধারণ জনগণের জন্য।"

আল্লাহ, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের প্রতি আন্তরিক উপদেশ আল্লাহর হক এবং কেবল তাঁরই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিক উপদেশ—এর এক অংশ হলো শাসকগণের প্রতি উপদেশ এবং মুসলিম জামা'আতের সঙ্গে লেগে থাকা। কেননা জামা'আতের সঙ্গে থাকা তাদের প্রতি সাধারণ উপদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেকের প্রতি পৃথকভাবে আন্তরিক উপদেশের ক্ষেত্রে কিছুটা সম্ভব হলেও, সবাইকে আলাদাভাবে উপদেশ দেয়া পূর্ণরূপে অর্জনযোগ্য নয়।

অনুচ্ছেদ

আর শাইখুল ইসলাম (আল্লাহ তাঁর আত্মাকে পবিত্র করুন) বলেছেন :

আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ হলেন তাঁর বান্দা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পরবর্তীতে বলি : এটি আল্লাহর একত্ব, এবং ইবাদতে ও সাহায্য চাওয়ায় তাঁর জন্য নিয়ত ও আমলের খালিসতা সংক্রান্ত এক গভীর মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "বলুন, হে মালিকুল মুলক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন এবং যাকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমান করেন..." (আলে ইমরান: ২৬)। আর তিনি, মহিমান্বিত, বলেছেন : "তোমাদের প্রতি যেই নেয়ামতই আছে, তা আল্লাহর কাছ থেকেই। অতঃপর যখন তোমাদের উপর বিপদ আপতিত হয়, তখন তোমরা তাঁরই নিকট উচ্চস্বরে সাহায্য প্রার্থনা কর..." (নাহল: ৫৩)। আর তিনি, মহিমান্বিত, বলেছেন : "আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে পতিত করেন, তবে তিনিই একমাত্র তা দূরকারী; আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দেন—তবে তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান..." (আনআম: ১৭)। আর তিনি, মহিমান্বিত, অন্য আয়াতে বলেছেন : "আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে পতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারবে না; আর যদি তিনি তোমার জন্য কল্যাণ চান, তবে কেউ তাঁর অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারবে না..." (ইউনুস: ১০৭)। আর তিনি বলেছেন : "আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য চাই..." (ফাতিহা: ৫)। আর তিনি বলেছেন : "অতএব, তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখো..." (হুদ: ১২৩)। আর তিনি বলেছেন : "আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই নিকট ফিরে যাই..." (হুদ: ৮৮ / আশ-শূরা: ১০)। আর তিনি বলেছেন : "যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই, এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান..." (তাগাবুন: ১)। আর তিনি বলেছেন : "অতএব জেনে রাখো, (হে মুহাম্মাদ), আল্লাহ

ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তোমার পাপ এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো..." (মুহাম্মাদ: ১৯)। আর তিনি বলেছেন : "বলুন, তোমরা কি চিন্তা করেছ যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আহ্বান করো? যদি আল্লাহ আমার জন্য ক্ষতি চান, তাহলে তারা কি তাঁর ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তাহলে তারা কি তাঁর অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে?" (যুমার: ৩৮)।

আর তিনি বলেছেন : "বলুন (হে মুহাম্মাদ), যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া ইলাহরূপে ডাকো, তাদের ডাকো। তারা আসমানসমূহ ও যমীনে এক কণার পরিমাণও মালিক নয়, এবং তাদের মধ্যে কারোই এতে কোন অংশীদারিত্ব নেই, এবং তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর কোন সাহায্যকারী নয়। আর তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ কার্যকর হয় না..." (সাবা: ২২-২৩)। আর তিনি বলেছেন : "বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আহ্বান করো, তারা তো তোমাদের থেকে কষ্ট দূর করতেও পারে না এবং তা অন্যদিকে সরিয়ে দিতেও পারে না। যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারাও তাদের রবের নিকট পন্থা খোঁজে—তাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী হতে পারে, এ প্রত্যাশায়। তারা তাঁর রহমতের আশা রাখে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ..." (ইসরা: ৫৬-৫৭)। আর তিনি বলেছেন : "আর আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে আহ্বান করো না। তাঁর ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিচার তাঁরই, এবং তোমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে..." (কাসাস: ৮৮)। আর তিনি বলেছেন : "আর সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করো যিনি কখনো মরবেন না, এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো। আর তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত। তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন এবং এদের মাঝখানে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন..." (ফুরকান: ৫৮-৫৯)। আর তিনি বলেছেন : "তাদেরকে আদেশ করা হয়নি, শুধুমাত্র যেন তারা আল্লাহরই ইবাদত করে, তাঁর জন্য দ্বীন খালিস রাখে, একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে ঝুঁকে থাকে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে..." (বাইয়্যিনাহ: ৫)।

এ ধরনের বহু উদাহরণ কুরআনে রয়েছে, এবং অনুরূপ হাদীসসমূহে, আর অনুরূপভাবে সমগ্র উম্মাহর ঐক্যমতে, বিশেষত তাদের মধ্যে যারা জ্ঞান ও ঈমানের অধিকারী। কেননা এই (নীতিকে) তারা দ্বীনের মূল চালিকাশক্তি মনে করে, আর সত্যিই তাই। আমরা এটি কয়েকটি দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করবো, যার পূর্বে একটি ভূমিকা দিচ্ছি।

আর সেটি হলো : বান্দা—বরং প্রতিটি জীবন্ত সত্তা—বরং আল্লাহ ছাড়া প্রতিটি সৃষ্টি অভাবগ্রস্ত ও প্রয়োজনময়; তার উপকারে যা আসে তা লাভ করা এবং যা ক্ষতিকর তা রোধ করার জন্য সে নির্ভরশীল। উপকার বলতে বোঝায় সুখ ও আনন্দ, এবং ক্ষতি বলতে বোঝায় কষ্ট ও শাস্তি। অতএব, তার জন্য দুইটি বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে : প্রথমত : যা কাম্য, উদ্দেশ্যপ্রাপ্ত এবং প্রিয়—যার মাধ্যমে উপকার ও আনন্দ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত : সেই সাহায্যকারী, মাধ্যম ও সহজতাকারী, যিনি সে উদ্দেশ্যপ্রাপ্ত বিষয় অর্জনে সহায়তা করেন এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করেন।

এই দুই বিষয় আসলে দুটি আলাদা বিষয় : **করণীয়** (ফাঈল) এবং **লক্ষ্য** (গায়াহ)। ফলে এখানে চারটি বিষয় রয়েছে :

প্রথমত : এমন এক বিষয় যা প্রিয়, এবং যার অস্তিত্ব কাম্য; **দ্বিতীয়ত** : এমন এক বিষয় যা অপছন্দনীয়, এবং যার অনুপস্থিতি কাম্য; **তৃতীয়ত** : কাম্য ও প্রিয় বিষয় অর্জনের মাধ্যম; **চতুর্থত** : অপছন্দনীয় বিষয় প্রতিহত করার মাধ্যম। এই চারটি বিষয় প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যক, বরং প্রতিটি জীবন্ত সত্তার জন্য; তার অস্তিত্ব ও কল্যাণ এগুলোর ওপর নির্ভরশীল। আর যে জীবন্ত নয়, তার ব্যাপারে আলোচনা ভিন্ন প্রকৃতির।

যখন এ বিষয়টি পরিষ্কার হলো, তখন আমি যে কথাটি উল্লেখ করেছি তা ব্যাখ্যা করা যায় কয়েকটি দিক থেকে : প্রথমত : আল্লাহ তা'আলাই এমন এক সত্তা, যিনি চান যে, তিনিই হোন উদ্দেশ্য, আহ্বানযোগ্য ও কাম্য। আর তিনিই হোন সাহায্যকারী, যে কাম্য বিষয় অর্জনে সহায়তা করেন, এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করেন। অতএব, তিনি, মহিমান্বিত, এমন এক সত্তা যিনি একাই এই চারটি বিষয়কে একত্রিত করেছেন, তাঁর ছাড়া আর কেউ নয়। এটাই হল তাঁর বাণীর অর্থ : "আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য চাই..." (ফাতিহা: ৫)। কেননা, 'ইবাদত' অন্তর্ভুক্ত করে উদ্দেশ্যলাভকে, এবং তা সর্বোত্তম রূপে; আর 'সাহায্য চাওয়া' অন্তর্ভুক্ত করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সাহায্য চাওয়াকে। প্রথম অংশটি উলুহিয়্যাহর অর্থবোধক, আর দ্বিতীয় অংশটি রুবুবিয়্যাহর (প্রভুত্ব) অর্থবোধক। কেননা ইলাহ হলেন সেই সত্তা যিনি ইবাদতের যোগ্য, যাঁর প্রতি ভালোবাসা, প্রত্যাবর্তন, মহিমা ও শ্রদ্ধাবোধ সহকারে ইবাদত করা হয়। আর রব হলেন সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে লালন-পালন করেন, তাঁকে সৃষ্টি করেন, তারপর তাঁর সকল অবস্থায়—ইবাদত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে—তাকে পথনির্দেশ দেন।

এ ব্যাপারে আল্লাহর অন্যান্য বাণীও অনুরূপ : "আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই নিকট ফিরে যাই..." (হুদ: ৮৮, আশ-শূরা: ১০)। আর তিনি বলেছেন : "অতএব, তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখো..." (হুদ: ১২৩)। আর তিনি বলেছেন : "আমরা কেবল আপনারই উপর ভরসা রাখি, আপনারই দিকে ফিরে আসি, এবং আপনারই দিকে ফিরে যাওয়াই আমাদের গন্তব্য..." (মুমতাহিনা: ৪)। আর তিনি বলেছেন : "আর সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করো, যিনি কখনো মরবেন না, এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো..." (ফুরকান: ৫৮)। আর তিনি বলেছেন : "আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি, এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন..." (রা'দ: ৩০)। আর তিনি বলেছেন : "আর তাঁর প্রতি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে সমর্পণ করো। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু; তাঁর ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব, তাঁকেই কাজের ব্যবস্থাপক হিসেবে গ্রহণ করো..." (মুযযাম্মিল: ৮-৯)।

এই সাতটি আয়াত দুটি বিস্তৃত ও মৌলিক মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয় দিক: যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাঁকে জানা, তাঁর দিকে খালিসভাবে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া। তাঁর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে; আর পরকালে তাঁকে দেখার মাধ্যমে তাদের চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়। তিনি পরকালে তাদের যা দিবেন, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় তাদের নিকট হলো তাঁকে দেখা; আর দুনিয়াতে তিনি যা দেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো তাঁর প্রতি ঈমান। তাঁর ইবাদত ও তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতায় তাদের যে প্রয়োজন, তা তাঁদের সৃষ্টির প্রয়োজন ও তাঁর রবুবিয়তের চেয়েও অধিক। কেননা, সেটাই তাদের জন্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য; এবং সেটার মাধ্যমেই তারা সক্রিয় ও সচল হয়। এ ছাড়া তাদের জন্য কল্যাণ, সফলতা, পরিতৃপ্তি ও আনন্দ কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। বরং যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিঃসন্দেহে তার জন্য হবে সংকীর্ণ জীবন, এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা শিরককে ক্ষমা করেন না, তবে তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার অন্য গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এ কারণেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম, এবং এই বাক্যের মাধ্যমে তাওহীদই হলো আসল বিষয়।

যেখানে পর্যন্ত লোকে তাওহীদের যে ধরনকে স্বীকার করে এবং কালামবিদগণ যে তাওহীদ রুবুবিয়্যাহ মেনে নেয়, তা একা যথেষ্ট নয়; বরং সেটি তাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে কাজ করে। এটি সেই হাদীসের অর্থ

যেখানে বর্ণিত হয়েছে: "হে আদমের সন্তান! আমি সবকিছু তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি, আর তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। অতএব, আমার প্রতি তোমার হকের খাতিরে, তুমি আমার জন্য যা সৃষ্টি করেছি, তা দিয়ে আমাকে ভুলে যেও না।" জেনে রেখো, আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হলো, তারা যেন তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে; যেমনটি সহীহ হাদীসে এসেছে, যা মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “তুমি কি জানো আল্লাহর বান্দাদের উপর কি হক?” মু'আয বলেন: “আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।” তিনি বললেন: “আল্লাহর হক হলো, তারা যেন তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে। তুমি কি জানো, বান্দারা যদি তা করে, তাহলে আল্লাহর উপর তাদের কি হক?” মু'আয বলেন: “আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।” তিনি বললেন: “তাদের হক হলো, তিনি তাদের শাস্তি দিবেন না।”

আল্লাহ এই ইবাদতকে ভালোবাসেন এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট হন; তিনি এর অধিকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যে ব্যক্তি তাঁর দিকে ফিরে আসে, তার তাওবায় তিনি আনন্দিত হন। যেমনিভাবে এই ইবাদতেই রয়েছে বান্দার সুখ, আনন্দ ও পরিপূর্ণতা। আমি আল্লাহর এই ভালোবাসা ও তাঁর এতে আনন্দ লাভ সম্পর্কে অন্যত্র কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। সৃষ্টিতে এমন কিছু নেই যার প্রতি বান্দা প্রশান্তি ও শান্তি লাভ করে এবং যার দিকে ফিরে সে সুখ অনুভব করে—এটা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়, যিনি পবিত্র ও মহান। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু ইবাদত করে— যদি সে তাকে ভালোবাসে এবং দুনিয়াতে এর দ্বারা কিছু মায়া ও স্বাদ লাভ করে—তবুও এটি তার জন্য এমন এক ধ্বংস ডেকে আনে যা বিষাক্ত খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ থেকে সৃষ্ট ক্ষতির চেয়েও অধিক। "যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ থাকত, তবে তা উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, আল্লাহ অতি পবিত্র, যিনি আরশের রব, তারা যা বলে তা থেকে।" (সূরা আম্বিয়া: ২২)

কারণ আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ভর করে সেই সত্যিকার ইলাহর উপাসনার উপর। অতএব, যদি সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ থাকত, তবে তিনি সত্যিকার ইলাহ হতেন না, কারণ আল্লাহর কোনো সমকক্ষ বা সদৃশ নেই। ফলে, আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত, কেননা যার মাধ্যমে তার কল্যাণ ও অস্তিত্ব নির্ধারিত, তা অনুপস্থিত হয়ে যেত। এটি ইলাহ হওয়ার দিক থেকে আলোচনা। আর রুবুবিয়্যাহর দিক থেকে বিষয়টি ভিন্ন, যা নিজ স্থানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জেনে রেখো, বান্দার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য—যা তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়—এর কোনো তুলনা নেই। তবে এটি কিছু দিক থেকে শরীরের খাদ্য ও পানির প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও এদের মাঝে বহু পার্থক্য রয়েছে। কেননা বান্দার প্রকৃত সত্তা হলো তার অন্তর ও আত্মা, আর এর কল্যাণ একমাত্র তাদের উপাস্য আল্লাহর মাধ্যমেই সম্ভব, যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। অতএব, আত্মা দুনিয়াতে প্রশান্তি পায় না আল্লাহর স্মরণ ছাড়া। সে চেষ্টা করে তাঁর দিকে এবং সে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এর জন্য তার সাক্ষাৎ অনিবার্য, এবং এর কল্যাণ শুধু সেই সাক্ষাতেই নিহিত। যদি কোনো বান্দা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কিছু আনন্দ বা সুখ লাভও করে, তা স্থায়ী নয়। বরং তা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়, এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয়। সে হয়তো কোনো সময় বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সেটি উপভোগ করে, কিন্তু অন্য সময়ে সেই জিনিসটি আর কোনো স্বাদ বা আনন্দ দেয় না। বরং, তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা এবং তার নিকট উপস্থিত থাকাই তার ক্ষতি ও বিপদ ডেকে আনতে পারে। কিন্তু তার রবের ব্যাপারে—সে প্রত্যেক অবস্থায়, প্রত্যেক সময়ে, এবং যেখানে-ই থাকুক না কেন—তার প্রতি তার প্রয়োজন রয়েছে, এবং আল্লাহ তার সঙ্গে আছেন। এ কারণেই আমাদের নেতা ইব্রাহীম খলীল (আলাইহিস সালাম) বলেন: "আমি অস্তমিত হওয়া বস্তুকে ভালোবাসি না।" (সূরা আন'আম: ৭৬) এবং কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হলো: "আল্লাহ—তাঁর ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুকে ধারণকারী।" (সূরা বাকারা: ২৫৫) আমি আল-ক্বাইয়্যুম শব্দের অর্থ অন্যত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি, এবং আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, এর অর্থ হলো—সেই সত্তা যিনি চিরন্তন, স্থায়ী, যিনি কখনো শেষ হন না, বিলীন হন না, ধ্বংস হন না, কোনো ভাবেই নয়।

এই দিকটি (দ্বিতীয় দিক) দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথম ভিত্তি: ঈমান, আল্লাহর ইবাদত, তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁকে মহিমান্বিত করা নিজেই হলো মানবজাতির খাদ্য, পুষ্টি, কল্যাণ ও ভিত্তি; যেমন ঈমানদারদের অবস্থান এবং কুরআনের ইঙ্গিত। এটা এমন নয়, যেমনটি কিছু কালামবিদ ও তাদের অনুরূপ ব্যক্তিরা বলে থাকেন—যে তাঁর ইবাদত কেবল এক বোঝা ও কষ্ট, যা হৃদয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, শুধুমাত্র পরীক্ষা ও পরীক্ষার জন্য অথবা প্রতিদান ও সওয়াবের জন্য নির্ধারিত—যেমনটি মু'তাযিলারা ও অন্যরা বলে থাকে। যদিও কিছু নেক আমল রয়েছে যা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, আর আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এসব কষ্টকর আদেশ পালনের জন্য বান্দাকে পুরস্কৃত করেন; যেমন তিনি বলেন: "তাদের কোনো তৃষ্ণা, কষ্ট..." (সূরা তওবা: ১২০) এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন: “তোমার পুরস্কার তোমার কষ্ট অনুযায়ী।” তবে এই কষ্ট

বা বোঝা ধর্মীয় আদেশের মৌল উদ্দেশ্য নয়; বরং তা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং এমন কিছু কারণে ঘটে যা এখানে আলোচ্য নয় এবং নিজ স্থানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণেই ‘ঈমান’ ও ‘সৎকর্ম’ শব্দগুলোকে কুরআন, হাদীস কিংবা সালাফদের কথায় ‘**তাকলীফ**’ (বোঝা/জিম্মা) নামে আখ্যায়িত করা হয়নি; বরং ‘তাকলীফ’ শব্দটি এসেছে অপনোদনের প্রসঙ্গে, যেমন: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না" (সূরা বাকারা: ২৮৬), "তোমাদেরকে কেবল তোমাদের নিজের জন্যই দায়িত্বশীল করা হয়েছে" (সূরা নিসা: ৮৪), "আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্য অনুযায়ীই দায়িত্ব দেন" (সূরা তালাক: ৭)। অর্থাৎ, যদিও আদেশে তাকলীফ রয়েছে, কিন্তু সেটি সাধ্যের বাইরে নয়; তাই পুরো শরীয়াহকে ‘তাকলীফ’ বলা সঠিক নয়, যখন এর অধিকাংশই চোখের শীতলতা, অন্তরের আনন্দ, আত্মার প্রশান্তি এবং পরিপূর্ণ সুখের কারণ। এই আনন্দ আসে আল্লাহর চেহারা কামনা করার দ্বারা, তাঁর প্রতি খালিসভাবে ফিরে যাওয়ার দ্বারা, তাঁকে স্মরণ করার দ্বারা এবং তাঁর দিকে মুখ ফেরানোর দ্বারা। তিনিই সেই সত্য উপাস্য, যার দ্বারা অন্তর প্রশান্তি পায়; আর এতে তাঁর কোনো বিকল্প হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তাহলে তুমি তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্য ধারণ করো। তুমি কি জানো, তাঁর কোনো তুলনা আছে?" (সূরা মারইয়াম: ৬৫)

দ্বিতীয় ভিত্তি: আখিরাতের সুখও মূলত তাঁর দিকে তাকানোর মতো, যেমন কিছু তাত্ত্বিক ও তাদের সঙ্গীরা দাবি করেছেন যে, সৃষ্ট কিছু ছাড়া সুখ বা আনন্দ নেই: খাদ্য, পানীয়, বিবাহিক সম্পর্ক, এবং এর মতো অন্যান্য বিষয়। বরং, সম্পূর্ণ আনন্দ এবং সুখ তাদের সৃষ্টি থেকে প্রাপ্ত অংশে নিহিত, যিনি মহিমান্বিত এবং পরম মর্যাদাশালী। যেমন এক উচ্চারণে এসেছে: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার রূপে তাকানোর আনন্দ এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা চাই, কোনো ক্ষতিকর দুর্দশা বা বিভ্রান্তিকর পরীক্ষার ছাড়াই।' এটি নাসাঈ ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত। এবং সঠিক মুসলিমে এবং অন্যত্র, সুহাইব থেকে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'যখন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে: 'হে জান্নাতবাসী! তোমাদের আল্লাহর সাথে একটি প্রতিশ্রুতি আছে, যা তিনি তোমাদের জন্য পূর্ণ করতে চান।' তারা বলবে: 'এটি কী? তিনি কি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেননি, জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচাননি?' তিনি বলবেন: 'তাহলে পর্দা উঠবে, এবং তারা তাঁকে দেখবে—মহিমান্বিত তিনি। তিনি তাদের কিছুই বেশি প্রিয় কিছু দেননি, তেমনটি তাঁর দিকে তাকানোর চেয়ে, এবং সেটি 'বৃদ্ধি'।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, যদিও তারা জান্নাতে আল্লাহর দেয়া সবকিছুতে পূর্ণ উপভোগ লাভ করবে, তবুও আল্লাহ তাদের কিছুই বেশি প্রিয় কিছু দেননি, তেমনটি তাঁর দিকে তাকানোর চেয়ে। এটি তাদের প্রিয় হওয়ার কারণে কারণ তাদের আনন্দ এবং সুখ এতে অন্য কোনো

জিনিসের তুলনায় বেশি। কারণ সুখ প্রিয় বস্তুর উপলব্ধির সঙ্গে অনুসরণ করে; যা একটি ব্যক্তির কাছে প্রিয়, তা তার জন্য আরও বেশি আনন্দের কারণ হয়, এবং তার উপভোগও বেশি হয়ে যায়।

এটি বর্ণিত হয়েছে যে, শুক্রবার হচ্ছে 'বৃদ্ধির দিন', যা আখিরাতের জীবনের শুক্রবার। এ সম্পর্কে হাদিস এবং বর্ণনাও রয়েছে। আল্লাহ পরম সম্মানিত বলেছেন অবিশ্বাসীদের বিষয়ে: {না! বস্তুত, তারা তাদের রবের কাছ থেকে, সেই দিন, বিভক্ত হবে। তারপর তারা অবশ্যই [প্রবেশ করবে] এবং দহন হবে জাহান্নামে...} [আল-মুত্তাফিফীন: ১৫-১৬] সুতরাং পর্দার শাস্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধরনের শাস্তি, এবং তাঁর রূপে তাকানোর আনন্দ হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনন্দ। তাদের সৃষ্টি থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য অংশ তাদের সেই অংশের জায়গা নিতে পারে না, যেটি তাঁকে, পরম সম্মানিত। এই দুটি ভিত্তি কিতাব ও সুন্নাহতে প্রতিষ্ঠিত, এবং এগুলোর উপর রয়েছে জ্ঞানী এবং বিশ্বাসী ব্যক্তিরা। জ্ঞানী সুফি শায়েখরা এগুলি নিয়ে আলোচনা করেন, এবং এগুলোর উপর রয়েছেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'হ এবং উম্মাহর সাধারণ লোক। এটি আল্লাহর দ্বারা মানুষের মধ্যে সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে। তারা কখনও কখনও এই বিষয়টি অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দলিল ও বর্ণনামূলক পাঠ ব্যবহার করে, এবং অন্য সময়ে আধ্যাত্মিক অনুভুতি ও অনুভূতির মাধ্যমে—যখন সুখ অস্বীকার করা হয়—যা তার অস্বীকারকে নাকচ করে দেয়। এবং তারা কখনও কখনও উপমার মাধ্যমে যুক্তি ব্যবহার করে, যা যৌক্তিক উপমা।

তৃতীয় দিক: যে সৃষ্ট বস্তুটি বান্দার জন্য কোনো উপকার বা ক্ষতি, দান বা বন্ধন, সঠিক পথ বা বিভ্রান্তি, জয় বা পরিত্যাগ, অবনতি বা উন্নতি, সম্মান বা অবমাননা দান করে না। বরং, তার রব, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য প্রেরণ করেছেন, তাকে দৃষ্টিপাত দিয়েছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, এবং তাঁর অনুগ্রহে তাকে ভরিয়ে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ তাকে ক্ষতি করেন, তাকে ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না; এবং যদি তিনি তাকে কোনো উপকার দেন, তিনি ছাড়া কেউ তা তুলে নিতে পারে না। সেবা প্রদানকারী [অন্য সৃষ্ট বস্তু], তাকে উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। এই দিকটি সাধারণ মানুষের কাছে প্রথমটির চেয়ে আরও স্পষ্ট, এজন্য তারা এর মাধ্যমে কুরআনে অধিকবার مخاطাবিত। তবে, যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি কুরআনের পথের উপর মনোযোগী হন, তিনি দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ তার বান্দাদের এই দিক দিয়ে প্রথম দিকে আহ্বান করছেন। এই দিকটি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা, সাহায্যের জন্য প্রার্থনা, তাঁকে আহ্বান এবং তাকে ছাড়া অন্য সবাইকে বাদ দেওয়ার দিকে নির্দেশ করে। এটি তাঁকে ভালোবাসার এবং আল্লাহর প্রতি সেবার দিকে প্ররোচিত করে, তাঁর সেবা প্রদানে এবং তাঁর দান প্রদানে। কিন্তু যখন তারা তাঁকে সেবা দেয়, তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়, তারা প্রথম দিকটি প্রবেশ করে। এই পৃথিবীতে এর একটি উপমা হল, এমন একজন ব্যক্তি যে একটি

মহা দুর্দশা, তীব্র দরিদ্রতা বা অশান্ত ভীতি দ্বারা আক্রান্ত, যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করে এবং সশ্রদ্ধ হয়, এমনকি তাঁর সাথে নিবিড় কথোপকথনের আনন্দে প্রবেশ করার জন্য, যা তার জন্য প্রথমত চাওয়া বা কামনা করার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। তবে, সে আগে এটি জানত না, যাতে এটি চাওয়া বা আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। কুরআন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি আহ্বান এবং তাঁর দান সম্পর্কে বর্ননা করে, এবং আল্লাহ যা পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন ধরনের আনন্দ এবং সুখ প্রতিশ্রুত করেছেন। সৃষ্ট বস্তুটি এই কিছুই ধারণ করে না। সুতরাং, এই দিকটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর দানে তাঁকে ভালোবাসার বিষয়ে নিশ্চিত করে।

চতুর্থ দিক: যে বান্দা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহী হয়, তা তার জন্য ক্ষতিকর হবে, যদি সে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করে আল্লাহর সেবায়। কারণ, যদি সে তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করে, তা তাকে ক্ষতি করে এবং ধ্বংস করে; তেমনই বিবাহ এবং পোশাকের ক্ষেত্রেও। যদি সে কিছু ভালোবাসে সম্পূর্ণ ভালোবাসায়, যাতে সে তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হয়ে যায়, তাহলে তাকে অবশ্যম্ভাবীভাবে তার থেকে বিরত থাকতে হবে অথবা তাকে আলাদা হতে হবে। বর্ণিত রয়েছে: 'যতটা ভালোবাসো, ভালোবাসো, কারণ তোমরা অবশ্যই তার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। যা ইচ্ছা করো, কারণ তোমরা তার ফলাফল নিশ্চয়ই পাবে। যেমন তোমরা বিচার করবে, তেমনি তোমরা বিচারিত হবে।' জানো যে, সবাই যা কিছু ভালোবাসে, তা আল্লাহ ছাড়া, তার প্রিয় ভালোবাসিত নিশ্চয়ই তাকে ক্ষতি করবে এবং তার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য যারা সোনা এবং রৌপ্য জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের ধন-সম্পদ আখিরাতের জীবনে তাদের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে, বলবে: 'আমি তোমার প্রাচুর্য! আমি তোমার সম্পদ!' এর মতো অন্যান্য উদাহরণও রয়েছে হাদিসে: আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন: 'হে আদম সন্তান!তা কি আমার জন্য উপযুক্ত নয় যে আমি প্রত্যেক মানুষের কাছে যাকে সে তার বিশ্বস্ত হিসেবে গ্রহণ করেছে?'

বিশ্বস্ততার মূল হল ভালোবাসা। তাই যারা আল্লাহ ছাড়া কিছু ভালোবাসে, আল্লাহ তাদের বিশ্বস্ততার উপর ছেড়ে দেবেন কিয়ামতের দিনে, এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্য! সুতরাং, যারা আল্লাহর জন্য কিছু ভালোবাসে না, তার জন্য ক্ষতি অনিবার্য, এটি বর্তমান বা অনুপস্থিত যে কোনও কিছু থেকে হতে পারে। যদি এটি অনুপস্থিত থাকে, সে বিচ্ছেদের দ্বারা দুঃখিত এবং কষ্ট পায়। যদি এটি উপস্থিত থাকে, তবে তার থেকে ক্ষতি অধিক হবে, সে কোনো আনন্দের তুলনায় বেশি কষ্ট পাবে। এটি চিন্তা এবং সূক্ষ্মভাবে বিবেচনার মাধ্যমে জানা যায়। সবাই যিনি কিছু ভালোবাসে আল্লাহ ছাড়া, তার জন্য ক্ষতি লাভের চেয়ে বেশি হবে। সুতরাং, সৃষ্ট বস্তুগুলি তার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তবে আল্লাহর জন্য এবং

আল্লাহর মধ্যে যা কিছু তা ছাড়া, এটি বান্দার জন্য পরিপূর্ণতা এবং সৌন্দর্য হয়ে থাকে। এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা অনুযায়ী: 'দুনিয়া অভিশপ্ত, এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা অভিশপ্ত, কেবল আল্লাহর স্মরণ এবং যা এর সাথে সম্পর্কিত।' এট-তিরমিযি এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চম দিক: সৃষ্টির উপর ভরসা করা এবং তার উপর নির্ভর করা ঐ দিক থেকেই ক্ষতির কারণ হয়; কেননা ঐ দিক থেকেই মানুষ হতাশ হয়। এটি চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্নিত বিষয়। বান্দা যখনই আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছুর প্রতি আশা ও নির্ভরতা স্থাপন করে, সে তখনই সেই দিক থেকে নিরাশ হয়; আর যখনই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মাধ্যমে বিজয় লাভের চেষ্টা করে, তখনই সে পরিত্যক্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে গ্রহণ করেছে, তারা যেন তাদের জন্য সম্মানের কারণ হয়। কখনোই না! তারা তাদের উপাসনার কথা অস্বীকার করবে এবং তারা তাদের বিরুদ্ধে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।" (সূরা মারইয়াম: ৮১-৮২)

সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত এই দুটি দিক হল—ইবাদত ও সাহায্য চাওয়ার বিষয়। সুতরাং যখন তিনি বলেন: "আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য চাই", তখন বান্দার কল্যাণ নিহিত থাকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার মধ্যেই। আর অন্য কারো ইবাদত করা এবং তার নিকট সাহায্য চাওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে তার ক্ষতি, ধ্বংস ও বিপর্যয়।

ষষ্ঠ দিক: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধনাঢ্য, প্রশংসিত, দানশীল, শক্তিশালী ও দয়ালু। তিনি স্বীয় বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন, অথচ তিনি তার থেকে সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। তিনি বান্দার উপকার করেন ও তার ক্ষতি দূর করেন, নিজ কোনো লাভের জন্য নয় কিংবা কোনো ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য নয়; বরং কেবল তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ থেকেই। পক্ষান্তরে বান্দা কোনো কাজ করে কেবল নিজেরই লাভের জন্য। সর্বোচ্চ যা কেউ আরেকজন বান্দার জন্য করতে পারে, তা হল তাকে ভালোবাসা, সম্মান করা, কিছু উপকার করা অথবা কোনো ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষা করা। যদিও এসব কাজও আল্লাহর তাওফিক ছাড়া সম্ভব নয়, তবুও যদি তা আল্লাহর জন্য না হয়, তাহলে তা করে নিজের লাভের উদ্দেশ্যে।

যদি কেউ কাউকে ভালোবাসে, সে তার ভালোবাসা থেকে নিজের কোনো উপকার লাভ করতে চায়—হোক তা বাহ্যিক সৌন্দর্য বা চারিত্রিক গুণাবলির কারণে। যদি কেউ নবী বা অলীদের ভালোবাসে, তাহলে তাদের

সাক্ষাৎ লাভ করতে চায়, তাদের কথা শুনে ও চেহারা দেখে তৃপ্তি লাভ করতে চায়। তেমনি, যে কেউ কাউকে সাহস, নেতৃত্ব, সৌন্দর্য বা উদারতার কারণে ভালোবাসে, সে ওই ভালোবাসা থেকে নিজের অংশ লাভ করতে চায়। যদি এতে কোনো স্বাদ বা আনন্দ না থাকত, সে কখনোই ভালোবাসত না।

আর যদি তারা কাউকে কোনো উপকার করে, যেমন—খিদমত, ধন-সম্পদ প্রদান, অসুস্থতা বা শত্রুতা দূরীকরণ, এমনকি দোআ বা প্রশংসার মাধ্যমেও—তবুও তারা কোনো না কোনো প্রতিদানের আশা করে যদি তা আল্লাহর জন্য না হয়।

রাজাদের সৈনিক, মালিকদের দাস, শিল্পীদের কর্মচারী, নেতাদের সহযোগীরা—সবাই মূলত তাদের নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করতেই পরিশ্রম করে। তাদের অধিকাংশই যার খিদমত করছে তার কল্যাণ আশা করে না—যতক্ষণ না সে অন্য কোনো উৎস থেকে শিষ্টাচার ও ধর্মীয় আদব শিক্ষা পায়; অথবা তার প্রকৃতিতে ইনসাফ ও অনুগ্রহ থাকে, যা প্রতিদান ও দয়ার কারণে হয়ে থাকে। অন্যথায়, প্রধান উদ্দেশ্য থাকে তার নিজেরই লাভ।

এটিই আল্লাহর হিকমত যার দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্টির কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, জীবিকা একে অপরের মধ্যে বণ্টন করেছেন, এবং তাদেরকে মর্যাদার দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরে উত্তম করেছেন, যেন তারা একে অপরের খিদমত গ্রহণ করে।

এটা স্পষ্ট হলে বোঝা যায়, সৃষ্টি আসলে তোমার উপকার করার উদ্দেশ্যে কিছু করে না; বরং তারা নিজেদের উপকারের জন্যই তোমার মাধ্যমে কিছু করে। এমনকি যদি সে ইনসাফ না মানে, তবে সে তোমার ক্ষতিও করতে পারে। সুতরাং যদি তুমি তাকে ডেকে সাহায্য চাও, তবে তুমি এমন একজনকে ডাকছ যার ক্ষতির আশঙ্কা উপকারের চেয়ে বেশি।

কিন্তু রব, যিনি পবিত্র ও মহান, তিনি তোমার উপকারের উদ্দেশ্যেই তোমার জন্য কল্যাণ চান, তিনি তা তোমার মাধ্যমে তোমাকেই উপকার দেন, কোনো প্রতিদান পাওয়ার জন্য নয়। এটি এমন এক উপকার যা ক্ষতি ছাড়া।

এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা তোমাকে সৃষ্টির প্রতি আশা করা বা তাদের কাছ থেকে উপকার প্রত্যাশা করা থেকে বিরত রাখবে; কেননা তারা তা চায় না এবং তারা তার যোগ্যও নয়।

তবে এটা যেন তোমাকে মানুষের প্রতি কঠোর করে না তোলে, বা তাদের প্রতি দয়া পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত না করে, কিংবা তাদের কষ্ট সহ্য করতে অনীহা না করে। বরং তাদের প্রতি দয়া কর আল্লাহর জন্য, তাদের কোনো প্রত্যাশা না রেখে। যেমন তুমি তাদের ভয় করো না, তেমনি তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করো না।

মানুষ সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে মানুষকে ভয় করো না। মানুষের বিষয়ে আল্লাহর প্রতি আশা রাখো, কিন্তু আল্লাহর বিষয়ে মানুষের প্রতি আশা রাখো না।

তুমি সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হও যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "তবে সে, যে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য দান করে, আর কারো প্রতি কোনো অনুগ্রহের কারণে দান করে না, যার প্রতিদান সে চায়; বরং সে তো তার প্রতিপালক, মহান রবের সন্তুষ্টির জন্যই দান করে..." (সূরা আল-লাইল: ১৭-২১)

আর যাদের সম্পর্কে তিনি বলেন: "আমরা তো আল্লাহর মুখের সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের আহার করাই। আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।" (সূরা আল-ইনসান: ৯)

সপ্তম দিক: সৃষ্টির অধিকাংশই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তোমার সাহায্য চায়, যদিও এতে তোমার ক্ষতি হয়ে থাকে। কেননা যে প্রয়োজনمند, সে অন্ধ; সে তার প্রয়োজন পূরণ ছাড়া আর কিছু বুঝে না।

অষ্টম দিক: যখন তোমার উপর ভয়, ক্ষুধা বা রোগের মতো কোনো বিপদ আসে, তখন সৃষ্টি তা দূর করতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা তা দূর করতে চায়ও না, যদি না তাদের নিজের কোনো স্বার্থ থাকে।

নবম দিক: যদি সমস্ত সৃষ্টি তোমাকে উপকার দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়, তারা ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তারা কেবল আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষেই উপকার বা ক্ষতি করতে পারে।

অতএব, তাদের উপর আশা স্থাপন কোরো না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তবে কি রহমান ছাড়া এমন কেউ আছে, যে তোমাদের জন্য বাহিনী হয়ে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? কাফিররা তো ধোঁকার মধ্যে আছে। অথবা, তিনি যদি তাঁর রিজিক রোধ করে দেন, তবে কে আছে যে তোমাদেরকে রিজিক দিতে পারবে? বরং তারা তো ঔদ্ধত্য ও বিমুখতায় লিপ্ত।" (সূরা আল -মুলক: ২০-২১)

বিজয় মানে হলো ক্ষতির প্রতিহতকরণ, আর রিজিক মানে হলো কল্যাণ লাভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা যেন এই গৃহের রবের ইবাদত করে, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে খাদ্য দিয়ে রক্ষা করেছেন এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।" (সূরা কুরাইশ: ৩-৪)

আর তিনি বলেন: "আমি কি তাদের জন্য এমন একটি নিরাপদ নগর স্থাপন করিনি, যেখানে সকল প্রকার ফলমূল আমাদের পক্ষ থেকে জীবিকা হিসেবে পৌঁছায়?" (সূরা আল-কাসাস: ৫৭)

আর খলীল (ইব্রাহীম) বলেন: "হে আমার রব! আপনি এ নগরকে নিরাপদ করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে ফলমূল দ্বারা রিজিক দিন..." (সূরা আল-বাকারা: ১২৬)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমাদেরকে কি রিজিক ও বিজয় দেওয়া হয় না তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমেই?" — তাদের দোআ, সালাত এবং আন্তরিকতার কারণে।

অনুচ্ছেদ

এই কথার সারাংশ হলো— যদি তুমি নিজেই নিজের কল্যাণ সম্পর্কে অবগত না হও, না পারো তা অর্জন করতে, এবং না থাকে তা অর্জনের যথাযথ ইচ্ছা, তবে অন্য মানুষ তো তার চেয়েও বেশি অজ্ঞ, অক্ষম এবং অউদ্যত তোমার কল্যাণ অর্জনে। কিন্তু আল্লাহ — যিনি পবিত্র ও মহান — তিনিই হলেন যিনি জানেন, অথচ তুমি জানো না; তিনি সক্ষম, অথচ তুমি অক্ষম; এবং তিনি তোমাকে তাঁর মহান অনুগ্রহ থেকে দান করেন। যেমন ইস্তিখারার হাদীসে এসেছে:

“হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ চাই, আপনার শক্তির মাধ্যমে সামর্থ্য চাই, এবং আপনার মহান অনুগ্রহ থেকে প্রার্থনা করি। নিশ্চয়ই আপনি সক্ষম, আমি সক্ষম নই; আপনি জানেন, আমি জানি না; এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়সমূহের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।“

অনুচ্ছেদ

এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তির কাছে তার কোন নেতা বা শাসকের মত, কিংবা তার কোনো সহকারী, সৈনিক বা চাকর, কিংবা তার বন্ধুবান্ধব অথবা সম্পদ—এসবই তার নিকট কল্যাণ আনয়ন ও অনিষ্ট প্রতিহতের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। সে তাদের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের সাহায্য চায়। যিনি সাহায্য প্রদান করেন, তাকেই ডাকা হয় এবং তার কাছে চাওয়া হয়। কতবার এমন হয় যে, ইবাদত নিজেই সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন তৈরি করে! যে কারো উপর অন্তর যখন জীবিকা, বিজয়, উপকার ও অনিষ্টের ব্যাপারে নির্ভর করে, তখন সে তার প্রতি নত হয়, তার সামনে বিনয়াবনত হয়, তার আদেশ মান্য করে, এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে ভালোবাসে—যদিও তাকে সে তার নিজের জন্য ভালো না-ও বাসতে পারে। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সে তাকে নিজ সত্তার কারণেই ভালোবাসে এবং নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে যায়—যেমনটি ঘটে বহু লোকের ক্ষেত্রে, যারা সম্পদ ভালোবাসে কিংবা তাদের ভালোবাসে যাদের মাধ্যমে তারা সম্মান বা কর্তৃত্ব পায়।

আর অন্তর যাকে ভালোবাসে, কামনা করে ও ইচ্ছা করে, তার সাহায্য চায় না বা তার ওপর নির্ভর করে না যতক্ষণ না সে মনে করে যে, সে তার উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম। যেমন প্রেমিক যখন বিশ্বাস করে যে, তার প্রিয়জন তার সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম। যদি সে মনে করে যে, তার উদ্দেশ্য পূরণে সে সক্ষম, তবে তার সাহায্য চায়; অন্যথায় চায় না। সুতরাং অবস্থা তিনটি হতে পারে: কেউ ভালোবাসার পাত্র হতে পারে কিন্তু সাহায্যকারী নয়; কেউ সাহায্যকারী হতে পারে কিন্তু ভালোবাসার পাত্র নয়; অথবা কারও মধ্যে উভয় দিক একত্রে থাকতে পারে।

যখন জানা যায় যে, প্রতিটি বান্দার জীবনের প্রতিটি সময় ও অবস্থায় এমন একটি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য থাকে, যাকে সে উপাস্য মনে করে, এবং এমন একটি চূড়ান্ত অবলম্বন থাকে, যার মাধ্যমে সে সাহায্য প্রত্যাশা করে—আর এই অবলম্বনই হলো তার 'সামাদ' (যার কাছে চাহিদা নিয়ে ফিরে যায়), যার দিকে সে সাহায্য ও ইবাদতের জন্য মুখ ফেরায়—তখন এটা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর বাণী: "আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য চাই..."—এটি একটি ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ ঘোষণা, যা শুরু ও শেষ—সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এর বাইরে কিছুই নয়।

ফলে অবস্থাগুলো চার প্রকারে বিভক্ত হয়:

(১) কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে এবং তার কাছেই সাহায্য চায়—সে মুসলিম হলেও—কারণ এই উম্মাহর মাঝে শিরকক্ত)হয় পিঁপড়ের নিঃশব্দ পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম।

(২) কেউ আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু সাহায্য চায় অন্য কারও নিকট থেকে—যেমন অনেক ধর্মানুরাগী ব্যক্তি, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য ও একমাত্র আল্লাহরই ইবাদতের নিয়ত রাখে, কিন্তু তাদের অন্তর এমন সব লোকের সামনে নত হয় যাদের কাছে তারা বিজয়, রিজিক, বা দিকনির্দেশনা আশা করে—রাজা, ধনী ব্যক্তি, অথবা কোনো শায়খের কাছ থেকে।

(৩) কেউ আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, কিন্তু ইবাদত করে অন্য কারও—যেমন বহু 'আহলুল আহওয়াল' (আধ্যাত্মিক অবস্থা ও ক্ষমতার অধিকারী), কিংবা বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ প্রভাবশালীরা, কিংবা বুজুর্গরা, যারা আল্লাহর সাহায্য চায়, তাঁর ওপর নির্ভর করে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর দিকেই ফিরে যায়—কিন্তু তাদের লক্ষ্য থাকে এমন কিছু যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আদেশ করেননি এবং আল্লাহ যে শরীয়াহ ও দ্বীন নিয়ে রাসুলকে পাঠিয়েছেন তা নয়।

(৪) যারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এবং একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য চায়।

এই চার ভাগ পরবর্তীতেও আলোচিত হয়েছে, কিন্তু কোনো সময় তা ইবাদত ও সাহায্য চাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং কোনো সময় সাহায্যের উৎসের ভিত্তিতে। এখানে তা ইবাদতের অবজেক্ট (উপাস্য) ও সাহায্যের উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রত্যেক বান্দার একটি উপাস্য থাকে এবং একটি সাহায্যের উৎস থাকে। আর পরে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সাহায্য চাওয়ার দিক থেকে—যেখানে মানুষের অবস্থান চার প্রকারে বিভক্ত হয়।

আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর উপর নির্ভরতা নির্দিষ্ট করার বাধ্যবাধকতা

আর শাইখুল ইসলাম বলেন:

সুতরাং, তাঁর ছাড়া আর কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কাজ করা উচিত নয়, এবং কেবল তাঁর কাছেই আশা রাখা উচিত। তিনিই—পবিত্র ও মহান—তোমাকে সৃষ্টি করে, তাঁর শক্তি, ইচ্ছা ও দয়ার মাধ্যমে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তোমার পক্ষ থেকে কোনো কারণ ছাড়া। আর তিনি যা করেছেন, তা করার ক্ষমতা তাঁর ছাড়া আর কারও নেই। অতঃপর যখন তুমি তাঁর কাছে জীবিকা চাও কিংবা কোনো ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করো, তখন তিনিই তা দিয়ে থাকেন; অন্য কেউ তা দিতে পারে না। তিনিই ক্ষতি প্রতিহত করেন; অন্য কেউ তা করতে পারে না।[6]

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তবে দয়াময়ের বাইরে এমন কে আছে যে তোমাদের জন্য রক্ষাকারী হতে পারে, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা তো ধোঁকার ভেতরেই আছে। কিংবা, যদি তিনি তাঁর রিজিক রুদ্ধ করে দেন, তবে কে আছেন যে তোমাদেরকে রিজিক দিতে পারবে? অথচ তারা ঔদ্ধত্য ও বিমুখতায় লিপ্ত..." (সূরা আল-মুলক: ২০-২১)

তিনি, পবিত্র ও মহান, নিজেই তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং নিজের পক্ষ থেকেই সদয়তা প্রদর্শন

---

[6] শাইখ নাসির ইবনে হামাদ আল-ফাহদ (পৃষ্ঠা ১৪-১৫) বলেন:

আমি বলি: এখানে দুটি বিষয় রয়েছে:

প্রথমত: এই অধ্যায়গুলো শাইখুল ইসলামের (রাহিমাহুল্লাহ্) কথার সংক্ষিপ্তসার, মূল বর্ণনা নয়, এবং আমি মূলটিকে পাইনি। যে প্রমাণে এটি সংক্ষিপ্তসার—তা হলো, ফাতাওয়ার অন্য স্থানে মূলের কিছু অংশ পাওয়া যায় (১৪/২০৩-২০৬), যা ১/৫৬-৫৮ পাতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উভয় স্থান পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, এই খণ্ডে যা আছে, তা ঐ অংশের সংক্ষিপ্তসার।

দ্বিতীয়ত: ১/ (আর সহীহ আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বানে এসেছে: 'তুমি আমাদের শান্তির পথ দেখাও, আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, তোমার নেয়ামতের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ বানাও, তা নিয়ে তোমার প্রশংসা করতে শেখাও, তা কবুল করাও এবং তা আমাদের ওপর পূর্ণ করো।') এখানে সম্ভবত লেখকের ভুল ঘটেছে, এবং সম্ভবত সঠিক পাঠ হওয়া উচিত (আর সূনান আবু দাউদ (৯৬৯) ও সহীহ ইবনে হিব্বান (৯৯৬)-এ এসেছে)। এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সনদ বিষয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে।

করেন। কেননা তিনি নিজেকে যেসব নামে অভিহিত করেছেন ও যেসব গুণে বর্ণনা করেছেন, তা থেকেই এ বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পড়ে। তিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, পরম প্রেমময়, পরম মহিমান্বিত। তিনি নিজ সত্তার দ্বারাই সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর শক্তি তাঁর সত্তাগত একটি আবশ্যক গুণ। তেমনিভাবে তাঁর দয়া, জ্ঞান ও হিকমতও সত্তাগত আবশ্যক বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুতেই একেবারেই মুখাপেক্ষী নন; বরং তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মুখাপেক্ষী নন। "আর কেউ কৃতজ্ঞ হলে, সে কেবল নিজেরই উপকার করে; আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে—তবে নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত ও মহান দাতা..." (সূরা আন-নামল: ৪০) "আর স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও দান করব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি তো অবশ্যই কঠোর।' আর মূসা বলেছিলেন, 'তোমরা ও পৃথিবীর যে কেউ যদি কুফরি করো—নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার যোগ্য।'" (সূরা ইবরাহীম: ৭-৮)

এবং সহীহ কুদসী হাদীসে এসেছে: "হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি, মানব ও জিন সকলেই সবচেয়ে পাপিষ্ঠ একজন ব্যক্তির হৃদয়ের উপর হয়, তবুও তা আমার রাজত্ব থেকে কিছুই কমাবে না। আর যদি তারা সবাই সবচেয়ে পরহেযগার একজন ব্যক্তির হৃদয়ের উপর হয়, তবুও তা আমার রাজত্বে কিছুই বাড়াবে না। আর যদি তারা একত্র হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের প্রত্যেককে তার চাহিদা অনুযায়ী দিয়ে দিই, তবুও আমার কাছে যা আছে তা থেকে কিছুই কমবে না..." (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)

সুতরাং, প্রভু—পবিত্র ও মহান—নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি যে পরিপূর্ণ গুণাবলির অধিকারী, তা তাঁর নিজের পক্ষ থেকেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি এ বিষয়ে কারো ওপর নির্ভরশীল নন। বরং, তাঁর কার্যকলাপ আসে তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে—তিনি পরিপূর্ণ, তাই তিনি কর্ম করেন। তাঁর অনুগ্রহ ও দানশীলতা তাঁর পরিপূর্ণতারই ফল। তিনি অন্য কারো প্রয়োজন থেকে কিছুই করেন না। বরং, তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন; কেননা তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা কার্যকর করেন। তিনি, পবিত্র ও মহান, যা চান তা অর্জন করেন, তা লাভ করেন এবং একমাত্র তিনিই তা হাসিল করেন। তাঁকে কেউ সাহায্য করে না, কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর কোনো কাজে কোনো সহকারী দরকার নেই, কোনো সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কোনো সহযোগী নেই, এবং কোনো দুর্বলতার কারণে তাঁর কোনো রক্ষক নেই।

অনুচ্ছেদ

আর বান্দা যতই আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হয়, তাঁর উপর নির্ভরশীলতা ও আত্মসমর্পণে যতই অগ্রগামী হয়, ততই সে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, তাঁর অধিক সম্মানপ্রাপ্ত হয়, এবং মর্যাদার দিক থেকে উচ্চে উঠে। অতএব, সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুখী তারা, যারা আল্লাহর সবচেয়ে বড় বান্দা। পক্ষান্তরে সৃষ্টির ব্যাপারে বলা হয়: "তোমার যাকে ইচ্ছা প্রয়োজন করো, তুমি তার বন্দী হয়ে যাও। যাকে ইচ্ছা নির্ভরতা ছাড়ো, তুমি তার সমকক্ষ হয়ে যাও। যাকে ইচ্ছা দয়া করো, তুমি তার শাসক হয়ে যাও।" একজন বক্তা সত্যই বলেছেন:

"নম্রতা ও ঘনিষ্ঠতার মাঝে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে

যার অপসারণে বিভ্রান্ত হয় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাও।

কারণ সে নম্রতা শির্ক—

সুতরাং হে বিবেকবান যুবক, অনুধাবন কর এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।"

বান্দা সৃষ্টির দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা ও সম্মান তখনই পায়, যখন সে তাদের একেবারেই প্রয়োজনমুক্ত থাকে। তুমি যদি তাদের প্রতি দয়ালু হও অথচ তাদের থেকে নিরপেক্ষ থাকো, তবে তারা তোমার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করবে। কিন্তু যখনই তুমি তাদের প্রতি প্রয়োজনমুখী হয়ে পড়ো — এক গ্লাস পানির মতো তুচ্ছ জিনিসের জন্য হলেও — তোমার মর্যাদা তাদের চোখে ততটাই হ্রাস পাবে, যতটা তোমার তাদের প্রতি নির্ভরশীলতা। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হিকমাহ ও রহমতের নিদর্শন, যাতে দীন কেবলমাত্র আল্লাহর হয় এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা হয়।

এই জন্যই হাতিম আল-আসামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "মানুষের থেকে নিরাপদ থাকা কিভাবে সম্ভব?" তখন তিনি বলেন: "তোমার ধন-সম্পদ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দাও, এবং তাদের সম্পদের প্রতি আশাবাদ ত্যাগ করো।" কিন্তু যদি তুমি তাদেরকে এর জন্য প্রতিদান দাও এবং তারা তা প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে যদি উভয়ের প্রয়োজন সমান হয়, তাহলে তোমরা সমান; যেমন দুই বিক্রেতা, কেউ কারো উপর অগ্রাধিকার রাখে না। আর যদি তারা তোমার থেকে অধিক প্রয়োজনমন্দ হয়, তবে তারা তোমার অনুগত

হবে।

সুতরাং আল্লাহ, যিনি পবিত্র ও মহান, তিনি তোমাকে তখনই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেন, যখন তুমি তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনমুখী ও নির্ভরশীল থাকো। পক্ষান্তরে, সৃষ্টি তখনই তোমাকে সবচেয়ে বেশি তুচ্ছ মনে করে, যখন তুমি তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল থাকো। কারণ তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত। তারা তোমার প্রয়োজন জানে না, এবং তারা তোমাকে তোমার জন্য কল্যাণময় বিষয়েও পথপ্রদর্শন করতে পারে না। তারা নিজেদের কল্যাণ সম্পর্কেই অজ্ঞ, তবে কিভাবে অন্যদের পথ দেখাবে? তারা তা সক্ষম নয়, এবং ইচ্ছাও রাখে না। তাই, তাদের কাছে নেই জ্ঞান, নেই ক্ষমতা, নেই ইচ্ছাও—যাতে তারা প্রকৃতপক্ষে তোমার উপকার করতে পারে। অথচ আল্লাহ, যিনি সুমহান, তিনি জানেন কোনটি তোমার জন্য কল্যাণকর, তিনি তা অর্জন করতেও সক্ষম, এবং তিনি তা চানও—তাঁর রহমত ও অনুগ্রহবশত। এটি তাঁর স্বভাবসুলভ গুণ; কোনো বাহ্যিক বিষয় তাঁকে ইচ্ছাশক্তি বা দয়ালু করে তোলে না। বরং, তাঁর দয়া তাঁর সত্তারই অন্তর্ভুক্ত; তিনি নিজের ওপর দয়া অবধারিত করে নিয়েছেন, এবং তাঁর দয়া সর্ববিষয়ে পরিব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে, সৃষ্টি সবই অভাবগ্রস্ত; তারা কেবল নিজের প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্যই কাজ করে। এটিই তাদের জন্য বিধি, এবং এটিই হিকমাহ। এর বাইরে কিছুই তাদের জন্য শোভনীয় নয়।

কিন্তু প্রকৃত সৌভাগ্যবান সেই, যে নিজের সত্যিকারের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে, এমন নয় যে, যা সে কল্যাণ মনে করে কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তারা তিন শ্রেণির হয়ে থাকে: জালিম (অন্যায়কারী), আদিল (ন্যায়পরায়ণ), এবং মুহসিন (উপকারকারী)।

অন্যায়কারী সে, যে তোমার থেকে সম্পদ বা উপকার গ্রহণ করে কিন্তু বিনিময়ে কিছু দেয় না, কিংবা তোমার ক্ষতি করে নিজে লাভবান হয়। ন্যায়পরায়ণ সে, যে বিনিময়ের মাধ্যমে লেনদেন করে, যেমন বিক্রেতা; সে না তোমার পক্ষে, না বিপক্ষে। পারস্পরিক প্রয়োজনেই এই সম্পর্ক চলে, যেমন স্বামী-স্ত্রী, বিক্রেতা ও ক্রেতা, বা অংশীদার। উপকারকারী সে, যে বিনিময়ের আশা না করেই দয়া করে। কিন্তু সেও তার নিজের প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্যই তা করে; যেমন সে দয়ার মাধ্যমে যা পায় তা তার আত্মার পছন্দ—পুরস্কার, মানুষের প্রশংসা বা সম্মানলাভ, অথবা তোমার নিকটবর্তী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ইত্যাদি। যেভাবেই হোক, সে তোমার প্রতি দয়া করে কেবল সে যা লাভের আশা করে তার জন্যই।

এবং বাকি সব সৃষ্টি তোমাকে সম্মান করে ও মর্যাদা দেয় শুধুমাত্র তখনই, যখন তারা তোমার থেকে কিছু পেতে চায়, কিংবা বিনিময়ের আশায় থাকে—যেমন বিক্রয়, অংশীদারিত্ব বা বৈবাহিক সম্পর্কের দুই পক্ষ একে অপরের প্রয়োজনমন্দ হয়; মালিক তার দাসের প্রয়োজন, দাসেরা মালিকের প্রয়োজন; বাদশাহ সৈনিকদের প্রয়োজন এবং সৈনিকরা বাদশাহদের প্রয়োজন—পৃথিবীর সমস্ত কার্যাবলি এইরূপ নির্ভরতার ওপর গঠিত। কিংবা তারা তোমার দয়ার দ্বারা উপকৃত হতে চায়। এমনকি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরাও—যদি তারা তোমাকে তোমার ব্যক্তিত্বের জন্য সম্মান করে, তবুও তারা তা করে তোমার মাধ্যমে যে সম্মান পায়, তার জন্যই। তুমি যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তারা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে ও তোমাকে ছেড়ে দেবে। অতএব বাস্তবিকভাবে, তারা কেবল নিজেদেরকেই ভালোবাসে এবং নিজেদের স্বার্থেই তোমাকে ভালোবাসে।

এইভাবে, রাজা থেকে শুরু করে নিচের পর্যায়ের সকল সৃষ্টি—তাদের মধ্যে একজনকে তুমি দেখতে পাবে যে বাহ্যিকভাবে প্রভু, যাকে সবাই মান্য করে; অথচ প্রকৃতপক্ষে সে বান্দা, যে তার প্রয়োজনীয়জনদের মান্য করে। কেউ যদি তার প্রভুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে পরিস্থিতি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বদলে যায়। আর যতই তুমি তাদের প্রতি প্রয়োজনমুখী হও, ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা ততই হ্রাস পেতে থাকে, তারা তোমার প্রয়োজন পূরণ করলেও।

কিন্তু মহান রবের ক্ষেত্রে, কোনো সৃষ্টির পক্ষেই তাঁর প্রতিদান দেওয়া কিংবা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর খাবারের থালা সরিয়ে নেওয়া হতো, তখন বলতেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, বিপুল, উত্তম ও বরকতময় প্রশংসা, যা কখনো শেষ হওয়ার নয়, অস্বীকৃত নয়, পরিত্যক্ত নয়, কিংবা যার বিকল্প নেই, হে আমাদের রব!" [সহীহ বুখারীতে আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত] বরং, আল্লাহ সবসময় এককভাবে অনুগ্রহকারী, তিনি বান্দার প্রতি অনুগ্রহ দানকারী, এতে তাঁর কোনো শরীক নেই। বাস্তবিকপক্ষে, সৃষ্টিজগতে যত নিয়ামত আছে, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর বান্দার প্রকৃত সুখ নিহিত রয়েছে তার আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও অভাবগ্রস্ততার পরিপূর্ণতায়, এবং এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি, জ্ঞান ও আচরণের মাধ্যমে পূর্ণরূপে গ্রহণ করার মধ্যে—অর্থাৎ, এই জ্ঞানের অনুসারে জীবন গঠনের মধ্যে। কেননা, কেউ হয়তো অভাবগ্রস্ত কিন্তু তা জানে না, যেমন কোনো ব্যক্তি যার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে অথচ সে জানে না, বরং মনে করছে তা এখনও আছে। যখন সে জানতে পারে যে সম্পদ নেই, তখন তার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। অনুরূপভাবে, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর প্রতি অভাবগ্রস্ত, কিন্তু কাফির

ও মুনাফিকরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ, গাফিল, এবং এটি স্মরণ করতেও অনিচ্ছুক, এবং এর ওপর আমল তো দূরের কথা। কিন্তু মু'মিন ব্যক্তি এটি স্বীকার করে এবং তার এই স্বীকৃতির অনুসারে আমল করে। তারাই প্রকৃত আল্লাহর বান্দা।

সুতরাং মানুষ এবং প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহর প্রতি নিজস্ব সত্তাগতভাবে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত। এ দরিদ্রতা তার সত্তার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য; এর ব্যতিক্রম কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহই স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর সবকিছুই তাঁর প্রতি দরিদ্র। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অভাবমুক্ত মালিক, আর সবই তাঁর প্রতি অভাবগ্রস্ত। বান্দা আল্লাহর প্রতি অভাবগ্রস্ত তাঁর রব হওয়ার দিক থেকেও এবং উপাস্য হওয়ার দিক থেকেও, যেমনটি অন্যান্য স্থানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ ক্রমাগত পাপ করে, সে দরিদ্র ও গুনাহগার। তার রব, যিনি মহান, তিনি তার প্রতি দয়া করেন, তাকে ক্ষমা করেন; তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যদি না হতো তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণের অস্তিত্বই থাকত না। আর যদি না থাকত তাঁর ক্ষমা, তবে বান্দা কখনোই তার পাপের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারত না। সে সর্বদা নিয়ামত অর্জন এবং ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজনমন্দ। নিয়ামত কেবল আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই আসে, এবং অনিষ্ট প্রতিহত হয় কেবল তাঁর ক্ষমার মাধ্যমে। কেননা, পাপ ছাড়া অন্য কোনো অনিষ্টের কারণ নেই। যেমন তিনি বলেছেন: "তোমার কাছে যে ভালো কিছু আসে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর তোমার নিকট যে মন্দ কিছু আসে, তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে..." (সূরা নিসা: ৭৯)। এখানে 'মন্দ' বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সকল বিপদ-আপদ, যা বান্দার জন্য অপছন্দনীয়, আর 'ভালো' বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সকল নিয়ামত, যা বান্দাকে সন্তুষ্ট করে। যেমন তিনি বলেন: "আর আমরা তাদেরকে ভালো ও মন্দ উভয় অবস্থায় পরীক্ষা করেছিলাম।" (সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৮)

সুতরাং নিয়ামত, রহমত এবং যাবতীয় কল্যাণ—আল্লাহর পক্ষ থেকে, অনুগ্রহ ও দয়ার ভিত্তিতে, সৃষ্টির পক্ষ থেকে কোনো প্রাপ্যতা ছাড়াই। যদিও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কিছু হক নির্ধারণ করেছেন, তবে সেটি বান্দার পক্ষ থেকে প্রাপ্য নয়, বরং আল্লাহ নিজেই তা নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। এই বিষয়টি অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর বিপদ-আপদ হয় বান্দার গুনাহ ও তাদের কৃতকর্মের কারণে। যেমন তিনি বলেন: "তোমাদের যেসব বিপদ আসে, তা তোমাদের নিজ হাতে করা কাজের ফল; তবে তিনি অনেক কিছু ক্ষমা করে দেন..." (সূরা আশ-শূরা: ৩০)

যদিও কখনো কোনো নিয়ামত বান্দার আনুগত্যের কারণে আসে, যার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেন, তবুও—তিনি মহিমাময়—আসলে তিনিই বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে আনুগত্যের তাওফীক দিয়েছেন, এবং তার জন্য প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন। তিনি মহান আল্লাহ, তিনিই বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মুসলিম বানিয়েছেন, আনুগত্যশীল বানিয়েছেন। যেমন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন: "যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথ দেখান..." (সূরা আশ-শু'আরা: ৭৮)। তিনি আরও বলেন: "আর আমাদেরকে তোমার অনুগত বানাও..." (সূরা আল-বাকারা: ১২৮)। তিনি আরও বলেন: "আমাকে সালাত কায়েমকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো..." (সূরা ইব্রাহীম: ৪০)। এবং আল্লাহ বলেন: "আর আমরা তাদেরকে নিজেদের আদেশ অনুযায়ী পথপ্রদর্শক বানিয়েছিলাম, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল এবং আমাদের নিদর্শনসমূহে তারা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল..." (সূরা আস-সাজদা: ২৪)। অতএব, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর রবের নিকট দোয়া করেছেন যেন তিনি তাঁকে মুসলিম বানান এবং সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানান। আর আল্লাহ বলেন: "কিন্তু আল্লাহ তোমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় করে তুলেছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন..." (সূরা আল-হুজুরাত: ৭)। এরপর তিনি বলেন: "...এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহস্বরূপ..." (সূরা আল-হুজুরাত: ৮)

সুনান আবু দাউদ ও সহীহ ইবনে হিব্বানে এসেছে: "তুমি আমাদের শান্তির পথসমূহে হিদায়াত দাও, আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসো, তোমার নিয়ামতের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ বানাও, তোমার প্রশংসা করাতে ও তা গ্রহণ করতে সক্ষম করো, এবং তা আমাদের ওপর পূর্ণ করো।" এবং সূরা ফাতিহায় এসেছে: "তুমি আমাদের সোজা পথে পরিচালিত করো..." (সূরা আল-ফাতিহা: ৬)। এবং ত্বাবারানী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি দোয়ায় এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন সন্ধ্যায় বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার কথা শোনেন, আমার অবস্থান দেখেন, আমার গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা জানেন, আমার কোনো কিছু আপনার কাছ থেকে অজ্ঞাত নয়। আমি এক মুসিবতগ্রস্ত, দরিদ্র, সাহায্যপ্রার্থী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত, শঙ্কিত ও স্বীয় পাপে স্বীকারকারী বান্দা। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি অভাবগ্রস্তের প্রার্থনায়, পাপীর মিনতি নিয়ে, লাঞ্ছিতের মিনতি নিয়ে। আমি আপনার কাছে দোয়া করছি এক ভীত, বিপদাপন্ন, নতজানু বান্দা, যার শরীর আপনার সামনে বিনীত, যার নাক আপনার জন্য অবনত। হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই দোয়ায় হতভাগা করবেন না। হে সবচেয়ে উত্তম প্রার্থিত ও সবচেয়ে উত্তম দাতা! আমার প্রতি দয়া করুন, আমার প্রতি করুণাময় হোন।"

কুরআনে 'বান্দা' শব্দটি সাধারণত সেই ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যে আল্লাহর ইবাদত করে। যে ব্যক্তি

তাঁর ইবাদত করে না, তার ক্ষেত্রে সাধারণত 'তাঁর বান্দা' বলা হয় না। যেমন তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো আধিপত্য থাকবে না" (সূরা হিজর: ৪২)। আর তিনি বলেন: "তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই বিপথগামীদের ব্যতীত" (সূরা হিজর: ৪২)। এ আয়াতে 'ব্যতিক্রম' (ইসতিসনা) বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি')—এ কথা অধিকাংশ তাফসীরকার ও আলিমগণ বলেছেন। এবং তিনি বলেন: "একটি ঝরনা, যার পানি আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে" (সূরা ইন্সান: ৬), "আর রহমানের বান্দারা তো সেই সকল ব্যক্তি, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে" (সূরা ফুরকান: ৬৩), "আর স্মরণ কর আমাদের বান্দা দাঊদকে" (সূরা সাদ: ১৭), "কি উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী" (সূরা সাদ: ৩০), "আর স্মরণ কর আমাদের বান্দা আইয়্যুবকে" (সূরা সাদ: ৪১), "আর স্মরণ কর আমাদের বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে" (সূরা সাদ: ৪৫), "অতঃপর তারা আমাদের বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দাকে পেল" (সূরা কাহফ: ৬৫), "পবিত্র মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন" (সূরা ইসরা: ১), "নিশ্চয়ই সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা" (সূরা ইসরা: ৩), "আর যদি তোমরা সন্দেহে থাকো যা আমরা আমাদের দাসের ওপর অবতীর্ণ করেছি" (সূরা বাকারা: ২৩), "আর তিনি তাঁর বান্দাকে যা ওহী করেছেন তা ওহী করেছেন" (সূরা নাজম: ১০), "আর যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকতে দাঁড়াল" (সূরা জিন: ১৯), "বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর দাসের ওপর 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন" (সূরা ফুরকান: ১)। এ জাতীয় বহু উদাহরণ আছে।

'বান্দা' শব্দটি সমস্ত সৃষ্টিজীবকেও বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই যাদের তোমরা আল্লাহ ছাড়া ডাকো, তারাও তোমাদের মতোই বান্দা" (সূরা আরাফ: ১৯৪), "তবে কি কাফিররা মনে করে যে, তারা আমার বান্দাদেরকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে?" (সূরা কাহফ: ১০২)। এ আয়াত সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এখানে ফেরেশতা ও নবীদের বোঝানো হয়েছে; যদি তাদেরকেই অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকে, তাহলে অন্যদের গ্রহণ করা আরও বেশি নিষিদ্ধ। তিনি বলেন: "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে রহমানের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না" (সূরা মারইয়াম: ৯৩)। সহীহ হাদীসে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, যা দাজ্জাল সম্পর্কে এসেছে: "অতঃপর আল্লাহ মসীহ ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে ওহী করবেন: আমার এমন কিছু বান্দা রয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করতে পারবে না।" এটি তাঁর এই বাণীর অনুরূপ: "আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের কতিপয় বান্দা পাঠিয়েছিলাম" (সূরা ইসরা: ৫)। এদেরকে আল্লাহর অনুগত বান্দা বলা হয়নি, বরং তারা ছিল বন্দী, শাসিত এবং আল্লাহর আদেশের অধীনস্থ। সম্ভবত তাদের 'বান্দা' বলা হয়েছে এজন্য যে, তারা সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার

করে এবং তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করে, যদিও তারা কাফির, যেমন তিনি বলেন: “তাদের অধিকাংশই আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করে” (সূরা ইউসুফ: ১০৬)। এবং তিনি বলেন: “সে তো রহমানের কাছে বান্দারূপে আসে” (সূরা মারইয়াম: ৯৩), অর্থাৎ বিনীত ও আত্মসমর্পণকারী অবস্থায়। এটা জানা যে, কিয়ামতের দিনে তারা এভাবেই আসবে; কেবল পার্থিব জীবনে তারা আল্লাহর ইবাদতে অহংকার করেছে। তারপর তিনি বলেন: “তিনি অবশ্যই তাদের গণনা করেছেন এবং পরিপূর্ণভাবে গুণেছেন। আর সবাই কিয়ামতের দিনে তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে” (সূরা মারইয়াম: ৯৪-৯৫)। তিনি এরপর বলেছেন: “আর তোমরা আমাদের কাছে একাকী এসেছো, যেভাবে প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম” (সূরা আনআম: ৯৪)। এবং তিনি বলেন: “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, সবাই তাঁর কাছে অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং তার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে” (সূরা আলে ইমরান: ৮৩), “আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, সবাই আল্লাহকে সিজদা করে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়” (সূরা রাদ: ১৫), “বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর” (সূরা বাকারা: ১১৬) এবং “সবাই তাঁর প্রতি অনুগত”।

এখানে শুধু তাদের সৃষ্টি হওয়া, পরিচালিত হওয়া ও ইচ্ছাধীন থাকা বোঝানো হয়নি। কারণ ‘ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়’ বলার অর্থ হয় তখনই যখন কোনো ব্যক্তি নিজে কিছু করে—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। আর যার কোনো কাজই নেই, তাকে ‘সিজদাকারী’ বা ‘অনুগত’ বা ‘আত্মসমর্পণকারী’ বলা যায় না। বরং সব সৃষ্টিই তাদের স্বভাবগতভাবে সৃষ্টিকর্তাকে চিনে, এবং তারা নানা দিক থেকে বিনীত, আত্মসমর্পণকারী, বাধ্য ও অনুগত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের প্রয়োজন ও নির্ভরতার জ্ঞান রাখে। কেউ কেউ দুঃসময়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে। কেউ কেউ তাঁর তাকদীর ও ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ করে। কেউ কেউ তাঁর বহু আদেশ পালন করে। কারণ অন্যান্য মানুষ একজন বান্দাকে তার ইচ্ছা পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে না; বরং সে তাকে এমন কিছু মানতে বাধ্য করে, যা সে অপছন্দ করে, অথচ তা আল্লাহর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। তারা কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ অমান্য করলেও, এমনকি তা তাওহীদের বিষয়েও হয়, তবুও তারা অনিচ্ছায় অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী—যেমন কিবলার অনুসারী পাপী, জিম্মী এবং অন্যান্যরা। তারা সেই দ্বীনের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে, যা আল্লাহ তাঁর রাসুলগণের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, যদিও তারা কিছু বিষয়ে অবাধ্য। মুমিন তার রবের আদেশে ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে, তদ্রূপ বিপদাপদেও ইচ্ছায় ধৈর্য ধারণ করে এবং আদেশ পালনে সচেষ্ট হয়। সুতরাং সে আল্লাহর প্রতি ইচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী ও অনুগত। সিজদার উদ্দেশ্য হলো আত্মসমর্পণ, এবং প্রতিটি সৃষ্টির সিজদা তার স্বভাব অনুযায়ী হয়—এমন একটি সিজদা যা তার প্রভুর

প্রতি আত্মসমর্পণ প্রকাশ করে।

সৃষ্ট জগতের আল্লাহর প্রতি দারিদ্র্য তথা নির্ভরতা এ অর্থে যে, তারা প্রতিটি বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভরশীল; তারা তাঁর ব্যতীত অস্তিত্বশীল নয়, এমনকি তাদের গুণাবলি ও কার্যাবলিও না—এটাই নির্ভরতার প্রথম স্তর। এটি হলো, তাঁর রবীয়্যাতের উপর তাদের নির্ভরতা, তাঁর সৃষ্টি ও পরিপূর্ণতার উপর নির্ভরতা। এ বিবেচনায় তারা তাঁর মালিকানাধীন, এবং তাঁরই, পবিত্র ও মহান তিনি, রাজত্ব ও প্রশংসা প্রাপ্য। এটি সেই সকল ব্যক্তির জানা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ফরজ ঈমান রাখে। কারণ সৃষ্টির সূচনা প্রমাণ করে যে, সৃষ্টি তাদের সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে, সৃষ্টির পরেও তাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে যে, তারা নির্ভরশীল। যেমন রিজিকের প্রয়োজন প্রমাণ করে যে, যার জন্য রিজিক দেওয়া হয়, সে রাযযাকের উপর নির্ভরশীল।

সঠিক মত হলো, সকল বস্তুর নির্ভরতা আল্লাহর উপর তাদের প্রকৃতিগত স্বভাবের কারণে; কোনো বাহ্যিক কারণ নয়। বরং তাদের দারিদ্র্য তাদের স্বভাবগত, এবং তাদের পক্ষে নির্ভরশীল না হওয়া অসম্ভব। যেমন প্রভুর ধনসম্পদের মালিক হওয়া তাঁর স্বভাবগত গুণ, এবং তাঁর পক্ষে দরিদ্র হওয়া অসম্ভব। তিনি স্বয়ং স্বনির্ভর, কোনো গুণের মাধ্যমে নয়। সৃষ্ট বস্তুর দারিদ্র্য ও নির্ভরতা তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, তারা থাকুক বা না থাকুক। যদি তারা অনুপস্থিতও হয়, এবং বৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়, 'এটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল', তাহলে অর্থ হবে—এটি আল্লাহ ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। অধিকাংশ মুসলিম ও তাত্ত্বিকগণের মতে এটাই সঠিক মত। এই নির্ভরতা বুদ্ধির মাধ্যমেও স্পষ্ট।

যা কুরআনে বর্নিত যে, সমস্ত সৃষ্টির আত্মসমর্পণ, সিজদা, তাসবীহ ও আনুগত্য—তা এই সাধারণ নির্ভরতার অতিরিক্ত কিছু, এবং তা সালাফ ও অধিকাংশ খালাফ মুসলিমদের মতে। তবে একটি দল বলে থাকে, তাদের নির্ভরতা, আত্মসমর্পণ, সৃষ্টি ও ইচ্ছাধীন থাকা—এটাই তাদের তাসবীহ ও আনুগত্য, যদিও তা 'হালতের ভাষা'র মাধ্যমে, এবং তারা সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন। যেমন বলা হয়: 'পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করো—কে এর নদীগুলো প্রবাহিত করেছে, গাছ লাগিয়েছে, এবং ফলমূল বের করেছে?' যদি সে মুখে উত্তর না দেয়, চিন্তায় তা জানাবে। গাজালী ও অন্যান্যরা এ মত প্রকাশ করেছেন, এবং এটি আবু বকর ইবনেল আনবারীর ব্যাখ্যা, তিনি আল্লাহর বাণী "সবাই তাঁর প্রতি অনুগত" (সূরা বাকারা: ১১৬) সম্পর্কে বলেন: প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর প্রতি অনুগত, অর্থাৎ আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বিধান তাদের উপর প্রয়োগ করেছেন, যা তাদের

বিনীততা প্রমাণ করে। এটি 'আজ-জাজ্জাজ'ও বলেছেন। আল্লাহর বাণী "যে কেউ আকাশে ও পৃথিবীতে আছে, সে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে" (সূরা আলে ইমরান: ৮৩) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, তিনি বলেন: সকলের আত্মসমর্পণ হলো—তাদের ফিতরাত অনুযায়ী তাঁর আদেশ কার্যকর হওয়া; এ ফিতরাত থেকে কেউ বিচ্যুত হতে পারে না। এই অর্থ সঠিক, তবে সঠিক মত যেটি সালাফ ও খালাফ অধিকাংশ আলেমের মতানুযায়ী, তা হলো—অনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও তাসবীহ কেবল এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা অতিরিক্ত কিছু। যেমন কেউ বলেন: যে অনিচ্ছুক সিজদা করে, তার সিজদা হলো—তার বিনীততা এবং আল্লাহ যা তাঁর জন্য নির্ধারণ করেছেন যেমন স্বাস্থ্য, অসুস্থতা, ধন, দারিদ্র্য—তা মেনে নেওয়া। এবং যেমন কেউ বলেন আল্লাহর বাণী: "প্রতিটি বস্তুই তাঁর প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে" (সূরা ইসরা: ৪৪), তারা বলেন: এদের তাসবীহ হলো—তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ, যা অন্যদের দ্বারা তাঁর তাসবীহকে আবশ্যক করে। সঠিক মত হলো—সব কিছু তাদের স্বভাব অনুযায়ী তাসবীহ ও সিজদা করে।

বিষয়টি হলো, বান্দাদের তাদের স্রষ্টার প্রতি নির্ভরশীলতা, তাঁর দিকে তাদের ইঙ্গিত এবং তাঁর পক্ষে তাদের সাক্ষ্যদান—এগুলো এমন স্বভাবগত বিষয়, যার উপর আল্লাহ তাঁদের সৃষ্টি করেছেন; যেমন তিনি তাঁদের স্বভাবগতভাবেই তাঁর প্রতি স্বীকৃতিসহ সৃষ্টি করেছেন, এই সকল নিদর্শনের প্রয়োজন ছাড়াই। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এবং নিদর্শনের ইঙ্গিত ও সার্বজনীন কিয়াস এবং উপমাস্বরূপ কিয়াসের পার্থক্যও সেখানে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ, যুক্তিভিত্তিক কিয়াস—হোক তা যুক্তির সূত্রের মতো সার্বজনীন রূপে উপস্থাপিত, কিংবা উপমাস্বরূপে এমনভাবে উপস্থাপিত যা সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে শাসনের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করে এবং যেখানে সে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেখানে সে শাসনের প্রয়োগকে অপরিহার্য করে—এই দুই ধরনের কিয়াসের বিভিন্ন রূপ আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

নিশ্চিত সত্য হলো, এই জ্ঞান যে, প্রতিটি সৃষ্টি বস্তুর জন্য অবশ্যই একজন স্রষ্টা থাকতে হয়—এটি একটি স্বভাবগত, অপরিহার্য জ্ঞান, যা নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান, এবং এটি সার্বজনীন বিধানের তুলনায় অধিক গভীর ও প্রবল। কেননা, সার্বজনীন বিষয় কেবল তখনই মানুষের মনে ধারণা লাভ করে যখন সে তার ব্যক্তিগত অনুরূপ উদাহরণসমূহ থেকে সে ধারণা তৈরি করে। যেমন, বহু সার্বজনীন বিধান রয়েছে যা অনেক তত্ত্বচিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা তাদের জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, যেমন—"সমগ্র অংশ অপেক্ষা বৃহৎ", বা "পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয় একসাথে সত্যও হতে পারে না, মিথ্যাও হতে পারে না", কিংবা "যেসব বস্তু একই কিছুর সমান, সেগুলোও পরস্পরের সমান"—ইত্যাদি।

কারো মনের মধ্যে যখনই কোনো সামগ্রিক ধারণা আসে, তখনই সে জানে যে তা তার অংশের তুলনায় বৃহৎ, এমনকি যদি সার্বজনীন বিধানটি তার মনে স্পষ্টভাবে উপস্থিত না-ও থাকে। যেমন সে জানে যে মানুষের দেহের কোনো একটি অঙ্গ অপরটির তুলনায় বড়, একটি দিরহাম তার অংশ অপেক্ষা বড়, একটি শহর তার কোনো একটি অংশের চেয়ে বড়, কিংবা একটি পাহাড় তার অংশের তুলনায় বড়। একইভাবে পরস্পরবিরোধী বিষয়—অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব। যখনই কোনো ব্যক্তি অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব কল্পনা করে, তখন সে জানে যে কোনো একটি বস্তু একই অবস্থায় একসাথে বিদ্যমান এবং অনুপস্থিত হতে পারে না, এবং সে এটি থেকেও মুক্ত থাকতে পারে না। এইভাবে মানুষ নির্দিষ্ট উদাহরণের ভিত্তিতে বিচার করে, যদিও সে হয়তো সার্বজনীন বিধানটি মনে করে না। এভাবে অন্যান্য বিষয়ও বিবেচ্য।

সার্বজনীন কিয়াসের উপকারিতা যেহেতু একটি সামগ্রিক বিষয় এবং নির্দিষ্ট নয়, তাই স্রষ্টাকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে নিদর্শনের পথই প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও কাম্য, যেমনটি কুরআনে এসেছে এবং যেমনটি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের স্বভাবগতভাবে দিয়েছেন। এমনকি কিয়াসপদ্ধতি যদি সঠিকও হয়, তবুও এর উপকারিতা অসম্পূর্ণ। কুরআনে যখন আল্লাহ তাআলা কোনো উপমা ব্যবহার করেন, তা হয় উচ্চতর সত্তার উপমা, কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ধারণের জন্য নয়। কারণ, যেসব অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে সৃষ্টিকে মুক্ত ঘোষণা করা উচিত, সেসব থেকে মহান স্রষ্টা আরও অধিক হারে মুক্ত; আর সৃষ্টির মধ্যে যেসব পূর্ণতা রয়েছে যাতে কোনো ত্রুটি নেই—যেমন জীবন, জ্ঞান, ও শক্তি—সেসবের মধ্যে স্রষ্টার প্রাপ্যতা আরও অধিক। অতএব, সমস্ত সৃষ্টি-সত্তা স্রষ্টার নিদর্শনস্বরূপ।

নিদর্শন ও উপমার মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, নিদর্শন নির্দিষ্ট সেই বস্তুর প্রতি নির্দেশ করে যার জন্য সে নিদর্শন ও চিহ্ন; সুতরাং প্রতিটি সৃষ্টি সত্তা স্বয়ং স্রষ্টার নিদর্শন ও প্রমাণ—এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি। এরপর, স্বভাবজাত প্রবৃত্তি নিদর্শনের প্রয়োজন ছাড়াই স্রষ্টাকে চিনে থাকে, কেননা তাদের সেই জ্ঞান নিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তারা এই নিদর্শন ব্যতীত স্রষ্টাকে না চিনত, তবে তারা এসব নিদর্শনকে স্রষ্টার নিদর্শন বলেও চিনত না। কারণ, একটি নাম যেভাবে নামকৃত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, ঠিক সেভাবে একটি নিদর্শনও সেই নির্দেশিত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে; তাই, নামকৃত বস্তু সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সেই নামকে কেউ নাম বলেও চিনবে না। তেমনি, কোনো কিছু কোনো কিছুর প্রমাণ বা নিদর্শন—এটি তখনই বোঝা যায়, যখন নির্দেশিত বস্তু এবং সেই প্রমাণের মধ্যকার সম্পর্ক ধারণা করা হয়। তবে কখনো মানুষ সে

সম্পর্কটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি না-ও করতে পারে; কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করে, তখন সে জানে যে নিদর্শনটি নির্দেশিত বিষয়েরই প্রমাণ, যদি সে জানে যে তা সে বিষয়ের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং যখন মানুষ জানে যে এই সকল সৃষ্টি বস্তু স্রষ্টার নিদর্শন, তখন তারা অবশ্যই স্রষ্টাকে পূর্ব থেকেই চেনে—কারণ, এইসব নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

সারকথা হলো, এই যে এই সকল যুক্তিভিত্তিক ও স্বভাবজাত পথসমূহই কুরআন প্রদর্শন করেছে, আর এতে বুদ্ধি ও ওহী একমত, মত ও গ্রন্থ সহমত। দার্শনিকদের মধ্যে যেমন ইবনেসীনা, আর-রাযী এবং তাদের অনুসারীরা বলেন: স্রষ্টাকে প্রমাণের উপায় হলো সম্ভাব্য সত্তাগুলো থেকে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ গ্রহণ করা, এবং এই যে সম্ভাব্য সত্তার জন্য একজন আবশ্যিক সত্তা থাকা জরুরি। তারা বলেন: অস্তিত্ব হয় আবশ্যিক, নয়তো সম্ভাব্য; আর সম্ভাব্য সত্তার জন্য অবশ্যই আবশ্যিক সত্তা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং উভয় অবস্থাতেই আবশ্যিক সত্তার অস্তিত্ব বর্নিত। ইবনেসীনা এই যুক্তি উদ্ভাবন করেন, তা গড়ে তুলেছেন কালামবিদ ও পূর্ববর্তী দার্শনিকদের আলোচনার ভিত্তিতে। কারণ, কালামবিদগণ অস্তিত্বকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:কাদিম (অজন্মা) এবং নবসৃষ্ট; আর ইবনে সীনা তা ভাগ করেন: আবশ্যিক ও সম্ভাব্য। কেননা, তার মতে আকাশমণ্ডল নবসৃষ্ট নয়; বরং তা সম্ভাব্য, যদিও কেউই তার আগে এভাবে ভাগ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, অনেক জ্ঞানী দার্শনিকই জানতেন এটি একটি ভুল বিভাজন, যা পূর্ববর্তী দার্শনিকদের ও সাধারণ বুদ্ধিমানদের বিরোধিতা করে। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে, কাদিমত্ব ও আবশ্যিক অস্তিত্ব পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত—এ বিষয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক সকলেই একমত। শুধুমাত্র এই নতুন মতবাদই এর ব্যতিক্রম।

কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ করি অনেক সৃষ্ট বস্তুর উদ্ভব—যা আগে ছিল না, তা পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে; আবার অস্তিত্ব লাভের পর অনুপস্থিত হয়েছে। যে বস্তু একসময় অনুপস্থিত ছিল অথবা ভবিষ্যতে অনুপস্থিত হবে, সেটি কখনোই আবশ্যিক সত্তা হতে পারে না এবং কাদিমও নয়।

এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয়, এই দার্শনিকগণ এক আবশ্যিক সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন, তবুও তাদের প্রমাণে এর কোনো ইঙ্গিত নেই যে, এই সত্তা আসমান ও নক্ষত্রমণ্ডল থেকে ভিন্ন। এটাই তাদের ব্যর্থতার এক দিক—যা ইমাম গাজালী ও অন্যান্যরা তুলে ধরেছেন। তবে তাদের মূল যুক্তি হলো, কোনো দেহ কখনো আবশ্যিক হতে পারে না, কারণ তা যৌগিক, আর আবশ্যিক সত্তা যৌগিক হতে পারে না। এই যুক্তিই তাদের

প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা বহু দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভ্রান্ততা দেখিয়েছি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই মতের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন, যেমন ইমাম গাজালী তা করেছেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে।

এর কারণ, ‘আবশ্যিক’ শব্দটি বহু অর্থবোধক হয়ে উঠেছে: কখনো তা এমন সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা নিজের দ্বারা বিদ্যমান ও অনস্তিত্বের অযোগ্য—এক্ষেত্রে সত্তাও আবশ্যিক, গুণাবলিও আবশ্যিক; কখনো তা এমন সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা নিজের দ্বারা টিকে থাকে—তাহলে সত্তা আবশ্যিক, কিন্তু গুণাবলি নয়; কখনো তা এমন সৃষ্ট সত্তার স্রষ্টার জন্য ব্যবহৃত হয়, যিনি সকল সৃষ্টির উৎপাদক। সুতরাং আবশ্যিক সত্তা হলো এমন এক সত্তা, যিনি এসব গুণাবলির অধিকারী। একটি সত্তা যা গুণাবলি থেকে খালি, কিংবা এমন গুণাবলি যা সত্তা থেকে পৃথক—এসব কিছু সৃষ্টি করেনি।

এই কারণেই তাদের মধ্যে যারা যাচাইকরণ ও জ্ঞানের দাবি করত, তারা শেষ পর্যন্ত আবশ্যিক সত্তাকে 'পরম অস্তিত্ব' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে—যা আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি।

এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো, এই যে, বান্দার প্রকৃত সৌভাগ্য নিহিত তার প্রভুর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতায় এবং তাঁর প্রতি প্রকৃত প্রয়োজনবোধে—অর্থাৎ, এই সত্যকে উপলব্ধি করা, তা জানা এবং সে অনুযায়ী বিনয়, নম্রতা ও শ্রদ্ধাবোধের সাথে নিজেকে উপস্থাপন করা। অন্যথায়, সব সৃষ্টি-সত্তা-ই প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনবান; তবে কেউ কেউ নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে এবং সীমালঙ্ঘন করে বসে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: "না! নিশ্চয়ই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, যখন সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে..." (আল-আলাক: ৬-৭)। আর তিনি বলেন: "আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়; আর যখন তাকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে ব্যাপকভাবে আহ্বান করতে থাকে..." (ফুস্সিলাত: ৫১)। এবং অন্য আয়াতে বলেন: "...সে তো চির হতাশ..." (আল-ইসরা: ৮৩)।

অনুচ্ছেদ

সৃষ্টির সঙ্গে সদাচরণে পরিপূর্ণতা আসে যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। অতএব, তুমি মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি আশা রাখবে, কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের প্রতি আশা রাখবে না। তুমি মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে, কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করবে না। তুমি আল্লাহর প্রতিদানের আশায় মানুষের প্রতি সদাচরণ করবে, তাদের প্রতিদানের আশায় নয়। আর তুমি আল্লাহকে ভয় করে তাদের উপর জুলুম করতে বিরত থাকবে, তাদের ভয়ে নয়। যেমন হাদীসে এসেছে: "মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি আশা রাখো, কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের প্রতি আশা রেখো না। মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করো না।"

অর্থাৎ: মানুষের প্রশংসার আশায় কিংবা তাদের নিন্দার ভয়ে তুমি কোনো ধরণের ইবাদত বা নৈকট্য লাভের কাজ তাদের উদ্দেশ্যে করো না। বরং আল্লাহর প্রতি আশা রাখো, এবং তুমি যা করো কিংবা যা থেকে বিরত থাকো সে বিষয়ে তাদের ভয় করো না। বরং তুমি যা আদিষ্ট হয়েছো তা করো, যদিও তারা তা অপছন্দ করে। এবং হাদীসে এসেছে: "নিশ্চয়ই এটি ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ যে, তুমি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করো, অথবা তুমি এমন কিছুর জন্য মানুষকে দোষারোপ করো যা আল্লাহ তোমাকে দেননি।"

নিশ্চয়তার অর্থ হলো: আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে ও তাঁর আনুগত্যকারীদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, এবং আল্লাহর তাকদীর, সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার ওপর নিশ্চিত হওয়া। সুতরাং, যদি তুমি আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করে মানুষকে সন্তুষ্ট করো, তবে তুমি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও রিযিকের ব্যাপারে নিশ্চিত নও। কেননা এর পিছনে থাকে দুটি কারণ: এক. তাদের কাছে পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি ঝোঁক, ফলে তাদের থেকে কিছু পাওয়ার আশায় তুমি আল্লাহর আদেশ পরিত্যাগ করো; অথবা দুই. আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারীদেরকে পৃথিবী ও আখিরাতে বিজয়, সাহায্য ও পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হওয়া। অথচ যদি তুমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো, তবে তিনি তোমাকে বিজয় দেবেন, রিযিক দিবেন এবং তাদের বোঝা থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করা হয় কেবল তাদের ভয়ে কিংবা তাদের উপর ভরসার কারণে, আর এটই ঈমানের দুর্বলতার প্রমাণ।

আর যদি তুমি ভাবো যে তারা তোমার জন্য যা করবে তা তোমার তাকদীরে নেই, তবে সেই বিষয়টি আল্লাহর হাতে, তাদের হাতে নয়। কেননা যা আল্লাহ চান তা-ই ঘটে, আর যা তিনি না চান তা ঘটে না। সুতরাং, যদি তুমি তাকদীরে না-লিখিত কোনো বিষয়ে তাদের দোষারোপ করো, তবে তা তোমার ঈমানের দুর্বলতা থেকেই আসে। অতএব, তুমি তাদের ভয় করো না, তাদের ওপর ভরসা করো না এবং নিজের খেয়াল ও বাসনার কারণে তাদের দোষারোপ করো না। বরং যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করেন, তিনিই প্রশংসার যোগ্য; এবং যাকে তারা নিন্দা করেন, তিনিই নিন্দার উপযুক্ত।

বনু তামিম গোত্রের একজন প্রতিনিধি বলেছিল: “হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু দাও, কারণ আমার প্রশংসা শোভা এবং আমার নিন্দা অপমান।” তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: “এই গুণ তো আল্লাহর, যিনি মহিমান্বিত ও সর্বোচ্চ।”

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) মুয়াবিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে লিখেছিলেন, এবং বর্ণিত আছে তিনি তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্পৃক্ত করে বলেছিলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে, আল্লাহ তাকে মানুষের বোঝা থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেন, তারা তাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো উপকার করতে পারবে না।” এটি মারফু হাদীসের রূপ। আর মাওকুফ বর্ণনায় এসেছে: “যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে, আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট হবেন এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, যারা তাকে আগে প্রশংসা করেছিল তারা পরবর্তীতে তাকে নিন্দা করতে থাকবে।” এটি তাঁর (আয়িশা) থেকে বর্ণিত শব্দ। এটি দ্বীনের অন্যতম গভীর উপলব্ধির বিষয়। মারফু বর্ণনাটিই অধিকতর উপযুক্ত ও সত্য। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, সে তো আল্লাহকে ভয় করেছে এবং সে আল্লাহর সৎ বান্দা। আর আল্লাহ সৎদের অভিভাবক, এবং তিনি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট। “আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে—আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ তৈরি করে দেন, এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন যেখান থেকে সে কল্পনাও করে না...” (সূরা আত-তালাক: ২-৩)

সুতরাং, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাকে মানুষের বোঝা থেকে মুক্ত করবেন। তবে সব মানুষ যে তাকে সন্তুষ্ট হবে এমন না-ও হতে পারে। তবে তারা সন্তুষ্ট হবে যখন তারা ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত হবে এবং পরিণতি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করে, তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে তার কোনো কাজে আসবে না, যেমন সেই যালিম ব্যক্তি যিনি তার হাত কামড়ে বলবে: "হায়, যদি আমি রাসুলের সঙ্গে একটি পথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধু না বানাতাম!" (সূরা আল-ফুরকান: ২৭-২৮)

আর যে প্রশংসাকারী নিন্দাকারীতে পরিণত হয়, তা প্রায়ই ঘটে এবং শেষপর্যন্ত দেখা যায়, কেননা পরিণতি তো তাকওয়ার জন্যই নির্ধারিত। তা তাৎক্ষণিকভাবে নাও ঘটতে পারে যখন মানুষের প্রবৃত্তি প্রাধান্য পায়। আর আল্লাহ, তিনি সর্বজ্ঞ।

তাওহিদ হলো শিরকের বিপরীত। অতএব, যদি বান্দা তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করে—যা আল্লাহর অধিকার—তবে সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক করে না, সে একজন মুওয়াহহিদ। আল্লাহর তাওহিদ এবং তাঁর ইবাদতের অংশ হলো আল্লাহর উপর ভরসা করা, তাঁর প্রতি আশা রাখা এবং তাঁকে ভয় করা। এর মাধ্যমে বান্দা শিরক থেকে পরিশুদ্ধ হয়। মানুষের হক আদায় করা এবং তাদের প্রতি জুলুম না করা বান্দাকে তাদের ব্যাপারে শিরক এবং জুলুম থেকে পরিশুদ্ধ করে। আর সে যখন তার রবের আনুগত্য করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, তখন সে নিজেকে জুলুম করা থেকেও পরিশুদ্ধ হয়।

তিনি, সর্বোচ্চ, কুদসী হাদীসে বলেন: "আমি নামাযকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে দুটি ভাগে ভাগ করেছি।" আর উভয় ভাগই বান্দার কল্যাণে ফিরেছে। যেমন তাবারানী বর্ণিত হাদীসে এসেছে, দোয়ার ব্যাপারে: "হে আমার বান্দারা! নিঃসন্দেহে এগুলো চারটি বিষয়: একটি আমার জন্য, একটি তোমাদের জন্য, একটি আমার ও তোমাদের মধ্যে, এবং একটি তোমাদের ও আমার সৃষ্টির মধ্যে। যা আমার জন্য: তা হলো, তোমরা আমার ইবাদত করো এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। যা তোমাদের জন্য: তা হলো, তোমাদের আমল, যার জন্য আমি তোমাদের পুরস্কৃত করবো যখন তোমরা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করবে। যা আমার ও তোমাদের মধ্যে: তা হলো, তোমাদের পক্ষ থেকে দোয়া আর আমার পক্ষ থেকে উত্তর। আর যা তোমাদের ও আমার সৃষ্টির মধ্যে: তা হলো, তাদের প্রতি তেমন আচরণ করো যেমনটা তোমরা চাও তারা তোমার প্রতি করুক।"

আল্লাহ উভয় অর্ধেককেই ভালোবাসেন। তিনি চান যে বান্দারা তাঁর ইবাদত করুক। বান্দাকে যে সাহায্য ও হিদায়াত দেওয়া হয়, তা তাঁর অনুগ্রহ ও সদয়তা থেকে আসে এবং এটি তাঁর ভালোবাসার ইবাদতের পথে উপায়স্বরূপ। তিনি কেবল তা-ই ভালোবাসেন যা ইবাদতের পথ।

বান্দা প্রথমে যা প্রয়োজন তা কামনা করে, আর তার প্রয়োজন ইবাদতের জন্য সাহায্য ও সঠিক পথে হিদায়াত। এর মাধ্যমেই সে ইবাদতের দিকে পৌঁছে যায়। অতএব, সে প্রথমে যা প্রয়োজন তা চায় যেন তা ব্যবহার করে প্রভুর ভালোবাসার পথে পৌঁছাতে পারে, যেখানে তার সুখ নিহিত।

তেমনিভাবে, "তোমাদের আমল, যার জন্য আমি তোমাদের পুরস্কৃত করবো যখন তোমরা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করবে।" সে পুরস্কারকে ভালোবাসে যা তার আমলের প্রতিদান। বান্দা কেবল নিজের জন্যই কাজ করে: "সে যা ভালো অর্জন করেছে তা তারই জন্য, এবং সে যা মন্দ অর্জন করেছে তার বোঝা তারই ওপর..." (সূরা আল-বাকারা: ২৮৬)

এরপর যখন সে ইবাদত কামনা করে, তখন তা কেবল নিজের উপকার, কল্যাণ এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির জন্যই কামনা করে। সুতরাং, বান্দা কখনো এমন কিছু চায় না যাতে তার উপকার নিহিত নেই। যদিও রব সেই ইবাদতকে ভালোবাসেন, তবু বান্দা তা কেবল নিজের উপযোগিতা বিবেচনায়ই কামনা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে তাঁর ইবাদত করে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং তাকে পুরস্কৃত করেন। অতএব, বান্দা সেই বরকত লাভ করে যা সে ভালোবাসে, কারণ সে তার প্রভুর ভালোবাসার বিষয় পূর্ণ করেছে।

এটি ক্রেতা-বিক্রেতার মত। বিক্রেতা মূলত ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য চায়, এবং এর প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, সে পণ্যের হস্তান্তরের ইচ্ছা রাখে। ক্রেতা চায় পণ্য, আর এর শর্ত হলো, সে মূল্য দেওয়ার ইচ্ছা রাখে। প্রভু চান যে তাঁকে ভালোবাসা হোক, আর এটি তখনই সম্ভব, যখন তিনি তা ভালোবাসেন যার দ্বারা ইবাদত সংঘটিত হয় (অর্থাৎ উপায়সমূহ)।

বান্দা ভালোবাসে যা তার প্রয়োজন এবং উপকারে আসে, আর এর শর্ত হলো, সে আল্লাহর ইবাদতকে ভালোবাসবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষদের প্রতি সদাচরণ করে, সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর হক এবং আল্লাহর বান্দাদের হক আদায় করছে। কিন্তু যে ব্যক্তি মানুষের নিকট থেকে প্রতিদান চায়—যেমন প্রশংসা, দোয়া বা অন্য কিছু—সে তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সদাচরণ করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে

ভয় করে এবং মানুষকে কেন্দ্র করে আল্লাহকে ভয় করে না, সে সৃষ্টির প্রতিও সদাচরণ করেছে এবং নিজের প্রতিও সদাচরণ করেছে। কারণ, আল্লাহর ভয় তাকে মানুষের হক আদায়ে বাধ্য করে এবং তাদের ওপর জুলুম করা থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মানুষকে ভয় করে কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে না, সে নিজের প্রতি এবং তাদের প্রতিও জুলুম করেছে, কেননা সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেছে ও তার ওপর ভরসা করেছে।

আর সে যদি আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে ভয় করে, তবে সে নিজের থেকে তাদের অনিষ্ট দূর করতে চায় যেকোনো উপায়ে—হোক তা তোষামোদি করে, তাদেরকে দেখিয়ে ইবাদত করে, অথবা এমন কিছু ব্যবহার করে যা তাদের অনিষ্টের চেয়ে বেশি বা সমতুল্য। এবং যদি সে তাদের ওপর ভরসা করে, তবে সে তাদের মধ্যে আল্লাহর হক আদায় করে না। আর যদি সে আল্লাহকে ভয় না করে, তবে সে তাদের ওপর জুলুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কারণ, মানুষের প্রকৃতি এমন যে, সে এমনকেও জুলুম করে যে তাকে কোনো ক্ষতি করেনি; তাহলে যারা তাকে কষ্ট দেয়, তাদের অবস্থা তো আরও স্পষ্ট।

এই ধরনের মানুষদেরকে প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা মানুষকে ভয় পায় এবং সুযোগ পেলে অন্যদের ওপর জুলুম করে, কিন্তু যখন কেউ তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে পড়ে। সে মানুষকে সেই অনুপাতে ভয় করে, যতটুকু সে দুর্বলতার অধিকারী। এ বিষয়গুলো মানুষের মাঝে ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবেই, যখন কেউ তাদের ওপর ভরসা করে এবং তারা তার প্রত্যাশা পূরণ করে না, তখন সে অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যদি সে আল্লাহকে ভয় না করে, তবে সে তাদের ওপর জুলুম করে। এ ধরনের বিষয় প্রায়ই মানুষের মাঝে দেখা যায়: একে অপরকে ভয় করে, একে অপরের ওপর ভরসা করে, আর প্রত্যেকে অপরের জুলুমের অভিযোগ করে এবং তাকে অপমান করতে চায়। ফলে, তারা একে অপরের ওপর জুলুম করে, আল্লাহর হক সম্পর্কেও জুলুম করে কারণ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর ভরসা করেছে, এবং নিজেদের প্রতিও জুলুম করেছে, কেননা এটা সেই পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত যার কারণে আত্মা শাস্তির যোগ্য হয়।

এটি মানুষকে নির্দিষ্ট পাপের দিকে ধাবিত করে যেমন শিরক ও ব্যভিচার। কারণ, যখন কেউ আল্লাহকে ভয়

করে না, তখন সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, বিশেষ করে যখন সে এমন কিছু চাইছে যা সে এখনো পায়নি। তার আত্মা সবসময় এমন কিছু কামনা করে যা তার চিন্তা ও দুশ্চিন্তা দূর করবে এবং যাতে সে প্রশান্তি লাভ করবে, অথচ তার নিকট আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদত নেই যার মাধ্যমে সে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তাই সে অবৈধ জিনিসে প্রশান্তি খোঁজে—যেমন অশ্লীল কাজ, হারাম পানীয় পান করা, মিথ্যা বলা, দুনিয়ার কথাবার্তা করা, ঠাট্টা-মসকরা করা, খেলাধুলায় মেতে থাকা, অসৎ সঙ্গীদের সাথে মেলামেশা করা এবং অন্যান্য বিষয়। অন্তর কেবল আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মানুষ এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, সে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত; তাকে যা উপকার করে তা অর্জন করতে এবং যা ক্ষতি করে তা প্রতিহত করতে হয়। তার আত্মা সদা সক্রিয় এবং সে চাইবেই এমন কিছু যা তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে, যাতে সে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। আর এই লক্ষ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। অন্তর কেবল আল্লাহর সাথেই প্রশান্তি লাভ করে, এবং আত্মা কেবল তার প্রতিই প্রশান্ত হয়। "যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য থাকত, তবে তা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত" (আল-আম্বিয়া: ২২)। আল্লাহ ছাড়া অন্য যেকোনো উপাস্য অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়, আর অন্তরের কল্যাণ কেবল আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়, তাঁর কোনো অংশীদার ছাড়া।

যদি অন্তর আল্লাহর জন্য খাঁটি না হয়, তবে তা অবশ্যই অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে—যারা অধিকাংশ মানুষের উপাস্য, যাদেরকে তারা নিজেদের জন্য সন্তুষ্ট থাকে। অতএব, তারা আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয় অন্যকে উপাস্য করে এবং তাদের নিকট সাহায্য চেয়ে। তারা তাদের ইবাদত করে এবং তাদের নিকট সাহায্য চায়, কারণ তারা জানে না যে প্রকৃত সুখ তাদের সৃষ্টিকর্তার ইবাদত ও তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যখন তারা তাঁর ইবাদত করে, তখন তারা অন্য সকল উপাস্য থেকে মুক্ত হয়ে যায়, এবং যখন তাঁকে সাহায্য চায়, তখন সৃষ্টির সাহায্য থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

যদি বান্দা এমন না হয়, তবে সে পাপী ও দরিদ্র। তার পরিপূর্ণতা কেবল তার প্রভুর আনুগত্যে নিহিত। এটাই মানুষের অবস্থা: সে গরিব ও অভাবগ্রস্ত, তারপরও সে পাপ করে এবং ভুলের মধ্যে পড়ে। সে তার প্রভুর মুখাপেক্ষী, কারণ তিনিই তার গোনাহ মাফ করে দেন; এবং সে তার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন: "জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর" (মুহাম্মদ: ১৯)।

তাওহীদের মাধ্যমে বান্দা শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি চায় মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হতে, সে যেন আল্লাহর ওপর ভরসা করে। আর ইস্তিগফারের মাধ্যমে তিনি তার পাপ ক্ষমা করেন এবং তাঁর শাস্তি দূর করেন: "আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না, যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে" (আল-আনফাল: ৩৩)।

বান্দার দারিদ্র্য ও দুরবস্থা কেবল তাওহীদের মাধ্যমেই দূর হয়; সে অবশ্যম্ভাবীভাবে এর মুখাপেক্ষী, আর যদি সে তা না পায়, তবে সে দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও কষ্টে নিপতিত থাকে এমন কিছু অন্বেষণে, যা সে এখনো পায়নি। আর আল্লাহ বলেন, "তিনি শিরক মাফ করেন না" (আন-নিসা: ৪৮, ১১৬)।

যদি ইস্তিগফার ও তাওহীদ একত্র হয়, তবে সে তার পরিপূর্ণতা ও সুখ লাভ করে এবং তার যন্ত্রণা দূর হয়। আর শক্তি ও ক্ষমতা কেবল আল্লাহর দ্বারাই হয়।

বান্দা সর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা করার ও তাঁর সাহায্য চাওয়ার মুখাপেক্ষী, যেমন সে সর্বদা আল্লাহর ইবাদতের মুখাপেক্ষী। তাই তার উচিত সর্বদা আল্লাহর প্রতি নিজের দারিদ্র্য ও প্রয়োজনকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর ইবাদত ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকা। কারণ, "শক্তি ও ক্ষমতা কেবল আল্লাহর দ্বারাই" এবং "আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই"।

তিনি বলেন: "নিশ্চয় এটা শয়তান, যে তোমাদেরকে তার মিত্রদের ভয় দেখায়" (আলে ইমরান: ১৭৫)। অর্থাৎ, সে তার মিত্রদের ভয় দেখিয়ে তোমাদের ভয় দেখায়। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সঠিক, যেমন ইবনে আব্বাস (রাহিমাহুল্লাহ্) ও অন্যান্যরা, এবং ভাষাবিদগণ যেমন আল-ফাররা' ও অন্যান্যরা।

ইবনেল আনবারী বলেন: আমরা এ আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করি তা হলো—"সে তোমাদেরকে তার মিত্রদের ভয় দেখায়"। আরবরা বলে: "আতায়তুল আমওয়াল", অর্থাৎ "আনায়তুল কাওমাল আমওয়াল" (আমি জাতিকে সম্পদ দিয়েছি), এখানে প্রথম অবজেক্ট বাদ গেছে।

আমি (ইবনে তাইমিয়্যাহ) বলি: কারণ শয়তান সাধারণভাবে মানুষকে তার মিত্রদের ভয় দেখায়; এমন নয় যে সে নির্দিষ্ট লোককে নির্দিষ্ট লোকের দ্বারা ভয় দেখায়। তাই এখানে প্রথম অবজেক্ট ('তোমাদেরকে') বাক্যগতভাবে বাদ গেছে, কারণ এটা উদ্দেশ্য নয় বরং প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত।

কিছু তাফসিরকার বলেছেন: সে তার মিত্রদের ভয় দেখায়, অর্থাৎ মুনাফিকদের। তবে প্রথম অর্থই অধিক

স্পষ্ট, কারণ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল কাফিরদের দ্বারা মুসলিমদের ভয় দেখানোর প্রেক্ষিতে। তিনি বলেন: "সে তোমাদেরকে তার মিত্রদের ভয় দেখায়, অতএব তাদেরকে ভয় করো না..." (আলে ইমরান: ১৭৫)। এখানে 'তাদের' শব্দটি শয়তানের মিত্রদের দিকে ইঙ্গিত করছে, যাদের বিষয়ে আগে বলা হয়েছিল "...তাদেরকে ভয় করো..." (আলে ইমরান: ১৭৩)।

দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা অর্থগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, যে শয়তান কেবল তার মিত্রদেরকেই ভয় দেখায়, কারণ তার কর্তৃত্ব তাদের ওপর। তাই সে তাদের মনেই ভয় ঢুকিয়ে রাখে, যদিও তারা সংখ্যায় ও অস্ত্রে পরিপূর্ণ। কিন্তু মুমিনগণ আল্লাহর ওপর ভরসা করে; কাফিররা তাদের ভয় দেখাতে পারে না।

অথবা তারা হয়তো প্রথম অবজেক্ট বোঝাতে চেয়েছে—অর্থাৎ: সে মুনাফিকদেরকে তার মিত্রদের ভয় দেখায়। এবং সে কাফিরদেরকেও ভয় দেখায়, যেমন সে মুনাফিকদেরকেও ভয় দেখায়।

যদি অর্থ এই হয় যে সে তার মিত্রদেরকেই ভয় দেখায়, তবে "তাদেরকে ভয় করো না"—এই 'তাদের' এর জন্য কোনো পূর্ববর্তী রেফারেন্স থাকত না। এছাড়া, সে তার মিত্রদের মিথ্যা আশা দেয়। কিন্তু আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন মুমিনদের কারণে, এবং শয়তান তা চায় না। তিনি বলেন: "তোমাদের ভয় তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়েও বেশি" (আল-হাশর: ১৩), এবং "আমি কাফিরদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেবো" (আল-আনফাল: ১২)।

তবে যারা সালাফ থেকে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারা উদ্দেশ্য করেছেন তাদেরকে যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও গোপনে শত্রুদের সাথে মিল রাখে, ফলে তারা মুনাফিক হয়। কেবল মুনাফিকরাই কাফিরদের ভয় পায় শয়তানের ভয়ের কারণে, যেমন আল্লাহ বলেন: "তারা এমন এক জাতি যারা ভয় করে" (আত-তাওবা: ৫৬), এবং বলেন: "আর যখন ভয় আসে..." (আল-আহযাব: ১৯)।

তাই উভয় ব্যাখ্যাই অর্থগতভাবে সঠিক। তবে বাক্যাংশ "তার মিত্রদের" দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে তাদেরকে যাদেরকে শয়তান ভয়াবহরূপে তুলে ধরে, না যে তারাই ভয় করে। কারণ, যখন শয়তান কাউকে ভয়ানক রূপে তুলে ধরে, তখন কেবল তারাই তাদেরকে ভয় করে যাদের হৃদয়ে শয়তান ভয় ঢুকিয়েছে।

এই আয়াত এ কথাও নির্দেশ করে যে, মুমিনদের জন্য শয়তানের মিত্রদের ভয় করা বৈধ নয়, বরং মানুষকেও ভয় করা বৈধ নয়, যেমন আল্লাহ বলেন: "তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো" (আল-মায়িদাহ: ৪৪)। অতএব, তিনি আল্লাহকে ভয় করতে বলেছেন এবং শয়তানের মিত্রদের ভয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন: "যাতে মানুষের কোনো দল তোমাদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করতে না পারে, তাদের মধ্যে যারা জুলুম করে, তাদের ছাড়া; অতএব, তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো" (আল-বাকারা: ১৫০)। তিনি বলেন: "যারা আল্লাহর বার্তাগুলো পৌঁছায় এবং তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকেও ভয় করে না" (আল-আহযাব: ৩৯), এবং বলেন: "তাহলে কেবল আমাকে ভয় করো" (আল-বাকারা: ৪০)।

কিছু মানুষ বলে: ‘হে প্রভু, আমি তো তোমাকে ভয় করি এবং তাকে ভয় করি যে তোমাকে ভয় করে না।’ এ কথাটি ত্রুটিপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। বরং বান্দার একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত, অন্য কাউকে নয়। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সে এতটাই তুচ্ছ যে তাকে ভয় করার কোনো মূল্য নেই; সে এক যালিম ও শয়তানের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহ তাকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ বলে, ‘কিন্তু সে তো আমাকে ক্ষতি করতে পারে’, তাহলে বলা হবে: সে কেবল তখনই তোমাকে ক্ষতি করতে পারে, যখন আল্লাহ তাকে তোমার উপর কর্তৃত্ব দেন। যদি আল্লাহ চান তোমাকে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে, তবে তিনি তা করবেন। সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে। মানুষ কেবল তার পাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর অসন্তুষ্টিকে এড়িয়ে চলো এবং তাঁর উপর ভরসা করো, তাহলে তিনি তোমাকে প্রত্যেক অপশক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাকে তোমার উপর কর্তৃত্ব দান করবেন না। কেননা তিনি বলেন: "আর যে কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাহলে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..." (সূরা আত-তালাক: ৩)। কোনো ব্যক্তিকে তোমার উপর কর্তৃত্ব দেওয়ার কারণ হলো তোমার পাপ এবং তার (আল্লাহকে ভয় না করা) সত্ত্বাকে ভয় করা। অতএব, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করো, পাপ থেকে তওবা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে সে ব্যক্তি তোমার উপর কর্তৃত্ব পাবে না; যেমন তিনি বলেন: "আর আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতেন না, যখন তারা ক্ষমা চাইত..." (সূরা আল-আনফাল: ৩৩)। আর হাদীসে এসেছে: “আল্লাহ বলেন: আমি আল্লাহ, আমার ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, রাজাদের রাজা আমি। রাজাদের হৃদয় ও তাদের কপালের আগা আমার হাতে। যে আমাকে মান্য করে, আমি রাজাদের হৃদয়কে তার প্রতি সদয় করে দেই। আর যে আমাকে অমান্য করে, আমি তাদের তার উপর শাস্তিস্বরূপ করে দেই। সুতরাং তোমরা রাজাদেরকে গালি দেওয়ার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করো না, বরং আমার দিকে তওবা করে ফিরে এসো এবং আমাকে মান্য

করো, আমি তাদেরকে তোমাদের প্রতি নম্র করে দিব।”

যেদিন উহুদের যুদ্ধে আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামের উপর শত্রুকে কর্তৃত্ব দিলেন, তখন তিনি বলেন: "তোমাদের উপর যখন একটি বিপদ এসেছে..." (সূরা আলে ইমরান: ১৬৫)। তিনি আরও বলেন: "আর কত নবী এমন ছিলেন, যার সাথে বহু রিব্বিয়ূন যুদ্ধ করেছে..." (সূরা আলে ইমরান: ১৪৬)। অধিকাংশ ক্বারী এখানে (قَاتَلَ) যুদ্ধ করেছে পড়েছেন। রিব্বিয়ূন অর্থ, সালাফ ও খালাফের অধিকাংশ মতে, বহু বৃহৎ দল। ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (একটি বর্ণনায়) এবং আল-ফাররা বলেন: বহু হাজার। ইবনে আব্বাস (আরেকটি বর্ণনায়), মুজাহিদ এবং কাতাদাহ বলেন: বহু দল। "রিব্বিয়ূন" শব্দটি রা-হরফে তিন প্রকার ইয়ারাব সহ পড়া হয়েছে। এই পাঠ অনুযায়ী—"قَاتَلَ"—রিব্বিয়ূন হল সেইসব লোক যারা নবীর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং "তারা দুর্বল হয়নি, মনোবল হারায়নি" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৬)। আর আবু আমর ও অন্যান্যদের পাঠ قُتِلَহত্যা করা হয়েছে। হলে, এর দুইটি ব্যাখ্যা হয়:

প্রথমত: এটি পূর্বের পাঠের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ, অর্থাৎ: বহু রিব্বিয়ূন নিহত হয়েছেন, অথচ তাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত ছিলেন তারা দুর্বল হননি—অর্থাৎ, তাদের মনোবল ভাঙেনি, কাপুরুষতা আসে নি, কিংবা শত্রুর সামনে তারা নত হননি। বরং তারা আল্লাহর আদেশ পালনে অবিচল ছিলেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দিলেন এবং আল্লাহর বাণী উচ্চস্থানে পৌঁছে গেল।

দ্বিতীয়ত: নবী নিহত হয়েছিলেন বহু রিব্বিয়ূনের সাথে, কিন্তু যারা বেঁচে ছিলেন তারা দুর্বল হননি নবীর শাহাদাতের কারণে। এটি উহুদের যুদ্ধে শয়তানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিহত হয়েছেন। তবে এই অর্থটি আয়াতের বাক্যগঠনের সঙ্গে খাপ খায় না। যথাযথ হবে এই যে, বিপদের তীব্রতা সত্ত্বেও তারা দুর্বল হয়নি। যদি অর্থ হয় যে নবী নিহত হয়েছেন এবং সঙ্গীরা ভয় পাননি, তাহলে তাদের বিপুল সংখ্যাকে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো না; বরং তাদের স্বল্প সংখ্যাকে তুলে ধরাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হতো। যদি তারা বহুসংখ্যক হয়, তবে তাদের এই অটলতা প্রশংসার যোগ্য হবে না। এছাড়া, এটি সাহাবীদের বিরুদ্ধেও যুক্তি হবে না, কারণ উহুদের দিনে তারা অল্পসংখ্যক ছিলেন এবং শত্রুরা সংখ্যায় বহুগুণ বেশি। তখন তারা বলতে পারত, "[অন্যরা] দুর্বল হয়নি কারণ তারা ছিল হাজার হাজার, অথচ আমরা অল্প।" তাছাড়া, আয়াতে বলা হয়েছে: "আর কত নবী..." — যা কিছুর ঘন ঘটা নির্দেশ করে; অথচ এমনটি জানা নেই যে বহু নবী জিহাদে শহীদ হয়েছেন। বরং এটি ইঙ্গিত করে যে,

প্রত্যেক নবীর সাথে নিহতদের সবাই রিব্বিয়ূন ছিলেন, অথচ বাস্তবে এমন হয়নি। কারণ মূসার পূর্ববর্তী নবীরা জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি এবং মূসা ও বনী ইসরাইলের নবীদের কেউ জিহাদে শহীদ হননি। প্রকৃতপক্ষে, এমন কোনো নবীকে চিহ্নিত করা যায় না যিনি জিহাদে শহীদ হয়েছেন। তাহলে কিভাবে এমনটি ঘনঘটা হতে পারে, এবং তার বাহিনীই বা বিশাল হবে কীভাবে?

আল্লাহ, মহিমান্বিত তিনি, পেছনে ফিরে যাওয়াকে নিন্দা করেছেন, হোক তা নবী শহীদ হওয়ার কারণে বা মৃত্যুবরণ করার কারণে। তিনি তাদেরকে এই জন্য দোষারোপ করেননি যে তারা ভয় পেয়েছিলো; বরং তাদেরকে দোষারোপ করেছেন এই জন্য যে তারা পশ্চাৎপদ হয়ে গিয়েছিল। এজন্যেই সিদ্দীক (আবু বকর) তাঁর (নবীর) মৃত্যুর পর এই আয়াত পাঠ করেছিলেন, যেন তারা পূর্বে তা শুনেনি।

এরপর তিনি আরেকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন: পূর্ববর্তীরা যুদ্ধ করত এবং তাদের মধ্য থেকে অনেকেই নিহত হত, তবুও তারা দুর্বল হতো না। এখানে তাদের সংখ্যার গুরুত্ব আছে, কারণ একই দলের বহু সদস্য নিহত হলে দুর্বলতা আসা স্বাভাবিক, অথচ তারা তা করেনি। যদি তারা দুর্বল হত, তাহলে তা তাদের ঈমানের দুর্বলতা প্রমাণ করত। এখানে বলা হয়নি, "তারা পশ্চাতে ফিরে যায়নি।" যদি অর্থ হত যে তাদের নবী নিহত হয়েছেন, তবে বলা হত, "তারা পশ্চাতে ফিরে যায়নি", কারণ এ বিষয়েই তিনি নিন্দা করেছেন—নবী মারা গেলে বা শহীদ হলে পশ্চাতে ফিরে যাওয়া। এজন্য তিনি, মহিমান্বিত তিনি, দুইটি বিষয় নিন্দা করেছেন: প্রথমত, নবী মারা গেলে বা শহীদ হলে ধর্মত্যাগ করা; দ্বিতীয়ত, আল্লাহর পথে শত্রুর কর্তৃত্ব দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দুর্বলতা, ভীরুতা ও আত্মসমর্পণ।

তিনি বলেন: "তারা দুর্বল হয়নি সে কষ্টে যা তাদের উপর আপতিত হয়েছিল..." (সূরা আলে ইমরান: ১৪৬)। তিনি বলেননি, "নবীর হত্যার কারণে তারা দুর্বল হয়নি।" যদি তিনি জীবিত থাকাকালীনই শহীদ হতেন, তাহলে সে অনুসারে উপযুক্ত ব্যাখ্যাই দিতেন। এছাড়া, যারা নবীর সাথে যুদ্ধ করেছে কিংবা শহীদ হয়েছে—এটি এ কথার প্রমাণ নয় যে নবী তাদের সাথে সরাসরি ময়দানে ছিলেন। বরং, যে কেউ নবীর দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করেছে, সে-ই তার সাথে যুদ্ধ করেছে। যে কেউ নবীর দ্বীনের জন্য শহীদ হয়েছে, সে-ই তার সাথে শহীদ হয়েছে। সাহাবীগণ এমনটাই বুঝেছিলেন, কারণ তাদের সর্বাধিক যুদ্ধ হয়েছিল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাতের পর, যতক্ষণ না তাঁরা শাম, মিশর, ইরাক, ইয়ামান, আরব, ফারস, রোম, পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চল জয় করেন। তখন তার সাথে যুদ্ধ করে শহীদদের সংখ্যাও বহু হয়ে যায়। কেননা যারা

নবীদের দ্বীনের উপর দৃঢ় ছিল ও লড়াই করেছে, তারা বহু। সুতরাং এই আয়াত সকল মুমিনদের জন্য শিক্ষা, কিয়ামত পর্যন্ত, কেননা তারা সবাই রাসুলের জন্য যুদ্ধ করছে, যদিও তিনি দুনিয়াতে নেই। সাহাবীগণ যারা এমন অভিযান পরিচালনা করেছেন যেখানে রাসুল উপস্থিত ছিলেন না, তবুও তারা তাঁর সঙ্গী, তাঁর পক্ষ থেকে যুদ্ধরত এবং তাঁর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত: "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর যারা তাঁর সাথে..." (সূরা আল-ফাতহ: ২৯)। এবং তাঁর এই বাণী: "আর যারা ঈমান এনেছে পরে, আর হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে..." (সূরা আল-আনফাল: ৭৫)। কাউকে মান্য করার জন্য তার চোখের সামনে উপস্থিত থাকাই শর্ত নয়।

রিব্বিয়ূন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা হলেন আলিমগণ, যেটি "রাব্বানী" শব্দের মতো। ইবনে যায়দ বলেছেন: তারা অনুসারীগণ, যেন তিনি তাদেরকে "মারবুবীন" (লালিত/শাসিত) বানিয়েছেন। তবে প্রথম ব্যাখ্যা (বৃহৎ দল) অধিকতর সঠিক নিম্নোক্ত কারণে:

প্রথমত: রাব্বানীয়ূন হলেন আহবার (আলেম/লেখক), যারা জনগণকে দীক্ষা দেন, আর তারা সর্বদা অল্প সংখ্যক হন।

দ্বিতীয়ত: জিহাদ ও ধৈর্যের আদেশ শুধু তাদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। নবীদের সঙ্গীরা সবাই রাব্বানী ছিলেন না, যদিও তারা জ্ঞান ও তাকওয়া রাখতেন।

তৃতীয়ত: "রাব্বানী" শব্দকে বৃহৎ দলের অর্থে ব্যবহার ভাষায় বর্নিত নয়।

চতুর্থত: "রিব্বী" শব্দকে আলেমের অর্থে ব্যবহার ভাষায় বর্নিত নয়; বরং যা জানা যায় তা হলো প্রথম অর্থ—বৃহৎ দল। যারা একে আলেম বলেছেন তারা বলেন এটি “রাব্ব” শব্দ থেকে নিয়ত, কিন্তু নূন ছাড়া। জনপ্রিয় পাঠ হল “রিব্বী” (কসরা সহ)। তাদের বক্তব্য কেবল তখনই ফিট করে, যখন কেউ “রাব্বী” (ফাতহা সহ) পড়েন। আবার কেউ কেউ “রুব্বী” (দাম্মা সহ) পড়েছেন, যা বিভিন্ন লাহজার নিদর্শন।

পঞ্চমত: আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য ও দৃঢ়তার নির্দেশ দিয়েছেন সব মুজাহিদকে, রাব্বানী হোক বা না হোক।

ষষ্ঠত: এখানে বিশেষভাবে আলেমদের উল্লেখ করার যৌক্তিকতা নেই। বরং তাদের উল্লেখ যুক্তিসঙ্গত সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৩ এবং আলে ইমরান: ৭৯-এ।

সপ্তমত: বলা হয়ে থাকে রাব্বানী শব্দটি "রাব্ব" থেকে এসেছে, আলিফ ও নূন সংযুক্ত হয়ে—যেমন

"লিহইয়ানী" (বিশাল দাড়িওয়ালা)। আবার বলা হয় তারা মানুষকে লালনপালন করে বলেই এ নাম। কেউ কেউ বলেন, এটি “রুব্বান” (জাহাজের ক্যাপ্টেন)-এর মত। শেষ মতটিই সঠিকতর, কারণ শব্দগঠনে সংযোজন ছাড়া অর্থ পাওয়া মূল নিয়ম। আর তারা যেহেতু মানুষকে পরিচালনা করে, এটি তাদের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু “রাব্ব” এর সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তা সকল বান্দার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতো। আল্লাহ তাঁর অলীদেরকে "রাব্বানী" বলেননি, এমনকি নবী ও রাসুলদেরকেও নয়। কেননা রাব্বানী সেই ব্যক্তি, যিনি জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো লোকদের পরিচালনা করেন। এজন্যই রাব্বানীয়ূনকে কখনও নিন্দা করা হয়, কখনও প্রশংসা। যদি তারা "রাব্ব" এর সরাসরি সম্পর্কিত হতো, তবে কখনোই নিন্দিত হতো না।

এই হচ্ছে অষ্টম কারণ: যদি "রাব্বানী" শব্দটি প্রশংসাস্বরূপ ধরা হয়, তবে তাদেরকে কিছু ক্ষেত্রে নিন্দাও করা হয়েছে। আর যদি এটি প্রশংসাসূচক না হয়, তবে তাদের মাঝে প্রশংসার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। যদি এটি জাহাজের কাপ্তানের দিক থেকে উদ্ভূত বলে ধরা হয়, তবে যারা "রাব্বানী" শব্দটিকে "রব" শব্দ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন তাদের মত অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অতএব, "রিব্বীয়্যীন" শব্দটিকে "রব" থেকে উদ্ভব বলা আরও অধিক অগ্রাহ্যযোগ্য।

নবম কারণ: যদি ধরে নেওয়া হয় যে শব্দটি "রব" থেকে উদ্ভূত, তবে তা আলিম হওয়াকে নির্দেশ করে না। হ্যাঁ, এটি ঈমান, ইবাদত ও আনুগত্যকে নির্দেশ করে, কিন্তু এসব তো সাধারণভাবে সকল মুমিনের মধ্যেই থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে পূজা করে এবং তার সাথে কাউকে শরিক করে না, সে আল্লাহর প্রতি অনুগত এবং তাকে জানে। সাহাবায়ে কিরাম সকলেই এমন ছিলেন, কিন্তু তাদের কাউকে "রাব্বানী" বা "রিব্বীয়" বলা হয়নি। শুধু একটি বর্ণনায় এসেছে, যখন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করেন, তখন ইবনেল হানাফিয়্যাহ বলেছিলেন: “আজ এই উম্মতের রাব্বানী ইন্তিকাল করেছেন।” এর কারণ ছিল, তিনি আল্লাহ যেই ইলম তাঁকে দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে মানুষকে আদব শিক্ষা দিতেন। যদিও খলিফাগণ তাঁর চেয়ে উত্তম ছিলেন, তবুও তাদের কাউকে "রাব্বানী" বলা হয়নি, যদিও বাস্তবে তারাই রাব্বানী ছিলেন।

ইব্রাহীম নাখাঈ বলেন: ‘আলকামাহ ছিলেন রাব্বানীদের অন্তর্ভুক্ত।’ এজন্য মুজাহিদ বলেন: “তারা হল এমন লোক যারা ছোট ছোট ইলম দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেন, তারপর বড় ইলম।” অর্থাৎ তারা আদেশ ও নিষেধের কাজ করেন। শুধু ইলম জানানোও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন—যে ব্যক্তি ইলম জানায়, অন্যের থেকে বর্ণনা করে এবং তা হাদীস আকারে বর্ণনা করে, যদিও সে আদেশ বা নিষেধ না করে। সালাফগণের নিকট থেকে "রাব্বানী" সম্পর্কে এটাই বর্ণিত হয়েছে।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: "তারা হচ্ছে সেইসব ব্যক্তি যারা মানুষকে হিকমত দিয়ে খাওয়ান ও তাদেরকে তার উপর গড়ে তোলেন।" এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "তারা হলেন ফকীহগণ যারা শিক্ষা দেন।" আমি বলি: আদেশ ও নিষেধের কাজ করা লোকেরা হলেন ফকীহগণ যারা শিক্ষা দেন।

কাতাদাহ ও আতা' বলেন: "তারা হলেন ফকীহ, আলিম, ও হিকমতবান।" ইবনে কুতাইবাহ বলেন: "তাদের মধ্যে একজনকে রাব্বানী বলা হয়, আর তারা হলেন—যারা ইলম শিক্ষা দেন এমন আলিমগণ।" আবু উবাইদ বলেন: "আমার ধারণা শব্দটি হিব্রু বা সিরিয়াক।" কারণ, আবু উবাইদ দাবি করেন, আরবেরা "রাব্বানীয়্যীন" শব্দটি জানত না। আমি বলি: শব্দটি আরবী, এবং এটি জাহাজের কাপ্তান থেকে উদ্ভূত, যিনি তার দেখাশোনা করেন এবং তত্ত্বাবধান করেন। তবে জাহিলী যুগের আরবদের মধ্যে "রাব্বানীয়্যীন" ছিল না, কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো নাযিলকৃত শরীয়তের উপর ছিল না।

অনুচ্ছেদ

আর শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং না তাদের পথ, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" (সূরা আল-ফাতিহা: ৬-৭)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: “ইহুদিরাই হলো তারা, যাদের প্রতি গজব নাযিল হয়েছে; আর খ্রিস্টানরাই হলো তারা, যারা পথভ্রষ্ট।”

আর আল্লাহর কিতাবেও এই বিষয়টি বহু স্থানে এসেছে, যেমন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সে সব ব্যক্তির সংবাদ দেব, যারা প্রতিদানের দিক থেকে এর চেয়েও নিকৃষ্ট? তারা হলো তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন এবং যাদের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন..." (সূরা আল-মায়িদা: ৬০)

তিনি বলেন: "অতএব তারা ফিরে গেল আল্লাহর ক্রোধসহ..." (সূরা আল-বাকারা: ৯০)

তিনি বলেন: "অতএব তারা আল্লাহর রোষানলের সম্মুখীন হয়ে ফিরে গেল, এবং তাদের উপর লাঞ্ছনা আরোপ করা হলো..." (সূরা আল-বাকারা: ৬১)

আর খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "বলুন, হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করো না এবং এমন এক সম্প্রদায়ের খেয়ালখুশি অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল।" (সূরা আল-মায়িদা: ৭৭)

আর তিনি বলেন: "হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম ছিলেন কেবল আল্লাহর রাসুল, তাঁর বানী যা তিনি মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে একটি রূহ। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের প্রতি ঈমান আনো এবং বলো না 'তিন'—বিরত হও, সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম।" (সূরা আন-নিসা: ১৭১)

আর তিনি বলেন: "ইহুদিরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র।' আর খ্রিস্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র।' এ কথা তারা তাদের মুখে বলে; তারা তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার অনুকরণ করে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তারা কেমন করে সত্য থেকে বিমুখ হচ্ছে! তারা তাদের আলেম ও ধর্মগুরুকে আল্লাহ ছাড়া রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মসীহ ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ তারা আদিষ্ট হয়েছিল এই মর্মে যে, তারা একমাত্র উপাস্যেরই 'ইবাদত করবে। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি তাদের শির্ক থেকে পবিত্র ও মহান।" (সূরা আত-তাওবা: ৩০-৩১)।।

আর তিনি বলেন: "কোনও মানুষ—যাকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছেন—তার জন্য উচিত নয় যে, সে লোকদেরকে বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার 'ইবাদত করো।' বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানিয় হউ, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও ও পড়ো।' এবং সে তোমাদেরকে আদেশ দেবে না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভু রূপে গ্রহণ করো। সে কি তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর তোমাদেরকে কুফরির আদেশ দেবে?" (সূরা আলে ইমরান: ৭৯-৮০)

আর তিনি বলেন: "বলুন, তাদেরকে আহ্বান করো, যাদের তোমরা আল্লাহ ছাড়া ইলাহ মনে করো—তারা তোমাদের থেকে বিপদ দূর করার কিংবা তা অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য রাখে না। যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারাও তাদের রবের সান্নিধ্য লাভের উপায় তালাশ করে—তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটবর্তী হতে পারে—তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়ংকর।" (সূরা আল-ইসরা: ৫৬-৫৭)

আর যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে প্রত্যেক সালাতে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি আমাদের সিদ্দিক পথ প্রদর্শন করেন—সেই পথ, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ, যারা ঐসব লোক হতে পৃথক যাদের উপর গজব নেমেছে ও যারা

পথভ্রষ্ট—এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার এই দুই পথের কোনো একটিতে ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এবং বাস্তবেও এমনটাই ঘটেছে, যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে—হাতের বাহুর সমান, হস্ত প্রসারণের সমান; এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে, তবুও তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে।" তারা জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহ্‌র রাসুল, তারা কি ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান?" তিনি বললেন, "আর কে?" এটি সহীহ হাদীস।

সালাফগণ (সত্‌পূর্বসূরীগণ) মনে করতেন, যে আলিম সিদ্দিক পথ হতে বিচ্যুত হয়, সে ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য ধারণ করে, আর যে সাধক বিভ্রান্ত হয়, সে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য ধারণ করে। এটা স্পষ্ট দেখা যায় ঐসব জ্ঞানীদের অবস্থায় যারা পথচ্যুত—তাদের কথা বিকৃত করা, হৃদয়ের কঠোরতা, জ্ঞানে কার্পণ্য, অহংকার, নিজেদের কথা ভুলে অন্যদের সৎকর্মে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে। আর দেখা যায় তাদের মাঝেও যারা সাধনা ও আত্মিক অবস্থার মধ্যে বিভ্রান্ত—নবী ও সৎকর্মশীলদের সম্পর্কে অতিরঞ্জন, ইবাদতে বিদআত, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ, ছবি ও সুরের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে।

এই কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা মরিয়মের পুত্র ঈসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো একজন বান্দা মাত্র; অতএব বলো: আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসুল।" এজন্যই আল্লাহ্ তাঁকে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থায় তাঁর দাসত্বের গুণে ভূষিত করেছেন, যেমন তিনি বলেন: "পবিত্রতা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালে সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন..." (সূরা আল-ইসরা: ১), এবং আল্লাহ্ বলেন: "এবং তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করেছেন তা তিনি ওহী করলেন..." (সূরা আন-নাজম: ১০), এবং আল্লাহ্ বলেন: "আর যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁকে আহ্বান করতে দাঁড়াল, তখন তারা তাঁকে ঘিরে গুচ্ছবদ্ধ দল হয়ে পড়ে..." (সূরা আল-জিন: ১৯)।

এই কারণেই তাকবীরে তাহিয়্যাহ এবং অন্যান্য সকল নির্ধারিত খুতবায়—যেমন জুমু'আর খুতবা, ঈদের খুতবা এবং খুতবাতুল হাজাহ (বিবাহের সময় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সময়ের খুতবা)—এ বলা হয়: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসুল।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দাসত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেন যেন তাঁর উম্মত

খ্রিষ্টানদের মতো ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছিল, সে ভুলে না পড়ে—যারা তাঁর উপরে উপাস্যত্ব আরোপ করেছিল। এমনকি যখন এক ব্যক্তি বলল, "যা আল্লাহ্ চান এবং আপনি চান," তিনি বললেন: "তুমি কি আমাকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ করে তুলেছো? বরং বলো: শুধু যা আল্লাহ্ চান।" আর তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন: "তোমরা বলো না, 'যা আল্লাহ্ চান এবং মুহাম্মাদ চান', বরং বলো, 'যা আল্লাহ্ চান, তারপর মুহাম্মাদ চান।" এবং তিনি বলেছিলেন: "আমার কবরকে উৎসবস্থল করো না; বরং যেখানে-ই থাকো, আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছায়।" এবং তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহ্, আমার কবরকে উপাস্যরূপে গৃহীত প্রতিমা বানিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ক্রোধ তাদের উপর প্রবল, যারা তাদের নবীদের কবরকে উপাসনাস্থল বানিয়েছে।" এবং তিনি বলেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কবরকে ইবাদতের স্থান বানাতো। সতর্ক হও! তোমরা কবরকে ইবাদতের স্থান বানিও না, কেননা আমি তোমাদেরকে এর থেকে নিষেধ করছি।"

উম্মাহর মাঝে অতিরঞ্জন দুটি গোষ্ঠীর মাঝে ঘটেছে: একটি হলো বিভ্রান্ত শী'আদের একটি দল, যারা নবী ও আহলুল বাইতের ইমামদের মধ্যে উপাস্যত্বের বিশ্বাস পোষণ করে; আরেকটি হলো অজ্ঞ সুফিদের একটি দল, যারা নবী ও অলীদের ব্যাপারে একই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে। অতএব, যে কেউ আমাদের নবী বা অন্য কোনো নবীর মধ্যে উপাস্যত্ব বা প্রভুত্ব কল্পনা করে, সে খ্রিষ্টানদের মতোই। বরং নবীদের হক হচ্ছে যা কিতাব ও সুন্নাহ নবীদের ব্যাপারে এনেছে তাই।

আল্লাহ্ তাআলা বনি ইসরাঈলের প্রতি তাঁর বক্তব্যে বলেন: "...তোমরা আমার রসূলগণকে বিশ্বাস করবে, তাদেরকে সম্মান করবে, এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিবে, আমি তোমাদের অপরাধসমূহ অবশ্যই মোচন করব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়..." (সূরা আল-মায়িদাহ: ১২)। আর "তু'যিরূহুম" অর্থ: সাহায্য, শ্রদ্ধা ও সম্মান। এবং আল্লাহ্ বলেন: "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলে ঈমান আনো, এবং তাঁকে (রাসুলকে) সম্মান ও শ্রদ্ধা করো..."—এটি রাসুলের হক—তারপর তিনি বলেন আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে: "...এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে পবিত্রতা ও মহিমা দান করো..." (সূরা আল-ফাতহ: ৮-৯)। আর আল্লাহ্ বলেন: "...আমার রহমত সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে, তাই আমি একে নির্ধারণ করব তাদের জন্য যারা আমার ভয় করে, যাকাত প্রদান করে, এবং আমার নিদর্শনসমূহে ঈমান আনে—যারা অনুসরণ করে রাসুলকে, উম্মী নবীকে, যাকে তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখতে পায়—যিনি তাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেন, মন্দ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য ভালো জিনিস হালাল করেন

এবং মন্দ জিনিস হারাম করেন, এবং তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল। অতএব, যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, সাহায্য করেছে, এবং যে আলো তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করেছে—তারা-ই সফলকাম..." (সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৬-১৫৭)। আর আল্লাহ্ বলেন: "বলুন, (হে মুহাম্মাদ), 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' বলুন, 'আল্লাহ্ ও রাসুলের আনুগত্য করো।' আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়—তবে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না..." (সূরা আলে ইমরান: ৩১-৩২)। এবং আল্লাহ্ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রাসুলের উপর দরূদ প্রেরণ করেন, আর তাঁর ফেরেশতাগণও। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর উপর দরূদ পাঠ করো এবং সালাম পাঠ করো..." (সূরা আল-আহযাব: ৫৬)। এবং আল্লাহ্ বলেন: "বলুন (হে মুহাম্মাদ), 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার ক্ষতির আশঙ্কা করো, এবং বাসস্থান যা তোমাদের পছন্দের—যদি এগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো...'" (সূরা আত-তাওবা: ২৪)।

তিনি কুরআনে ত্রিশটিরও অধিক স্থানে রাসুলের আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদেরকে আহ্বান করা হয় এমন কিছুর দিকে যা তোমাদের জীবন দান করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসুলের আহ্বানে সাড়া দাও..." (সূরা আল-আনফাল: ২৪)। এবং আল্লাহ্ বলেন: "না, শপথ তোমার রবের, তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তোমাকে তাদের মধ্যকার বিবাদে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়, এবং তোমার সিদ্ধান্তে তারা তাদের অন্তরে কোনো সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করে..." (সূরা আন-নিসা: ৬৫)। এবং আল্লাহ্ বলেন: "অতএব, যারা রাসুলের আদেশ থেকে বিচ্যুত হয়, তারা যেন সতর্ক থাকে—কোনো ফিতনা কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের উপর আপতিত না হয়..." (সূরা আন-নূর: ৬৩)। এবং আল্লাহ্ বলেন: "যখন মুমিনগণকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের দিকে, যাতে তিনি তাদের মাঝে ফয়সালা করেন, তখন তারা বলে: আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। তারাই সফলকাম। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসুলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর প্রতি সচেতন থাকে—তারা-ই সফলকাম।" (সূরা আন-নূর: ৫১-৫২)। সুতরাং আল্লাহ্ আনুগত্যকে আল্লাহ্ ও রাসুলের জন্য নির্ধারণ করেছেন, আর ভয় ও তাকওয়াকে শুধু আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন: "...তোমরা আমাকে ভয় করো..." (সূরা আল-বাকারা: ৪০)। এবং তিনি বলেন: "...আর

আমাকে ভয় করো…” (সূরা আল-বাকারা: ৪১)। এবং তিনি বলেন: “…তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো…” (সূরা আল-মায়িদা: ৪৪)। এবং তিনি বলেন: “নিশ্চয়ই যারা তোমার হাতে বাই‘আত করে, তারা তো আল্লাহ্‌র সাথেই বাই‘আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে…” (সূরা আল-ফাতহ: ১০)। এবং আল্লাহ্ বলেন: “তোমরা রাসুলকে ডাকাকে একে অপরকে ডাকার মতো করে রেখো না…” (সূরা আন-নূর: ৬৩)। এবং আল্লাহ্ বলেন: “নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক প্রিয়, আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মায়েদের সমতুল্য…” (সূরা আল-আহযাব: ৬)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও অধিক প্রিয় না হই।” তখন ‘উমর বললেন: “আল্লাহ্‌র কসম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আপনি আমার কাছে আমার নিজের ব্যতীত সব কিছুর চেয়েও প্রিয়।” তিনি বললেন: “না, হে ‘উমর, (যতক্ষণ না) আমি তোমার নিজের চেয়েও প্রিয় না হই।” তখন ‘উমর বললেন: “তাহলে, এখন আপনি আমার নিজের চেয়েও প্রিয়।” তিনি বললেন: “এখন, হে ‘উমর (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।”

অতএব, আল্লাহ তাঁর কিতাবে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকারসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন: তাঁর আনুগত্য করা, তাঁকে ভালোবাসা, সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, তাঁকে সাহায্য করা, তাঁকে বিচারক রূপে গ্রহণ করা, তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠানো, নিজে, পরিবার ও ধন-সম্পদের উপর তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া, সকল বিরোধীয় বিষয়ে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করা, এবং এ জাতীয় আরও বহু অধিকার। আর তিনি এ কথাও জানিয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য, যেমন তিনি বলেছেন: "যে কেউ রাসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল…" (সূরা আন-নিসা: ৮০)। আর তাঁর প্রতি বায়আত করাকে আল্লাহর প্রতি বায়আত রূপে গণ্য করেছেন, তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই যারা আপনার (হে মুহাম্মদ) প্রতি বায়আত করে, তারা মূলত আল্লাহর প্রতি বায়আত করে…" (সূরা আল-ফাতহ: ১০)। আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিনি নিজের নামের সঙ্গে রাসুলের নাম জুড়ে দিয়েছেন, তিনি বলেন: "…তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যদি তোমাদের নিজেদের থেকে, তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ থেকে অধিক প্রিয় না হয়…" (সূরা আত-তাওবা: ২৪)। আর কষ্টার্জনের প্রসঙ্গে বলেন: "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়…" (সূরা আল-আহযাব: ৫৭)। আনুগত্য ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রেও বলেন: "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে…" (সূরা আন-নিসা: ১৩), "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে…" (সূরা আন-

নিসা: ১৪)। আর সন্তুষ্টির প্রসঙ্গে বলেন: "...অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অধিক হকদার যে তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করুক..." (সূরা আত-তাওবা: ৬২)। এ সমস্তই এবং এর অনুরূপ বিষয়সমূহই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক—আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কোরবানি হোক।

অথচ ইবাদত ও সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট, তাঁর কোন শরিক নেই। যেমন তিনি বলেন: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না..." (সূরা আন-নিসা: ৩৬), "আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই নিকট সাহায্য চাই..." (সূরা আল-ফাতিহা: ৫), "তারা আদিষ্ট হয়নি শুধু এই কারণে যে তারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, সঠিকভাবে দ্বীনের প্রতি ঝুঁকে..." (সূরা আল-বায়্যিনাহ: ৫)। তিনি ইবাদত ও তাওয়াক্কুলকে একত্রে উল্লেখ করেছেন বহু স্থানে, যেমন: "...অতএব তুমি তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর উপরই ভরসা রাখো..." (সূরা হুদ: ১২৩), "আর ভরসা করো সেই চিরঞ্জীবের উপর, যিনি মরেন না, এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করো..." (সূরা আল-ফুরকান: ৫৮), "...আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাই..." (সূরা হুদ: ৮৮)। তাওয়াক্কুলও শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, যেমন তিনি বলেন: "...এবং যারা ভরসা করে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করে..." (সূরা ইবরাহীম: ১২)। তিনি আরও বলেন: "বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো, যদি আল্লাহ আমাকে কোনো ক্ষতিতে ফেলতে চান, তাহলে তারা কি তা দূর করতে পারবে? অথবা যদি তিনি আমার প্রতি দয়া করতে চান, তবে তারা কি তা প্রতিহত করতে পারবে?' বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তাঁরই উপর ভরসাকারীরা ভরসা রাখে।'..." (সূরা আয-যুমার: ৩৮)। তিনি বলেন: "যাদেরকে মানুষ বলল, 'নিশ্চয়ই মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে, তাই তাদের ভয় করো।' তখন তা তাদের ঈমান আরও বাড়িয়ে দিল, আর তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ কর্মবিধায়ক।'..." (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)।

আর দু'আ কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য, তা হোক ইবাদতের দু'আ বা প্রার্থনার ও সাহায্য প্রার্থনার দু'আ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "এবং (তিনি ওহি করেন) যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য, অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। এবং যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকতে দাঁড়াল, তখন তারা তাকে ঘিরে প্রায় একত্রিত হয়ে পড়ল। বলুন (হে মুহাম্মদ), 'আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকছি এবং আমি তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না।'..." (সূরা আল-জিন: ১৮-২০)। তিনি বলেন: "তোমরা আল্লাহকেই ডাকো, একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রতি, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে..." (সূরা গাফির: ১৪)। আর তিনি বলেন: "তুমি আল্লাহর

সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকো না, তাহলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে..." (সূরা আশ-শু'আরা: ২১৩)। এবং তিনি বলেন: "আর তুমি তাদের দূরে সরিয়ো না যারা তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যা ডাকে, শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে..." (সূরা আল-আনআম: ৫২)। তিনি ফিরিশতা, নবী এবং অন্যান্যদের ডাকার ব্যাপারে নিন্দা করেছেন, যেমন তিনি বলেন: "বলুন (হে মুহাম্মদ), 'যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া ডাকো, তাদের ডাকো। তারা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি দূর করার বা স্থানান্তর করার ক্ষমতা রাখে না।' যাদেরকে তারা ডাকে, তারাও তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে, (দেখে) তাদের মধ্যে কে নিকটতর হয়, এবং তারা তাঁর রহমত কামনা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ..." (সূরা আল -ইসরা: ৫৬-৫৭)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, কিছু লোক ফিরিশতা, ঈসা এবং উযায়েরকে ডাকত, তখন আল্লাহ বলেন: তোমরা যাদের ডাকো, তারাও আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর প্রতি আশা রাখে এবং তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয়, যেমন তোমরাও তাঁর নৈকট্য কামনা করো। তিনি বলেন: "আর যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর কষ্ট এসে পড়ে, তখন হারিয়ে যায় যাদের তোমরা ডেকে থাকো, তারা সবাই..." (সূরা আল-ইসরা: ৬৭)। আর তিনি বলেন: "সে কি নয় যিনি দুর্দশাগ্রস্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে, এবং কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানান? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ কি আছে?" (সূরা আন-নামল: ৬২)। তিনি বলেন: "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তা যথাযথ হক ছাড়া হত্যা করে না, এবং তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না..." (সূরা আল-ফুরকান: ৬৮)।

তাওহীদের স্বীকৃতি ও ইবাদত ও সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা কুরআনে অতি ঘন ঘন এসেছে; বরং এটিই ঈমানের প্রাণ এবং ইসলামের শুরু ও শেষ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে মানুষদের সাথে যুদ্ধ করার, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল।" আর তিনি বলেন: "আমি এমন একটি কথা জানি, যা কেউ মৃত্যুর সময় বললে, তার আত্মা সহজে বের হয়।" আর তিনি বলেন: "যার শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" এটি দ্বীন ও ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু, আর অন্যান্য সব আমল তার অঙ্গস্বরূপ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "নিশ্চয়ই সব আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়তেরই ফল পাবে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়ার কোনো সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্য, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে।" এর দ্বারা তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, নিয়ত অন্তরের আমল, এবং এটি আমলের ভিত্তি। একমাত্র আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালিস করা, শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করাই হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর প্রকৃত অর্থ।

এই কারণে আমরা শাইখ ইয়াহইয়া আশ-শারশারীর ঐসব কবিতাকে অপছন্দ করি, যেখানে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় সাহায্য প্রার্থনার (ইস্তিগাছা) কথা বলেছেন, যেমন:

"আপনার মাধ্যমেই আমি সাহায্য চাই, সহায়তা কামনা করি, উদ্ধার প্রার্থনা করি..."

এবং এর অনুরূপ বাক্যাবলী।

অনুরূপভাবে, বহু মানুষের সেই আচরণ আমরা অপছন্দ করি, যারা নেককার ব্যক্তিদের নিকট এবং তাদের সদৃশদের নিকট থেকে সাহায্য চায় (ইস্তিনজাদ), জীবিত হোক বা মৃত, তাদের নিকট থেকে সহায়তা চায়। আমি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বৈঠকে প্রকাশ্যে এ বিষয়ের নিন্দা করেছি এবং মানুষের সামনে তাওহীদ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছি। আর আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেছেন, সাধারণ ও বিশেষ—উভয়ের মধ্য থেকেই—তাদের উপকার করেছেন।

এটাই ইসলাম নামক সর্বজনীন ধর্ম, যা আল্লাহ সমস্ত নবীদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন: "আমি প্রত্যেক জাতির নিকট একজন বার্তা প্রেরণ করেছি, (বলেছি:) 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো'..." (সূরা: আন-নাহল, আয়াত: ৩৬)। তিনি আরও বলেছেন: "আমি তোমার আগে যে কোনো রাসুল প্রেরণ করিনি, কিন্তু আমি তার প্রতি ওহি পাঠিয়েছি যে, 'আমার ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, অতএব আমার ইবাদত করো'..." (সূরা: আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫)। এবং তিনি বলেছেন: "আপনার আগে যাদেরকে রাসুলরূপে প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন—আমি কি 'আর-রাহমান' ছাড়া অন্য কারো উপাসনা নির্ধারণ করেছি?" (সূরা: আয-যুখরুফ, আয়াত: ৪৫)। এবং তিনি বলেছেন: "হে রাসুলগণ! তোমরা উত্তম রিযিক ভক্ষণ করো এবং সৎকর্ম করো। আমি তোমাদের কৃতকর্ম জানি। আর তোমাদের এই দীন একটিই দীন এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, তোমরা

আমার তাকওয়া অবলম্বন করো..." (সূরা: আল-মু'মিনূন, আয়াত: ৫১-৫২)। এবং তিনি বলেছেন: "তিনি তোমাদের জন্য সেই দীন নির্ধারণ করেছেন, যা তিনি নূহের উপর নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং যা আমি তোমার প্রতি ওহি করেছি (হে মুহাম্মাদ), এবং যা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার উপর নির্দেশ দিয়েছিলাম—তোমরা এই দীন প্রতিষ্ঠা করো এবং এতে বিভক্ত হয়ো না। মুশরিকদের জন্য এই দাওয়াত খুবই কঠিন..." (সূরা: আশ-শূরা, আয়াত: ১৩)। এবং তিনি বলেছেন: "আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য..." (সূরা: আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবালকে বলেছিলেন: "হে মুআয, তুমি কি জানো আল্লাহর বান্দাদের উপর কী হক?" আমি বললাম, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন: "তাঁর হক হলো, তারা যেন তাঁরই ইবাদত করে এবং তার সাথে কাউকে শরিক না করে। তুমি কি জানো যদি তারা এটা করে, তবে আল্লাহর উপর তাদের কী হক?" যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না।" তিনি ইবনে আব্বাসকে বলেছিলেন: "যদি তুমি কিছু চাও, আল্লাহর নিকট চাও। আর যদি তুমি সাহায্য চাও, আল্লাহর নিকট চাও।"

ইবাদতের মধ্যে রয়েছে: ভয়, রুজু, আনুগত্য, ও তাওবা। যেমন আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন: "যারা আল্লাহর বার্তাবলী পৌঁছে দেয়, তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না..." (সূরা: আল-আহযাব, আয়াত: ৩৯)। তিনি বলেছেন: "...তোমরা মানুষকে ভয় কোরো না, বরং আমাকেই ভয় করো..." (সূরা: আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৪)। তিনি বলেছেন: "আল্লাহর মসজিদসমূহ তো কেবল তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না..." (সূরা: আত-তাওবাহ, আয়াত: ১৮)। এবং খলীল ইবরাহীম বলেছিলেন: "...আমি তোমাদের যে শরিক স্থাপন করছো, তা ভয় করি না, যদি না আমার প্রতিপালক কিছু ইচ্ছা করেন। আমার প্রতিপালক সব কিছুর জ্ঞান রাখেন, তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না? আমি কীভাবে তা ভয় করবো, যা তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক করছো—যার জন্য তিনি কোনো দলিল নাযিল করেননি? যদি তোমরা জেনে থাকো, তবে বলো, এই দুই দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিক হক কার আছে? যারা ঈমান আনে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম (শিরক) দ্বারা মিশ্রিত করে না—তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিকভাবে পরিচালিত..." (সূরা: আল-আন'আম, আয়াত: ৮০-৮২)। এবং তিনি বলেছেন: "তোমরা কি এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে...?" পরবর্তী আয়াতে তিনি বলেন: "...তোমরা কি

তাদের ভয় করো? বরং আল্লাহ অধিক হক রাখেন, যেন তোমরা তাঁকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও..." (সূরা: আত-তাওবাহ, আয়াত: ১৩)। "আর আমাকে ভয় করো..." (সূরা: আল-বাকারা, আয়াত: ৪১)। তিনি বলেছেন: "যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে..." (সূরা: আন-নূর, আয়াত: ৫২)। এবং নূহ বলেছিলেন: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো..." (সূরা: নূহ, আয়াত: ৩)।

তিনিই ইবাদত ও তাকওয়াকে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করলেন এবং আনুগত্যকে নিজের জন্য নির্ধারিত করলেন। যেমন আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন: "আমি কোনো রাসুলই প্রেরণ করিনি, কিন্তু আল্লাহর আদেশে যেন তার আনুগত্য করা হয়..." (সূরা: আন-নিসা, আয়াত: ৬৪)। অনুরূপভাবে, অন্যান্য রাসুল যেমন: নূহ, হুদ, সালিহ, শু'আইব, লূত ইত্যাদি বলেছেন: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো..." (সূরা: আশ-শু'আরা, আয়াত: ১০৮, ১২৬, ১৪৪, ১৬৩, ১৭৯)। অতএব তারা তাকওয়াকে আল্লাহর জন্য এবং আনুগত্যকে নিজেদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কুরআনে অসংখ্য স্থানে বলা হয়েছে: "আল্লাহকে ভয় করো..." এবং: "আমরা তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছি..." (সূরা: আন-নিসা, আয়াত: ১৩১)।

তদ্রূপ, তিনি বলেন: "তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাই" (হূদ: ৮৮)। এবং তিনি বলেন: "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো..." (আয-জুমার: ৫৪)। এবং তিনি ইবরাহীম সম্পর্কে বলেন: "যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন, 'আত্মসমর্পণ করো', সে বলল, 'আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম'..." (আল-বাকারা: ১৩১)। আর বিলকীস বলেছিল: "...নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমি সুলায়মানের সঙ্গে আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করছি..." (আন-নামল: ৪৪)। এবং তিনি বলেন: "তবে কে উত্তম ধর্মে সে ব্যক্তি অপেক্ষা, যে তার মুখমণ্ডল আল্লাহর দিকে সমর্পণ করে এবং সে সদাচারী এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সত্যানুসারী..." (আন-নিসা: ১২৫)। এবং তিনি বলেন: "হ্যাঁ বরং, যে ব্যক্তি তার মুখ আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে এবং সে সদাচারী—তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে..." (আল-বাকারা: ১১২)। এবং তিনি বলেন: "তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে তাওবা করো..." (আন-নূর: ৩১)। "আর যে তাওবা করে এবং সৎকর্ম করে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহর দিকে সত্যিকারের তাওবা করে..." (আল-ফুরকান: ৭১)। এবং তিনি বলেন: "...তোমাদের স্রষ্টার নিকট তাওবা করো..." (আল-বাকারা: ৫৪)। "আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা করো..." (আত-তাহরীম: ৮)।

আর মাফ চাওয়ার বিষয়ে: "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সদা ক্ষমাকারী..." (নূহ: ১০)। "এবং বলো, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে তাওবা করো'..." (হূদ: ৩)।

রিজিক ও বিজয় প্রার্থনার ক্ষেত্রেও, যেমন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা বা শত্রুর বিরুদ্ধে কুনূত দোয়ার মাধ্যমে। তিনি বলেন: "...তোমরা আল্লাহর নিকট রিজিক চাও, তাঁকে ইবাদত করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও..." (আল-আনকাবূত: ১৭)। এবং তিনি বলেন: "যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না; আর যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর পর তোমাদেরকে কে সাহায্য করতে পারবে? অতএব, আল্লাহর উপরই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত..." (আলে ইমরান: ১৬০)।

এবং ইস্তিগাসা—সাহায্য প্রার্থনার বিষয়ে, তিনি বলেন: "যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিলেন..." (আল-আনফাল: ৯)।

আর ইস্তিজারা—রক্ষা প্রার্থনার বিষয়ে, তিনি বলেন: "বলো, 'কার হাতে সব কিছুর অধিকার—আর তিনি রক্ষা করেন অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ রক্ষা করতে পারে না—তোমরা যদি জানতে?' তারা বলবে, 'এটা আল্লাহর।' বলো, 'তবে তোমরা কীভাবে প্রতারিত হচ্ছো?'" (আল-মু'মিনূন: ৮৮-৮৯)।

আর ইস্তিআযা—আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়ে, তিনি বলেন: "বলো, 'আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের প্রতিপালকের নিকট...'" (আল-ফালাক: ১)। এবং "বলো, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট...'" (আন-নাস: ১)। এবং তিনি বলেন: "বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশ্রয় চাই শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে, এবং আমি আশ্রয় চাই হে আমার প্রতিপালক! যেন তারা আমার নিকট না আসে'..." (আল-মু'মিনূন: ৯৭-৯৮)। এবং তিনি বলেন: "অতএব, যখন তুমি কুরআন পাঠ করো, তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো" (আন-নাহল: ৯৮)।

আর নিজের বিষয় সোপর্দ করা প্রসঙ্গে, ফেরাউনের বংশধরের ঈমানদার ব্যক্তি বলেছিলেন: "আমি আমার বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখেন..." (গাফির:

৪৪)। আর সহীহ হাদীসে (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সম্মত) রয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের সময় যে দোয়া শিখিয়েছেন: "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সোপর্দ করেছি, আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে ফিরিয়েছি, আমার বিষয় আপনার নিকট সমর্পণ করেছি এবং আমার পিঠ আপনার কাছে সঁপে দিয়েছি..."

আর তিনি বলেন: "এবং তুমি এর দ্বারা সতর্ক করো তাদেরকে, যারা আশঙ্কা করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে একত্রিত হবে—তাদের জন্য তাঁর ব্যতীত কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না..." (আল-আন'আম: ৫১)। এবং তিনি বলেন: "আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু রয়েছে ছয় দিনে; এরপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তোমাদের নেই তাঁর ব্যতীত কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী..." (আস-সাজদাহ: ৪)।

অতএব, ওয়ালী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তোমার সব বিষয় পরিচালনা করেন, আর শাফী' হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সেখানে সুপারিশকারী হন, অর্থাৎ সাহায্যকারী। সুতরাং বান্দার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো স্বতন্ত্র অভিভাবক নেই, এবং না কোনো সাহায্যকারী।

আর তিনি বলেন: "আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুঃখ দেন, তবে তা তিনি ছাড়া কেউ দূর করতে পারে না; আর যদি তিনি তোমার জন্য কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তবে কেউ তাঁর অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারে না..." (ইউনুস: ১০৭)। এবং তিনি বলেন: "আল্লাহ যা কিছু মানুষের জন্য রহমত হিসেবে দেন, কেউ তা রোধ করতে পারে না; আর যা তিনি রোধ করেন, তা পরে কেউ ছেড়ে দিতে পারে না..." (ফাতির: ২)। এবং তিনি বলেন: "তারা কি আল্লাহ ছাড়া সুপারিশকারীদের গ্রহণ করেছে? বলো, 'তাদের কিছুই নেই, আর তারা বুঝেও না?' বলো, 'সুপারিশ পুরোটাই আল্লাহর অধীনে। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বাদশাহত্ব তাঁরই...'" (আয-জুমার: ৪৩-৪৪)। এবং তিনি বলেন: "বলুন, হে মুহাম্মদ, 'তোমরা ডেকো তাদের, যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত তোমরা আহ্বান করো।' তারা আকাশ ও পৃথিবীতে এক কণার পরিমাণও মালিক নয়, এবং তাদের জন্য সেখানে কোনো অংশ নেই, আর তাঁদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর কোনো সাহায্যকারীও নয়। এবং সুপারিশ কোনো উপকারে আসে না তাঁর কাছে, ছাড়া সেই ব্যক্তির যার জন্য তিনি অনুমতি দেন..." (সাবা: ২২-২৩)। এবং তিনি বলেন: "কে আছো যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে..." (আল-বাকারা: ২৫৫)। এবং তিনি বলেন: "আর কত ফেরেশতা আছে আকাশে, যাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না—অবশেষে

আল্লাহ অনুমতি দিলে, যাকে তিনি চান ও যার প্রতি সন্তুষ্ট হন..." (আন-নাজম: ২৬)।

সুতরাং ইবাদত, সাহায্য প্রার্থনা, এবং যা এর অন্তর্ভুক্ত—যেমন দোয়া, ইস্তিগাসা, ভয়, আশা, তাওবা, ভরসা, ক্ষমা প্রার্থনা—সবকিছু শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, যার কোনো শরীক নেই। কেননা, ইবাদত আল্লাহর উলুহিয়্যাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সাহায্য প্রার্থনা রবুবিয়্যাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর আল্লাহই জগতসমূহের প্রতিপালক; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমাদের আর কোনো রবও নেই—না ফেরেশতা, না নবী, না অন্য কেউ। বরং সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হল আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি করা, অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর শিরক হল—তোমার ইবাদত, ভরসা ও সাহায্য প্রার্থনায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অংশী করা। যেমন তারা বলেছিল: "...আমরা তো কেবল তাদের ইবাদত করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়..." (আয-জুমার: ৩)। এবং যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: "...আমরা তো তোমার সঙ্গে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদের দেখি না, যাদেরকে তোমরা শরীক মনে করতে..." (আল-আন'আম: ৯৪)। এবং তিনি বলেন: "তারা কি আল্লাহ ছাড়া সুপারিশকারীদের গ্রহণ করেছে? বলো, 'তাদের কিছুই নেই এবং তারা বুঝেও না?'..." (আয-জুমার: ৪৩)। এবং তিনি বলেন: "...তোমাদের নেই তাঁর ব্যতীত কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী..." (আস-সাজদাহ: ৪)।

ইবাদতের শ্রেণিসমূহ: সালাত তার সমস্ত অংশসহ, এবং তার প্রতিটি অংশও যা নিজের মধ্যেই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত—যেমন সেজদা, রুকু, তাসবীহ, দোআ, কিরাআত, ও কিয়াম—এই সব কিছুর উপযুক্ততা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। ইবাদতের উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক কোনো কাজ করা বৈধ নয়, আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য নয়—না সূর্য, না চাঁদ, না কোনো ফেরেশতা, না কোনো নবী, না কোনো নেককার ব্যক্তি, না কোনো নবী বা নেককার ব্যক্তির কবরের জন্য। এই বিধান সকল নবীদের ধর্মে প্রযোজ্য এবং আমাদের শরীআতেও তা বর্ণিত হয়েছে, এমনকি কোনো মানুষকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক সেজদা করাও হারাম। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রাঃ)-কে তাঁর কাছে সেজদা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেন: "যদি আমি কাউকে কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তার উপর তার স্বামীর অধিকারের গুরুত্বের কারণে।" তিনি সালাম দেওয়ার সময় রুকু করা নিষিদ্ধ করেছেন, এবং সালাতে তিনি বসা অবস্থায় থাকলে পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তেও নিষেধ করেছেন।

একইভাবে যাকাত, সাধারণ সদকা হোক কিংবা নির্দিষ্ট ফরয যাকাত—এটি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই

দেওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর তাঁর কাছে কারো কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হয়, বরং কেবল তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে..." (আল-লাইল: ১৯-২০)। আবার বলেন: "আমরা তোমাদের কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাওয়াই..." (আল-ইনসান: ৯)। এবং বলেন: "আর যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ খোঁজার জন্য ও নিজেদেরকে সুদৃঢ় রাখার জন্য..." (আল-বাকারা: ২৬৫)। আবার বলেন: "...আর তোমরা যাকাত যাই দাও, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে—তারাই বহুগুণ লাভকারী..." (আর-রূম: ৩৯)। তাই এই কাজ ধর্মীয়ভাবে ফেরেশতা, সূর্য, চাঁদ, নবী, অথবা নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও করা বৈধ নয়—যেমন কিছু ভিখারী ও বুযুর্গপূজকেরা করে থাকে, বলে: "অমুক অমুকের ওয়াসিলায়," এবং শপথ করে নবী, সাহাবী বা নেক ব্যক্তিদের নামে—যেমন বলা: "বাকর ও আলী, নূরুদ্দীন আরসলান, শায়খ আদী ও শায়খ জালীদের কসম।"

একইভাবে হজ—এটি কেবল আল্লাহর ঘরের জন্যই পালনযোগ্য। তাই তাওয়াফ কেবল কাবা শরীফের চারপাশে করা যায়, মাথা মুন্ডনও কেবল সেখানে, এবং অবস্থান (ওকূফ) কেবল তার সন্নিকটে। এটি কোনো নবী, কোনো নেক ব্যক্তি, কোনো নবী বা নেক ব্যক্তির কবর, অথবা কোনো মূর্তির জন্য নয়। অনুরূপভাবে রোযা—এটি কেবল আল্লাহর জন্যই রাখা যায়। তারা কোনো তারা, সূর্য, চাঁদ, কিংবা নবী-নেক ব্যক্তিদের কবরের উদ্দেশ্যে রোযা রাখতে পারে না।

এই সব কিছু দুইটি সাক্ষ্যবাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা—যা ধর্মের মূল ভিত্তি: "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" এবং "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল"। ইলাহ হলেন সেই সত্তা যাঁর ইবাদত করা বান্দাদের কর্তব্য, যা তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও ভয় অন্তর্ভুক্ত করে। তাই উলূহিয়্যাত সম্পর্কিত সব কিছু একমাত্র আল্লাহর অধিকার, এবং রিসালাত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ রাসুলের হক।

যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি এই দুই সাক্ষ্য, এই উম্মাহ হলো সাক্ষ্যদাতা এবং তারা সাক্ষ্যদানের বৈশিষ্ট্যধারী। আর খ্রিষ্টানদের মধ্যে যাজকরা আছে, যাদের ইবাদত আছে কিন্তু সাক্ষ্য নেই। এ কারণেই তারা বলেছে: "হে আমাদের রব! আমরা তোমার প্রতি নাযিলকৃত বাণীতে ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি, অতএব আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করো।" (আল-ইমরান: ৫৩)। এ কারণেই তত্ত্বভিত্তিক আলেমগণ বলেছেন—এই দুই সাক্ষ্য দ্বীনের প্রথম ফরজ, যেমনটি আহলুস-সুন্নাহর ইমামরা বলছেন এবং মানসুর আস-সামআনী, শায়খ আব্দুল কাদির ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। [যারা গোমরাহিতে পড়ে] তারা এটিকে শিরকের ভিত্তি বানিয়ে দ্বীনের তাওহীদের ধারা পরিবর্তন করে, যা দ্বীনের মূল।

এর অন্যতম কারণ হলো—আল্লাহ যে নির্দিষ্ট শরীআত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তা থেকে সরে গিয়ে এমন একটি সাধারণ ভিত্তিতে চলে যাওয়া, যা সাবিয়ান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটি হলো বিকৃত কিয়াস (উপমা), যেমন তারা বলেছে: "ব্যবসা তো সুদের মতই..." (আল -বাকারা: ২৭৫)। তারা শ্রবণকে এক শ্রেণি করতে চায় এবং ধর্মকে এক শ্রেণি মনে করে, অথচ তারা শরঈ ও বিদআতী শ্রবণের মধ্যে, অথবা আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। শরঈ, ধর্মীয় শ্রবণ হলো—আল্লাহর কিতাব শ্রবণ, কণ্ঠস্বর দিয়ে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুশোভিত করা। যেমন নবী বলেছেন: "তোমরা কুরআনকে তোমাদের কণ্ঠস্বর দিয়ে শোভিত করো।" এবং আবু মূসা বলেন: "যদি আমি জানতাম আপনি শুনছেন, তবে আমি অবশ্যই তা আরও শোভিত করতাম।" আর বৈধ হলো ছবি (শওয়ার—যা বৈধ রূপ বা চেহারা বোঝায়, হারাম নয়), স্ত্রীগণ ও দাসীরা যাদেরকে আল্লাহ বৈধ করেছেন।

আর ইবাদত—এটি কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্যই, কোনো শরীক ছাড়া। "সেসব ঘরে, যেগুলোর উঁচু হওয়ার ও সেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ; সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁকে পবিত্রতা প্রদান করেন, এমন পুরুষেরা..." (আন-নূর: ৩৬-৩৭)।

এই অর্থই সেই মূলনীতিকে মজবুত করে—"সিরাতে মুস্তাকীমের অনুসরণ মানেই জাহান্নামীদের পথ থেকে ভিন্ন হওয়া।" কারণ এটি শরঈ, বিধিবদ্ধ বিষয়ের সাথে প্রাকৃতিক, বিদআতী বিষয়ের সাদৃশ্য স্থাপন নিষিদ্ধ করে, কেবলমাত্র সাধারণ মিল থাকার কারণে। যেমন একটি সুন্দর কণ্ঠ একা কোনো শরঈ বিষয় নয়, যতক্ষণ না তার সাথে একটি বৈশিষ্ট্য যোগ হয়—যেমন কুরআনের হরফসমূহ। তখন সাধারণ এবং বিশেষের সম্মিলন হয় উপকারী দ্বীন।

বান্দার আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট কিছু না চাওয়া সম্পর্কিত

তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতএব, যখন তুমি অবসর হও, তখন ইবাদতে পরিশ্রম কর। আর তোমার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ কর।" (সূরা আল-ইনশিরাহ: ৭-৮)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাসকে বলেছিলেন: “তুমি যখন চাইবে, আল্লাহর নিকট চাও; আর যখন সাহায্য চাবে, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও।”

তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে: “তোমাদের কেউ যেন তার প্রভুর কাছে তার সমস্ত প্রয়োজন চায়—যদি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তবুও যেন তা আল্লাহর নিকট চায়; কারণ আল্লাহ তা সহজ না করলে, তা কখনোই সহজ হবে না।”

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদী ইবনে হাতিম এবং তার সঙ্গে যারা বাইআত করেছিলেন, তাদের বলেছিলেন: “তোমরা কারো কাছে কিছু চেয়ো না—যদি তোমাদের কারো চাবুক পড়ে যায়, সে যেন কাউকে না বলে ‘এটি আমাকে দাও।’”

আর সহীহ হাদীসে এসেছে, সেই সত্তর হাজার ব্যক্তির বিষয়ে, যারা হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে—তারা এমন যারা ঝাড়ফুঁক চায় না, দাগ দেয় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না। আর ঝাড়ফুঁক চাওয়া মানেই কারো কাছে তা চাওয়া, যা এক প্রকার চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের নিকট সম্পদ চাওয়াকে নিষিদ্ধ করার হাদীস বহু রয়েছে, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ভিক্ষা চাওয়া তিন শ্রেণির মানুষ ছাড়া কারো জন্য বৈধ নয়।” তিনি আরও বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন তার রশি নিয়ে যায়...”, “যতক্ষণ না সে চায়, ভিক্ষার দ্বার বন্ধ হবে না...”, “যে ব্যক্তি লোকদের কাছে চায়, অথচ তার কাছে প্রয়োজন মিটানোর সামর্থ্য রয়েছে...”, এবং আরও অনেক হাদীস। আর তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তা মানুষের কাছে পেশ করে, তার অভাব কখনো দূর হবে না...”

আর জ্ঞানসহ অনুমোদিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ জিজ্ঞাসার দ্বারা উত্তরদাতার জ্ঞান কমে না; বরং উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, এবং প্রশ্নকারীও তার প্রয়োজন পূরণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তারা যখন জানত না, তখন কেন প্রশ্ন করল না? নিশ্চয়ই অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো প্রশ্ন করা।” তবে কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো নিষিদ্ধ, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: “তোমরা এমন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন কোরো না...” (সূরা আল-মায়িদা: ১০১), এবং যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপ্রয়োজনীয় ও জটিল প্রশ্ন থেকে নিষেধ করেছেন।

আর অন্যকে নিজের জন্য দোয়া করতে বলা—তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরকে বলেছিলেন: “আমাদের জন্য তোমার দোয়ায় ভুল করবে না।” এবং তিনি বলেন: “যখন মুয়াজ্জিনের কথা শুনবে, তার মতো করে বলো, তারপর আমার উপর দরুদ পাঠাও; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠায়, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য ‘ওসীলা’ চাইবে, কারণ এটি জান্নাতে একটি মর্যাদা, যা কেবল একজন বান্দারই প্রাপ্য, এবং আমি আশা করি আমি সেই হব। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হবে।”

এ বিষয়ে বলা যেতে পারে: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নিকট দোয়ার অনুরোধ করেছেন মূলত উম্মতের উপকারের জন্য; কারণ তারা যখন তার জন্য দোয়া করে, তখন তারা নিজের জন্য দোয়ার চেয়েও অধিক সাওয়াব লাভ করে। যেমন তিনি তাকে বলেছিলেন, যে বলল, “আমি কি আপনার জন্যই আমার সব দোয়া নিবেদন করব?” তিনি বললেন: “তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের সব চিন্তা থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেবেন।” অতএব, তিনি তাদের দোয়া চেয়েছেন তাদের উপকারার্থেই, যেমন তিনি তাদেরকে যা আদেশ করেছেন, তাও তাদেরই কল্যাণের জন্য ছিল। কেননা, সহীহ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে: “কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য অদৃশ্য অবস্থায় দোয়া করলে, আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন; সে যখনই দোয়া করে, সেই ফেরেশতা বলে, ‘আমীন, এবং তোমার জন্যও একই দোয়া হোক।’”

অনুচ্ছেদ

শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন:

ইবাদতসমূহ শরীয়তের উপর এবং অনুসরণের উপর ভিত্তি করে গঠিত, খেয়াল-খুশি ও বিদআতের উপর নয়। নিশ্চয়ই ইসলাম দুইটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: প্রথমত, আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না; দ্বিতীয়ত, আমরা আল্লাহর ইবাদত সেই পন্থায় করি যা তিনি তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবান দিয়ে বিধিবদ্ধ করেছেন। আমরা খেয়াল-খুশি ও বিদআতের ভিত্তিতে তাঁর ইবাদত করি না। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "এরপর আমি তোমাকে একটি শরীয়তের পথ দিয়েছি ধর্মের ব্যাপারে, অতএব তুমি তার অনুসরণ কর এবং জ্ঞানহীনদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমার কোনই প্রতিরক্ষা করতে পারবে না..." (আল-জাসিয়া: ১৮-১৯)। আর তিনি বলেন: "তাদের কি কিছু শরীক রয়েছে, যারা তাদের জন্য এমন একটি ধর্ম বিধিবদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?" (আশ-শূরা: ২১)।

অতএব, কারো জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহর ইবাদত করবে, কিন্তু কেবলমাত্র সে পদ্ধতিতে যা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধিবদ্ধ করেছেন, হোক তা ফরজ বা নফল। কেউ আল্লাহর ইবাদত করবে না কোনো নবউদ্ভাবিত বিষয়ে ভিত্তি করে। এটি বর্নিত হয়েছে "সুনান" গ্রন্থসমূহে আল-ইরবায ইবনে সারিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস দ্বারা—তিরমিযি বলেছেন: এটি একটি হাসান সহীহ হাদীস। আর মুসলিমে এসেছে যে, তিনি তাঁর খুতবায় বলতেন: "সর্বোত্তম কথা আল্লাহর বাণী, সর্বোত্তম হিদায়াত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিদায়াত, আর নিকৃষ্টতম বিষয়গুলো হলো নবউদ্ভাবিত বিষয়সমূহ, আর প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী।"

আর কারো জন্য বৈধ নয় যে, ইবাদত করবে অন্য কারো নয় বরং একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং, সে সালাত আদায় করবে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য, রোযা রাখবে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে, হজ্জ করবে না কিন্তু কেবল আল্লাহর ঘরের জন্য, ভরসা করবে না কিন্তু কেবল আল্লাহর উপর, ভয় পাবে না কিন্তু কেবল আল্লাহকেই, মানত করবে না কিন্তু কেবল আল্লাহর জন্য, শপথ করবে না কিন্তু কেবল আল্লাহর নামে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন তোমাদের পূর্বপুরুষদের নামে শপথ করতে। যার শপথ করতে হয়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা নীরব থাকে।" এবং সুনানসমূহে এসেছে: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে শিরক করেছে।" আর ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: "যদি আমি আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করি, তবুও তা আমার নিকট অধিক প্রিয়, এর চেয়ে যে আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে সত্য শপথ করি।" কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা শিরক, আর আল্লাহর নামে শপথ করা তাওহীদ। আর তাওহীদের সাথে মিথ্যা বলাও শিরকের সাথে সত্য বলার চেয়ে উত্তম। এজন্যই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা হলো, এটি শিরকের সমান হয়ে যায়, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকের সমতুল্য করে দেওয়া হয়েছে," এটি তিনি দুইবার বা তিনবার বলেছেন। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন আল্লাহ তায়ালার বাণী: "...আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে যায়, তারপর তাকে পাখি ছিনিয়ে নেয় অথবা বাতাস তাকে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে..." (আল-হাজ্জ: ৩১)।

যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে আর তাতে শিরক সংঘটিত হয়, তাহলে সে ব্যক্তি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে মানত করে, তাহলে তা কত বড় শিরকের কাজ! মানত তো শপথ অপেক্ষা বড় একটি বিষয়। এজন্য, কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, উমরা বা সদকার মানত করে, তবে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী তা পূরণ করা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে, কেউ যদি আল্লাহর নামে কোন কাজ করার শপথ করে, তবে তা তার উপর আবশ্যক নয়; বরং বলা হয়, সে তার শপথের কাফফারা আদায় করে এবং শপথকৃত কাজটি না করলেও চলে, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন শপথ করে, অতঃপর দেখে যে, অন্য কোনো কিছু তাতে অপেক্ষা উত্তম, সে যেন উত্তমটি করে এবং তার শপথের কাফফারা আদায় করে..." সহীহ হাদীসে বর্নিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করা নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "নিশ্চয়ই মানত কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না; এটি তো কেবল কৃপণ ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু বের করে আনার একটি মাধ্যম..." অতএব, যদি (আল্লাহর নামে) মানত করাও কোনো কল্যাণ বয়ে না আনে, তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানত করার অবস্থা কী হতে পারে? তবে, যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করা হয় এবং তা আনুগত্যমূলক কাজ হয়, তবে তা পূরণ করা আবশ্যক। আর যদি তা গুনাহর কাজ হয়, তবে তা পূরণ করা জায়েজ নয়—এ বিষয়ে সকল আলেম একমত। কেবল ইখতিলাফ হয়েছে এ বিষয়ে যে, এর কোন বিকল্প আছে কি না বা এটি শপথের কাফফারার মতো কোনো

কাফফারায় পরিণত হয় কি না; কারণ সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তা পালন করে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার মানত করে, সে যেন তা না করে..."

অতএব, যে ব্যক্তি মনে করে যে, কোনো সৃষ্টির নামে মানত করা তার উপকার করে বা তার কোনো ক্ষতি দূর করে, সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, যারা মনে করে সৃষ্টিকে ইবাদত করলে উপকার হয় বা ক্ষতি দূর হয়। এই মুশরিকদের নিকট শয়তান রূপ ধারণ করে আসে, কথা বলে, তাদের কাউকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিছু গায়েবী খবর দেয়, কিছু রিযিক, খাবার, পোশাক কিংবা অন্যান্য জিনিস এনে দেয়, যেমনটা আরব ও অনারব মূর্তিপূজকদের সাথেও ঘটেছে। এধরনের ঘটনা বিপুল পরিমাণে বর্তমান সময়ে এবং পূর্বের যুগেও বিদ্যমান ছিল—তারা সেইসব বিদআতিপন্থী যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করে, হয় অন্যকে আল্লাহর সাথে শরীক করে ইবাদতের মাধ্যমে, অথবা এমন ইবাদত করে যা আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেননি।

এদের কেউ যদি কোনো আদাত(অলৌকিক) বিষয় প্রকাশ করে, তবে তা দুভাবেই হতে পারে—হোক তা শয়তানী অবস্থা কিংবা প্রতারণামূলক অবস্থা। তাদের মধ্যকার বুদ্ধিমানদের সাথে শয়তান থাকে, আর এ অবস্থা অন্যদের সাথেও হতে পারে; তবে শয়তান কারো সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে না যতক্ষণ না তার মধ্যে কোনো বিদআত থাকে, হোক তা কুফর, ফাসিকতা, অথবা শরীয়তের অজ্ঞতা। কারণ, শয়তানের উদ্দেশ্যই হলো, যতদূর সম্ভব মানুষকে পথভ্রষ্ট করা। যদি সে কাউকে কুফরে নিপতিত করতে পারে, সে তা করে; যদি না পারে তবে তাকে গুনাহগার বা অবাধ্য বানানোর চেষ্টা করে; আর যদি পারে না, তবে তার আমল ও দ্বীনকে দুর্বল করার জন্য তার মধ্যে এমন বিদআত চালু করিয়ে দেয় যা দ্বারা সে শরীয়তের বিরোধিতা করে—শয়তান এভাবেই তার দ্বারা উপকৃত হয়।

এই কারণেই ইমামগণ বলেছেন: যদি তুমি কোনো ব্যক্তিকে আকাশে উড়তে দেখো অথবা পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখো, তবে তার আদেশ ও নিষেধের প্রতি আনুগত্য না যাচাই করা পর্যন্ত তার দ্বারা ধোঁকা খেয়ো না। এই কারণেই অনেক লোক পাওয়া যায় যারা আকাশে উড়ে বেড়ায়, আর তাদের বহন করে শয়তান; এটি আল্লাহর নেক ওলিদের কারামতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যাকে শয়তান 'আরাফাতে নিয়ে যায়, ফলে সে সেখানে মানুষের সঙ্গে অবস্থান করে, তারপর [শয়তান] তাকে রাতের মধ্যেই ফিরিয়ে এনে তার শহরে রেখে আসে। এই মূর্খ ব্যক্তি মনে করে এটি আল্লাহর কোনো অলির পক্ষ থেকে হয়েছে, অথচ সে জানে না যে, এর জন্য তার তাওবা করা ফরজ। আর যদি সে বিশ্বাস করে যে এটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও আনুগত্যের কাজ, তবে তাকে তাওবা করতে বলা হবে; যদি সে তাওবা করে, তাহলে ভালো, না

করলে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ, যে হজ্জ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ করেছেন, তা ইহরাম গ্রহণ এবং 'আরাফাতে অবস্থানকে আবশ্যিক করে তোলে, এবং এর পরে তাওয়াফুল ইফাযা (ফেরার তাওয়াফ) করাকে অপরিহার্য করে তোলে, কারণ এটি এমন একটি রুকন, যার দ্বারা হজ্জ পূর্ণ হয় না। বরং, তাকে মুজদালিফায় অবস্থান করতে হবে, জামার উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে, বিদায়ের তাওয়াফ (তাওয়াফুল বিদা) করতে হবে, নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে হবে, এবং মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে; হজ্জের অন্যান্য দায়িত্বগুলোও পালন করতে হবে। এসব বিভ্রান্ত লোকদের, যাদের শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে, সে আকাশে বহন করে নিয়ে যায়; তাদের মধ্যে কেউ থাকে যাকে শয়তান তার কাপড়ের ভেতরে বহন করে, ফলে সে 'আরাফাতে অবস্থান করে এবং একই রাতে আবার ফিরে আসে, এমনকি সে একই দিনে তার শহরে ও 'আরাফাতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে এমনও কেউ থাকে যার আকৃতি শয়তান ধারণ করে 'আরাফাতে দাঁড়িয়ে থাকে, ফলে কেউ যিনি তাকে চেনেন, তাকে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখেন এবং ভাবেন যে ঐ ব্যক্তি 'আরাফাতে অবস্থান করেছে। এরপর যদি সেই শায়েখ বলেন, 'আমি এ বছর 'আরাফাতে যাইনি,' তখন সে ব্যক্তি ভাবে, এটি ঐ শায়েখের আকৃতিতে সৃষ্ট কোনো ফেরেশতা ছিল; অথচ সেটি ছিল এক শয়তান, যে তার রূপ ধারণ করেছিল। এ জাতীয় ঘটনা এবং এর অনুরূপ অনেক কিছু প্রায়ই ঘটে থাকে, আর এগুলো শয়তানী অবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্ধ হয়ে থাকে, আমরা তার জন্য এক শয়তান নির্ধারিত করি, আর সে তার সাথী হয়..." (সূরা যুখরুফ: ৩৬)। আর দয়াময়ের স্মরণ হচ্ছে সেই যিকর যা তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "নিশ্চয় আমিই যিকর (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব..." (সূরা হিজর: ৯)। এবং আল্লাহ তায়ালা বলেন: "অতঃপর যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোনো হিদায়াত আসে..."—পর্যন্ত তাঁর বাণী—"...আমার নিদর্শনসমূহ তোমার কাছে এসেছিল, অথচ তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে; সুতরাং আজ তুমিও ভুলে যাওয়া হবে..." (সূরা ত্বাহা: ১২৩-১২৬)। আর ভুলে যাওয়া মানে তা বিশ্বাস ও কর্ম দ্বারা পরিত্যাগ করা, যদিও কেউ এর বর্ণনা মুখস্থ রাখে। ইবনে আব্বাস বলেন: 'যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তার মধ্যে যা আছে তা অনুসরণ করে, আল্লাহ তার জন্য নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে হতভাগা হবে না।' এরপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর কিতাব ও হিকমতের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন এবং সুখী করেন। আর যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে বিভ্রান্ত হয় ও হতভাগা হয়, এবং শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে ও ধ্বংস করে দেয়।

অতএব, আল্লাহর নেক ওলিদের যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ও কারামত, তা ঈমানের ফল। কেননা, এটাই তাঁর অলিদের অবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "সত্বর! আল্লাহর ওলিদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।" (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)। আর এই কারামতসমূহ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ঈমানদার বান্দার জন্য দুনিয়া ও দ্বীনের কল্যাণ স্বরূপ। তা দ্বীনের প্রমাণ ও দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণে উপকার দেয়, যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযাগুলো দ্বীনের প্রমাণ ছিল এবং মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করেছিল। এর উদাহরণ: খাদ্য ও পানীয়তে বরকতের প্রকাশ, যেমন তাঁর আঙুলের মধ্য থেকে পানি নির্গমন; বৃষ্টির জন্য দোয়ার মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণ; কাফিরদের পরাজিত করা; রোগীদের সুস্থতা দান দোয়ার মাধ্যমে; এবং এমন গোপন বিষয় সম্পর্কে সত্য ও উপকারী সংবাদ যা উপস্থিত লোকদের অজানা ছিল। আর নবীগণের সংবাদ কখনো মিথ্যা হয় না।

অন্যদিকে, যাদের অবস্থা শয়তানী, তারা কাহিনদের মতো; কখনো মিথ্যা বলে, আবার কখনো সত্যও বলে, এবং তাদের কার্যকলাপে আদেশ বিরোধিতা অবশ্যই থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, কার ওপর শয়তান অবতীর্ণ হয়? তারা প্রত্যেক পাপী মিথ্যাবাদীর ওপর অবতীর্ণ হয়..." (সূরা শু'আরা: ২২১-২২২)। এ কারণেই তাদের কাউকে দেখা যায় নাপাক ও ময়লার মতো জিনিসের সাথে লিপ্ত, যা শয়তান পছন্দ করে, অথবা অশ্লীল কাজ করে, অথবা মানুষের জান-মাল বা অন্য কোনো বিষয়ে জুলুম করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন: "...অশ্লীলতা—তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন—পাপ ও অন্যায়ের উপর ভিত্তি করে জুলুম, এবং আল্লাহর সাথে শরিক করা..." (সূরা আ'রাফ: ৩৩)। আর আল্লাহর ওলিরা হচ্ছেন তারা, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেন—আদেশ পালনে, নিষেধ এড়িয়ে চলায় এবং তাকদীরে ধৈর্য ধারণে। এটি একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ, যার জন্য বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন, আর এই জায়গা তার জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা

আর শায়খুল ইসলাম বলেছেনঃ

আমি পূর্বে বহু স্থানে, ফিকহের কিছু মূলনীতি ও চূড়ান্ত খসড়ার মধ্যে এই কথা লিখেছি যে, সকল সৎকর্মের মূল হলো ন্যায়বিচার এবং সকল কুকর্মের মূল হলো জুলুম। এটি একটি বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটাই সকল সৎকর্মের উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য—আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা ও খালেসভাবে দীনকে শুধুমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারণ করা। যা এই উদ্দেশ্য পূরণ করে না, তা পরিপূর্ণ সৎকর্ম নয় এবং পরকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য পুরস্কারের যোগ্য নয়—যদিও তাতে কিছু ভালো দিক থাকতে পারে এবং দুনিয়াতে কিছু পুরস্কার লাভ হতে পারে।

আর তিনি যা হারাম করেছেন, তা সরলতা ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি, অন্যায় এবং প্রতিটি বস্তুকে তার নির্ধারিত স্থানের বাইরে স্থাপন করা—অতএব তা হলো জুলুম।

এই কারণেই তিনি, মহিমান্বিত ও মহান আল্লাহ, এই দুই বিষয়কে একত্র করেছেন তাঁর বাণীতে: "বলুন, 'আমার প্রতিপালক ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছেন এবং প্রতিটি সেজদার স্থানে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করো এবং তাঁকে ডেকো, দীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে।'..." (সূরা আল-আ'রাফ: ২৯)।

এই আয়াত সূরা আল-আ'রাফে অবস্থিত, যা দীনী মূলনীতি, কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং যারা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত দীন থেকে নতুন বিধান তৈরি করে, যেমন শিরক এবং পবিত্র জিনিসকে হারাম করা, অথবা যারা আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করেছে—যেমন ইবলিস, এবং নূহ (আঃ)-এর কওম থেকে শুরু করে ফেরাউনের কওম পর্যন্ত রাসূলদের বিরোধীরা, এবং আহলে কিতাব থেকে যারা কিতাবকে বিকৃত করেছে—তাদের নিন্দা করে।

অতএব, এই সূরাটি সেই সকল ব্যক্তিকে নিন্দা করে যারা মিথ্যা দীন নিয়ে আসে—যেমন আরবদের কুফর—এবং যারা পুরোপুরি সঠিক দীনের বিরোধিতা করে—যেমন যারা সকল নবীর কুফর করে—অথবা যারা দীনের একটি অংশের বিরোধিতা করে—যেমন আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফর করে।

এবং তিনি, মহিমান্বিত ও মহান আল্লাহ, এই সূরায়, সূরা আল-আন'আমে এবং অন্যান্য সূরায় মুশরিকদের

পাপদ্বয়কে একত্র করেছেন।

তার একটি হলো—আল্লাহ যাকে আদেশ দেননি, তা আদেশ করা, যেমন শিরক;

আরেকটি হলো—আল্লাহ যাকে হারাম করেননি, তা হারাম করা, যেমন পবিত্র জিনিসকে হারাম করা।

প্রথমটি হলো—আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত দীন থেকে বিধান তৈরি করা।

আর দ্বিতীয়টি হলো—আল্লাহ যা হারাম করেননি, তা হারাম করা।

তেমনি সহীহ হাদীসে, 'ইয়ায ইবনে হিমারের হাদীসে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, আল্লাহর বাণী আছে: "নিশ্চয় আমি আমার বান্দাদের হুনাফা (সরাসরি দ্বীনের ওপর) সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তান তাদের নিকট এসে তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, এবং আমি যা হালাল করেছি তা তাদের জন্য হারাম করে দেয়, এবং তারা তাদেরকে আমার সঙ্গে শরিক করতে আদেশ দেয়, যার জন্য আমি কোন দলীল অবতীর্ণ করিনি।"

এই কারণেই, শিরক ও এর অনুরূপ মিথ্যা ইবাদতের নবউদ্ভাবনই হলো সেই বিষয় যা খ্রিস্টানদের উপর প্রধানত আপতিত হয়েছে এবং যারা তাদের অনুসরণ করে এমন ভ্রান্ত সুফিদের উপরও।

আর মিথ্যা হারাম করার নবউদ্ভাবনই হলো যা ইহুদিদের উপর প্রধানত আপতিত হয়েছে এবং তাদের অনুরূপ ভ্রান্ত ফকীহদের উপরও।

বরং ইহুদি ধর্মের ভিত্তিতেই অনেক কষ্টকর বিধি ও নিষেধ রয়েছে।

এই কারণেই আল-মসীহ (ঈসা আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন: "আর আমি তোমাদের জন্য কিছু জিনিস হালাল করতে এসেছি, যা তোমাদের উপর হারাম ছিল..." (আলে ইমরান: ৫০)।

আর খ্রিস্টান ধর্মের ভিত্তিতে রয়েছে অতিরিক্ত সম্মান ও ভক্তি, যা অস্পষ্ট শব্দ ও সাধারণ কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

অতএব, যাদের অন্তরে কুচিন্তা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করে, ফিতনা সৃষ্টি করে এবং তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা খোঁজে।

আমি অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি যে, আল্লাহর তাওহীদ—অর্থাৎ খালেসভাবে তাঁর জন্য দীনকে নির্ধারণ করা—এবং যে ন্যায়বিচার আমরা করি, তা-ই হলো দীন ইসলামের মূল।

সবকিছু এখানেই প্রত্যাবর্তন করে।

কারণ, একনিষ্ঠতার সঙ্গে দীনকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হলো ন্যায়বিচারের মূলে, যেমন আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা হলো একটি বড় জুলুম।

অনুচ্ছেদ

আর শাইখুল ইসলাম বলেছেন:

জেনে রাখো—আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন—আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থাপন করা হল সবচেয়ে বড় গুনাহ, যার দ্বারা আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করা ক্ষমা করেন না, আর তিনি যাকে ইচ্ছা তা ব্যতীত অন্য সব গুনাহ ক্ষমা করেন" (সূরা নিসা: ৪৮)। এবং দুই সহীহ হাদীসে (বুখারী ও মুসলিম) আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, “সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?” তিনি বললেন, “যে তুমি আল্লাহর জন্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপন করো, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” আর 'নিদ্দ' অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতএব, জেনে শুনে আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপন করো না" (সূরা বাকারা: ২২)। আবার বলেন: "আর সে আল্লাহর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপন করে যেন মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে। বলো, তোমার কুফরীতে কিছুদিন উপভোগ করো, নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা যুমার: ৮)।

অতএব, যে কেউ আল্লাহর সৃষ্টির কাউকে তাঁর উপযুক্ত ইলাহিত্ব ও রবুবিয়্যতের অধিকারসমূহে শরিক করে, সে নিঃসন্দেহে উম্মতের ইজমা অনুযায়ী কুফর করেছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর ইলাহিত্বের প্রাপ্য, কারণ তিনিই একমাত্র উপাস্য, হৃদয় যিনি বরাবর অভিমুখ করে, ভালোবাসে, কামনা করে, বিপদে তাঁর শরণ নেয়। আর তার বাইরে যা কিছু আছে তা হলো আল্লাহর দাসত্বের অধীন এবং প্রয়োজনমুখী। সুতরাং কিভাবে এগুলো ইলাহ হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ" (সূরা যুখরুফ: ১৫)। আর বলেন: "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের কাছে বান্দা হয়ে হাজির হবে না" (সূরা মারইয়াম: ৯৩)। আবার বলেন: "খ্রিষ্ট, আল্লাহর বান্দা হওয়া থেকে কখনো বিমুখ হবে না এবং তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতারাও নয়" (সূরা নিসা: ১৭২)। আরও বলেন: "আর আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য স্থাপন করো না। আমি তো তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী" (সূরা যারিয়াত: ৫১)। তিনি আরও বলেন: "বলুন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি আল্লাহরই এবাদত করি, তাঁরই জন্য দ্বীনকে বিশুদ্ধ রাখি" (সূরা যুমার: ১১)।

সুতরাং আল্লাহ—পবিত্র তিনি—তিনিই তাঁর নিজ গুণে ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি বলেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের রব" (সূরা ফাতিহা: ২)। এখানে 'আল হামদ' (প্রশংসা) এর পূর্বে আলিফ লাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা সমস্ত প্রশংসাকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং বুঝায় যে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য। এরপর তিনি বলেন: "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য চাই" (সূরা ফাতিহা: ৫)। এ বাক্যটি হল তাঁর পূর্বোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক্ক ইলাহ নেই এবং তাঁর ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

তাঁর বাণী: "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি" নির্দেশ করে যে, ইলাহিত্ব অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করতে হবে, যেমন: ভালোবাসা, ভয়, আশা, আদেশ ও নিষেধ। আর "এবং কেবল তোমারই সাহায্য চাই" নির্দেশ করে রবুবিয়্যত অনুযায়ী বান্দার দাসত্ব, যেমন: ভরসা করা, দায়িত্ব অর্পণ করা ও আত্মসমর্পণ করা; কেননা রব অর্থ পালনকারী ও সমস্ত বিষয়ের সুষ্ঠু পরিচালনাকারী। আর আল-মালিক অর্থ, যিনি তাঁর সম্পদের মালিক এবং তাঁর ইচ্ছামতো তা পরিচালনা করেন।

যখন বান্দা এই রবুবিয়্যতের রহস্য উপলব্ধি করে যে, সমস্ত মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা আল্লাহর হাতে—যেমন তিনি বলেন: "বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান" (সূরা মুলক: ১)—তখন সে বুঝতে পারে যে, উপকার ও অপকার, গতি ও স্থিরতা, দান ও রোধ, উন্নয়ন ও অবনমন—সবকিছুরই নিয়ন্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি দেন, তিনি ফিরিয়ে নেন, তিনি উত্তোলন করেন, তিনি অবনমন ঘটান। এই উপলব্ধিই হলো কাওনীয় আদেশের রহস্য এবং রবুবিয়্যতের গুণের জ্ঞান। আর "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি" বাক্যটি ইলাহিত্বের গুণের জ্ঞান, যা শরঈ আদেশের রহস্য উদ্ঘাটন করে। সুতরাং আদেশ, নিষেধ, ভালোবাসা, ভয় ও আশার মাধ্যমে বাস্তবায়ন ঘটে ইলাহিত্বের উপলব্ধি থেকে; আর ভরসা, দায়িত্ব অর্পণ ও আত্মসমর্পণের বাস্তবায়ন ঘটে রবুবিয়্যতের উপলব্ধি থেকে, যা সৃষ্টিজগতের সর্বব্যাপী পরিচালনার জ্ঞান, যেমন আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই যখন আমরা কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেই, তখন আমরা তাকে বলি 'হয়ে যাও', আর তা হয়ে যায়" (সূরা নাহল: ৪০)।

যখন কোন বান্দা এই অবস্থার সম্পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করে এবং এতে সফল হয়, অথচ এই অবস্থা তাকে প্রথম অবস্থান (ইলাহিত্ব) থেকে গাফিল করে না, তখন সে তার দাসত্বে প্রকৃত গভীর অনুধাবনকারী হয়ে ওঠে। কেননা, এই দুই অবস্থানেই দ্বীনের সমস্ত দিক আবর্তিত হয়। কারণ, দয়া, অনুগ্রহ, উদারতা ও

সৌন্দর্যের সকল অবস্থাই রবুবিয়্যতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই বলা হয়: এই আয়াতে কুরআনের সমস্ত রহস্য অন্তর্ভুক্ত: "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য চাই"। কারণ, এর প্রথমাংশ নির্দেশ করে আদেশ, নিষেধ, ভালোবাসা, ভয় ও আশার মাধ্যমে ইবাদত করা; আর পরের অংশ নির্দেশ করে আত্মসমর্পণ ও ইচ্ছা পরিত্যাগ করে দাসত্ব পালন করা। আর দাসত্বের সকল প্রকার এই দুইয়ের অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তি এই অবস্থান ও প্রথম অবস্থান (ইলাহিত্ব) থেকে অনুপস্থিত থাকে এবং শুধু দেখে যে আল্লাহই সমস্ত কিছুর উপর কায়েম, তিনি প্রত্যেক নফসের কাজ অনুযায়ী তার বিচার করেন, সমস্ত কিছু তাঁর হুকুম ও ইচ্ছার অধীনে চলছে—এবং সে এজন্য পার্থক্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, আদেশ-নিষেধ ও নবুওতকে ত্যাগ করে, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে তীরের মত ছিটকে পড়ে। আর যদি এই অবস্থান তাকে এমনভাবে গ্রাস করে যে তার বুদ্ধি তাকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতে পারে না, তাহলে সে ক্ষমাযোগ্য কিন্তু অপূর্ণ। তবে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে এই দুই অবস্থানকে একত্রিত করে: শরঈ আদেশের অবস্থান এবং কাওনীয় আদেশের অবস্থান।

আর এই অবস্থানে পথিকদের অনেকেই পিছলে পড়েছে, কারণ তারা যা কিছু চায়, তার ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করেছে, ফলে তারা তাদের ইচ্ছার দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকে ঢেকে দিয়েছে। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা ও প্রিয় পথেই রয়েছে প্রকৃত ধনশালীতা। যদি তারা আল্লাহর ইচ্ছার ভিত্তিতে তাঁকে ইবাদত করত, তাহলে এসব বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হতো না। কেননা, যখন বান্দা তার দাসত্বকে উপলব্ধি করে এবং তার প্রভুর আদেশের প্রতি সতর্ক থাকে, তখন সে তার ইবাদতে প্রভুর থেকে গাফেল হয় না, আবার প্রভুর দর্শনে ইবাদত থেকেও গাফেল হয় না। বরং তার দুইটি দৃষ্টি থাকে: একটি দ্বারা সে তার প্রভুর দিকে তাকায়, যেন সে তাঁকে দেখছে—যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহসানের ব্যাখ্যায় বলেছেন: "তুমি আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি না দেখতে পারো, তবে জেনে রেখো তিনি তো তোমাকে দেখছেন"—এবং অন্যটি দ্বারা সে তার প্রভুর আদেশের দিকে তাকায়, যেন তা বাস্তবায়ন করে প্রভুর প্রিয় শরঈ আদেশ অনুযায়ী।

সুতরাং, যখন এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন শিরক—যে শিরকের দ্বারা কোনো ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়—দুই প্রকার: উলুহিয়াতের শিরক এবং রুবুবিয়াতের শিরক।

উলুহিয়াতের শিরক হলো: আল্লাহর জন্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপন করা—অর্থাৎ, উপাসনায়, ভালোবাসায়, ভয়ে, আশায় অথবা তাঁর প্রতি ফিরে আসার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করা। এটাই সেই শিরক, যা আল্লাহ

তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করেন না। তিনি মহান বলেন: "কাফিরদের বলে দাও, যদি তারা বিরত হয়, তবে অতীত যা কিছু হয়েছে তা তাদের জন্য ক্ষমা করা হবে" (আল-আনফাল: ৩৮)। এটাই ছিল সেই শিরক যার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, কারণ তারা উলুহিয়াতে অংশীদার স্থাপন করত। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের আল্লাহর সমকক্ষ করে এবং তাদেরকে ভালোবাসে যেমন তারা আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অধিক শক্তিশালী" (আল-বাকারা: ১৬৫)। আবার বলেন: "আমরা তো কেবল এদেরকে আল্লাহর কাছে সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমেই পূজা করি" (আয-যুমার: ৩)। এবং বলেন: "সে কি সকল উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছে? নিশ্চয়ই এটি এক আশ্চর্যকর বিষয়" (সাদ: ৫)। এবং তিনি বলেন: "নিক্ষেপ করো জাহান্নামে প্রতিটি উদ্ধত কাফিরকে"—পর্যন্ত বলেন—"যে আল্লাহর সঙ্গে আরেকটি উপাস্য স্থাপন করেছিল; সুতরাং তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো" (কাফ: ২৪-২৬)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুসাইনকে বলেন: "তুমি কতজনকে উপাসনা করো?" তিনি বলেন: "ছয়জনকে পৃথিবীতে এবং একজনকে আসমানে।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন: "তবে তুমি কার প্রতি আশা ও ভয় রাখো?" তিনি বলেন: "আসমানের সেই একের প্রতি।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে না, যাতে আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিতে পারি?" অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "বলো: হে আল্লাহ! আমাকে আমার হিদায়াতের প্রতি অনুপ্রাণিত করো এবং আমার নফসের শার থেকে আমাকে রক্ষা করো।"

আর রুবুবিয়াতের ব্যাপারে, তারা তা স্বীকার করত। আল্লাহ বলেন: "তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো: কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ" (আল-আনকাবুত: ৬১)। এবং বলেন: "বলো: জমিন এবং তাতে যেসব কিছু আছে, তা কার? যদি তোমরা জানো?" তারা বলবে: "আল্লাহর"—পর্যন্ত বলেন—"তবে তোমরা কীভাবে ধোঁকায় পড়লে?" (আল-মু'মিনূন: ৮৪-৮৯)। এবং তাদের মধ্যে কেউই বিশ্বাস করত না যে মূর্তিরাই বৃষ্টি বর্ষণ করে, জীবিকা দেয় কিংবা সৃষ্টিজগত পরিচালনা করে। বরং তাদের শিরক ছিল, যেমন আমরা বলেছি, তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছিল যাদেরকে তারা আল্লাহর মতো ভালোবাসত। এই অর্থটি নির্দেশ করে যে, যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে, সে শিরক করল। যেমন আল্লাহ বলেন: "তারা এতে বিতর্ক করতে করতে বলবে, 'আল্লাহর কসম, আমরা তো স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে জাহান্নামের মালিকের সমকক্ষ বানিয়েছিলাম'" (আশ-শু'আরা: ৯৬-৯৮)। অনুরূপভাবে, যে কেউ কাউকে আল্লাহর মতো ভয় করে অথবা আল্লাহর মতোই তার ওপর আশা রাখে—এবং অনুরূপ বিষয়গুলো—সেগুলোও এর

অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: রুবুবিয়াতের শিরক। কারণ রব—তিনিই মালিক, পরিচালক, দাতা, রোখকারী, ক্ষতিকারক, উপকারকারী, অপমানকারী, মর্যাদা দানকারী, সম্মানকারী এবং হীনকারী। সুতরাং, যে কেউ এ গুণাবলির মধ্যে কোনো একটিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে দেখে, সে রুবুবিয়াতে শিরক করেছে।

তবে কেউ যদি নিজেকে এই শিরক থেকে মুক্ত করতে চায়, সে যেন প্রথম দাতার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যিনি তাকে অনুগ্রহ করেছেন। আর যেন সে সেই ব্যক্তির প্রতিও প্রতিদান দেয় যে তার উপকার করেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে, তার প্রতিদান দাও। যদি কিছু না পাও প্রতিদান দেওয়ার জন্য, তবে তার জন্য দোয়া করো যতক্ষণ না মনে হয় তুমি প্রতিদান দিয়েছ।" কেননা সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যেমন তিনি বলেন: "আর তোমাদের যা কিছু নেয়ামত রয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই" (আন-নাহল: ৫৩)। এবং বলেন: "আমি উভয় দলকেই—এই দলকে এবং ঐ দলকে—তোমার প্রতিপালকের দান থেকে দান করে থাকি" (আল-ইসরা: ২০)। সুতরাং, প্রকৃত দাতা হলেন আল্লাহ, যিনি রিজিক সৃষ্টি করেন, নির্ধারণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার বান্দাদের মধ্যে দান করেন। আর মানুষের দানকারী তো সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ দান করেছেন এবং যার অন্তরকে অন্যের প্রতি দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং, আল্লাহই প্রাথমিক এবং শেষ।

এই অর্থকে আরও শক্তিশালী করে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলা বাণী: "জেনে রেখো, যদি পুরো উম্মত তোমার উপকারে আসতে চায়, তারা উপকার করতে পারবে না, তবে শুধু সেইটুকু যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার ক্ষতি করতে চায়, তারা ক্ষতি করতে পারবে না, তবে শুধু সেইটুকু যা আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে লিখে রেখেছেন। কলমগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।" তিরমিযি বলেন: এটি একটি সহীহ হাদীস। এটি প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কেউ উপকার করতে পারে না, আর তিনিই ক্ষতি করতে পারেন। এবং অনুরূপভাবে সবকিছু যা রুবুবিয়াতের জন্য প্রয়োজনীয়।

সুতরাং, যে এই মহত্তম পথে চলে, সে সৃষ্টির গোলামি এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত থেকে মুক্তি পায়, এবং লোকদের নিন্দা ও দোষারোপ থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখে। তখন তাওহীদ তার অন্তরে বিশুদ্ধ হয়ে যায়, ঈমান শক্তিশালী হয়, বক্ষ প্রশস্ত হয় এবং হৃদয় আলোকিত হয়। "আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট" (আত্ব-তালাক: ৩)। এই কারণেই ফুদাইল ইবনে ‘ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যে মানুষকে

চেনে, সে শান্তি পায়।" তিনি বলেন—এবং আল্লাহই ভালো জানেন—মানুষ কাউকে উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।

আর গোপন শিরক হলো এমন, যা থেকে খুব কম মানুষই নিরাপদ থাকে, যেমন আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ভালোবাসা। তবে যদি তার ভালোবাসা আল্লাহর জন্য হয়, যেমন নবী, সৎলোক ও সৎকর্মের প্রতি ভালোবাসা, তবে তা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এ ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার ইঙ্গিত বহন করে। প্রকৃত ভালোবাসা হলো প্রিয়তাজন ও তার পছন্দসই বিষয়গুলোকে ভালোবাসা এবং তার অপছন্দকে ঘৃণা করা। যার ভালোবাসা বিশুদ্ধ, সে প্রিয়তাজনের বিরোধিতা করতে পারে না। কারণ বিরোধিতা কেবল অনুসরণের দুর্বলতার কারণে হয় এবং তা ভালোবাসার দুর্বলতার প্রমাণ। আল্লাহ তাআলার বাণী ভালোবাসার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে: "বল, (হে মুহাম্মাদ), 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন'" (আল-ইমরান: ৩১)।

সুতরাং আলোচনা এই (বৈধ) ভালোবাসা নিয়ে নয়, বরং আলোচনা সেই ভালোবাসা নিয়ে যা আত্মা দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি হয়ে থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার তাওহীদে দুর্বলতা এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় ত্রুটির প্রমাণ। যদি তার আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পরিপূর্ণ হতো, তবে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে (স্বতন্ত্রভাবে) ভালোবাসত না। আর প্রথম শ্রেণির ভালোবাসা—নবী ও সৎকর্মের প্রতি—এর সঙ্গে বিরোধী নয়, কারণ তা আল্লাহর ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি এমন একটি মানদণ্ড যা সম্ভবত তোমার মনে আসে নি: যত বেশি বান্দার প্রভুর প্রতি ভালোবাসা শক্তিশালী হয়, ততই অন্যান্য প্রিয় বস্তু তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায় এবং হ্রাস পায়; আর যতই ভালোবাসা দুর্বল হয়, ততই সে প্রিয় বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে।

এবং তেমনি হলো ভয়, আশা এবং এগুলোর অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। কেননা, যদি কোনো বান্দার তার প্রতিপালকের প্রতি ভয় পরিপূর্ণ হয়, তবে সে তাঁর ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "যারা আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয় এবং তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না" (আল-আহযাব: ৩৯)। আর যখন তার ভয় কমে যায়, তখন সে সৃষ্টিকে ভয় করতে থাকে। এবং তার ভয় যতটা বাড়ে বা কমে, ততটাই সৃষ্টি-ভয়ও বাড়ে বা কমে, যেমন আমরা ভালোবাসার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এবং তেমনি হলো আশা ও অন্যান্য অনুরূপ বিষয়।

সুতরাং এটি হলো গোপন শিরক, যা থেকে খুব কম মানুষই নিরাপদ থাকে, কেবল আল্লাহ তায়ালা যাকে নিরাপদ রাখেন তিনি ছাড়া। এবং বর্ণিত হয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে শিরক পিঁপড়ের পায়ের আওয়াজের চেয়েও অধিক গোপন। আর এসব বিপদ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো একমাত্র আল্লাহর জন্য ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে" (আল-কাহফ: ১১০)। আর ইখলাস তখনই অর্জিত হয় যখন অন্তরে বৈরাগ্য সৃষ্টি হয়, আর বৈরাগ্য তখনই আসে যখন তাকওয়া থাকে; আর তাকওয়া হলো আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের অনুসরণ করা।

অনুচ্ছেদ

আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহামহিম, তাঁর দিকে অন্তরসমূহের গমন ও আকর্ষণের একটি মূলনীতি দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক, যেন অন্তরসমূহ তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং এর ফলে তাদের বিপদাপদ হালকা হয়ে যায় বা আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। সুতরাং আমরা বলি: জেনে রেখো, অন্তরসমূহকে আল্লাহর দিকে চালিতকারী তিনটি বিষয় রয়েছে: ভালোবাসা, ভয় এবং আশা। এদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় হলো ভালোবাসা; এবং এটি একটি নিজস্ব উদ্দেশ্য, যার নিজস্ব গন্তব্য রয়েছে, কারণ এটি দুনিয়া ও আখিরাতে চাওয়া হয়; ভয়ের মত নয়, কারণ ভয় আখিরাতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "জেনে রাখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না" (ইউনুস: ৬২)। ভয় প্রদানের উদ্দেশ্য হলো বিরত রাখা ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করা।

তাহলে, ভালোবাসা হলো এমন এক শক্তি, যা বান্দাকে তার প্রিয়তম আল্লাহর দিকে যাত্রায় এগিয়ে নেয়। আর এই ভালোবাসা যত বেশি বা কম, তার যাত্রাও ততই মজবুত বা দুর্বল হয়। ভয় তাকে তার প্রিয়ের পথ থেকে বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করে, আর আশা তাকে পথপ্রদর্শন করে। এটি এক মহান মূলনীতি, যার প্রতি প্রত্যেক বান্দার মনোযোগ দেওয়া উচিত, কেননা ইবাদত এ ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। এবং প্রত্যেক মানুষের অবশ্যই আল্লাহরই বান্দা হতে হবে, অন্য কারও নয়। যদি বলা হয়: কিন্তু বান্দা কখনও এমন অবস্থায় থাকে, যখন তার মাঝে এমন কোনো ভালোবাসা থাকে না, যা তাকে তার প্রিয় আল্লাহর সন্ধানে উদ্দীপ্ত করতে পারে, তাহলে অন্তরসমূহ কীভাবে চালিত হয়?

আমরা বলি: দুটি বিষয়ে তা চালিত হয়—

একটি হলো: আল্লাহর অধিক পরিমাণে স্মরণ। কেননা অধিক স্মরণ অন্তরসমূহকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে তোলে। এজন্যই আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহামহিম, অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো" (আল-আহযাব: ৪১-৪২)।

দ্বিতীয়টি হলো: আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "অতএব তোমরা আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হও" (আল-আ'রাফ: ৬৯)। এবং তিনি বলেন: "আর তোমাদের নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে" (আন-নাহল: ৫৩)। এবং তিনি

বলেন: "তিনি তোমাদের প্রতি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে তাঁর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন" (লুকমান: ২০)। এবং তিনি বলেন: "আর যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাও, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না" (ইব্রাহীম: ৩৪ / আন-নাহল: ১৮)।

অতএব, যখন বান্দা স্মরণ করে যে, আল্লাহ তাকে আকাশ ও পৃথিবী এবং এতে থাকা বৃক্ষ, পশু ও অন্যান্য জিনিসের অধীনতা দান করেছেন, আর তার অন্তরে ঈমান ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নিয়ামত দান করেছেন, তখন তা অবশ্যই তার অন্তরে এক প্রেরণা সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, ভয় জাগ্রত হয় ভয় প্রদর্শনকারী আয়াতসমূহ, সতর্কবার্তা, উপস্থিতির দৃশ্য, হিসাব গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করলে। তেমনি, আশা জাগ্রত হয় আল্লাহর উদারতা, সহনশীলতা, ক্ষমা ও আশাব্যঞ্জক বিষয়াবলি নিয়ে চিন্তা করলে।

তাওহীদের আলোচনা সুদীর্ঘ। এখানে উদ্দেশ্য হলো কেবলমাত্র একটি সতর্কবাণী উপস্থাপন, যা সামান্য ইঙ্গিতেই যথেষ্ট। এবং আল্লাহ, যিনি পবিত্র ও মহান, তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

অনুচ্ছেদ

আর শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

আল্লাহ আমাদের নেতা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, যিনি আল্লাহর খলীল, তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি জুলুমকারী মুশরিকদের সাথে বিতর্কে বলেছিলেন: "তোমরা যাকে আল্লাহর সাথে শরিক করো, আমি কীভাবে তার ভয় করবো, অথচ তোমরাই ভয় করো না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরিক করেছ যার জন্য তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি? তাহলে এই দুই দলের মধ্যে কে নিরাপত্তার অধিক হকদার, যদি তোমরা জেনে থাকো?" "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানে জুলুম মিশ্রিত করেনি—তাদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে, এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।" (সূরা আন'আম: ৮০-৮২)

এবং সহীহ হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতে জুলুমকে শিরক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেন: "তোমরা কি আল্লাহর নেক বান্দার এই বাণী শুনোনি: 'নিশ্চয়ই শিরক হলো একটি মহাজুলুম'?" (সূরা লুকমান: ১৩)

সুতরাং ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই ধারণাকে যে, আমরা আল্লাহর সাথে তাদের যে সমস্ত সৃষ্টিকে শরিক করা হয়, তাদের ভয় করবো, অথচ তারা নিজেরাই ভয় করে না যে, তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরিক করেছে যার জন্য আল্লাহ কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি। এবং তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, যে দল শিরক করে না, তারাই নিরাপদ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত।

এটি একটি মহান আয়াত, যা একজন মুমিন, একনিষ্ঠ আল্লাহর বান্দার জন্য বহু অবস্থায় উপকারে আসে। নিশ্চয়ই এই উম্মতের মধ্যে শিরক প্রকাশিত ভাবে তো আছেই, তার চেয়েও মারাত্মক হলো এর লুকায়িত রূপ, যা পিঁপড়ার পদচারণার চেয়েও গোপন। এটি ইবাদত ও উপাসনায় শিরক, আনুগত্য ও অনুসরণে শিরক, বিশ্বাস ও গ্রহণে শিরক।

খ্রিষ্টানদের উগ্রবাদীরা, রাফেযীরা, পথভ্রষ্ট সুফিগণ, দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ মাঝে মাঝে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দোয়া করে শিরকে লিপ্ত হয়, কখনো এমন কোনো ইবাদতে লিপ্ত হয় যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের

উদ্দেশ্যে করা হয়, আবার কখনো উভয়টি করে। যারা এই ধরণের শিরকে লিপ্ত হয়, তারা প্রায়শই আনুগত্যের শিরকেও লিপ্ত হয়।

অনেক ফকীহ, বাদশাহদের সৈন্য, বিচারকদের অনুসারী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও আনুগত্যের শিরক পাওয়া যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আদী ইবনে হাতিমকে বলেছিলেন, যখন তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন: "তারা তাদের আলেম ও পাদ্রীদেরকে আল্লাহ ছাড়া পালনকর্তা বানিয়ে নিয়েছে, এবং মরিয়মপুত্র ঈসাকে (ও)." (সূরা আত-তাওবা: ৩১), ‘আদী বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল! তারা তো তাদের উপাসনা করেনি।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তারা তাদের উপাসনা করেনি, বরং তারা যখন হারামকে হালাল করত, তখন তারা তাদের কথা মেনে নিত, এবং যখন হালালকে হারাম করত, তখনও তারা মেনে নিত।"

অতএব, আপনি এমন বহু ভ্রান্ত অনুসারীকে পাবেন যারা তাদের নেতার নির্দেশ অনুযায়ী যেটা ফরজ, সেটা ফরজ মেনে নেয়, যেটা হারাম, সেটা হারাম মেনে নেয়, হালালকে হালাল এবং দ্বীনকে এমন মনে করে যেমনটি সে নির্ধারণ করেছে—তা হোক দ্বীন সংক্রান্ত, দুনিয়াবি, বা উভয়ই। এরপর সে এমন ব্যক্তিকে ভয় দেখায়, যে এই শিরক থেকে দূরে থাকে, অথচ সে নিজেই এমন কিছুকে আল্লাহর শরিক করেছে আনুগত্যে, যার জন্য আল্লাহ কোনো প্রমাণ দেননি।

এখানে ব্যতিক্রম তারা, যাদের আনুগত্য আল্লাহ ফরজ করেছেন—যেমন রাসুল, শাসক, আলেম, পিতা-মাতা, শায়েখ ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার শিরক হলো বিশ্বাস ও গ্রহণে শিরক, যেখানে অনেকে ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, এমনকি কিছু ফকীহ, সুফি, বাদশাহ ও বিচারকদের অনুসারীরা তাদের নেতার বর্ণিত বিশ্বাস, মতামত যাচাই বা বাতিল, কাউকে প্রশংসা বা নিন্দা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ ছাড়াই তার কথা মেনে নেয়। সে তার এই বিশ্বাসকে আল্লাহর সাথে শরিক করেছে, কিন্তু এ নিয়ে তার নিজের ওপর কোনো ভয় নেই। তবে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাসযোগ্য—যেমন রাসুলগণ, হক্ক আলেম, সত্যনিষ্ঠ শহীদগণ ইত্যাদি—তাদেরকে বিশ্বাস করা ব্যতিক্রম।

সুতরাং আনুগত্য ও বিশ্বাসের ক্ষেত্র দুই ভাগে বিভক্ত: একটি হল যেটা মানুষের জন্য শরিয়তসম্মত, আরেকটি হল যেটা শরিয়তসম্মত নয়। আর ইবাদত, সাহায্য চাওয়া, ও উপাসনার ক্ষেত্রে কোনো মানুষেরই

এতে কোনো অধিকার নেই।

যেমন কথায় আছে: "আমি যখনই কারও থালায় হাত দিলাম, তখনই তার দাসে পরিণত হলাম।" নিঃসন্দেহে, যে তোমাকে সাহায্য করে এবং রিযিক দেয়, তার কিছু কর্তৃত্ব তোমার উপর স্থাপিত হয়। তাই মুমিন চায় যেন তার উপর কোনো কর্তৃত্ব না থাকে—অলঙ্ঘনীয়ভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসুল, এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তাদের কর্তৃত্ব ছাড়া।

মানুষের সম্পদ গ্রহণ করলে তারা তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যদি কেউ এই কর্তৃত্ব ও পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবে তা প্রশংসনীয়। তবে কেউ যদি এ দ্বারা নিজেকে উঁচু করা, নেতৃত্ব অর্জন, বা রিয়া করে, তবে তা নিন্দনীয়। অনেক সময় সম্পদ গ্রহণ না করার পিছনে উদ্দেশ্য হতে পারে আত্মনির্ভরতা, মানুষের সম্পদ তাদের জন্য রেখে দেওয়া, যাতে তাদের ধনসম্পদ হ্রাস না পায় এবং দ্বীনের ক্ষতি না হয়। আবার, এটি তাদের অন্তরে স্থান পাওয়ার একটি উপায়ও হতে পারে।

তবে যদি গ্রহণ করার কারণে দাতা তার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং সে বাধ্য হয় আল্লাহর অবাধ্যতায় অংশ নিতে বা আনুগত্যে বাধাগ্রস্ত হয়, তবে তা ফিতনার জন্ম দেয়, যার মূল কারণ হলো তার এই পরাধীনতা।

আর উপহার গ্রহণে বিরত থাকার কিছু নিন্দনীয় উদ্দেশ্যও থাকতে পারে:

১. রিয়া করা, আত্মনির্ভরদের অনুকরণ করে।

২. অহংকার, মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

৩. কৃপণতা, যাতে কাউকে উপকার করতে না হয়।

৪. অলসতা, মানুষকে ভালো কিছু দেওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ।

সারসংক্ষেপ: কেউ উপহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে নিজের উপকারের জন্য বা মানুষের উপকারের জন্য; এটি হলে তা প্রশংসনীয়। আবার কেউ বিরত থাকতে পারে মানুষের ক্ষতি বা নিজের ক্ষতির উদ্দেশ্যে; এটি নিন্দনীয়।

এই কারণেই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, কারণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর বিপরীতে গ্রহণ করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে দেখা যায় যে, গ্রহণ না করাকে উত্তম মনে করা হয় এবং সমাজে এটাই অধিক মর্যাদাপূর্ণ, তবে যদি গ্রহণ সঠিক উদ্দেশ্যে হয়, আর তা মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়, তাহলে তা অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন

শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

কেউ যদি বলে: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিগাসাহ) করা বৈধ, এমন প্রত্যেক বিষয়ে যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে বৈধ, এই অর্থে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনার একটি মাধ্যম (ওসীলা) — যেমনিভাবে বাকি নবী ও সৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমেও সাহায্য প্রার্থনা করা হয় ঐসব বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেসব বিষয়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর রাসুলের মাধ্যমে বিপদ থেকে উদ্ধার চায়, সে আসলে তাঁর মাধ্যমেই সাহায্য প্রার্থনা করেছে; সে তা "ইস্তিগাসাহ", "ওসীলা" বা এই অর্থবোধক অন্য যেকোনো শব্দ ব্যবহার করেই বলুক না কেন। এবং যে ব্যক্তি বলে, "হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার রাসুলের মাধ্যমে তোমার নিকট ওসীলা করছি", বা "আমি তোমার নিকটে তোমার রাসুলের মাধ্যমে সাহায্য চাই যে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও", — এটা আরবদের ও সব জাতির ভাষায় সত্যিকারার্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে ইস্তিগাসাহ।

তিনি আরও বলেন: অতীত ও বর্তমান সকল যুগেই মানুষ কারো মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার অর্থ বুঝে এসেছে, এবং সৃষ্টি জগতে কারো প্রতি সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি প্রযোজ্য—এবং ওসীলার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়ে থাকে। আর "ইস্তিগাসাহ" শব্দটি সাধারণভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য যারা ওসীলার মাধ্যমে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে, এবং নবী ও সৎ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তা সঠিক।

তিনি আরও বলেন: আত্-তাবারানী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীদের একজন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "এই মুনাফিক থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে সাহায্য চাও!" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "নিশ্চয়ই আমার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া হয় না; বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই সাহায্য চাওয়া হয়।"

প্রশ্নকারী বলে: যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর সম্পর্কে সাহায্য চাওয়ার বিষয়

অস্বীকার করেন এবং এর অনুরূপ বিষয়েরও অস্বীকার করেন, যাতে করে তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত থাকে এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার ঘোষণা থাকে, তাহলে আমাদের পক্ষে তা অস্বীকার না করে বরং এমন সাধারণ বাক্য বলা কি ঠিক হবে—যেমন প্রশ্নকারী বলেছে—যে, নবী ও সৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমে এমন সকল বিষয়ে সাহায্য চাওয়া বৈধ, যা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত? এবং এ সময় "তিনি মাধ্যম ও সংযোগকারী"—এ কথাটি বলা জরুরি নয়। এবং সে দাবী করে যে, যে ব্যক্তি বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া যায় না, সে ব্যক্তি তাঁর অসম্মানকারী এবং এজন্য কাফির, তবে যদি অজ্ঞ হয় তবে তাকে ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি সে "ইস্তিগাসাহ" এর অর্থ জেনে নেয়, তারপরও তা বলায় স্থির থাকে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করাই তাঁর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা—এ কথাও সে বলে।

সুতরাং, মুসলিমদের কোনো আলেম কি এরূপ বলেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমে এমন প্রত্যেক বিষয়ে সাহায্য চাওয়া বৈধ, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত? এবং যেমন প্রশ্নকারী বলেছে, এরূপ সাধারণ বাক্য বলা কি বৈধ? আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমে বা অন্যদের মাধ্যমেও আল্লাহ্‌র নিকট ওসীলা গ্রহণ করা, এটি কি ঐ ব্যক্তির মাধ্যমেই সাহায্য প্রার্থনা হিসেবে গণ্য হবে, যেমন প্রশ্নকারী ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে দাবি করেছে? এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করাকে ইস্তিগাসাহ বলা হয় কি না—এটি যেমনই হোক না কেন, কোনো আলেম কি এরূপ বলেছেন যে, প্রত্যেক নবী ও সৎ ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট ওসীলা গ্রহণ করা বৈধ?

নিশ্চয়ই শাইখ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম তাঁর প্রসিদ্ধ ফাতওয়া সমূহে এ কথা ফাতওয়া দিয়েছেন যে, যদি এ বিষয়ে হাদীস সহীহ হয়, তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট ওসীলা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তাহলে, কোনো ব্যক্তি কি এর বিপরীত কিছু বলেছেন?

এবং যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে, তবে যে ব্যক্তি বলে: "বাকি নবী ও সৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করা যায় না", যেমন শাইখ ইজ্জুদ্দীন ফাতওয়া দিয়েছেন—তাহলে কি সে কাফির হয়ে যাবে, যেমন প্রশ্নকারী তাকে বলেছে? তাহলে কি শায়খের দেওয়া এ ফাতওয়াই কুফরি হবে? বরং, যদি কেউ বলে: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করা বা সাহায্য প্রার্থনা করা তাঁর জীবদ্দশা ও উপস্থিত অবস্থায় বৈধ, মৃত্যুর পর ও অনুপস্থিত অবস্থায় নয়"—তাহলে কি এটি কুফরি হবে? নাকি এটি তাঁর অসম্মান? আর কেউ যদি বলে: "যেসব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কারো কোনো

ক্ষমতা নেই, তাতে কেবল আল্লাহ্‌র নিকটেই সাহায্য চাওয়া হবে”—অর্থাৎ, শুধু আল্লাহ্‌র নিকটই তা চাওয়া হবে—তাহলে কি এটি কুফরি হবে? নাকি এটি সত্য কথা? এবং যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয় নিজের সম্পর্কে অস্বীকার করেছেন, কারণ তা কেবল রব্বুল 'আলামীন এর বৈশিষ্ট্য—তাহলে আমাদের পক্ষে কি তা অস্বীকার করা হারাম? না কি তা অস্বীকার করাই আমাদের জন্য ওয়াজিব অথবা বৈধ?

আপনি আমাদের একটি ফয়সালা দিন—আল্লাহ্‌ আপনাকে দয়া করুন—যাতে পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ উত্তর থাকে, আপনি সফলতা অর্জনকারী ও সাওয়াবপ্রাপ্ত হোন, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা চান।

উত্তর

তিনি উত্তর দিলেন:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

কোনো মুসলিম আলেম কখনো বলেননি যে—সকল বিষয়ে যেসব বিষয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া হয়ে থাকে, সেসব বিষয়ে কোনো সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া (ইস্তিগাসা) বৈধ—না কোনো নবীর, না ফেরেশতার, না কোনো নেককার ব্যক্তির এবং না অন্য কারো মাধ্যমেও। বরং ইসলাম ধর্মে এটি অবশ্যজ্ঞানীয় বিষয় যে, এ ধরনের সাধারণ বক্তব্য দেওয়া বৈধ নয়।

এবং কেউ বলেনি যে, নবীর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করাই তাঁর মাধ্যমে ইস্তিগাসা করা। বরং এমনকি সাধারণ মানুষও যারা তাদের দোআয় বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করে—যেমন কেউ বলে, “হে আল্লাহ! আমি অমুক শায়েখের হক্কে, বা তাঁর মর্যাদার মাধ্যমে, বা সংরক্ষিত তক্তা ও কলমের মাধ্যমে, বা কা'বার মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করছি”—তারা জানে যে, তারা এসব জিনিসের মাধ্যমে ইস্তিগাসা করছে না। কেননা, যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে ইস্তিগাসা করছে, সে তাঁর নিকট কিছু চাইছে ও অনুরোধ করছে; কিন্তু যে ব্যক্তি কারো মাধ্যমে তাওয়াসসুল করছে, তার নিকট কিছু চাওয়া হচ্ছে না, বরং তার মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট চাওয়া হচ্ছে। আর সবাই পার্থক্য করতে পারে—কাকে আহ্বান করা হচ্ছে আর কার মাধ্যমে আহ্বান করা হচ্ছে।

ইস্তিগাসা মানে হলো—গাওস (ত্রাণ) চাওয়া, অর্থাৎ কষ্ট মোচন কামনা; যেমন ইস্তিনসার অর্থ হলো সাহায্য

চাওয়া, এবং ইস্তি'আনা অর্থ হলো সহায়তা প্রার্থনা। আর কোনো সৃষ্ট জীবের কাছে এমন কিছু চাওয়া যায় যা তার সাধ্য ও ক্ষমতার মধ্যে আছে; যেমন আল্লাহ বলেন: "কিন্তু যদি তারা দীন বিষয়ে তোমার সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমার কর্তব্য" (সূরা আল-আনফাল: ৭২)। এবং যেমন তিনি বলেন: "তার দলের একজন তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য চাইল" (সূরা আল-কাসাস: ১৫)। এবং তিনি বলেন: "সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা কর" (সূরা আল-মায়িদা: ২)। কিন্তু যেসব বিষয়ে কেবলমাত্র আল্লাহরই ক্ষমতা আছে, সেগুলো শুধু আল্লাহর নিকটেই চাওয়া হবে। এ কারণেই মুসলিমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে ইস্তিগাসা করতেন না, বরং তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং তাওয়াসসুল করতেন; যেমন সহীহ বুখারীতে আছে—উমর ইবনেল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আল-আব্বাসের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! আমরা যখন অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হতাম, তখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করতাম, ফলে তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করছি, সুতরাং তুমি আমাদের বৃষ্টি দাও।" এবং তখন বৃষ্টি হয়েছিল।

সুনান আবু দাউদ-এ আছে: এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, "আমরা আল্লাহর মাধ্যমে আপনার জন্য শাফাআত চাই, এবং আপনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট শাফাআত চাই।" তিনি বললেন: "আল্লাহর ব্যাপার তো অনেক বড়! নিশ্চয়ই আল্লাহর মাধ্যমে তাঁর কোনো সৃষ্টির নিকট শাফাআত চাওয়া যায় না।" সুতরাং তিনি "আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট শাফাআত চাই" কথাটি গ্রহণ করলেন, কিন্তু "আমরা আল্লাহর মাধ্যমে আপনার জন্য শাফাআত চাই" কথাটি অস্বীকার করলেন।

মুসলিমরা একমত যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিনে শাফাআতকারী হবেন এবং মানুষ তাঁর নিকট শাফাআত চাইবে। তবে আহলুস সুন্নাহর মতে, তিনি গোনাহগারদের জন্য শাফাআত করবেন, আর ওয়াঈদিয়া (মু'তাযিলা ও খারিজীরা) মনে করে তিনি শুধু সওয়াব বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করবেন।

প্রশ্নকর্তার এই বক্তব্য—"যে ব্যক্তি নবীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাওয়াসসুল করে, বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার রাসুলের মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করছি,' সে প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাধ্যমে ইস্তিগাসা করল—আরবদের ভাষায় ও সব জাতির ভাষায় এটিই বোঝায়"—এটি একটি মিথ্যা কথা, যা তাদের নামে

অপবাদ। কেননা, এটি আদম সন্তানদের কোনো ভাষায়ই পরিচিত নয়; বরং সবাই জানে—যার নিকট ইস্তিগাসা করা হয়, তাকে চাওয়া হয় ও ডাকা হয়; আর যার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা হয়, তাকে কিছু চাওয়া হয় না। এবং এতে কেউই বিভ্রান্ত হয় না—হোক সেটা আল্লাহর মাধ্যমে তাওয়াসসুল বা সৃষ্টির মাধ্যমে।

আর কোনো সৃষ্ট জীবের নিকট, যা সে করতে সক্ষম, সে বিষয়ে সাহায্য চাওয়া বৈধ। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব, যাঁর দ্বারা এ বিষয়ে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। এবং যদি কেউ তাকে উদ্দেশ্য করে বলে: "আমি অমুকের হক্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি" বা "অমুকের মর্যাদার কারণে," তবে কেউ বলবে না যে, সে যার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করেছে, তার মাধ্যমেই সে ইস্তিগাসা করেছে; বরং সে যে ব্যক্তি বা সত্তার নিকট দোআ করেছে, শুধুমাত্র তারই নিকট ইস্তিগাসা করেছে।

এ কারণেই আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলেমরা বলেছেন: "আল-মুঘীস" (ত্রাণদাতা) নামটির অর্থ "আল-মুজীব" (সাড়া দানকারী), কিন্তু "ত্রাণদান" হলো কার্যত প্রয়োগ, আর "সাড়া দেয়া" হলো বাক্যগত প্রতিক্রিয়া।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাওয়াসসুল—তাকে ইস্তিগাসা বলা হোক বা না হোক—আমরা সালাফদের মধ্যে কাউকে পাই না যিনি তা করেছেন। এ বিষয়ে কোনো হাদীসও বর্ণিত হয়নি, এবং আমরা শুধু 'ইযযুদ্দীন' শায়েখের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞার ফাতওয়াই জানি।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তাওয়াসসুল সম্পর্কে সুনান গ্রন্থসমূহে একটি হাদীস রয়েছে—নাসাঈ, তিরমিযি এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন: এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছি, আপনি আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোআ করুন।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "অজু করো, দু'রাকাআত নামায পড়ো, তারপর বলো: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তোমার নিকট চাইছি এবং তোমার দিকে ফিরছি। হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার মাধ্যমে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে শাফাআত কামনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার নবীর শাফাআত আমার পক্ষে কবুল করো।'" তিনি বললেন: "তোমার যদি অন্য কোনো প্রয়োজন থাকে, তবে সেটার জন্যও একই রকম করো।" এরপর আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই হাদীসের কারণেই ইযযুদ্দীন শায়েখ শুধুমাত্র নবীর মাধ্যমে তাওয়াসসুলের অনুমোদন দিয়েছেন।

মানুষ এই বিষয়ে দুটি মত পোষণ করে:

প্রথমত, এই তাওয়াসসুল হলো সেই তাওয়াসসুল যা উমর ইবনেল খাত্তাব উল্লেখ করেছেন, যখন তিনি বলেছিলেন: "আমরা যখন খরার সম্মুখীন হতাম, তখন আমরা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করতাম, আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দান করতে; আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করছি, সুতরাং তুমি আমাদের বৃষ্টি দান করো।" কেননা উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় বৃষ্টির জন্য তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন, এরপর তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁরা তাঁর চাচা আব্বাসের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করেছেন। আর তাঁদের এই তাওয়াসসুল ছিল তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দু'আ করা—অর্থাৎ তিনি দু'আ করতেন এবং তাঁর সাথে তাঁরাও দু'আ করতেন; সুতরাং তিনি আল্লাহর নিকট তাঁদের মাধ্যম হতেন। আর এই (ব্যক্তিগত উপস্থিতি/দু'আর মাধ্যমে তাওয়াসসুল) সাহাবায়ে কেরাম তাঁর মৃত্যুর পর কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতেও করেননি। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের অবস্থায় তাঁদের জন্য একজন সুপারিশকারী ছিলেন, যিনি তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। এজন্যই তিনি অন্ধ লোকের হাদীসে বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে আমার জন্য তাঁর সুপারিশ কবুল করো।" ফলে এটা বর্নিত হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য সুপারিশ করেছিলেন, আর তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর (নবীর) সুপারিশ কবুল করা হয়।

দ্বিতীয় মত হলো: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকালের পর, উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে, তাঁর ব্যক্তিত্ব/মর্যাদার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা বৈধ।

আর কেউ বলেনি যে, যে ব্যক্তি প্রথম মত পোষণ করে সে কুফরি করেছে, কিংবা তাকে কুফরি সাব্যস্ত করার কোন ভিত্তি নেই। কারণ এটি একটি সূক্ষ্ম মাসআলা, যার দলিলগুলো স্পষ্ট নয়। আর কুফরি তখনই সাব্যস্ত হয় যখন কেউ দ্বীনের মৌলিকভাবে জানা বিষয় অস্বীকার করে, অথবা এমন কোনো হুকুম অস্বীকার করে যা সহীহ সূত্রে পরিবাহিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। আর দু'আর মধ্যে কী কী বিষয় শরীয়াহ্ সম্মত এবং কী কী নয়—এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে যে মতানৈক্য আছে, তা এমনিভাবে তাদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে যে, যবেহর সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ পাঠ করা শরীয়াহ্ সম্মত কি না—এটি এমন কোনো বিষয় নয়, যা মুসলিমদের কেউ অপমান হিসেবে গণ্য করে।

আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, যে কেউ তাঁর কথিত “ইসতিগাছা” অস্বীকার করে সে কুফরি করেছে, এবং যিনি শাইখ ইয্যুদ্দীন বা তাঁর মত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে কাফের ফাতওয়া দিয়েছে—তাঁর এই বক্তব্য এতটাই স্পষ্টভাবে ভুল যে এর উত্তর দেওয়াই প্রয়োজন হয় না। বরং যারা এমন বিষয়ে মানুষকে কাফের বলে, তারা এমন কঠোর শাস্তির যোগ্য, যা মিথ্যার অপবাদদাতারা পায়, বিশেষ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার ভাইকে বলে, ‘হে কাফের!’ তবে তা তাদের একজনের ওপর প্রত্যাবর্তিত হয়।”

আর যে ব্যক্তি বলেছে: “যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষমতাবান নয়, তা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাওয়া যাবে”—সে অবশ্যই সত্য কথাই বলেছে। বরং, যদি সে আবু ইয়াজীদ (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর মত করে বলত: “সৃষ্ট জীবের পক্ষ থেকে অন্য এক সৃষ্ট জীবের সাহায্য প্রার্থনা করা, ডুবন্তের পক্ষ থেকে অন্য এক ডুবন্তের সাহায্য চাওয়ার মতো,” কিংবা যেমন শাইখ আবু আবদুল্লাহ আল-কুরাশী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন: “সৃষ্ট জীবের পক্ষ থেকে অন্য সৃষ্ট জীবের সাহায্য চাওয়া বন্দীর পক্ষ থেকে অন্য বন্দীর সাহায্য চাওয়ার মতো”—তবুও সে উত্তম কাজই করত। কেননা, এ বক্তব্যের সাধারণ অর্থ হলো পরিপূর্ণ ইসতিগাছা (সকল বিষয়ে)। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাসকে বলেছিলেন: “যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।”

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছু অস্বীকার করেন, তখন তিনি সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য, যেমন তিনি প্রত্যেক বিষয়ে, হোক তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, যা কিছু বলেছেন, সবকিছুতেই তিনি সত্যবাদী। আর তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে—ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক—আমাদের ঈমান রাখা আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি তাঁর কোনো অস্বীকারকে ‘সম্মানের’ অজুহাতে অস্বীকার করে, সে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য রাখে, যারা মাসীহ (আলাইহিস্‌সালাম)-এর স্বীয় দাসত্ব সম্পর্কিত বক্তব্যকে অস্বীকার করে তাঁর প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির কারণে। সুতরাং আমাদের জন্য বৈধ হলো—তিনি যা অস্বীকার করেছেন, আমরা তা অস্বীকার করি; তবে তাঁর অস্বীকারিত বিষয়ের বিপরীতে কিছু বলার অধিকার কারো নেই।

আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন

শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ্)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়:

সম্মানিত আলেমগণ, দ্বীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ–আল্লাহ যেন তাঁদেরকে তাঁর আনুগত্যে সাফল্য দান করেন–তাঁদের নিকট জানতে চাওয়া হচ্ছে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে যে বলে: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট সাহায্য (ইস্তিগাসা) চাওয়া বৈধ নয়। এই বক্তব্য তার জন্য নিষিদ্ধ কি না? এটি কি কুফর নাকি নয়? আর যদি সে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীস দ্বারা নিজের মতের সমর্থন করে, তবে কি এই প্রমাণ তার জন্য উপকারী হবে? এবং যদি কিতাব ও সুন্নাহর প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে তার উপর কী করণীয়? আমাদেরকে এর ফিকহী রায় দিন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর

তিনি উত্তর দিলেন:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

বিশুদ্ধ সুন্নাহ দ্বারা এবং উম্মাহর ঐক্যমত্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন একজন সুপারিশকারী (শাফি‘) যাঁর সুপারিশ কবুলযোগ্য, এবং তিনি কিয়ামতের দিন সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করবেন। মানুষ তাঁর নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করবে, যেন তিনি তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট সুপারিশ করেন, এবং তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এরপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ একমত যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় গুনাহগারদের জন্যও সুপারিশ করবেন, এবং তাওহীদের অনুসারীদের কেউই চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু খারিজি ও মু‘তাযিলা ফিরকাসমূহ বড় গুনাহগারদের জন্য তাঁর সুপারিশ অস্বীকার করেছে, যদিও তারা মু’মিনদের জন্য তাঁর সুপারিশ অস্বীকার

করেনি। এরা বিভ্রান্ত বিদআতী দল, আর তাদের কুফর সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মতবিরোধ ও বিশদ আলোচনা রয়েছে।

আর যে ব্যক্তি এমন কোন বিষয়ে অস্বীকার করে যা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও উম্মাহর ঐক্যমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে কুফরী করে, হোক না সে এটিকে 'ইস্তিগাসা' নামে ডাকুক বা না ডাকুক।

আর যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সুপারিশকে স্বীকার করে, কিন্তু সাহাবারা তাঁর মাধ্যমে যেভাবে তাওয়াসসুল ও সুপারিশ কামনা করতেন তা অস্বীকার করে—যেমন সহীহ বুখারীতে আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'উমর ইবনেল খাত্তাব (রাযি.) যখন খরা পড়ত, তখন আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন: "হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করতাম, আর তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতে; আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করছি, অতএব তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও"—আর এরপর তারা বৃষ্টি লাভ করত।

আর আবু দাউদের সুন্নানে ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে: এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–কে বলল, "প্রাণশক্তি নিঃশেষিত, পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত, সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে! আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন, কারণ আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সুপারিশ চাই, আর আমরা আল্লাহর মাধ্যমে আপনার নিকট সুপারিশ চাই।" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন এমনভাবে যে, তা তাঁর সাহাবাদের মুখমণ্ডলে দৃশ্যমান হয়েছিল। তিনি বললেন, "ধ্বংস হোক তোমার! নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কাউকে সুপারিশকারী বানিয়ে কিছু চাওয়া যায় না। আল্লাহর বিষয় এত বড় যে!" এরপর তিনি হাদীসের বাকি অংশ বললেন। সুতরাং, তিনি "আমরা আল্লাহর মাধ্যমে আপনার নিকট সুপারিশ চাই" এই বক্তব্যকে অস্বীকার করলেন, কিন্তু "আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সুপারিশ চাই" এই কথাকে অস্বীকার করলেন না; বরং তিনি সেটিকে অনুমোদন দিলেন। অতএব, এখান থেকে এর বৈধতা বর্নিত হয়। সুতরাং, যে এটি অস্বীকার করে, সে বিভ্রান্ত, ভুলপথগামী এবং বিদআতী। তবে তাকে কুফরী সাব্যস্ত করা যাবে কি না, সে বিষয়ে ইখতিলাফ ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আর যে ব্যক্তি কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে বিশ্বাস রাখে—যেমন তাঁর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ, তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল ইত্যাদি—কিন্তু একথা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে আহ্বান করা বৈধ নয়, এবং এমনসব বিষয় যা কেবলমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তা কেবল তিনিই দান করেন—যেমন গুনাহ মাফ, অন্তরের হিদায়াত, বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদের উৎপাদন ইত্যাদি—তাহলে এই ব্যক্তি সঠিক কথা বলেছে। বরং, এটি এমন এক বিষয় যাতে মুসলিমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?" (আলে ইমরান ১৩৫), এবং বলেন, "তুমি যাকে পছন্দ কর, তাকে হিদায়াত দিতে পারো না; বরং আল্লাহ যাকে চান, তাকেই হিদায়াত দেন।" (আল-কাসাস ৫৬)। আর আল্লাহ বলেন, "হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন সৃষ্টিকর্তা আছে, যে আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের রিজিক দেয়?" (ফাতির ৩)। এবং তিনি বলেন, "এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও তোমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করার জন্যই করা হয়েছে। আর সাহায্য তো কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।" (আল-আনফাল ১০; আলে ইমরান ১২৬)। এবং তিনি বলেন, "যদি তোমরা রাসুলকে সাহায্য না করো, তাহলে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দেয়, আর সে দুইজনের একজন ছিল, যখন তারা গুহায় ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলল: 'চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'" (আত-তাওবা ৪০)।

অতএব, কিতাব ও সুন্নাহ যে বিষয়গুলোর অর্থ প্রমাণ করেছে, সেগুলোকে প্রমাণ করতে হবে, আর যেগুলোকে অস্বীকার করেছে, সেগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। আর যে শব্দ বা বাক্য দ্বারা কোন অর্থ বোঝানো হয়—হোক তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক—যদি তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বক্তব্যে আসে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি তা অন্য কারো বক্তব্যে হয় এবং তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়, তাহলে তার উপর ভিত্তি করে হুকুম হবে; আর না হলে, তার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বক্তব্যে এমন শব্দও থাকতে পারে যার অর্থ সঠিক, কিন্তু কেউ তা ভুলভাবে বুঝে এমন কিছু গ্রহণ করে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্য নয়। তখন তার এই ভুল বুঝা প্রত্যাখ্যাত হবে।

যেমন তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জাম আল-কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যুগে এক মুনাফিক ছিল, যে মুসলিমদের কষ্ট দিত। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, "চলো, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এই মুনাফিকের বিরুদ্ধে।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমার নিকট সাহায্য চাওয়া হয় না; বরং সাহায্য কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট চাওয়া হয়।"

এ প্রসঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় অর্থটিই বোঝাতে চেয়েছেন—অর্থাৎ এমন কিছু চাওয়া, যা কেবলমাত্র আল্লাহরই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। অন্যথায় সাহাবিগণ তাঁর নিকট দোআ চাইতেন এবং তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন, যেমন সহীহ বুখারীতে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে—তিনি বলেন: "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখোমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, যখন তিনি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন, এবং তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে আসতেন না, যতক্ষণ না নালাগুলো বয়ে যেত।" আমি সেই কবির কথা স্মরণ করতাম:

"সেই শুভ্রবর্ণের মুখাবয়ব যাঁর মাধ্যমে মেঘমালা বৃষ্টিদানে অনুপ্রাণিত হয়

একমাত্র আশ্রয় এতিমদের জন্য, বিধবাদের রক্ষক"

এটি আবু তালিবের কবিতা।

এই কারণেই আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ নিয়ে যারা কিতাব রচনা করেছেন, তারা বলেছেন: প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য জানা জরুরি যে, পরিপূর্ণ অর্থে সাহায্যকারী এবং উদ্ধারকারী কেবলমাত্র আল্লাহ। আর সমস্ত সাহায্য তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, যদিও তা অন্য কারো হাতের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। অতএব, প্রকৃত মালিকত্ব তাঁরই, তিনি পবিত্র ও মহান; অন্য কারো দিকে সাহায্যকে সম্বন্ধ করা কেবল রূপক অর্থে। তারা বলেন: আল্লাহ তা'আলার মহামহিম নামসমূহের মধ্যে রয়েছে আল-মুগীস (উদ্ধারকারী/চরম প্রয়োজনের সময় সাহায্যকারী) এবং আল-গিয়াস (সাহায্যকারী)। আবু হুরায়রাহ্‌র একটি হাদীসে আল-মুগীস নামটির উল্লেখ আছে। তারা বলেন: এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত্য রয়েছে। আবু 'আব্দুল্লাহ আল-হালীমী বলেন: 'আল-গিয়াস' হলো 'আল-মুগীস'-এরই সমার্থক। এবং সাধারণত বলা হয়: "গিয়াসুল মুসতাগীসীন" (সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য)। এর অর্থ হলো—যিনি তাঁর বান্দাদের সংকটে পৌঁছে যান, যখন তারা তাঁকে আহ্বান করে, এবং তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন ও তাদের উদ্ধার করেন।

এবং বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার যে বর্ণনা দুইটি সহীহ কিতাবে আছে, তাতে বলা হয়েছে: "হে আল্লাহ! আমাদের সাহায্য করুন ! হে আল্লাহ! আমাদের সাহায্য করুন !" বলা হয়: "আঘাসাহু" (তিনি তাকে সাহায্য করলেন)—এই শব্দটি "ইগাসাহ", "গিয়াস" ও "গাওস" রূপে ব্যবহৃত হয়। এই নাম 'আল-মুগীস' অর্থের দিক থেকে 'আল-মুজীব' (সাড়া প্রদানকারী) ও 'আল-মুস্তাজীব' (যিনি ডাকে সাড়া দেন)-এর সমার্থক। আল্লাহ

তা'আলা বলেন: "(স্মরণ করো) যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাহায্য চেয়েছিলে, আর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন" (সূরা আল-আনফাল: ৯)।

তবে 'ইগাসাহ' (সাহায্য) শব্দটি কাজের সাথে অধিক প্রাসঙ্গিক, আর 'ইস্তিজাবাহ' (সাড়া দেওয়া) শব্দটি কথার সাথে অধিক প্রাসঙ্গিক, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে একটির জায়গায় অন্যটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তারা বলেন: 'মুসতাগীস' (সাহায্যপ্রার্থী) ও 'দাঈ' (আহ্বানকারী)-এর মাঝে পার্থক্য হলো—মুসতাগীস সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করে, আর দাঈ আহ্বান জানায় সেই সত্তাকে যিনি ডাকা হচ্ছে এবং যিনি সাহায্য করতে পারেন। তবে এতে কিছু খেয়াল করার বিষয় আছে, কারণ ইস্তিগাসাহর শব্দসমূহের মাঝে এমনো আছে: "হে আল্লাহ! মুসলিমদের সাহায্য করো!"। এবং মারূফ আল-কারখীর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রায়ই বলতেন: "ওয়া গাওসাহ!" (হে আমার সাহায্য!), এবং তিনি বলতেন: "আমি আল্লাহর এই বাণী শুনেছি—'(স্মরণ করো) যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাহায্য চেয়েছিলে, আর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন'" (সূরা আল-আনফাল: ৯)। এবং বর্নিত দোআয় আছে: "হে চিরঞ্জীব, হে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আপনার দয়ায় আমি সাহায্য চাই, আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দিন, আমাকে এক চোখের পলকের জন্যেও আমার নিজের ওপর অথবা আপনার কোন সৃষ্টির ওপর ছেড়ে দিয়েন না।"

তাঁর দয়ার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া আসলে তাঁর নিকটই সাহায্য চাওয়া; যেমন তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়া মানে প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাওয়া। এবং যেমন তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে শপথ করা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সত্তার মাধ্যমেই শপথ করা। যেমন হাদীসে আছে: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাই, যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।" এবং অন্য হাদীসে আছে: "আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার রাগ থেকে আশ্রয় চাই, এবং আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে, এবং আমি আপনার মাধ্যমে আপনার নিকটই আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা গণনা করতে সক্ষম নই; আপনি তেমনই যেমন আপনি নিজেই আপনার প্রশংসা করেছেন।"

এই কারণেই ইমামগণ আল্লাহর বাণী অসৃষ্ট প্রমাণে যে দলিল পেশ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাই।" তারা বলেন: আশ্রয় চাওয়া সৃষ্টির নিকট বৈধ নয়। শপথও তেমনই। সহীহ হাদীসে বর্নিত হয়েছে যে, রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে, অথবা চুপ থাকে।" অন্য বর্ণনায় এসেছে: "যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে শিরক করেছে।" এটিকে তিরমিযি সহীহ বলেছেন। এরপর, সহীহ হাদীসে রয়েছে: "আল্লাহর মর্যাদার কসম", "আল্লাহর জীবনের কসম" ইত্যাদি, যা মুসলিমগণ একমত যে, এগুলো সেই নিষিদ্ধ 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ' নয় যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আর ইস্তিগাসাহ এমন অর্থে যে, কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও অবস্থান অনুযায়ী কিছু চায়—এ বিষয়ে কোন মুসলিমের মতভেদ নেই। যে এই অর্থে মতভেদ করে, সে যদি এমন কিছুকে অস্বীকার করে যার অস্বীকৃতি কুফরি হয়, তবে সে কাফের; আর যদি না হয়, তবে সে ভুল করছে ও পথভ্রষ্ট। আর যে অর্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিগাসাহর অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (যেমন ঐ মুনাফিকের ঘটনা), তা অবশ্যই অস্বীকারযোগ্য। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এমন কিছু স্বীকার করে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য বৈধ, সে-ও কাফের, যদি তার বিরুদ্ধে দলীল কায়েম করা হয়, যার অস্বীকৃতি কুফরি।

এই শ্রেণিভুক্ত কথা হলো আবু ইয়াযীদ আল-বিস্তামী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি: "সৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টির সাহায্য চাওয়া ঠিক যেন ডুবে যাওয়া একজন ডুবে যাওয়া অন্যজনের কাছ থেকে সাহায্য চায়।" এবং মিশরের অঞ্চলে প্রসিদ্ধ শাইখ আবু আবদুল্লাহ আল-কুরাশীর উক্তি: "সৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টির সাহায্য চাওয়া যেন বন্দি একজন বন্দি অন্যজনের কাছ থেকে সাহায্য চায়।" আর মূসা আলাইহিস সালামের দোআয় আছে: "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই, এবং আপনারই নিকট অভিযোগ পেশ করা হয়, আপনি-ই সাহায্য চাওয়ার উপযুক্ত, আপনারই কাছ থেকে সাহায্য কামনা করা হয়, আপনাকেই ভরসা করা হয়, এবং আপনার ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।"

যেহেতু এই অর্থটিই (অর্থাৎ পরিপূর্ণ সাহায্য) ইস্তিগাসাহ শব্দ থেকে সীমাহীনভাবে ব্যবহৃত হলে বোঝা যায়, এবং যেহেতু এটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত, তাই অন্য কারো জন্য একে নিরঙ্কুশভাবে অস্বীকার করা সঠিক। এই কারণে মুসলিমদের কোনো ইমামের পক্ষ থেকে কখনোই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে নিরঙ্কুশ ইস্তিগাসাহ অনুমোদিত হয়েছে বলে জানা যায় না, এবং কোনো ইমাম এমন কাউকে দোষারোপ করেননি যিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে নিরঙ্কুশ ইস্তিগাসাহ অস্বীকার করেছেন।

একইভাবে সাহায্য চাওয়া—এতে এমন কিছু বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একমাত্র আল্লাহরই উপযুক্ত, যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী: "আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই" (সূরা আল-ফাতিহা: ৫)। কেননা, ইবাদতের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাহায্য একমাত্র আল্লাহই প্রদান করেন, যদিও মানুষ তাদের সামর্থ্যের মধ্যে অন্য মানুষের সাহায্য চাইতে পারে। একই কথা বিজয় বা সাহায্য লাভ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমার সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য কর" (সূরা আল-আনফাল: ৭২)। পরিপূর্ণ বিজয় হল এমন কিছু সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে শত্রুকে পরাজিত করা যায়, আর এর উপর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই আছে।

যে কেউ কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা বর্নিত বিষয়ের বিরোধিতা করে, সে হয় কাফির, না হলে সীমালঙ্ঘনকারী ফাসিক, অথবা সাধারণ পাপাচারী, যদি না সে একজন মু'মিন মুজতাহিদ হয় এবং ইজতিহাদে ভুল করে থাকে, সেক্ষেত্রে তার ইজতিহাদের কারণে সে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে এবং তার ভুল ক্ষমার যোগ্য হবে। তদ্রূপ, যদি তার কাছে প্রমাণ স্থাপন করার মত জ্ঞান না পৌঁছে থাকে, তাহলেও শাস্তি নেই। কেননা, আল্লাহ বলেন: "আমি কোনো জাতিকে শাস্তি দিই না যতক্ষণ না তাদের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ করি" (সূরা আল-ইসরা: ১৫)। কিন্তু যদি কিতাব ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ তার কাছে পৌঁছায় এবং সে তার বিরোধিতা করে, তাহলে সেই বিরোধিতার প্রেক্ষিতে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে—হোক তা মৃত্যুদণ্ড অথবা তার চেয়ে কম কিছু।

আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

অনুচ্ছেদ

শাইখুল ইসলাম বলেন:

আল্লাহ তাদের সেই উপাস্যদের, যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া পূজা করত, 'শাফাআতকারী' বলেছেন, যেমনিভাবে তিনি অন্য স্থানে তাদেরকে 'অংশীদার'ও বলেছেন। যেমন তিনি সূরা ইউনুসে বলেছেন: "তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে পূজা করে, যা না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে, না উপকার করতে পারে, এবং তারা বলে, 'এরা হলো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফাআতকারী।' বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাও যা তিনি আসমান ও যমিনে জানেন না?' তিনি পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে!" (ইউনুস: ১৮)

আর তিনি বলেন: "তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শাফাআতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে? বলে দাও, 'যদিও তারা কোনো কিছুর মালিক নয়, এবং কিছুই বুঝে না?' বলে দাও, 'সমস্ত শাফাআত একমাত্র আল্লাহর জন্য।'" (আয-যুমার: ৪৩-৪৪)

তিনি আরও বলেন: "যেদিন কিয়ামত এসে যাবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে। এবং তাদের কোনো শাফাআতকারী থাকবে না তাদের শরিকদের মধ্য থেকে।" (আর-রূম: ১২-১৩)

আর আল্লাহ শিরক ও শাফাআতকে একত্র করে বলেছেন: "বল (হে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য মনে করো, তাদেরকে ডাকো।' তারা আসমান ও যমিনে এক কণার ওজন পরিমাণও মালিক নয়, এবং তাতে তাদের কোনো অংশও নেই, এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহর জন্য কোনো সাহায্যকারীও নয়। আর তাঁর নিকট শাফাআত কিছুই কাজে আসে না, তবে যাকে তিনি অনুমতি দেন—তাই শাফাআতের উপকার করে।" (সাবা: ২২-২৩)

এই আয়াতে চারটি ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের উপর নির্ভর

করতে পারত:

১. কিছু মালিকানার অধিকারী হওয়া, যত সামান্যই হোক।

২. কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদার হওয়া।

৩. আল্লাহর কোনো কাজে সহায়ক হওয়া, যার মাধ্যমে কেউ আল্লাহর সমকক্ষ হয়।

৪. শাফাআতের অধিকার থাকা।

এই আয়াতে প্রথম তিনটি ভিত্তিকেই বাতিল করা হয়েছে: নেই মালিকানা, নেই অংশীদারিত্ব, নেই সহায়তা। অতএব যখন এই তিনটি বাতিল হলো, তখন কেবল শাফাআত অবশিষ্ট থাকে, এবং আল্লাহ এটিকে তাঁর অনুমতির সাথে শর্তযুক্ত করেছেন।

তিনি বলেন: "আকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে, যাদের শাফাআত কিছুই কাজে আসে না, যতক্ষণ না আল্লাহ অনুমতি দেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন এবং যাকে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।" (আন-নجم: ২৬)

আর তিনি বলেন: "বল, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া ডেকে থাকো, তাদেরকে ডাকো। তারা তোমাদের থেকে কোনো বিপদ দূর করতে পারে না, এবং তা স্থানান্তরও করতে পারে না।'" (ইসরা: ৫৬-৫৭)

তিনি আরও বলেন, তাদের উপাস্য বানানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে: "আমরা তো কেবল তাদের পূজা করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়।" (আয-যুমার: ৩)

আর তিনি বলেন: "তবে তারা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য বানিয়েছিল, তারা কেন তাদের সাহায্যে এলো না? বরং তারা তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা, এবং তারা যা উদ্ভাবন করত, তা-ই।" (আল-আহক্বাফ: ২৮)

অনুচ্ছেদ

শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

কুরআনে যে শাফাআত অস্বীকার করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর ভয় করো সে দিনকে, যেদিন কোনো ব্যক্তি অন্য কারও কোনো উপকারে আসবে না, তার কাছ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, এবং কোনো প্রতিদানও গ্রহণ করা হবে না।" (বাকারা: ৪৮)

তিনি আরও বলেন: "তার কাছ থেকে কোনো প্রতিদান গ্রহণ করা হবে না, এবং কোনো শাফাআত তাকে উপকারে আসবে না।" (বাকারা: ১২৩)

তিনি বলেন: "যেদিন আসবে, যেদিন কোনো লেনদেন হবে না, কোনো বন্ধুত্ব থাকবে না, এবং কোনো শাফাআতও থাকবে না।" (বাকারা: ২৫৪)

আর তিনি বলেন: "আজ আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই, নেই কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু।" (আশ-শু'আরাঃ ১০০-১০১)

তিনি বলেন: "জালিমদের জন্য নেই কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং নেই কোনো এমন সুপারিশকারী যার কথা মানা হবে।" (গাফির: ১৮)

তিনি বলেন: "যেদিন তার বাস্তবতা সামনে আসবে, সেদিন যারা আগে তা ভুলে ছিল তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রাসুলগণ তো অবশ্যই সত্য নিয়ে এসেছিলেন, তবে এখন কি আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে যে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা কি আমরা ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারি যেন আমরা যা করতাম তা ছেড়ে অন্য কিছু করি?'" (আল-আ'রাফ: ৫৩) এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত।

এইসব আয়াত থেকে খারিজি ও মু'তাযিলা গোষ্ঠী প্রমাণ গ্রহণ করেছে যে গুনাহগারদের জন্য শাফাআত হবে না। তারা বলেছে, যার জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, তার জন্য কোনো শাফাআত গ্রহণযোগ্য নয়, এবং যে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে সে তা থেকে বের হতে পারবে না। তবে তারা পুরস্কারপ্রাপ্তদের জন্য শাফাআত অস্বীকার করেনি, বরং শুধু পুরস্কার বৃদ্ধির জন্য শাফাআতকে স্বীকার করেছে।

উম্মতের সালাফ, তাদের ইমামগণ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ সর্বসম্মতভাবে গুনাহগারদের জন্য শাফাআতকে স্বীকার করেছেন, এবং এই বিশ্বাস রাখেন যে যার অন্তরে সরিষার দানার সমান ঈমান থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বহু সহীহ হাদীসে শাফাআতের উল্লেখ আছে—এর মধ্যে অন্যতম হলো, হিসাবের জন্য দাঁড়ানো মানুষেরা যখন বিচার শুরু করার জন্য সুপারিশ চাইবে, তখন তাদের মধ্যে মু'মিন ও কাফির উভয়ই থাকবে। এটা কাফিরদের জন্য এক প্রকার শাফাআতের শামিল।

তাছাড়া সহীহ হাদীসে আল-'আব্বাস ইবনে 'আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আবু তালিবকে কোনো উপকার করতে পেরেছেন? তিনি তো আপনাকে রক্ষা করতেন এবং আপনার পক্ষ নিয়ে রাগান্বিত হতেন।" তিনি বলেন: "হ্যাঁ, তিনি জাহান্নামের অগভীর স্থানে রয়েছেন, যদি আমি না থাকতাম, তবে তিনি অবশ্যই জাহান্নামের গভীর তলানিতে থাকতেন।"

আর 'আবদুল্লাহ ইবনে আল-হারিস বলেন: আমি আল-'আব্বাসকে বলতে শুনেছি: আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আবু তালিব তো আপনাকে রক্ষা করতেন এবং সহায়তা করতেন, এটা কি তাকে কোনো উপকার করেছে?" তিনি বলেন: "হ্যাঁ, আমি তাকে জাহান্নামের প্রবল গভীরতা থেকে বের করে এনে অগভীর স্থানে নিয়ে এসেছি।"

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের প্রসঙ্গে বলেন: "সম্ভবত আমার শাফাআত কিয়ামতের দিনে তাকে উপকার দিবে, ফলে তাকে জাহান্নামের এমন অগভীর স্থানে রাখা হবে, যা তার টাখনু পর্যন্ত পৌঁছাবে, আর সেখান থেকে তার মস্তিষ্ক ফুটে উঠবে।"

এটি একটি স্পষ্ট ও সহীহ প্রমাণ যে, কাফিরদের মধ্যে কারো জন্য শাস্তি লঘু করার উদ্দেশ্যে শাফাআত

হয়েছে; বরং তাকে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত বানানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত হলো আবু তালিব, যার পায়ে আগুনের জুতা থাকবে, আর তা থেকে তার মস্তিষ্ক ফুটে উঠবে।"

আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "নিশ্চয়ই জাহান্নামে যার শাস্তি সবচেয়ে হালকা হবে, তার পায়ে আগুনের দুই জোড়া জুতা থাকবে, সেখান থেকে তার মস্তিষ্ক ফুটে উঠবে।"

নু'মান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "জাহান্নামে যার শাস্তি সবচেয়ে হালকা হবে, তার পায়ের নিচে দুটি আগুনের অঙ্গার রাখা হবে, সেখান থেকে তার মস্তিষ্ক ফুটে উঠবে।"

তিনি আরও বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "নিশ্চয়ই জাহান্নামে যার শাস্তি সবচেয়ে হালকা, সে এমন ব্যক্তি যার পায়ে আগুনের দুই জোড়া জুতা ও দুইটি ফিতা থাকবে, যেখান থেকে তার মস্তিষ্ক ফুটে উঠবে যেমন কড়াই ফুটে ওঠে। সে ভাববে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কারো নেই, অথচ প্রকৃতপক্ষে, তিনিই তাদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত।"

এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গ (আবু তালিবের প্রসঙ্গ) প্রমাণ করে, যারা বলে যে কুরআনে অস্বীকৃত শাফাআত শুধু কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য—এ বক্তব্য দুর্বল। তারা বলে, কুরআনে 'যালিম' বলতে কাফিরদের বোঝানো হয়েছে...

তাদের বলা উচিত: যে শাফাআত অস্বীকার করা হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত শাফাআত—যেখানে একজন সুপারিশকারী নিজ থেকেই কারো জন্য সুপারিশ করে, আর অপরজন তা গ্রহণ করে। কিন্তু যদি আল্লাহ কাউকে অনুমতি দেন, আর সে অনুমতির ভিত্তিতে শাফাআত করে, তবে সে নিজে থেকে কিছু করে না; বরং সে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। তার শাফাআত গ্রহণযোগ্য হয়, আর সম্পূর্ণ বিষয়টাই সেই সত্তার হাতে যিনি নির্দেশ দেন ও যাঁকে আহ্বান করা হয়।

কুরআনের বহু আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্নিত হয়েছে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে শাফাআত করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন: “কে আছে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে শাফাআত করতে পারে?” (বাকারা: ২৫৫)

আর বলেন: “তাঁর নিকটে শাফাআত কোনো উপকারে আসবে না, কিন্তু যাকে তিনি অনুমতি দিবেন তার জন্যই হবে।” (সাবা': ২৩)

আর বলেন: “তারা কেবল তাদের জন্যই শাফাআত করতে পারে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।” (আম্বিয়া: ২৮)

আরও অনেক আয়াত আছে এই বিষয়ে।

এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য তিনি বলেন: “এবং তুমি এই কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করো, যারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, যাঁর ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী নেই, যেন তারা তাঁকে ভয় করে।” (আন'আম: ৫১)

আল্লাহ আরও বলেন: “আল্লাহই আসমানসমূহ ও জমিন এবং তাদের মধ্যকার সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তাঁর ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী নেই।” (সাজদা: ৪)

সুতরাং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী নেই।

যেখানে সুপারিশকে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে অস্বীকার করা হয়েছে, সেখানে স্পষ্ট যে যখন সুপারিশ আল্লাহর অনুমতিক্রমে হয়, তখন তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে হয় না। যেমনভাবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে যে বন্ধুত্ব বা রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তাও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হয় না। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের অভিভাবক তো কেবল আল্লাহ, এবং তাঁর রাসুল, এবং যারা ঈমান এনেছে—যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু অবস্থায় থাকে। আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং ঈমানদারদেরকে অভিভাবক বানায়, তবে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।" (সূরা আল-মায়েদা: ৫৫-৫৬)

আরও বলেছেন: "তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে? বল, 'তারা যদিও কোনো কিছুর মালিক নয় এবং তারা বুদ্ধি-বিবেচনাও রাখে না?' বল, 'সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই।'" (সূরা আয-যুমার: ৪৩-৪৪) তিনি তাদের নিন্দা করেছেন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশকারী বানিয়েছে এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে সুপারিশ পুরোপুরি আল্লাহর অধিকার। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পক্ষ থেকে সুপারিশ অস্বীকৃত, কারণ কেউই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে না; অতএব, সুপারিশ একমাত্র আল্লাহরই। তিনি আরও বলেছেন: "তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে পূজা করে যা তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, আর তারা বলে, 'এগুলোই তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাও যা তিনি আসমান ও জমিনে জানেন না?' তিনি পবিত্র ও মহিমান্বিত, যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে তাদের ঊর্ধ্বে!" (সূরা ইউনুস: ১৮)

এর আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি বন্ধুত্বকেও সেদিন অস্বীকার করেছেন, যেমন তিনি বলেন: "একদিন আসার আগেই—যেদিন লেনদেন থাকবে না, বন্ধুত্ব থাকবে না এবং সুপারিশ থাকবে না। আর কাফিররাই হল জালিম।" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৪) এটা জানা যায় যে, তিনি কেবল দুনিয়ার প্রচলিত বন্ধুত্ব এবং তার প্রচলিত উপকারই অস্বীকার করেছেন—যেমন বন্ধুরা দুনিয়ায় একে অপরের উপকারে আসে। যেমন তিনি বলেন: "আর কী তোমাকে জানাবে কিয়ামতের দিন কী? আবার কী তোমাকে জানাবে কিয়ামতের দিন কী? সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, এবং সেদিন সমস্ত আদেশ আল্লাহরই।" (সূরা আল-ইনফিতার: ১৭-১৯) এবং তিনি বলেন: "যাতে তুমি সাক্ষাৎ দিবস সম্পর্কে সতর্ক করতে পারো। যেদিন তারা বের হবে, তাদের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না। আজ কার? সার্বভৌমত্ব আজ কেবলমাত্র আল্লাহর, একক, পরাক্রমশালী!" (সূরা গাফির: ১৫-১৬)

তিনি অস্বীকার করেননি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকারী বন্ধুত্ব থাকতে পারে। বরং তিনি বলেছেন: "সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, তবে মুত্তাকিরা ব্যতিক্রম। [তাদেরকে বলা হবে:] 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।'" (সূরা যুখরুফ: ৬৭-৬৮) আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন: “যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা নিশ্চিত।” আবার আল্লাহ তাআলা বলেন: “কোথায় তারা, যারা আমার গৌরবের জন্য একে অপরকে ভালোবাসত? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না।”

অতএব, বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সকল কিছুই তাওহীদের সঠিক বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। আর কেউ উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করা জায়েয নয়, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেকে সাহায্য চাওয়াও বৈধ নয়। কিয়ামতের দিনে এটা সমগ্র সৃষ্টির নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই। আর সকল মিথ্যা দাবিদার তাদের দাবি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন এমন কেউ থাকবে না যে নিজেকে আল্লাহর শরিক বলে দাবি করবে, কিংবা অন্য কারো জন্যও এমন দাবি করবে। এটি দুনিয়ার মত নয়, কেননা যদিও আল্লাহ ছাড়া কোনো রব বা উপাস্য নেই, তথাপি দুনিয়ায় অন্যদেরকে রব ও উপাস্য বানানো হয়েছে, এবং এমন দাবি করা হয়েছে।

আর দুনিয়ায় এমন হয় যে, একজন সুপারিশকারী অন্যের পক্ষে সুপারিশ করতে পারে এবং সেই সুপারিশ থেকে উপকারও পেতে পারে, যদিও তাকে সুপারিশের অনুমতি না দেওয়া হয়ে থাকে। এবং কেউ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে তাকে সাহায্য করতে পারে, কিংবা কোনো ক্ষতি থেকে মুক্তি পেতে পারে। সুতরাং দুনিয়ায় মানুষ ও সম্পদ থেকে উপকার পাওয়া যায়—কখনো স্বতন্ত্রভাবে এবং কখনো সহযোগিতার মাধ্যমে, যেটা সুপারিশ। আর সম্পদের দ্বারা মুক্তিপণ দিয়ে উপকার পাওয়া যায়।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই তিন প্রকারের উপকারকেই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন: "কোনো প্রাণ অন্য প্রাণের জন্য মোটেই উপকারী হবে না, তার কাছ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং তার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিদানও গ্রহণ করা হবে না।" (সূরা আল-বাকারা: ৪৮) আবার বলেন: "সেদিন লেনদেন নেই, বন্ধুত্ব নেই, এবং সুপারিশ নেই।" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৪) যেমন তিনি বলেন: "সেদিন কোনো পিতা তার পুত্রের উপকারে আসবে না, এবং কোনো পুত্রও তার পিতার উপকারে আসবে না।" (সূরা লুকমান: ৩৩)

এটাই হলো বিষয়টি, আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আর আল্লাহ যেসব সুপারিশকে অস্বীকার করেছেন, তা ফিরে আসে ঈমানের দুই ভিত্তির যথার্থ বাস্তবায়নে—সেগুলো হলো: আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান—তাওহীদ এবং প্রত্যাবর্তন। যেমন তিনি বহু স্থানে এ দু'টি একত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন বলেন: "আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছি।'" (সূরা আল-বাকারা: ৮) এবং বলেন: "যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর, এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।'" (সূরা আল-বাকারা: ১৫৬) এবং বলেন: "তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তো

একটি প্রাণীর মতই।" (সূরা লুকমান: ২৮) এবং বলেন: "তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদের জীবন দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, তারপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন, এরপর তোমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আল-বাকারা: ২৮) এবং এ জাতীয় আরও বহু আয়াত।

অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন

শায়খুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ)–কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

দুই ব্যক্তির বিষয়ে, যারা বিতর্ক করছিল, এবং তাদের একজন বলল: আমাদের ও আল্লাহর মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী থাকা আবশ্যক, কারণ আমরা তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারি না সেই মধ্যস্থতা ব্যতীত।

উত্তর

তিনি উত্তরে বললেন:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

যদি সে এই উদ্দেশ্যে বলে থাকে যে, আমাদের ও আল্লাহর মধ্যে এমন একজন মধ্যস্থতাকারী থাকা চাই, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আদেশ পৌঁছে দিবেন—তাহলে এটি সঠিক কথা। কেননা, সৃষ্টিজগৎ জানে না আল্লাহ কী পছন্দ করেন ও সন্তুষ্ট হন, কী আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছেন, তাঁর ওলীদের জন্য তিনি কী সম্মান প্রস্তুত রেখেছেন, এবং তাঁর শত্রুদের জন্য কী শাস্তি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; তেমনি জানে না আল্লাহ তা'আলা কোন সুন্দর নাম ও মর্যাদাশীল গুণাবলির অধিকারী, যেগুলোর জ্ঞান মানবমস্তিষ্কের আওতার বাইরে—এসব বিষয়ে কেবলমাত্র তাঁদের মাধ্যমে জানা যায়, যাঁদের আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি রাসুল করে প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং, যারা রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনে ও তাঁদের অনুসরণ করে, তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের নিজের নিকটবর্তী করেন, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সম্মানিত করেন। পক্ষান্তরে, যারা রাসুলদের বিরোধিতা করে, তারা অবশ্যই অভিশপ্ত এবং তাদের প্রতিপালকের দিক থেকে পথভ্রষ্ট ও পর্দার আড়ালে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে আদম সন্তানেরা! যদি তোমাদের মধ্য থেকে আমার

আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করার জন্য তোমাদের কাছে রাসুল আসে, তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে ও নিজেদের সংশোধন করে—তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা আমার আয়াত অস্বীকার করে এবং তাদের প্রতি অহংকার করে—তারা জাহান্নামের সঙ্গী, তাতে চিরকাল থাকবে।" (আল-আ'রাফ: ৩৫-৩৬)

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতঃপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো পথনির্দেশ আসে, তবে যে কেউ আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে সে না পথভ্রষ্ট হবে, না কষ্টে পড়বে। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে অবশ্যই সংকুচিত জীবন যাপন করবে, এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালেন, অথচ আমি তো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম?' তিনি বলবেন, 'আমার নিদর্শনসমূহ তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, তাই আজ তুমিও ভুলে যাওয়া হলে।'" (ত্বা-হা: ১২৩-১২৬)

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহ তাআলা কুরআন পাঠ ও তার আমলের উপর ঈমান রাখা ব্যক্তির জন্য এ কথা নিশ্চিত করে দিয়েছেন যে, সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে দুঃখভোগ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন: "প্রতিবার যখন তাদের কোন দল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলেন, কিন্তু আমরা অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো কেবলমাত্র ঘোর বিভ্রান্তিতে আছ।'" (আল-মুলক: ৮-৯)

আর আল্লাহ বলেন: "আর যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে দলবদ্ধভাবে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। যখন তারা তাতে পৌঁছাবে এবং তার দরজাগুলো খোলা হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রাসুল আসেনি, যিনি তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করতেন এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করতেন?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, এসেছিলেন, কিন্তু কাফেরদের উপর শাস্তির কথা পূর্বে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।'" (আয-যুমার: ৭১)

আর আল্লাহ বলেন: "আর আমরা রাসুলগণকে কেবলমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করে

থাকি। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও নিজেদের সংশোধন করে—তাদের জন্য কোনো ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা আমার আয়াত অস্বীকার করে—তাদেরকে শাস্তি স্পর্শ করবে, তাদের অবাধ্যতার কারণে।" (আল-আন'আম: ৪৮-৪৯)

আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি ওহি প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি প্রেরণ করেছি। এবং ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের, 'ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি, এবং দাঊদকে আমরা যবূর প্রদান করেছিলাম। আর আমি এমন অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের ঘটনা আমি তোমার কাছে পূর্বে বর্ণনা করেছি, এবং এমনও রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। আমরা রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে মানুষের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত না থাকে রাসুলদের পরে।" (আন-নিসা: ১৬৩-১৬৫)

এ জাতীয় বহু আয়াত কুরআনে রয়েছে। এটি এমন বিষয় যা সকল ধর্মানুসারী—মুসলিম, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে একমত। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাসুলদের স্বীকার করে, যারা আল্লাহর আদেশ ও বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রাসুল নির্বাচন করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও।" (আল-হজ্জ: ৭৫)

যে ব্যক্তি এসব মধ্যস্থতাকারী রাসুলদের অস্বীকার করে, সে সকল ধর্মানুসারীদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। যে সূরাসমূহ আল্লাহ মক্কায় অবতীর্ণ করেছেন—যেমন: আল-আন'আম, আল-আ'রাফ, যেগুলো আলিফ-লাম-রা, হা-মিম, তা-সিন দিয়ে শুরু হয়েছে—এগুলো দ্বীনের মূল বিষয়সমূহ নিয়ে নাজিল হয়েছে, যেমন: আল্লাহ, তাঁর রাসুলগণ ও আখিরাতে ঈমান। আল্লাহ তাতে কাফেরদের ঘটনা বলেছেন, যারা রাসুলদের অস্বীকার করেছিল, কিভাবে তিনি তাদের ধ্বংস করেছেন, আর রাসুলগণ ও মুমিনদের কীভাবে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ বলেন: "আর আমার কথা তো আগেই চলে গেছে আমার রাসুলগণের ব্যাপারে যে, তারাই বিজয়ী হবে। আর আমার সৈন্যরাই অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।" (আস-সাফফাত: ১৭১-১৭৩)

আর বলেন: "নিশ্চয়ই আমরা সাহায্য করবো আমাদের রাসুলদের এবং যারা ঈমান এনেছে—দুনিয়ার জীবনে

এবং যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে, সেদিনও।" (গাফির: ৫১)

সুতরাং, এই মধ্যস্থতাকারীগণ (রাসুলগণ) হলেন, যাঁদের আনুগত্য করা, অনুসরণ করা এবং তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করা ফরজ। যেমন আল্লাহ বলেন: "আমি কোনো রাসুলকেই প্রেরণ করিনি, কিন্তু যাতে তার আনুগত্য করা হয় আল্লাহর অনুমতিক্রমে।" (আন-নিসা: ৬৪)

আর আল্লাহ বলেন: "যে রাসুলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" (আন-নিসা: ৮০)।

আর বলেন: "বলো (হে মুহাম্মাদ!), যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" (আলে ইমরান: ৩১)।

আরো বলেন: "তারা যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, সাহায্য করে এবং তাঁর সাথে অবতীর্ণ নূরকে অনুসরণ করে—তারাই সফলকাম।" (আল-আ'রাফ: ১৫৭)।

আল্লাহ বলেন: "তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ—তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও আখিরাতে আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (আল-আহজাব: ২১)।

আর যদি সে মধ্যস্থতাকারী বলতে এমন কাউকে বোঝায়, যার মাধ্যমে উপকার অর্জন এবং ক্ষতি দূর করা যায়—যেমন বান্দাদের রিযিক, বিজয় ও হিদায়াতের জন্য মধ্যস্থতা করা, যাকে তারা এ উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং যার প্রতি আশায় মুখ তুলে চায়—তাহলে এটি হচ্ছে শিরকের অন্যতম বড় ধরন, যার মাধ্যমে আল্লাহ মুশরিকদের কাফির সাব্যস্ত করেছেন; কেননা তারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিল, যার মাধ্যমে তারা উপকার টানতে এবং ক্ষতি দূর করতে চাইত। অথচ সুপারিশ (শাফা'আত) কেবল তার পক্ষেই বৈধ, যাকে আল্লাহ অনুমতি দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহই যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তোমাদের জন্য তার ব্যতীত কোনো সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী নেই। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সূরা আস-সাজদা: ৪)

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর তুমি কুরআনের মাধ্যমে তাদের সতর্ক করো, যারা আশঙ্কা করে যে তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে—তাদের জন্য তার ব্যতীত কোনো সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী

থাকবে না।" (সূরা আল-আন'আম: ৫১)

আর তিনি বলেন: "বলুন, 'তোমরা যাদের আল্লাহ ছাড়া আহ্বান করো, তাদের ডাকো; তারা তোমাদের থেকে কষ্ট দূর করার কিংবা তা স্থানান্তর করার কোনো ক্ষমতা রাখে না।' তারা যাদের আহ্বান করে, তারাও তাদের প্রতিপালকের দিকে সন্নিকট হওয়ার উপায় খোঁজে—তাদের মধ্যে কে অধিক সন্নিকট হতে পারে—এবং তারা তার রহমতের আশা করে ও তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়ানক।" (সূরা আল-ইসরা: ৫৬-৫৭)

আর তিনি বলেন: "বলুন, 'তোমরা যাদের আল্লাহ ছাড়া আহ্বান করো, তাদের ডাকো।' তারা আকাশে ও জমিনে একটি কণার সমানও মালিকানা রাখে না, তাদের মধ্যে কেউ এতে অংশীদারও নয়, এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারী নয়। এবং তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে কোনো সুপারিশও উপকারে আসবে না।" (সূরা সাবা: ২২-২৩)

সালাফদের একটি দল বলেছেন: কিছু লোক ছিল যারা ঈসা (আলাইহিস সালাম), 'উযায়ের (আলাইহিস সালাম), এবং ফেরেশতাদের ডাকা শুরু করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ফেরেশতা ও নবীরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট দূর করতে পারে না এবং তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তার রহমতের আশা করে ও তার শাস্তিকে ভয় করে।

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন: "এটা মানুষের (নবীর) জন্য সমীচীন নয় যে আল্লাহ তাকে কিতাব, হুকুম ও নবুয়ত দান করেন, আর সে লোকদেরকে বলে, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হও,' বরং (সে বলবে), 'তোমরা প্রভুর আলেম হও, কিতাব শিক্ষা দেওয়ার কারণে এবং যেহেতু তোমরা তা অধ্যয়ন করছ।' এবং সে তোমাদেরকে ফেরেশতা ও নবীদের প্রভু বানাতে আদেশ করবে না। কি! সে কি তোমাদের ইসলাম গ্রহণের পর তোমাদেরকে কুফরিতে আহ্বান করবে?" (সূরা আলে ইমরান: ৭৯-৮০)

অতএব, ফেরেশতা ও নবীদেরকে মধ্যস্থতাকারী মনে করে যারা তাদের ডাকে, তাদের উপর ভরসা করে এবং তাদের কাছে উপকার লাভ ও ক্ষতি প্রতিহতের অনুরোধ করে—যেমন গুনাহ মাফ চাওয়া, হৃদয়ের

হিদায়াত, দুঃখ থেকে মুক্তি এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য—সে ব্যক্তি মুসলিমদের সর্বসম্মত মতে কাফির।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা বলে, 'রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র! বরং তারা (ফেরেশতারা) সম্মানিত বান্দা। তারা তার কথা অগ্রাহ্য করে না এবং তার আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। তিনি জানেন যা তাদের সামনে এবং যা তাদের পেছনে, এবং তারা কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না, শুধুমাত্র যাকে তিনি অনুমতি দেন। আর তারা তার ভয়ে ভীত। তাদের কেউ যদি বলে, 'আমি আল্লাহ ছাড়া আরেক উপাস্য,' তবে আমরা তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেব। এভাবেই আমরা জালিমদের প্রতিদান দেই।" (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৬-২৯)

আর তিনি বলেন: "মসীহ কখনোই আল্লাহর বান্দা হওয়াকে অস্বীকার করবে না, এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও নয়। আর যারা তার ইবাদতে অহংকার করে ও বিমুখ থাকে, তিনি তাদের সবাইকে তার কাছে জমা করবেন।" (সূরা আন-নিসা: ১৭২)

আর তিনি বলেন: "তারা বলে, 'রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তোমরা তো এক ভয়ানক কথা বলে ফেলেছো। এতে আকাশ প্রায় বিদীর্ণ হয়ে যাবে, জমিন চিড়েআসবে, এবং পাহাড় ভেঙে পড়বে। যে তারা রহমানের জন্য সন্তান আরোপ করেছে! এটি রহমানের পক্ষে সমীচীন নয় যে তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। আকাশ ও জমিনে এমন কেউ নেই যে সে রহমানের নিকট একজন বান্দা হয়ে না আসে। তিনি তাদের সবাইকে গণনা করে রেখেছেন এবং যথাযথ হিসাব করেছেন। আর সবাই কিয়ামতের দিন তার নিকট একাকী উপস্থিত হবে।" (সূরা মারইয়াম: ৮৮-৯৫)

আর তিনি বলেন: "তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ইবাদত করে, যা তাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না, এবং তারা বলে, 'এরা হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যা তিনি আসমান ও জমিনে জানেন না?' তিনি পবিত্র ও মহান, তাদের শিরক থেকে।" (সূরা ইউনুস: ১৮)

আর তিনি বলেন: "আকাশে বহু ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোনো উপকারে আসবে না—তাঁর

অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত।" (সূরা আন-নাজম: ২৬)

আর তিনি বলেন: "কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)

আর তিনি বলেন: "আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্টে স্পর্শ করেন, তবে তা তিনি ছাড়া কেউ দূর করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমার জন্য কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই।" (সূরা ইউনুস: ১০৭ / আল-আন'আম: ১৭)

আর তিনি বলেন: "আল্লাহ যাকে দয়া করেন, তা কেউ ধরে রাখতে পারে না, আর তিনি যা ধরে রাখেন, তা কেউ ছাড়াতে পারে না।" (সূরা ফাতির: ২)

আর তিনি বলেন: "বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যাদের তোমরা আল্লাহ ছাড়া আহ্বান করো? যদি আল্লাহ আমার জন্য কোনো কষ্ট নির্ধারণ করেন, তবে তারা কি তাঁর কষ্ট দূর করতে পারবে? আর যদি তিনি আমার প্রতি দয়া করতে চান, তবে তারা কি তাঁর দয়া প্রতিহত করতে পারবে?' বলো, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আমি তাঁরই উপর ভরসা করি যারা ভরসা করে।" (সূরা আয-যুমার: ৩৮)

এবং কুরআনে এমন বহু আয়াত রয়েছে।

নবীদের ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে—যেমন জ্ঞানের ও দ্বীনের মহৎ আলিমগণ—যে ব্যক্তি তাঁদেরকে রাসুল ও তাঁর উম্মতের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীকার করে, যেন তাঁরা (উম্মতের নিকট) বার্তা পৌঁছে দেন, শিক্ষা দেন, সংশোধন করেন এবং উম্মত তাঁদের অনুসরণ করে—সে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। যখন এই (আলিমগণ) কোনো বিষয়ে ইজমা করেন, তখন তাঁদের ইজমা দলীলরূপে চূড়ান্ত হয়; তাঁরা ভ্রান্তির উপর একমত হন না। আর যদি তাঁরা কোনো বিষয়ে ইখতিলাফ করেন, তবে তারা তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিকট ফিরিয়ে দেন। কারণ তাঁদের প্রত্যেকেই পুরোপুরি মাসূম নন; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির কথার কিছু গ্রহণযোগ্য এবং কিছু বর্জনীয়—তাঁর ব্যতিক্রম হলেন কেবল আল্লাহর রাসুল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আলিমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীরা দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি; বরং রেখে গেছেন জ্ঞান। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে, সে অধিক ভাগ্য লাভ করে।"

কিন্তু যদি কেউ তাঁদেরকে আল্লাহ ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী বলে স্বীকার করে—যেমন রাজাদের ও

প্রজাদের মাঝে দরবারি হয়—যারা সৃষ্টির প্রয়োজনসমূহ আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়; এবং বলে যে, আল্লাহ তাঁদের মাধ্যমেই বান্দাদের হিদায়াত দেন ও রিজিক দেন; ফলে সৃষ্টিজগৎ তাঁদেরকে ডাকে, আর তাঁরা আল্লাহকে ডাকে; যেমন রাজাদের নিকট দরবারিরা প্রজাদের প্রয়োজন উপস্থাপন করে, কারণ তারা রাজাদের নিকটে থাকে এবং প্রজারা তাঁদের নিকট প্রয়োজন চায়, হয় সরাসরি রাজার দরবারে যাওয়ার ভদ্রতার অভাবে, অথবা এ কারণে যে, মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে চাওয়া রাজার নিকট সরাসরি চাওয়ার চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ হয়, কারণ তারা রাজাদের নিকটে। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে এভাবে মধ্যস্থতাকারী মনে করে, সে একজন কাফির, মুশরিক, যার তাওবা গ্রহণের জন্য তাকে আহ্বান জানাতে হবে; যদি তাওবা করে, তবে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে। **এদেরকেই বলা হয় 'আল্লাহর ব্যাপারে মূর্তিপূজার দর্শন পোষণকারী**'; তারা সৃষ্টিকে আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করেছে এবং আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করিয়েছে। কুরআনে এদের ব্যাপারে বহু খণ্ডন রয়েছে, যা এই ফাতওয়ার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়।

রাজা ও প্রজার মাঝে মধ্যস্থতাকারী থাকবার তিনটি কারণ থাকে:

প্রথমত: রাজাকে এমন কিছু জানানো, যা সে জানে না। আর যে বলে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবস্থা জানেন না, যতক্ষণ না কিছু ফেরেশতা, নবী বা অন্য কেউ তাঁকে জানায়, সে কাফির। বরং আল্লাহ—তিনি পবিত্র ও মহান—"গোপন ও আরও গোপন বিষয় জানেন; তাঁর নিকট আসমান ও যমীনে কিছুই গোপন নয়।" "আর তিনি শ্রবণকারী, দৃষ্টিশীল" (সূরা আশ-শূরা: **১১**)। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে আহাজারি করা সকল কণ্ঠস্বর শুনেন; একটি শুনা অন্যটি শুনা থেকে তাঁকে বিভ্রান্ত করে না, চাওয়ার প্রাচুর্য তাঁকে বিভ্রান্ত করে না, এবং অনবরত চাওয়ায় তিনি ক্লান্ত হন না।

দ্বিতীয়ত: রাজা তাঁর প্রজার ব্যবস্থাপনা ও শত্রুদের প্রতিরোধে অপারগ, তাই তাঁকে সহায়তার জন্য সহযোগী দরকার হয়। ফলে তাঁকে দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে সাহায্যকারী প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ—তিনি পবিত্র ও মহান—কারও সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, দুর্বলতার কারণে কোনো সহযোগীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "বল, 'তোমরা যাদের আল্লাহ ব্যতীত আহ্বান করো তাদের ডাকো। তারা আসমান ও যমীনে একটি পরমাণু পরিমাণ মালিকানাও রাখে না; সেখানে তাদের কোনো অংশ নেই; এবং আল্লাহর মধ্যে

তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই'" (সূরা সাবা: ২২)। তিনি আরও বলেন: "বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোনো শরিক নেই এবং তিনি কোনো দুর্বলতার কারণে সহযোগীর মুখাপেক্ষী নন।' এবং তাঁকে মহিমায় মহান করে স্মরণ করো" (সূরা আল-ইসরা: ১১১)। সৃষ্টি জগতের যত কারণ আছে—সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও মালিক হলেন তিনিই। তিনি অপরাপরের মুখাপেক্ষী নন; অপরাপর তাঁর মুখাপেক্ষী। রাজারা তাঁদের সাহায্যকারীদের মুখাপেক্ষী, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রাজত্বে অংশীদার; কিন্তু আল্লাহর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই; রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই, এবং তিনি সব কিছুর উপর সক্ষম।

তৃতীয়ত: রাজার ইচ্ছা হয় না প্রজাদের উপকার করার, সদয় হওয়ার বা দয়া করার, যতক্ষণ না বাহ্যিক কোনো প্ররোচনা আসে যা তাকে উদ্দীপ্ত করে। ফলে কেউ যদি তাঁকে উপদেশ দেয়, সম্মান করে অথবা তার উপর প্রভাব রাখে, এমন যে রাজার মনে তার ব্যাপারে আশা বা ভয় জন্মে, তখন রাজা সেই ব্যক্তির কথা শুনে প্রজাদের প্রয়োজন পূরণ করে। কখনো উপদেশদাতার বক্তব্যে, কখনো সম্মানিত ব্যক্তির প্রভাবে অথবা ভয় ও আশার কারণে রাজার ইচ্ছা উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ—তিনি মহান—সব কিছুর রব ও মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি মায়ের চেয়েও অধিক দয়ালু। প্রতিটি জিনিস তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটে; তিনি যা চান, তাই ঘটে; যা চান না, তা ঘটে না। তিনি যখন বান্দাদের পরস্পরের মাধ্যমে উপকার দেন, এক ব্যক্তিকে অপরের প্রতি সদয় করেন, তার জন্য দোয়া করান, তার জন্য সুপারিশ করান, তখন এর সবই তিনিই সৃষ্টি করেন। তিনিই দয়াশীল ব্যক্তির হৃদয়ে দয়া, দোয়া ও সুপারিশের ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এমন কেউ নেই, যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করতে পারে, বা তাঁকে এমন কিছু শিক্ষা দিতে পারে যা তিনি জানতেন না, বা যাকে আল্লাহ আশা করেন বা ভয় করেন। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'হে আল্লাহ, তুমি চাও তো আমাকে মাফ করো; তুমি চাও তো আমার প্রতি দয়া করো।' বরং সে যেন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা করে, কেননা আল্লাহকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।"

যারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে, তারা কেবল তাঁর অনুমতি নিয়েই করে, যেমন আল্লাহ বলেন: "কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)। তিনি আরও বলেন: "তারা কেবল তার পক্ষেই সুপারিশ করতে পারে যাকে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন" (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৮)। তিনি আরও বলেন: "বল, 'তোমরা যাদের আহ্বান করো আল্লাহ ছাড়া, তারা আসমান ও যমীনে একটি পরমাণু পরিমাণও মালিক নয়; সেখানে তাদের কোনো অংশ নেই, এবং তাঁর মধ্যে তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

আর তাঁর নিকট কেবল তার পক্ষেই সুপারিশ লাভবান হয়, যার জন্য তিনি অনুমতি দেন" (সূরা সাবা: ২২-২৩)। ফলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যাদের ডাকা হয়, তারা মালিক নয়, রাজত্বে অংশীদার নয়, এবং তাঁকে সাহায্যকারীও নয়। আর তাঁদের সুপারিশও উপকারে আসে না, যতক্ষণ না তিনি অনুমতি দেন। এটি রাজাদের বিপরীত; তাদের নিকট মধ্যস্থতাকারী কখনো মালিক, কখনো রাজত্বে শরিক, কখনো সহায়তাকারী হয়। তারা রাজাদের অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করে, এবং রাজাও তা গ্রহণ করে—কখনো তার প্রয়োজনের কারণে, কখনো ভয়ের কারণে, কখনো তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের কারণে। সে নিজের সন্তান ও স্ত্রীর মধ্যস্থতাও গ্রহণ করে, কারণ সে তাদের মুখাপেক্ষী। যদি তার স্ত্রী ও সন্তান মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে সে কষ্ট পাবে। এমনকি সে দাসের মধ্যস্থতাও গ্রহণ করে; যদি না করে, তবে হয়ত দাস আনুগত্য করবে না বা ক্ষতি সাধন করবে। মানুষের মাঝে পারস্পরিক সুপারিশ সম্পূর্ণই এরূপ। কেউ কাউকে সুপারিশ করে না, যতক্ষণ না তার দ্বারা কিছু পাওয়ার আশা করে বা তার ভয় করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কারও মুখাপেক্ষী নন—না কারও প্রতি আশা করেন, না ভয় করেন, না কারও প্রয়োজন আছে তাঁর। বরং তিনিই সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: "জেনে রেখো! আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে, তারা বাস্তবে কোনো শরিক অনুসরণ করে না; তারা কেবল অনুমান অনুসরণ করে এবং কল্পনা করে।"

তারপর তিনি বলেন: "তারা(মুশরিকরা) বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত; আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর" (সূরা ইউনুস: ৬৬-৬৮)।

মুশরিকরা এমন প্রকারের সুপারিশকারী গ্রহণ করে যাদের সম্পর্কে তারা পূর্বে থেকে পরিচিত সুপারিশের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বলেন, "আর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুকে উপাসনা করে, যা তাদের কোনো উপকার করে না এবং ক্ষতিও করে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি জানেন না আকাশমণ্ডলীতে কিংবা পৃথিবীতে?' তিনি পবিত্র ও মহান, তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে" (সূরা ইউনুস: ১৮)। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বলেন, "তবে কেন তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, যারা তাদের কাছে সন্নিকটতা সাধনের উপায় ছিল, তাদের সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল তাদের মিথ্যা ও তারা যা উদ্ভাবন করেছিল তাই" (সূরা আহকাফ: ২৮)। আর তিনি মুশরিকদের সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে তারা বলেছিল, "আমরা তো কেবল তাদেরই উপাসনা করি যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয় মর্যাদায়" (সূরা যুমার: ৩)। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বলেন, "আর সে কখনও তোমাদেরকে ফিরিশতা ও নবীদেরকে রব হিসেবে

গ্রহণ করতে বলবেন না। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর কি সে তোমাদেরকে কুফর করতে আদেশ দিবে?" (সূরা আলে ইমরান: ৮০)। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বলেন, "বলুন, 'তোমরা যাদেরকে তাঁর পরিবর্তে ডাকো, তাদেরকে ডাকো; তারা তোমাদের থেকে কষ্ট অপসারণ করতে কিংবা তা অন্যদিকে সরিয়ে দিতে কোনো ক্ষমতা রাখে না।' যাদেরকে তারা ডাকে, তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছে সন্নিকটতা লাভের উপায় খোঁজে—তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে নিকটবর্তী হতে পারে—আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়ংকর" (সূরা ইসরা: ৫৬-৫৭)।

অতএব, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, যাদের ডাকা হয় আল্লাহ্ ছাড়া, তারা কষ্ট দূর করার কিংবা তা অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না; বরং তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে, তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর নৈকট্য লাভে প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং, তিনি—পবিত্র ও মহিমান্বিত—ফিরিশতা ও নবীদের পক্ষ থেকে (স্বতন্ত্রভাবে) সুপারিশ করার ক্ষমতা অস্বীকার করেছেন, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে সুপারিশের ব্যতিক্রম। আর সুপারিশ হচ্ছে দোয়া। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একে অপরের জন্য সৃষ্টির দোয়া উপকারী এবং আল্লাহ্ তা আদেশ করেছেন। তবে দোয়া বা সুপারিশকারী ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া বা সুপারিশ করতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। অতএব, সে এমন সুপারিশ করতে পারে না যা নিষিদ্ধ, যেমন মুশরিকদের জন্য সুপারিশ করা বা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বলেন, "নবী ও যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়, যদিও তারা আত্মীয় হয়, যখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন শুধুমাত্র একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করার কারণে। কিন্তু যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন সে তার থেকে বিমুখ হয়ে গেল" (সূরা তাওবা: ১১৩-১১৪)। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও, তা সমান; আল্লাহ্ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না" (সূরা মুনাফিকুন: ৬)।

সহীহ হাদীসে বর্নিত যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন না, যেমন তাঁর বাণীতে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে অংশীদার করা ক্ষমা করেন না, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তা ছাড়া অন্য সব কিছু ক্ষমা করে দেন" (সূরা নিসা: ৪৮), এবং তাঁর বাণীতে: "তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কখনোই তার জানাযার নামায পড়ো না এবং তার কবরের কাছে দাঁড়িও না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা

ফাসিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে" (সূরা তাওবা: ৮৪)। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বলেন, "তোমরা তোমাদের রবকে বিনীতভাবে ও গোপনে ডাকো। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না" (সূরা আ'রাফ: ৫৫)—এটি দোয়া প্রসঙ্গে। দোয়ার সীমালঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে এমন কিছু চাওয়া, যা আল্লাহ্ করেন না—যেমন, নবীদের মর্যাদার অনুরোধ করা যখন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ইত্যাদি; অথবা এমন কিছু চাওয়া যাতে আল্লাহ্র অবাধ্যতা জড়িত, যেমন কুফর, ফাসিকতা ও গুনাহের কাজে সাহায্য চাওয়া।

সুতরাং, যে সুপারিশকারীকে আল্লাহ্ সুপারিশের অনুমতি দেন, তার সুপারিশ হয় এমন দোয়া যা সীমালঙ্ঘন করে না। যদি তাদের কেউ এমন দোয়া করে যা তার জন্য উপযুক্ত নয়, তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ নবীগণ এমন অনুপযুক্ত বিষয়ে অনুমোদিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়। যেমন নূহ (আলাইহিস সালাম) বলেন, "হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার পুত্রও আমার পরিবারভুক্ত, আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য; আর আপনি তো সবার চেয়ে উত্তম বিচারক।" আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বলেন, "হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়; সে তো এক অশুভ কাজ করেছে। সুতরাং তুমি আমাকে এমন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো না যার জ্ঞান তোমার নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যাতে তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।" তখন [নূহ] বললেন, "হে আমার রব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন বিষয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন করা থেকে যার জ্ঞান আমার নেই। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব" (সূরা হূদ: ৪৫-৪৭)।

প্রত্যেক দোয়াকারী সুপারিশকারী, যে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করে এবং যার দোয়া কবুল হয়, তার দোয়া ও সুপারিশ কেবল আল্লাহ্র আদেশ, হুকুম ও ইচ্ছার মাধ্যমেই ঘটে। তিনিই দোয়া কবুল করেন ও সুপারিশ গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনিই কারণ ও ফল সৃষ্টি করেন। দোয়া হলো সেই কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান নির্ধারিত করেছেন।

যদি এটাই অবস্থা হয়, তবে: কেবলমাত্র কারণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া তাওহীদের ক্ষেত্রে শিরক; কারণকে কারণ বলেই অস্বীকার করা বুদ্ধির ত্রুটি; আর কারণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা শরীয়াহর অবমাননা। বরং বান্দার উচিত তার ভরসা, দোয়া, প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্র দিকে নিবদ্ধ করা, যিনি পবিত্র ও মহান। আর আল্লাহ্ তার জন্য যে কারণ ইচ্ছা করেন, তা নির্ধারণ করেন—সৃষ্টির দোয়া হোক বা অন্য কিছু।

দোয়া শরীয়তপ্রদত্ত: উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তি নিম্নের জন্য দোয়া করতে পারেন, এবং নিম্ন ব্যক্তি উচ্চের জন্যও দোয়া করতে পারেন। সুতরাং নবীদের থেকে সুপারিশ ও দোয়া চাওয়া বৈধ, যেমন মুসলিমগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বৃষ্টির জন্য সুপারিশ চাইতেন ও তাঁর কাছে দোয়ার অনুরোধ করতেন। তেমনি তাঁর পরে উমর ও মুসলিমগণ তাঁর চাচা আব্বাসের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আর কিয়ামতের দিন মানুষ নবীদের কাছে ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সুপারিশ চাইবে, যিনি সুপারিশকারীদের সর্দার এবং তাঁর জন্য রয়েছে কিছু বিশেষ সুপারিশ। এ সত্ত্বেও, দুই সহীহ গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্নিত যে তিনি বলেছেন: “যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে শুনো, তখন তার মতো বলো, এরপর আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো; কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট ‘আল-ওসীলাহ’ চাইবে; এটি জান্নাতে এমন একটি মর্যাদা যা কেবল আল্লাহ্র কোনো একজন বান্দার উপযুক্ত, আর আমি আশা করি আমি সেই বান্দা হবো। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট ‘আল-ওসীলাহ’ চায়, কিয়ামতের দিনে তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হবে।” আর তিনি উমরকে বলেছিলেন, যখন তিনি উমরাহর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন এবং বিদায় নিচ্ছিলেন: “হে আমার ভাই! আমাকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেও না।”

সুতরাং, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে তাঁর জন্য দোয়া করতে বলেছেন, কিন্তু এটি এমন নয় যে তিনি তাদের কাছে কিছু চেয়েছেন প্রয়োজনে। বরং, তিনি তাদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন যেমন তিনি তাদেরকে অন্য সকল আনুগত্যমূলক কাজে আদেশ দেন, যার জন্য তারা সওয়াব পান, এবং তিনি তাদের কাজের সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব লাভ করেন। কেননা, সহীহ হাদীসে বর্নিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "যে কেউ হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসারীদের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে, তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর যে কেউ গোমরাহির দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসারীদের গুনাহের সমপরিমাণ গুনাহ বহন করবে, তাদের গুনাহ থেকে কিছুই কমানো হবে না।" তিনি উম্মতের হিদায়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত আহ্বানকারী, তাই উম্মত তাঁর অনুসরণে যে যে ভাল কাজ করে, তিনি তার অনুরূপ সওয়াব লাভ করেন।

তদ্রূপ, যখন তারা তাঁর উপর দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের উপর দশগুণ রহমত নাযিল করেন, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব লাভ করেন, এবং দোয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি যা কিছু কল্যাণ পৌঁছে, তা তাঁর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতরূপে বিবেচিত হয়। সহীহ হাদীসে বর্নিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে,

আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, ঐ ফেরেশতা বলে: 'আমীন, এবং তোমার জন্যও অনুরূপ।'" এবং অন্য হাদীসে এসেছে: "সবচেয়ে দ্রুত কবূল হওয়া দোয়া হলো একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে আরেকজন অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়া।"

সুতরাং, অন্যের জন্য দোয়া করলে উভয়ই উপকৃত হয়—দোয়া প্রার্থনাকারী এবং যার জন্য দোয়া করা হয়েছে। এমনকি দোয়া প্রার্থনাকারী যদি দোয়া প্রাপ্ত ব্যক্তির চেয়ে নিচু মর্যাদারও হয়। এক মুমিন তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করলে উভয়েরই উপকার হয়। অতএব, কেউ যদি আরেকজনকে বলে, "আমার জন্য দোয়া করো", এবং সে উভয়ের উপকারের উদ্দেশ্য করে, তবে তারা একত্রে নেকি ও তাকওয়ার উপর সহযোগিতা করেছে। অনুরোধকারী ব্যক্তি অনুরোধপ্রাপ্তকে এমন এক কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে যা উভয়ের উপকারে আসে, আর অনুরোধপ্রাপ্ত ব্যক্তি এমন কাজ করেছে যা উভয়ের জন্য কল্যাণকর। এটি সেই ব্যক্তির মতো, যে অন্য কাউকে সৎকর্ম ও তাকওয়ার দিকে আহ্বান করে; যাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সে তার কর্মের জন্য সওয়াব পায়, আর আহ্বানকারীও অনুরূপ সওয়াব পায়, কেননা সে তাকে সেই কাজে ডেকেছে।

বিশেষ করে যেহেতু কিছু দোয়া আল্লাহর বান্দার জন্য আদেশকৃত, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আপনার গুনাহ ও মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন" (সূরা মুহাম্মদ: ১৯)। অতঃপর তিনি বলেছেন: "যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, যদি তারা আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত, আর রাসুল তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তাহলে তারা আল্লাহকে অতীব তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু পেত" (সূরা আন-নিসা: ৬৪)। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা চাওয়া ও রাসুলের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়াকে উল্লেখ করেছেন, যেহেতু রাসুলকে মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

আল্লাহ কোনো সৃষ্টিকে এমন কিছু চাওয়ার আদেশ দেননি, যা তিনি ওই দ্বিতীয় সৃষ্টিকে করতে আদেশ দেননি। বরং, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাকে আদেশ করেছেন—তা বাধ্যতামূলক হোক বা নফল—তা আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য, তাঁর নৈকট্যের মাধ্যম, কর্মীর জন্য কল্যাণ, এবং একটি সৎকাজ। বান্দা যখন তা সম্পাদন করে, তখন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ ও বরকতের প্রকাশ।

নিশ্চয়ই আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হল বান্দাদের ঈমানের দিকে হিদায়াত দান করা। ঈমান হলো কথা ও

কাজ; তা আনুগত্য ও সৎকর্মের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। যত বেশি সে সৎকাজ করে, তার ঈমান তত বেশি বৃদ্ধি পায়। এটিই প্রকৃত বরকত, যেমন আল্লাহর বাণীতে উল্লেখ আছে: "তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন" (সূরা ফাতিহা: ৭) এবং: "আর যে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সঙ্গী হবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন" (সূরা আন-নিসা: ৬৯)। আর যে দুনিয়াবি অনুগ্রহ ধর্ম ছাড়া—তা কি আল্লাহর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, না নয়? এ বিষয়ে আমাদের উস্তাদদের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যেও দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো: এক দিক থেকে এগুলো বরকত, যদিও অন্য দিক থেকে তা পূর্ণ বরকত নয়। কিন্তু ধর্মীয় বরকত, যা খোঁজা উচিত, তা হল যা আল্লাহ বাধ্যতামূলক ও নফল হিসেবে আদেশ করেছেন। এটাই প্রকৃত কল্যাণ, মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী, এবং এটিই প্রকৃত বরকত আহলুস-সুন্নাহর মতে, কেননা তাঁদের মতে, আল্লাহই বান্দাকে সৎকাজ করার বরকত দান করেন। কাদারিয়্যাহ মতে, তিনি কেবল কাজ করার সামর্থ্যই দিয়েছেন, যা ভালো ও মন্দ উভয়ের জন্যই উপযোগী।

এখানে মূল বিষয় হলো: আল্লাহ কোনো সৃষ্টিকে এমন কিছু চাওয়ার আদেশ দেননি যা ওই দ্বিতীয় সৃষ্টির জন্য উপকার বয়ে আনে না, হোক তা ফরয বা নফল। কেননা তিনি কেবল বান্দার কাছ থেকে সেই কাজ চান যা ওই ব্যক্তির উপকারে আসে। তাহলে তিনি কিভাবে অন্যকে এমন কিছু চাইতে আদেশ করবেন যা তার উপকারে আসে না? বরং, তিনি তো বান্দাকে অপর বান্দার সম্পদ চাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন, যদি না তা প্রয়োজনে হয়। যদি কারো উদ্দেশ্য হয় অনুরোধপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপকার, অথবা উভয়ের উপকার, তবে তা সওয়াবযোগ্য। কিন্তু যদি তার উদ্দেশ্য কেবল নিজের চাওয়া পূরণ হয়, অনুরোধপ্রাপ্তের কোনো কল্যাণ চাওয়া না হয়, তবে এটি নিছকই নিজের চাওয়া। আল্লাহ এমন চাওয়ার আদেশ দেননি; বরং, সম্ভবত তিনি তা নিষিদ্ধ করেছেন, কেননা এটি কেবল সৃষ্টির কাছে কিছু চাওয়া, যার মধ্যে না আল্লাহর প্রতি ইচ্ছা আছে, না তাঁর বান্দার কল্যাণের সদিচ্ছা আছে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করতে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়েছেন, এবং বান্দাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে বলেছেন। অথচ এ ব্যক্তি না তো আল্লাহর প্রতি অনুরাগ করেছে, যা ইবাদত, না বান্দার কল্যাণ চেয়েছে, যা সদকা। যদিও এমন অনুরোধের কারণে সে গোনাহগার না-ও হতে পারে, তবে যে কাজ আল্লাহ আদেশ করেছেন ও যে কাজ তিনি কেবল অনুমতি দিয়েছেন—এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তুমি কি দেখ না যে, নব্বই হাজার সাহাবির মধ্যে যারা হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের বৈশিষ্ট্য হাদীসে এসেছে: "তারা রুকইয়া চায় না।" যদিও রুকইয়া চাওয়া বৈধ। আমরা এ বিষয়ে অন্যত্র

বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মূল বক্তব্য এই যে: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে এমন মাধ্যম স্থাপন করে যেমন রাজা ও প্রজার মাঝে মধ্যস্থতা করা হয়, সে একজন মুশরিক। এটা মুশরিকদের ধর্ম, যারা মূর্তিপূজা করত। তারা বলত, এরা নবী ও সৎ লোকদের প্রতিমা, আর তারা আমাদের আল্লাহর কাছে নৈকট্য এনে দেয়। এটি সেই শিরক যার জন্য আল্লাহ খ্রিস্টানদের নিন্দা করেছেন, যখন তিনি বলেছেন: "তারা তাদের আলেম ও সন্ন্যাসীদের আল্লাহর পরিবর্তে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে, এবং মারিয়ামের পুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা আদেশপ্রাপ্ত ছিল কেবল এক ইলাহর ইবাদত করতে; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাদের শরীক থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে" (সূরা তাওবা: ৩১)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (হে মুহাম্মাদ), নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটে। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব, তারা যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৬)। অর্থাৎ, তারা যেন আমার আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে আহ্বানে সাড়া দেয়, এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যে আমি তাদের দোয়া কবূল করব, যদি তারা আমাকে ডাকে বিনীতভাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতএব, যখন আপনি অবসর হোন, তখন ইবাদতের জন্য দাঁড়ান। আর আপনার রবের দিকে আকাঙ্ক্ষা করুন" (সূরা আশ-শারহ: ৭-৮)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যখন সমুদ্র আপনাদেরকে বিপদে ফেলে, তখন আপনারা যাদেরকে ডাকতেন তারা সব হারিয়ে যায়, একমাত্র তিনি ছাড়া" (সূরা আল-ইসরা: ৬৭)।

আল্লাহ বলেন: "কে সেই ব্যক্তি যে বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, এবং বিপদ দূর করেন এবং আপনাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন?" (সূরা আন-নামল: ৬২)।

আল্লাহ বলেন: "যারা আসমান ও জমিনে আছে, সবাই তাঁর কাছে কিছু না কিছু চায়; প্রত্যহ তিনি একেক

শানে থাকেন" (সূরা আর-রহমান: ২৯)।

আল্লাহ তাঁর কিতাবে এই তাওহীদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে শিরক করার সমস্ত মূল উপড়ে ফেলেছেন, যাতে কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ওপর ভরসা না রাখে, এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশা না করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতএব, তোমরা মানুষের ভয় করো না বরং আমারই ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহকে সামান্য মূল্যে বিক্রি কোরো না" (সূরা আল-মায়েদা: ৪৪)। তিনি বলেন: "এ তো শয়তানই, যে তার বন্ধুদের দ্বারা তোমাদেরকে ভয় দেখায়"—অর্থাৎ, সে তার সহযোগীদের ভয় দেখিয়ে তোমাদেরকে ভীত করে—"অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তুমি কি দেখোনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হাত সংযত রাখো এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও?' কিন্তু যখন তাদের জন্য যুদ্ধ ফরজ করা হলো, তখন তাদের একদল মানুষকে এমন ভয় করল যেমন আল্লাহকে ভয় করে, বরং আরও তীব্র ভয়সহ" (সূরা আন-নিসা: ৭৭)। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহর মসজিদগুলো কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না" (সূরা আত-তাওবাহ: ১৮)। তিনি বলেন: "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতি সচেতন থাকে—তারা-ই সফলকাম" (সূরা আন-নূর: ৫২)। তিনি এভাবেই স্পষ্ট করেছেন যে, আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য, কিন্তু ভয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা যদি সন্তুষ্ট থাকত আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যেটা দিয়েছেন তাতে এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দেবেন এবং তাঁর রাসুলও...' " (সূরা আত-তাওবাহ: ৫৯)। অনুরূপভাবে আল্লাহ বলেন: "যারা যখন লোকেরা তাদেরকে বলল, 'নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, অতএব, তাদেরকে ভয় করো', তখন তা তাদের ঈমানে আরও বৃদ্ধি করল এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক' " (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের মাঝে এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতেন এবং শিরকের মূল কেটে দিতেন; কেননা, এটাই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কথার বাস্তবতা। কারণ, ইলাহ হলো সেই সত্তা, যাকে অন্তর পূর্ণ ভালোবাসা, মহত্ত্ব, ভক্তি, সম্মান, আশা ও ভয় থেকে আরাধনা করে। তাই তিনি তাদের বলেছিলেন:

"তোমরা বলো না, 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ যা চান', বরং বলো, 'আল্লাহ যা চান, এরপর মুহাম্মদ যা চান'।" এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, "আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান।" তিনি জবাব দিলেন, "তুমি কি আমাকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বানালে? বরং বলো, 'আল্লাহ যা চান একাই'।"

তিনি বলেন: "যে কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে।" তিনি বলেন: "যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে, সে শিরক করেছে।" তিনি ইবনে আব্বাসকে বলেন: "যদি তুমি কিছু চাও, তাহলে আল্লাহর নিকট চাও; আর যদি সাহায্য চাও, তাহলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। কলম শুকিয়ে গেছে যা কিছু তোমার ভাগ্যে ঘটবে তা নিয়ে। যদি সৃষ্টিজগৎ তোমার উপকারে আসে, তারা কিছুই উপকার করতে পারবে না, কিন্তু কেবলমাত্র যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখেছেন তা ছাড়া। আর যদি তারা তোমার ক্ষতিসাধনে একত্র হয়, তারা কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু কেবলমাত্র যা আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে লিখেছেন তা ছাড়া।"

তিনি আরও বলেন: "তোমরা আমাকে অতিরিক্ত প্রশংসা কোরো না যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামকে অতিরিক্ত প্রশংসা করেছে। আমি তো একজন দাস, সুতরাং বলো, 'আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল'। তিনি বলেন: "হে আল্লাহ, আমার কবরকে এমন মূর্তি বানিও না যা উপাসনা করা হয়।" তিনি বলেন: "আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিও না; বরং আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ যেখানেই থাকো না কেন, আমার কাছে পৌঁছে যায়।" তিনি তাঁর (শেষ) অসুস্থতাকালে বলেন: "আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করুন; তারা তাদের নবীদের কবরকে উপাসনার স্থান বানিয়েছে"—তিনি তাদের কার্যকলাপ থেকে সতর্ক করছিলেন। আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "যদি এমন না হতো, তাহলে তাঁর কবর প্রকাশ্য করা হতো, কিন্তু তিনি এটা অপছন্দ করতেন যেন তা উপাসনার স্থান বানানো হয়।" এ বিষয়ে আলোচনা বিশাল।

একজন মুমিন জানে যে, আল্লাহই সবকিছুর প্রতিপালক ও মালিক, কিন্তু সে আল্লাহর নির্ধারিত কারণসমূহ অস্বীকার করে না; যেমন আল্লাহ বৃষ্টিকে শস্য উৎপাদনের কারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যা কিছু আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি হিসাবে নাযিল করেন, তা দ্বারা তিনি ভূমিকে তার মৃতাবস্থার পর জীবিত করেন এবং তাতে সব প্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দেন" (সূরা আল-বাকারা: ১৬৪)। যেমন তিনি সূর্য ও চাঁদকে কিছু সৃষ্টির জন্য কারণ বানিয়েছেন। আর যেমন তিনি সুপারিশ ও দোয়ার মাধ্যমে তাঁর কিছু ফয়সালার কারণ

বানিয়েছেন—যেমন মুসলিমদের জানাজায় সালাত, যা মৃতের ওপর আল্লাহর রহমতের কারণ এবং সালাত আদায়কারীদের জন্য সওয়াবের মাধ্যম।

তবে কারণ সংক্রান্ত তিনটি বিষয় জানা উচিত:

প্রথমত: নির্দিষ্ট কোনো কারণ একা নিজে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং অন্যান্য কারণের সঙ্গে তা যুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং অনেক সময় কিছু প্রতিবন্ধকতাও থাকে। যদি আল্লাহ সব কারণ পূর্ণ না করেন এবং প্রতিবন্ধকতা দূর না করেন, তবে লক্ষ্য অর্জিত হবে না। তিনি পবিত্র ও মহান—তিনি যা চান তা-ই ঘটে, যদিও মানুষ তা না চায়; আর মানুষ যা চায়, তা ঘটে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা চান।

দ্বিতীয়ত: কোনো কিছুকে কারণ বলে বিশ্বাস করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। যে কেউ এমন কিছুকে কারণ বলে বিশ্বাস করে যার সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই অথবা যা শরিয়াহর বিরোধী, সে ভুল করে। যেমন কেউ মনে করে যে মানত করা বিপদ প্রতিরোধের অথবা বরকত লাভের কারণ। অথচ দুই সহীহে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: “এটি কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না; এটি কেবল কৃপণের কাছ থেকে কিছু বের করে আনে।”

তৃতীয়ত: ধর্মীয় কাজ—এসবকে কোনো কারণ বানানো বৈধ নয় যতক্ষণ না তা শরীয়াহ্ প্রদত্ত হয়। কেননা ইবাদত নির্ভর করে শরীয়াহ্‌র উপর। সুতরাং কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে অন্যের কাছে দোয়া করা বৈধ নয়, যদিও সে মনে করে যে এতে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। তেমনি কেউ আল্লাহর ইবাদত করে এমন নতুন উদ্ভাবিত পন্থায় যা শরীয়াহ'র বিরোধী, এমন করাও বৈধ নয়, যদিও সে মনে করে তা উপকারী। কারণ, শয়তান মানুষকে কিছু উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করতে পারে যদি সে শিরক করে। কারও কিছু উদ্দেশ্য কুফর, বড় গুনাহ ও পাপের মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে, কিন্তু তবুও তা করা বৈধ নয়; কেননা, এর দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয় এর দ্বারা অর্জিত সামান্য লাভের তুলনায় অনেক বেশি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন কল্যাণ অর্জন ও পরিপূর্ণ করার জন্য এবং অশুভতা দূরীকরণ ও হ্রাস করার জন্য। যা কিছু আল্লাহ আদেশ করেছেন, তার কল্যাণ তার অনিষ্টের চেয়ে অধিক এবং যা তিনি নিষেধ করেছেন, তার অনিষ্ট তার উপকারের চেয়ে বেশি।

এই সারসংক্ষেপগুলো বিশদ ব্যাখ্যার দাবিদার, যা এই সংক্ষিপ্ত লেখায় স্থান পাবে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন।

অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন

আর তাঁকে (রাহিমাহুল্লাহ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

প্রশ্নকারী বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে দোআ কবুল করেন, কেননা তিনি হলেন মাধ্যম এবং ওসীলা।

উত্তর

তিনি উত্তর দিলেন:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যদি প্রশ্নকারী এ কথা বোঝাতে চান যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান, তাঁর আনুগত্য, এবং তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ বান্দার দোআ কবুল হওয়া এবং তার সাওয়াব লাভের ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম—তাহলে তিনি সত্য বলেছেন।

কিন্তু যদি তিনি বোঝাতে চান যে, কোন সৃষ্ট অস্তিত্বের মাধ্যমে দোআ আল্লাহর কাছে পৌঁছানো না হলে আল্লাহ কারো দোআ কবুল করেন না, অথবা কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কসম না খেলে দোআ কবুল হয় না, কিংবা ঈমান, আনুগত্য ও সুপারিশ ছাড়াই নবীদের আত্মাসমূহ দোআ কবুল হওয়ার একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম—তাহলে এতে সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে।

আর আল্লাহই ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন

আর শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করা কি বৈধ?

উত্তর

তিনি উত্তর দিলেন:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তাঁর প্রতি ঈমান, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর আনুগত্য, তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ, তাঁর দোআ ও সুপারিশ এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয় তাঁর কাজ অথবা তাঁর সম্পর্কে বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ—এসবের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করা শরিয়ত সম্মত, এবং মুসলিমদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবাগণ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর (অর্থাৎ তাঁর দোআর) মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করতেন, আর তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরা তাঁর চাচা আব্বাসের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করতেন।

আর কেউ যদি বলে, "হে আল্লাহ! আমি তাঁর মাধ্যমে আপনার কাছে ওসীলা গ্রহণ করছি"—এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে, যেমন তাঁদের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কসম করার ব্যাপারেও ইখতিলাফ রয়েছে।

মালিক, শাফি'ঈ ও আবু হানিফার মতো অধিকাংশ ইমামগণ মত পোষণ করেন যে, রাসুল বা ফেরেশতাদের মতো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা বৈধ নয় এবং তা দ্বারা কসম কার্যকরও হয় না—এ বিষয়ে

আলেমদের ইজমা রয়েছে। আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে দুটি বর্ণনার একটি এই মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কসম বৈধ, অন্যদের নয়।

এই কারণেই ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর সাহাবী আল-মারওয়াযীকে লিখিত "মানাসিক" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, দোআয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু আহমাদ ব্যতীত অন্যরা বলেন: এটি মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর উপর কসম করার মতো, আর কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর উপর কসম করা বৈধ নয়। আর আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় রাসুলের নামে কসম করা বৈধ বলা হয়েছে, এজন্য তিনি তাঁর মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করাকেও বৈধ বলেছেন।

কিন্তু আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে অপর বর্ণনাটি অধিকাংশ আলেমের মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: যে রাসুলের নামে কসম করা বৈধ নয়, অতএব তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর উপর কসম করাও বৈধ নয়, যেমন ফেরেশতা ও অন্যান্য নবীদের মাধ্যমেও বৈধ নয়। কেননা, সালাফ ও ইমামদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা পাই না যিনি বলেছেন যে, আল্লাহর উপর তাঁর (রাসুলের) মাধ্যমে কসম করা যায়, যেমন তারা সাধারণভাবে অন্যদের মাধ্যমেও কসম করাকে বৈধ বলেননি।

এ কারণেই আবু মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, আল্লাহর উপর ফেরেশতা, নবী বা অন্য কারো মাধ্যমে কসম করা যাবে না। কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে—তখন তিনি বলেন: "যদি হাদীসটি সহীহ হয়, তবে তা তাঁর ক্ষেত্রে বিশেষ হবে।" অথচ ঐ হাদীসটি তাঁর মাধ্যমে কসম করার বৈধতা প্রমাণ করে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কসম করবে, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে, অথবা চুপ থাকে।" আর তিনি বলেছেন: "যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে, সে শিরক করেছে।"

আর দোআ ইবাদত, আর ইবাদত কেবল শরীয়তের নির্দেশ ও অনুসরণের উপর নির্ভর করে, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বা বিদআতের উপর নয়।

আর আল্লাহই ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদ

আর শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের আত্মার মন্দ ও আমাদের কর্মের অশুভ পরিণতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ হলেন তাঁর বান্দা ও রাসুল। তিনি তাঁকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি তা সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন। আল্লাহই সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট।

তিনি তাঁকে কিয়ামতের পূর্বে সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর মাধ্যমে গোমরাহী থেকে হিদায়াত দান করেছেন, অন্ধত্ব থেকে দৃষ্টি দান করেছেন, বিভ্রান্তি থেকে সঠিক পথে এনেছেন, আর তাঁর দ্বারা অন্ধ চোখ, বধির কান ও মোহর মারা অন্তর খুলে দিয়েছেন। তিনি (রাসুল) বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতের জন্য খালিছ উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন এবং তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন, যতক্ষণ না তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট নিশ্চিততা এসে পৌঁছল। আল্লাহ তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত ও বিপুল শান্তি বর্ষণ করুন।

এইভাবেই তিনি সত্য ও মিথ্যা, হিদায়াত ও গোমরাহী, সঠিক পথ ও বিভ্রান্তি, জান্নাতিদের পথ ও জাহান্নামিদের পথ, এবং আল্লাহর বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করেছেন। তাই হালাল হলো যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হালাল করেছেন, হারাম হলো যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হারাম করেছেন, এবং দ্বীন হলো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল বিধিবদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন উভয় শ্রেণির সৃষ্টির—মানব ও জিন—দিকে। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য হলো তাঁর উপর ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনা এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁর অনুসরণ করা। তাঁর উপর ঈমান ও তাঁর অনুসরণই হলো আল্লাহর পথ, আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর ইবাদত, আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর বন্ধুদের পথ এবং সেই মাধ্যম যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর বাক্যে নির্দেশ দিয়েছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নিকট পৌঁছার মাধ্যম অনুসন্ধান করো" (আল-মায়িদাহ: ৩৫)।

আল্লাহর নিকট পৌঁছার মাধ্যম কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সম্ভব, যে রাসুলের উপর ঈমান ও তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে এ মাধ্যম গ্রহণ করে। তাঁর উপর ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করা প্রত্যেকের উপর, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ও ইন্তেকালের পর, তাঁর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে আবশ্যক। তাঁর উপর ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করার কর্তব্য কোনো অবস্থাতেই, কোনো সৃষ্টির জন্য, একবার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাতিল হয় না, আর না তা কোনো অজুহাতে রহিত হয়।

আল্লাহর সম্মান ও রহমত লাভ এবং তাঁর অপমান ও শাস্তি থেকে মুক্তির পথ একমাত্র রাসুলের উপর ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করাই। আর তিনিই (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত সৃষ্টির জন্য সুপারিশকারী, "মাকাম মাহমুদ" বা প্রশংসিত স্থানের অধিকারী—যার জন্য পূর্বসূরি ও পরবর্তী সকলেই তাঁকে ঈর্ষা করবে। তিনি আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বোচ্চ সম্মানিত সুপারিশকারী।

আল্লাহ তা'আলা মূসা সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাবান ছিলেন" (আল-আহ্যাব: ৬৯)। এবং ঈসা সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাসম্পন্ন" (আল ইমরান: ৪৫)। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সকল নবী ও রাসুলের চেয়ে উচ্চতর।

তবে, তাঁর সুপারিশ ও দোআ কেবল সেই ব্যক্তিরই উপকারে আসে, যার জন্য তিনি দোআ করেন ও সুপারিশ করেন। সুতরাং যার জন্য রাসুল দোআ ও সুপারিশ করবেন, সে-ই তাঁর সুপারিশ ও দোআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ওসীলা গ্রহণ করেছে। যেমন সাহাবাগণ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর দোআ ও সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহর

নিকট ওসীলা গ্রহণ করতেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন মানুষ তাঁর দোআ ও সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ওসীলা গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত ও বিপুল শান্তি বর্ষণ করুন।

"তাওয়াস্সুল" শব্দটি সাহাবাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল মূলত এই অর্থে—অর্থাৎ তাঁর দোআ ও সুপারিশের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ। তাঁর দোআ ও সুপারিশের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ তখনই উপকার বয়ে আনে, যখন তা তাঁর প্রতি ঈমানসহ হয়ে থাকে। আর ঈমান ছাড়া, কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কোনো সুপারিশকারী কিয়ামতের দিন উপকারে আসবে না।

এই কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর চাচা, তাঁর পিতা ও অন্যান্য কাফিরদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তাঁকে বলা হয়েছে: "তুমি তাদের জন্য মাগফিরাত চাও বা না চাও, তাদের জন্য আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না" (আল-মুনাফিকূন: ৬)।

তবে কাফিরদের মধ্যেও কুফরের স্তরে তারতম্য রয়েছে, যেমন মুমিনদের মধ্যেও ঈমানের স্তরে তারতম্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: “হারাম মাস পিছিয়ে দেয়া কুফরে অতিরিক্ত যোগ" (আত-তাওবা: ৩৭)। তাই কাফিরদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের কারণে কুফরে হালকা পর্যায়ে থাকে, তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ তাঁর শাস্তি লাঘবের জন্য উপকারে আসবে, পুরোপুরি শাস্তি মাফের জন্য নয়।

যেমন সহীহ মুসলিমে আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আবু তালিবকে কোনো উপকার দিতে পেরেছেন? তিনি তো আপনাকে রক্ষা করতেন এবং আপনার পক্ষ থেকে রাগ প্রকাশ করতেন।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তিনি জাহান্নামের এক হালকা স্তরে আছেন, যদি আমি না থাকতাম তবে তিনি জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকতেন।"

আর এক বর্ণনায় এসেছে: "আবু তালিব আপনাকে রক্ষা করতেন, সমর্থন করতেন এবং আপনার পক্ষ অবলম্বন করতেন, এটা কি তাঁর কোনো উপকারে এসেছে?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আমি তাঁকে জাহান্নামের

গভীর স্থান থেকে হালকা স্থানে নিয়ে এসেছি।"

এবং সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত: যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাঁর চাচা আবু তালিবের কথা বলা হয়, তখন তিনি বললেন: "সম্ভবত কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে। ফলে তিনি জাহান্নামের এমন এক হালকা স্থানে অবস্থান করবেন যা তাঁর গোড়ালিতে পৌঁছবে, আর সেখান থেকে তাঁর মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে।" তিনি আরও বলেন: "জাহান্নামিদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন আবু তালিব; তিনি আগুনের দুটি জুতা পরবেন, যার কারণে তাঁর মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে।"

তদ্রূপ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য যে দোয়া করতেন, তা তাঁদের উপকারে আসতে পারত এইভাবে যে, এতে করে তাঁদের ওপর দুনিয়ার শাস্তি বিলম্বিত হতো। যেমন তিনি এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতেন যাঁকে তাঁর জাতি আঘাত করেছিল, আর তিনি বলছিলেন: "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না।" বলা হয়েছে যে, তিনি এই অর্থে দোয়া করেছিলেন: তাদের এমনভাবে ক্ষমা করো যেন তুমি তাদের ওপর দুনিয়ার শাস্তি তাড়াতাড়ি না আনো। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন, তবে যমীনের পৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তু ছেড়ে দিতেন না; কিন্তু তিনি নির্ধারিত এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের বিলম্ব দেন" (ফাতির: ৪৫)।

তদ্রূপ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাফেরদের জন্য দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাদের হেদায়াত দেন বা তাদের রিজিক দেন, আর আল্লাহ তাঁদের হেদায়াত দিতেন বা রিজিক দিতেন। যেমন তিনি আবূ হুরাইরার মায়ের জন্য দোয়া করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে হেদায়াত দিয়েছেন। আবার যেমন তিনি দাওস গোত্রের জন্য দোয়া করেছিলেন: "হে আল্লাহ! দাওসকে হেদায়াত দাও এবং তাদেরকে নিয়ে এসো", ফলে আল্লাহ তাদের হেদায়াত দিয়েছেন। এবং যেমন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, তিনি কিছু মুশরিকদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করেছিলেন, যখন তারা তাঁর কাছে বৃষ্টির দোয়া করতে অনুরোধ করেছিল, তখন তিনি তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন। এটি ছিল তাঁদের প্রতি তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ, যার মাধ্যমে তিনি তাঁদের অন্তরকে কোমল করতে চেয়েছিলেন, যেমন তিনি অন্যান্য উপায়েও তাঁদের অন্তর কোমল করতেন।

সমস্ত মুসলিম একমত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে সৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ

মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি; আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা কারও নেই, আর তাঁর সুপারিশের চেয়ে বড় সুপারিশও কারও নেই। তবে নবীদের দোয়া ও তাঁদের সুপারিশ ঈমান ও আনুগত্যের মর্যাদার সমতুল্য নয়। কেননা, তাঁদের প্রতি ঈমান এবং তাঁদের আনুগত্য পরকালের কল্যাণ ও শাস্তি থেকে পরিত্রাণের কারণ — নিঃশর্তভাবে ও সাধারণভাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে অবশ্যই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ করে, সে অবশ্যই জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিন্তু সুপারিশ ও দোয়া দ্বারা বান্দারা যেটুকু উপকার লাভ করে, তা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষ এবং তাতে কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। কাফেরদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুপারিশ বা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা—যদি তারা কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে—তাদের কোনো উপকারে আসে না, যদিও সুপারিশকারী ব্যক্তি সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বড় সুপারিশকারী কেউ নেই, এরপর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ। ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন এবং তার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করে দাও, যেদিন হিসাব কায়েম হবে" (ইবরাহীম: ৪১)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন, ইবরাহীমের অনুসরণ করে, আর কিছু মুসলিমও তাঁদের আত্মীয়দের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অবতীর্ণ করলেন: "নবী ও মু'মিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়-স্বজন হয়, যখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামবাসী" (আত-তাওবাহ: ১১৩)। তারপর আল্লাহ ইবরাহীমের ওযর তুলে ধরেন, বলেন: "আর ইবরাহীমের তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছিল কেবল একটি অঙ্গীকারের কারণে, যা সে তাকে দিয়েছিল। কিন্তু যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিল। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ও সহনশীল। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেওয়ার পর গোমরাহ করবেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দেন, তারা কী থেকে সাবধান থাকবে" (আত-তাওবাহ: ১১৪-১১৫)।

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্নিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইবরাহীম

কিয়ামতের দিনে তাঁর পিতা আজরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তখন আজরের চেহারা হবে অন্ধকার ও ধুলোময়। ইবরাহীম তাকে বলবেন: 'আমি কি তোমাকে বলিনি যেন আমার অবাধ্য হয়ো না?' তাঁর পিতা বলবে: 'আজ আমি তোমার অবাধ্য হবো না।' তখন ইবরাহীম বলবেন: 'হে আমার রব! তুমি তো আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করবে না। আর আমার পিতার (এই অবস্থায় দেখা যাওয়া) চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে?' আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহামহিম, বলবেন: 'আমি তো জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য হারাম করে রেখেছি।' তারপর বলা হবে: 'তোমার পায়ের নিচে তাকাও।' সে তাকাবে, তখন সে একটি রক্তমাখা হাইয়েনা দেখতে পাবে। তাকে পা ধরে তুলে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

অতএব, যেহেতু সে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল, তাই ইবরাহীমের তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোনো উপকারে আসেনি, যদিও ইবরাহীমের মর্যাদা ও মাকাম অত্যন্ত উচ্চ। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বলেছেন: "তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিল: 'আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করো, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমরা তোমাদের অস্বীকার করেছি, আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো'—ইবরাহীম কর্তৃক তাঁর পিতাকে বলা ব্যতীত—'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারি না। হে আমাদের রব! তোমার ওপরই আমরা নির্ভর করেছি, আর তোমারই দিকে আমরা ফিরে গিয়েছি, আর তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা করো না, আর আমাদের ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'" (আল-মুমতাহিনাহ: ৪-৫)।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের অনুসরণ করতে বলেছেন, তবে ইবরাহীমের তাঁর পিতাকে বলা—"আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব"—এর মধ্যে ব্যতিক্রম করেছেন, কেননা আল্লাহ কাউকে ক্ষমা করেন না যদি তাঁর সঙ্গে শিরক করা হয়।

তদ্রূপ, সকল সুপারিশকারীর নেতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি আমার প্রভুর কাছে আমার মায়ের জন্য

ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। তারপর আমি তাঁর কবরে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছি, আর তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।" আর এক বর্ণনায় এসেছে: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেন, আর তিনি কাঁদেন এবং চারপাশের লোকদেরও কাঁদিয়ে দেন। তারপর তিনি বলেন: "আমি আমার রবের কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আর আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছি, আর তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

এবং সহীহে আনাস থেকে বর্নিত: "এক ব্যক্তি বলল: 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা কোথায়?' তিনি বললেন: 'জাহান্নামে।' সে যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন: 'নিশ্চয়ই আমার পিতা এবং তোমার পিতা দুজনেই জাহান্নামে রয়েছে।'"

সহীহ হাদীসসমূহে আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত যে, যখন এই আয়াত নাজিল হলো: "আর সতর্ক করো আপনার নিকটাত্মীয়দের" (সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪), তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রকে আহ্বান করলেন, এবং তারা একত্রিত হলো। তিনি তাদেরকে সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে সম্বোধন করে বললেন: "হে বনী কা'ব ইবনে লু'য়্য, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো! হে বনী মুররাহ ইবনে কা'ব, নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো! হে বনী 'আব্দ শামস, নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো! হে বঅনী 'আব্দ মানাফ, নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো! হে বনী 'আব্দুল মুত্তালিব, নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো! হে ফাতিমাহ, তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো! আল্লাহর নিকট থেকে আমি তোমাদের জন্য কিছুই মালিক নই, তবে তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, যা আমি যথাযথভাবে রক্ষা করব।"

এবং এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন: "হে কুরাইশের জনগণ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট থেকে মুক্ত করে নাও, আমি তো আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না! হে বনী 'আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না! হে আব্বাস ইবনে 'আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন উপকার করতে পারব না! হে ছাফিয়্যাহ—আল্লাহর রাসুলের ফুফু! আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন উপকার করতে পারব না! হে ফাতিমাহ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চাইতে পারো, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।"

‘আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন "আর সতর্ক করো আপনার নিকটাত্মীয়দের" আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: “হে ফাতিমাহ, মুহাম্মদের কন্যা! হে ছাফিয়্যাহ, ‘আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা! আমি আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের জন্য কিছুই মালিক নই। আমার মাল থেকে যা ইচ্ছা চাইতে পারো।”

এবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি অবৈধ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তার ভয়াবহতা তুলে ধরলেন, এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করলেন। তারপর বললেন: “কেউ যেন কিয়ামতের দিনে তার ঘাড়ে ডাকরত উট নিয়ে আমার কাছে না আসে, আর বলে: ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে সাহায্য করুন!’ আমি তখন বলব: ‘আমি তোমার জন্য কিছুই মালিক নই; আমি তো তোমাদের কাছে (বার্তা) পৌঁছে দিয়েছি।’ কেউ যেন ঘাড়ে হামহাম করা ঘোড়া নিয়ে না আসে, কেউ যেন ছেংকার দেওয়া ভেড়া নিয়ে না আসে, কেউ যেন তার ঘাড়ে উড়ে যাওয়া কাপড় (চুরি করা বস্ত্র) নিয়ে না আসে, কেউ যেন তার ঘাড়ে নীরব ধন-সম্পদ (সোনা বা রৌপ্য) নিয়ে না আসে, আর বলে: ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে সাহায্য করুন!’ আমি বলব: ‘আমি তোমার জন্য কিছুই মালিক নই; আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।’”

এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয়ে তাদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম এতে আরও যোগ করেছেন: “কেউ যেন কিয়ামতের দিনে তার ঘাড়ে ক্রন্দনরত আত্মা (দাস) নিয়ে না আসে, আর বলে: ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে সাহায্য করুন!’ আমি বলব: ‘আমি তোমার জন্য কিছুই মালিক নই; আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।’”

বুখারীতে আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত আছে: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন এমন না আসে যে সে তার ঘাড়ে ভেড়া বহন করছে, যা ছেংকার দিচ্ছে, আর বলছে: ‘হে মুহাম্মদ!’ আমি বলব: ‘আমি তোমার জন্য কিছুই মালিক নই; আমি তো (বার্তা) পৌঁছে দিয়েছি।’ এবং কেউ যেন এমন না আসে যে সে তার ঘাড়ে উট বহন করছে, যা ডাকছে, আর বলছে: ‘হে মুহাম্মদ!’ আমি বলব: ‘আমি তোমার জন্য কিছুই মালিক নই; আমি তো পৌঁছে দিয়েছি।’”

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী “আমি আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের জন্য কিছুই মালিক নই”, এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তার পিতাকে বলা বাণীর অনুরূপ: "আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট থেকে তোমার জন্য কিছুই করবার অধিকার রাখি না" (সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৪)।

তাঁর মুমিনদের জন্য শাফাআত ও দু'আ দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী—এতে মুসলিমদের মধ্যে ইজমা রয়েছে। কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য পুরস্কার বৃদ্ধি ও মর্যাদা উন্নীতকরণের জন্য তাঁর শাফাআতের ব্যাপারেও মুসলিমদের ইজমা রয়েছে, যদিও কিছু বিদআতি তা অস্বীকার করেছে বলা হয়।

আর উম্মতের পাপীদের জন্য তাঁর শাফাআতের বিষয়ে সাহাবিগণ, তাদের পরবর্তী সৎ অনুসারীগণ এবং চার ইমামসহ সকল মুসলিম ইমাম একমত হয়েছেন। কিন্তু খারেজী, মু'তাজিলা ও জায়দিয়্যাহদের অনেক বিদআতি তা অস্বীকার করেছে। তারা বলে: যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা তা থেকে বের হবে না, না শাফাআতের দ্বারা, না অন্য কিছু দ্বারা। তাদের মতে, কেবল সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে যে জাহান্নামে প্রবেশ করেনি, এবং যে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না; তাদের মতে এক ব্যক্তির মধ্যে পুরস্কার ও শাস্তি একত্র হতে পারে না।

কিন্তু সাহাবাগণ, তাঁদের সৎ অনুসারীগণ এবং চার ইমামসহ অন্যান্য ইমামগণ মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা বর্নিত বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআতের দ্বারা আল্লাহ কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, আবার কিছু লোককে অন্যদের শাফাআতের মাধ্যমে বের করবেন, আবার কিছু লোককে কোন শাফাআত ছাড়াই বের করবেন।

শাফাআত অস্বীকারকারীরা আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা দলিল পেশ করেছে: "আর ভয় করো সেই দিনকে, যেদিন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জন্য কিছুই করতে পারবে না, আর তার থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, এবং তার থেকে কোন ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না" (সূরা আল-বাকারা: ৪৮), এবং "আর না গ্রহণ করা হবে ক্ষতিপূরণ, আর না উপকার দেবে সুপারিশ" (সূরা আল-বাকারা: ১২৩), এবং "পূর্বে এমন এক দিনের আগমন ঘটবে যার মধ্যে নেই কোন লেনদেন, বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৪), এবং "যালেমদের জন্য নেই কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কোন সুপারিশকারী যার কথা গ্রহণ করা হবে"

(সূরা গাফির: ১৮), এবং "তাদের কোন উপকারে আসবে না সুপারিশকারীদের সুপারিশ" (সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৪৮)।

আহলুস সুন্নাহর জবাব হলো, এতে দুটি বিষয় বোঝানো হয়েছে:

প্রথমত: শাফাআত মুশরিকদের উপকারে আসে না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বর্ণনা করে বলেন: "তোমাদের কী জাহান্নামে প্রবেশ করাল?" তারা বলবে, "আমরা নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, এবং আমরা মিসকিনদেরকে আহার্য দিতাম না। আমরা অসার আলোচনায় লিপ্ত থাকতাম এবং প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম, যতক্ষণ না মৃত্যু এসে পৌঁছাল। তখন তাদের উপকারে আসবে না কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ" (সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৪২-৪৮)। এদের শাফাআত অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ, তারা কাফির ছিল।

দ্বিতীয়ত: এতে সেই ধরনের শাফাআত অস্বীকার করা হয়েছে, যা মুশরিক ও তাদের সাদৃশ্য বিদআতীরা ধারণা করে—যারা মনে করে সৃষ্টি এমন মর্যাদার অধিকারী যে তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে, যেমন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে এবং তার প্রয়োজন বা ভয়-ভীতির কারণে তা গ্রহণ করা হয়, এবং যেভাবে এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে লেনদেন করে। মুশরিকরা ফেরেশতা, নবী এবং নেককারদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে সুপারিশকারী বানিয়েছিল, এবং তাদের প্রতিমা তৈরি করে তাদের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করত। তারা বলত: “তারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ, আমরা তাদের দোআ ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সওয়াল করি যাতে তারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করে।” যেমন রাজাদের নিকট তাদের অনুগতদের মাধ্যমে সওয়াল করা হয়, কারণ তারা রাজাদের নিকটে সাধারণের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী। তারা রাজাদের অনুমতি ছাড়াই সুপারিশ করে, এমনকি রাজা পছন্দ না করলেও, তাকে সেই সুপারিশ গ্রহণ করতে হয়, চাহিদা বা ভয়-ভীতির কারণে।

আল্লাহ এই ধরনের সুপারিশ অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?" (আল-বাকারা: ২৫৫)। তিনি আরও বলেন, "আকাশসমূহে বহু ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কিছুই কাজে আসবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ অনুমতি দেন যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং তিনি সন্তুষ্ট থাকেন" (আন-নাজম: ২৬)। তিনি ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন, "তারা(মুশরিকরা) বলে,

‘পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ পবিত্র মহান তিনি! বরং তারা সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে কথা বলতে পারে না এবং তাঁর আদেশেই কাজ করে। তিনি জানেন তাদের সামনে যা আছে এবং যা তাদের পেছনে আছে; আর তারা এমন কারো জন্যই সুপারিশ করতে পারে না, যিনি তাঁর অনুমোদিত, এবং তারা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত" (আল-আম্বিয়া: ২৬-২৮)। তিনি বলেন, "বলুন, ‘তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আহ্বান করো তাদের ডাকো।’ তারা আসমানসমূহ ও জমিনে এক কণার পরিমাণও অধিকার রাখে না, তাদের কোনো অংশীদারিত্বও সেখানে নেই, এবং তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। আর আল্লাহর নিকট সুপারিশ উপকারে আসে না, শুধুমাত্র তার জন্য যাকে তিনি অনুমতি দেন" (সাবা: ২২-২৩)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, আর তারা বলে, ‘এরা আমাদের সুপারিশকারী আল্লাহর নিকট।’ বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাও যা তিনি জানেন না আসমানসমূহে বা জমিনে?’ পবিত্র মহান তিনি এবং তিনি উঁচু যা তারা তাঁর সাথে শরিক করে" (ইউনুস: ১৮)। তিনি বলেন, "এবং এ দ্বারা (কুরআন) তাদেরকে সতর্ক করুন, যারা ভয় করে যে তারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে একত্রিত হবে—তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না—যাতে তারা ভয় করে" (আল-আন'আম: ৫১)। তিনি বলেন, "আল্লাহই যিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তাঁর ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী নেই। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (আস-সাজদা: ৪)। তিনি বলেন, "তারা যাদেরকে তাঁকে ছাড়া আহ্বান করে, তারা কোনো সুপারিশের ক্ষমতা রাখে না; কেবল তারা পারে, যারা সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং তারা জানে" (আয-যুখরুফ: ৮৬)। তিনি বলেন, "তোমরা তো আমাদের নিকট এসেছ একাকী, যেমন করে আমরা প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, এবং তোমরা যা কিছু তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমাদের পেছনে ফেলে এসেছ। আর আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের সেই ‘সুপারিশকারীদের’ দেখি না, যাদেরকে তোমরা অংশীদার মনে করতে। তোমাদের মাঝে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, এবং তোমরা যা দাবী করতে তা হারিয়ে গেছে" (আল-আন'আম: ৯৪)। তিনি বলেন, "তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে? বলুন, ‘যদিও তারা কোনো কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না, আর তারা বুঝেও না?’ বলুন, ‘সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব তাঁরই। অতঃপর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।’ যখন একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয় সংকুচিত হয় বিরক্তিতে; আর যখন তাঁর ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয়, তখন তারা আনন্দিত হয়" (আয-যুমার: ৪৩-৪৫)। তিনি বলেন, "আর সব কণ্ঠস্বর পরম করুণাময়ের সামনে স্তব্ধ হয়ে যাবে, আর তুমি কিছুই শুনবে

না, শুধুমাত্র মৃদু ফিসফাস। সেদিন কোনো সুপারিশ উপকারে আসবে না, শুধু তার জন্যই, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেন এবং যার জন্য তিনি বক্তব্য অনুমোদন করেন" (ত্বা-হা: ১০৮-১০৯)। এবং ইয়াসীন-এর সাথী বলেন, "আমি কেন তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে? আমি কি তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে উপাস্য গ্রহণ করবো? যদি পরম করুণাময় আমার জন্য কোনো অকল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না, এবং তারা আমাকে রক্ষা করতেও পারবে না। নিশ্চয়ই তখন আমি স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবো। আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো" (ইয়াসীন: ২২-২৫)।

সুতরাং, এই সেই সুপারিশ যার বিশ্বাস মউশরিক-রা ফিরিশতা, নবী এবং সৎলোকদের জন্য করেছিল—এমনকি তারা তাদের মূর্তি বানিয়েছিল এবং বলেছিল, 'আমরা তাদের ছবি দিয়ে সুপারিশ প্রার্থনা করছি মানে আমরা তাদের মাধ্যমেই সুপারিশ চাইছি।' আর তারা তাদের কবরের নিকটে গিয়ে বলত, 'আমরা তাদের মৃত্যুর পর তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সুপারিশ চাই যাতে তারা আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে।' এবং তারা তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদের উপাসনা করত।

এই ধরনের সুপারিশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল বাতিল ঘোষণা করেছেন, মুশরিক -দেরকে এর কারণে নিন্দা করেছেন এবং তাদেরকে কাফির গণ্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওম সম্পর্কে বলেন, "তারা বলল, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনো পরিত্যাগ করো না এবং ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসরকেও কখনো পরিত্যাগ করো না।' এবং তারা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে" (নূহ: ২৩-২৪)। ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্যরা বলেন: এরা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের কিছু সৎলোক ছিল। যখন তারা মারা গেল, তখন মানুষ তাদের কবরকে কেন্দ্র করে উৎসর্গ করতে লাগল, পরে তারা তাদের মূর্তি বানিয়ে উপাসনা করতে লাগল।

এটি তাফসীর, হাদীস এবং অন্যান্য কিতাবে সুপরিচিত, যেমন বুখারী ইত্যাদিতে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, এর শিকড় কেটে দেন এবং সকল পথ বন্ধ করে দেন—এমনকি তিনি তাদের ওপর লানত করেন যারা নবী ও সৎলোকদের কবরকে এমন স্থান বানায় যেখানে ইবাদত করা হয়, যদিও সেখানে নামাজ পড়া ব্যক্তি তাদের মাধ্যমে

সুপারিশ না-ও চায়। তিনি কবরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করেন এবং আলী ইবনে আবী তালিবকে পাঠিয়েছিলেন এই আদেশ দিয়ে যে তিনি যেন কোনো উঁচু কবর ছেড়ে না দেন তা সমান না করে, এবং কোনো ছবি ছেড়ে না দেন তা মুছে না ফেলে। আর তিনি ছবিসমূহ অঙ্কনকারীদের উপর লানত করেছেন। আবু আল-হাইয়্যাজ আল-আসাদী থেকে বর্ণিত: আলী ইবনে আবী তালিব আমাকে বলেছিলেন: "আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠাব না, যেই কাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? যেন তুমি কোনো ছবি রেখে না আসো তা মুছে না ফেলে, এবং কোনো উঁচু কবর না রেখে না আসো তা সমান না করে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "এবং কোনো চিত্রকলা যেন তুমি মুছে না ফেলো।" মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

“তাওয়াসসুল” শব্দটি দ্বারা তিনটি অর্থ উদ্দেশ্য করা হতে পারে

এর দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে ইজমাপূর্ণ দুটি অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে:

প্রথমটি হলো ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি, যা হল তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করা।

দ্বিতীয়টি হল তাঁর দোয়া ও শাফাআত, যা উপকারী এবং যার জন্য তিনি দোয়া করেন ও শাফাআত করেন, সে এর মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করে—এটিও মুসলিমদের ইজমাভিত্তিক বিষয়।

যে কেউ এই দুটি অর্থের যে কোনো একটি অর্থে তাঁর মাধ্যমে তাওয়াস্সুলকে অস্বীকার করে, সে একজন কাফির, ধর্মত্যাগী, যাকে তাওবা করার আহ্বান জানানো হয়। যদি সে তাওবা করে, তবে ভালো; না করলে তাকে ধর্মত্যাগী হিসেবে হত্যা করা হয়। তবে তাঁর প্রতি ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করা হচ্ছে দ্বীনের মৌলভিত্তি, এবং এটি ইসলামের দ্বীন থেকে সকল শ্রেণির মানুষ—বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ উভয়ের—জন্য জানা বিষয়। সুতরাং যে কেউ এ অর্থকে অস্বীকার করে, তার কুফর প্রকাশ্য, যা আলেম-জহাল্লা সবার নিকটই পরিষ্কার।

আর তাঁর দোয়া ও শাফাআত এবং মুসলিমদের এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়টি যে অস্বীকার করে, সে-ও কাফির। তবে এ অস্বীকার পূর্বের তুলনায় বেশি গোপন। তাই কেউ যদি অজ্ঞতার কারণে এটি অস্বীকার করে, তবে তাকে তা জানিয়ে দেওয়া উচিত; এরপরও যদি সে অস্বীকারে স্থির থাকে, তবে সে মুরতাদ গণ্য হবে।

তাঁর পার্থিব জীবনে দোয়া ও শাফাআতের বিষয়টি—এতে কিবলার অনুসারীদের কেউই বিরোধিতা করেনি। আর কিয়ামতের দিনে শাফাআতের ব্যাপারে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ—যাঁরা সাহাবা, তাঁদের সৎ

অনুসারী এবং চার ইমামসহ সমস্ত মুসলিম ইমামগণ—এর অবস্থান হল যে, তিনি কিয়ামতের দিন বিশেষ ও সাধারণ শাফাআত করবেন। তিনি তাঁর উম্মতের মধ্যে যাদের জন্য আল্লাহ তাকে অনুমতি দেবেন, তাঁদের মধ্যে কবিরা গুনাহগারদের জন্য শাফাআত করবেন।

তাঁর শাফাআত কেবল তাওহীদের অনুসারী, মু'মিনদের উপকারে আসবে; মুশরিকদের কোন উপকারে আসবে না— যদি মুশরিক কেউ তাঁকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তবুও তাঁর শাফাআত তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কেবলমাত্র তাওহীদ ও তাঁর প্রতি ঈমানই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। এ কারণেই আবু তালিব ও অন্যরা তাঁকে ভালোবাসলেও যেহেতু তাঁরা তাঁর আনীত তাওহীদকে স্বীকার করেনি, তাই তাঁর বা অন্য কারো শাফাআতের মাধ্যমে তাঁদের জন্য জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয়নি।

সহীহ বুখারিতে আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল, কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআতের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবেন?” তিনি বলেন: “কিয়ামতের দিন আমার শাফাআতের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি সে, যে অন্তর থেকে আন্তরিকভাবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।”

আর সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “প্রতিটি নবী একটি করে কবুলযোগ্য দোয়ার মালিক ছিলেন, এবং প্রত্যেক নবী তাঁর সেই দোয়া দ্রুত করে নিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার দোয়াটি কিয়ামতের দিন শাফাআতের জন্য রেখে দিয়েছি। আল্লাহ চাইলেই এটি আমার উম্মতের সেই সকলের জন্য কার্যকর হবে, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে।”

আর সুনান গ্রন্থে ‘আউফ ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা আগমন করেন এবং আমাকে দুটি বিকল্প দেন—আমার অর্ধেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ অথবা শাফাআতের সুযোগ। আমি শাফাআত বেছে নিয়েছি, এবং এটি তার জন্য হবে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে।” অন্য বর্ণনায় আছে, “যে কেউ আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, সে আমার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

এই ভিত্তিটি—তাওহীদ—ই হচ্ছে দ্বীনের মূল ভিত্তি, যার ব্যতীত আল্লাহ প্রথম ও শেষ কোনো মানবজাতির কারো দ্বীনই গ্রহণ করেন না। এ তাওহীদ নিয়েই আল্লাহ রাসুলদের প্রেরণ করেছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমার পূর্বে যাদেরকে প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো—আমরা কি কখনো রহমান ছাড়া অন্য ইলাহকে পূজার জন্য নির্ধারিত করেছিলাম?" (সূরা যুখরুফ: ৪৫)। আবার বলেন: "আমি তোমার পূর্বে কোনো রাসুলকেই প্রেরণ করিনি, কিন্তু তাঁর প্রতি এ ওহি পাঠিয়েছি—'আমিই একমাত্র ইলাহ, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।'" (সূরা আম্বিয়া: ২৫)। আরও বলেন: "আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট একটি রাসুল প্রেরণ করেছি—'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।' অতঃপর তাদের কেউ কেউ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়।" (সূরা নাহল: ৩৬)

আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহান, প্রত্যেক রাসুল সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে এ কথা বলেই আহ্বান করেছেন: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই" (সূরা আ'রাফ: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; সূরা হুদ: ৫০, ৬১, ৮৪; সূরা মু'মিনূন: ২৩, ৩২)।

মুসনাদে ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমাকে তরবারির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের ঘনিষ্ঠ পূর্বে, যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা হয়, তাঁর কোনো শরিক না থাকে। আমার রিযিক আমার বর্শার ছায়াতলে স্থাপন করা হয়েছে, আর যে আমার আদেশের বিরোধিতা করে, তার ওপর অপমান ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যে কোনো কওমের অনুরূপ, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

কুরাইশ ও অন্যান্য মুশরিকরা—যাদের শিরকের কথা কুরআনে এসেছে, যাদের রক্ত ও সম্পদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল করেছেন, যাদের নারীদের বন্দী করেছেন এবং যাদের জন্য তিনি জাহান্নাম অবধারিত করেছেন—তারা স্বীকার করত যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ, যেমন তিনি বলেন: "তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সূরা লুকমান: ২৫)

তিনি আরও বলেন: “তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো, ‘কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ তখন তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?” (সূরা আনকাবূত: ৬১)

তিনি বলেন: “বলো, ‘পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা কার?’ যদি তোমরা জানো?” তারা বলবে, ‘আল্লাহর।’ বলো, ‘তাহলে তোমরা স্মরণ করো না কেন?’ বলো, ‘সাত আকাশের প্রতিপালক ও মহা আরশের প্রতিপালক কে?’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ।’ বলো, ‘তাহলে তোমরা ভয় করো না কেন?’ বলো, ‘সবকিছুর কর্তৃত্ব যার হাতে, যিনি রক্ষা করেন অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ রক্ষা করতে পারে না—তা যদি তোমরা জানো?’ তারা বলবে, ‘সবই আল্লাহর।’ বলো, ‘তবে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছো?’ বরং আমরা তাদের কাছে সত্য এনেছি, আর নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।” (সূরা মু’মিনূন: ৮৪-৯০)

মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরিক করেছে, তারা স্বীকার করত যে, সেই উপাস্যরা সৃষ্ট, কিন্তু তারা তাদেরকে সুপারিশকারী মনে করত এবং তাদের ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাইত, যেমন আল্লাহ বলেন: “তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে, যা তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, আর বলে, ‘এরা আমাদের আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।’ বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাও, যা তিনি জানেন না আসমানসমূহে বা জমিনে?’ তিনি পবিত্র ও মহান, যাদেরকে তারা শরিক করে।” (সূরা ইউনুস: ১৮)

আবার বলেন: “এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি, অতএব আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর জন্যই দ্বীনকে খাঁটি রেখে। জান রেখো, আল্লাহর জন্যই খাঁটি দ্বীন। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ করে, তারা বলে, ‘আমরা কেবল এদের ইবাদত করি যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে।’ অবশ্যই আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে পথ দেখান না, যে মিথ্যাবাদী ও কাফির।” (সূরা যুমার: ১-৩)

তারা(মুশরিকরা) তালবিয়ায় বলত: “লাব্বাইক, তোমার কোনো শরিক নেই, তবে একটি শরিক আছে, সে

তোমারই মালিক, তুমিই তার মালিক।”

আল্লাহ বলেন: “তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেন। তোমাদের ডান হাতের অধিকারভুক্তদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যাকে তোমরা তোমাদের জীবিকার অংশীদার মনে করো—যাতে তোমরা সমান হয়ে যাও এবং একে অপরের মতো তাদের ভয় করো?” (সূরা রূম: ২৮)

এইভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তার মালিকানাধীন বান্দাকে তিনি শরিক করা উপযুক্ত নয়। যদি তোমরা নিজের দাসকে তোমার সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে মানতে রাজি না হও, তবে কীভাবে আল্লাহর বান্দাকে তাঁর শরিক মানো?

এটি তাদের মতোই যারা বলে, আল্লাহর কন্যাসন্তান আছে। তখন আল্লাহ বলেন: “তারা আল্লাহর জন্য এমন কিছু নির্ধারণ করে যা তারা নিজেরাই অপছন্দ করে, আর তাদের জিহ্বা বলে মিথ্যা যে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ! নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম, এবং তাতে তারা তাড়িত হবে।” (সূরা নাহল: ৬২)

আর বলেন: “তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে ক্ষোভ চেপে রাখে। সে লজ্জায় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। সে চিন্তা করে, অপমানে ধরে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? শুনে রাখো, কত নিকৃষ্ট তারা ফয়সালা করে!” (সূরা নাহল: ৫৮-৬০)

যে মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরকের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন, তারা মূলত দুই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত: নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওম এবং ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর কওম।

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওম: তাদের শিরকের সূচনা হয়েছিল নেককার ব্যক্তিদের কবরের কাছে ভক্তি প্রদর্শন থেকে। অতঃপর তারা তাদের মূর্তি নির্মাণ করল, তারপর তাদের উপাসনা শুরু করল।

ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর কওম: তাদের শিরকের মূল ছিল তারা নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদের উপাসনা

করত।

এই দুই দলই জিনদের উপাসনা করত, কারণ শয়তানেরা তাদের সাথে কথা বলত এবং কিছু বিষয়ে তাদেরকে সাহায্য করত। তারা ভাবত তারা ফেরেশতাদের উপাসনা করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা জিনদের উপাসনা করত, কারণ জিনেরাই তাদের সাহায্য করত এবং তাদের শিরকে সন্তুষ্ট ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"স্মরণ কর, যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফেরেশতাদের বলবেন, 'তোমাদেরকেই কি এরা উপাসনা করত?' তারা বলবে, 'আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বরং তারা জিনদের উপাসনা করত, অধিকাংশই তাদের ওপর বিশ্বাসী ছিল।'" (সাবা: ৪০-৪১)

ফেরেশতাগণ কখনো তাদের শিরকে সাহায্য করেন না, না জীবিত অবস্থায়, না মৃত্যুর পর, এবং তারা এতে সন্তুষ্টও হন না। কিন্তু শয়তানরা তাদের সাহায্য করতে পারে এবং মানুষের রূপ ধরে তাদের সামনে উপস্থিত হয়; তারা তাদের চোখে দেখে এবং তখন এক শয়তান বলে, 'আমি ইবরাহিম', 'আমি ঈসা', 'আমি মুহাম্মাদ', 'আমি খিযির', 'আমি আবু বকর', 'আমি উমর', 'আমি উসমান', 'আমি আলী', 'আমি অমুক শাইখ।' তাদের মধ্যে কেউ কাউকে নিয়ে বলে, 'এটাই অমুক নবী' বা 'এটাই খিযির', অথচ এরা সবাই একে অপরের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন জিন। জিনেরা মানুষের মতোই: তাদের মধ্যে আছে কাফির, ফাসিক, অবাধ্য, অজ্ঞ উপাসকও। তাদের মধ্যে কেউ কোনো শায়খকে ভালোবাসে, ফলে সে তার রূপ ধারণ করে বলে, 'আমি অমুক।' এটি কোনো নির্জন স্থান বা প্রান্তরে ঘটতে পারে। সে তাকে খাদ্য-পানীয় দিতে পারে, পথ দেখাতে পারে, বা কোনো ঘটনার সংবাদ দিতে পারে। তখন মানুষটি ভাবে, এটি মৃত বা জীবিত শায়খের আত্মা করেছে। সে বলে, 'এটি শায়খের গোপন রহস্য', 'এটি তার সূক্ষ্ম সত্তা', 'এটি তার হাকীকত', অথবা 'এটি একজন ফেরেশতা, যিনি তাঁর রূপে এসেছেন।' অথচ এটি কেবল একজন জিন, কারণ ফেরেশতারা শিরক, মিথ্যা, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহায়তা করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"বলুন, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া ডাকো, তাদের ডেকে দেখো; তারা তোমার কষ্ট দূর করার শক্তি রাখে না, না তা সরিয়ে নেয়ার।' যাদেরকে তারা ডাকে, তারাও নিজেদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজে—কে তার নিকটবর্তী হবে—তারা তাঁর রহমত প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।" (ইসরা: ৫৬-৫৭)

সালাফদের একদল বলেন: এমন লোক ছিল যারা ফেরেশতা ও নবীদের, যেমন উজাইর ও মসীহের নিকট দোয়া করত। তাই আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ফেরেশতা ও নবীগণও আল্লাহর বান্দা, যেমন উপাসনাকারীরাও বান্দা, এবং তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, তারাও আল্লাহর রহমতের আশা করে, শাস্তির ভয় রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায়, যেমন সকল সৎকর্মশীল বান্দা করে।

এই মুশরিকদের কেউ কেউ বলে: "আমরা তাদের মাধ্যমে সুপারিশ কামনা করি," অর্থাৎ আমরা ফেরেশতা ও নবীদের নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করি। "তাদের কারো কবরের নিকট গিয়ে আমরা তার কাছে সুপারিশ চাই। যখন আমরা তাদের মূর্তি তৈরি করি—যা হয় ভাস্কর্য অথবা আঁকা চিত্র, যেমন খ্রিস্টানরা গির্জায় যেভাবে আঁকে—তারা বলে: এই চিত্রগুলোর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে স্মরণ রাখা ও তাদের জীবনধারাকে মনে রাখা, এবং আমরা এই চিত্রগুলোর প্রতি সম্বোধন করি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মূল ব্যক্তিকে সম্বোধন করা, যাতে সে আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করে।"

তাদের কেউ বলে: "হে আমার প্রভু অমুক", অথবা "হে আমার প্রভু জিরজিস বা বুতরুস", অথবা "হে আমার প্রভু মারইয়াম", অথবা "হে আমার প্রভু ইবরাহিম বা মূসা ইবনে ইমরান" ইত্যাদি, "আপনি আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করুন।" তারা মৃত ব্যক্তিকে কবরের কাছে সম্বোধন করে বলে, "আপনার রবের নিকট আমার জন্য প্রার্থনা করুন।" অথবা জীবিত থাকা অবস্থায় অদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তারা তাকে এমনভাবে সম্বোধন করে, যেন সে সামনে উপস্থিত। তারা কবিতা আবৃত্তি করে, যাতে কেউ বলে: "হে আমার প্রভু অমুক, আমি আপনার আশ্রয়ে এসেছি, আমি আপনার সান্নিধ্যে, আল্লাহর কাছে আমার জন্য সুপারিশ করুন, আমাদের শত্রুর ওপর বিজয় দানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, এই দুঃখ দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, আমি অমুক কষ্টের অভিযোগ করছি আপনার কাছে, দয়া করে আল্লাহর নিকট দোয়া করুন।" কেউ কেউ বলে, "আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ তা'আলার এই বাণীকে ভুল ব্যাখ্যা করে:

"আর যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি তোমার কাছে আসত (হে মুহাম্মাদ), এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়ালু পেত।" (নিসা: ৬৪)

তারা বলে, "আমরা যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তবে আমরা সাহাবাদের মতোই হবো যারা তাঁর জীবদ্দশায় ক্ষমা প্রার্থনা করত।" অথচ এইভাবে তারা সাহাবা, তাবেঈন এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইজমার বিরোধিতা করে। কারণ, তাঁদের মধ্যে কেউই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে সুপারিশ চায়নি, কোনো কিছু চায়নি, এবং কোনো ইমামও এটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি। বরং কিছু পরবর্তী যুগের ফকীহ এটি উল্লেখ করেছেন একটি জাল কাহিনীর মাধ্যমে যা ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ)-এর নামে চালানো হয়েছে, যা পরে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই ধরণের ফেরেশতা, নবী, ওলীদের মৃত্যুর পর, কবরের পাশে কিংবা অনুপস্থিত অবস্থায় সম্বোধন করা, কিংবা তাদের চিত্রকে সম্বোধন করা—যার অর্থ তাদের মাধ্যমে সুপারিশ চাওয়া—এমন এক ধর্মের অংশ, যা আল্লাহ শরীয়ত দেননি, কোনো রাসুল এর জন্য পাঠাননি, কোনো কিতাবে এটি অবতীর্ণ করেননি। মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী এটি না ওয়াজিব, না মুস্তাহাব। সাহাবা, তাবেঈন, কিংবা কোনো ইমাম এ কাজ করেননি, বরং কেউ এর নির্দেশ দেননি।

যদিও এই ধরণের শিরক অনেক সাধক ও যাহিদ দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং তারা এসব নিয়ে অনেক কাহিনী ও স্বপ্ন বর্ণনা করে, তবুও এসব সবই শয়তানের পক্ষ থেকে। তাদের কেউ কেউ মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কবিতা রচনা করে, তার মাধ্যমে সুপারিশ চায়, সাহায্য চায়, অথবা নবী-রসূল ও ওলীদের প্রশংসা করতে গিয়ে এসব কথাবার্তা বলে। এগুলোর কোনোটিই শরীয়তে বিধিবদ্ধ নয়, না ওয়াজিব, না মুস্তাহাব—সমস্ত ইমামদের ইজমা অনুযায়ী।

যে ব্যক্তি এমন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে যা না ওয়াজিব, না মুস্তাহাব—অথচ সে এটিকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব মনে করে—সে পথভ্রষ্ট, বিদআতী এবং অপবিত্র বিদআতের অনুসারী, ভালো বিদআতেরও নয়—সমস্ত ইমামের একমত অনুযায়ী। কারণ আল্লাহর ইবাদত কেবল ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বিষয়ের মাধ্যমেই করা যায়। অনেকেই এই ধরণের শিরকের ভেতর বিভিন্ন উপকারিতা ও ফজিলত বর্ণনা করে এবং মতামত, ব্যক্তিগত পছন্দ, অনুকরণ, স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

এই শ্রেণির মানুষের প্রতি জবাব দ্বি-মাত্রিক:

প্রথমত: কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন।

দ্বিতীয়ত: কিয়াস, রুচিবোধ ও বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে, এ বিষয়ের মধ্যে যে বিপর্যয় ও ক্ষতি নিহিত আছে তা স্পষ্ট করা, কারণ এতে যে ক্ষতি নিহিত আছে, তা থেকে প্রাপ্ত সামান্য উপকারের চেয়ে অধিকতর ভারী।

প্রথম বিষয়ে বলা যায়: ইসলামের ধর্ম থেকে এটি একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ ও তাওয়াতুর প্রাপ্তভাবে জানা, এবং উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের ইজমার দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত যে মৃত বা অনুপস্থিতদের নিকট থেকে চাওয়া (দোয়া, সুপারিশ ইত্যাদি) কখনোই ওয়াজিব বা মুস্তাহাব নয়। জানা কথা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পূর্ববর্তী কোনো নবীও মানুষের জন্য এই পদ্ধতি প্রচলন করেননি যে তারা ফেরেশতা, নবী ও সৎ ব্যক্তিদের নিকট দোয়া করে কিংবা তাঁদের মাধ্যমে সুপারিশ কামনা করে, তাঁদের মৃত্যুর পর কিংবা অনুপস্থিত থাকা অবস্থায়। কেউ বলে না: "হে আল্লাহর ফেরেশতাগণ! আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করো! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য জয়, রিজিক ও হিদায়াত কামনা করো।" অনুরূপভাবে, কেউ মৃত নবী বা সৎ ব্যক্তির নিকট বলে না: "হে আল্লাহর নবী! হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো! আমার জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করো! আল্লাহর কাছে চাও যে তিনি আমাকে মাফ করে দিন, হিদায়াত দিন, বিজয় দিন বা সুস্থতা দান করুন।" কেউ বলেনা: "আমি আমার গুনাহর অভিযোগ তোমার নিকট করছি," অথবা "আমার রিজিকের সংকট," বা "শত্রুর আধিপত্য," বা "অমুক ব্যক্তি আমাকে যুলুম করেছে তার বিষয়ে অভিযোগ করছি।" কেউ বলেনা: "আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি, আমি তোমার মেহমান, আমি তোমার প্রতিবেশী," বা "তুমি যার আশ্রয় দাও সে নিরাপদ হয়," কিংবা "তুমি সর্বোত্তম আশ্রয়দাতা।" কেউ কবরের পাশে চিঠি লিখে ঝুলিয়ে দেয় না, কেউ কবরবাসীর নামে কোনো দরখাস্ত লিখে তা এমন কারো কাছে নিয়ে যায় না যে ঐ দরখাস্তের ভিত্তিতে কিছু করে থাকে—এগুলো সেইসব বিদআতের অন্তর্ভুক্ত যা আহলে কিতাব ও কিছু মুসলিম উদ্ভাবন করেছে, যেমন খ্রিষ্টানরা তাদের গির্জাগুলোতে করে এবং কিছু মুসলিম বিদআতীরা নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবরের পাশে কিংবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে করে থাকে।

এটি ইসলামের ধর্ম থেকে স্বতঃসিদ্ধ, তাওয়াতুরে প্রাপ্ত এবং মুসলিমদের ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য এসব কিছু শরীয়ত হিসেবে নির্ধারণ করেননি। অনুরূপভাবে, তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণও এসব কিছু শরীয়তরূপে নির্ধারণ করেননি। এমনকি আহলে কিতাবদের নিকটও কোনো নবী থেকে এসব বিষয়ে কোনো রেওয়ায়াত নেই, যেমনিভাবে মুসলিমদের কাছেও তাদের নবী থেকে এসব বিষয়ে কিছু নেই। তাঁদের নবীর সাহাবাগণ, তাদের পরবর্তী সৎ অনুসারীগণ

কিংবা মুসলিমদের কোনো ইমামই এসব কিছু করেননি। চার ইমামসহ অন্য কেউও এসবকে মুস্তাহাব মনে করেননি। কোনো ইমাম এমনকি হজ্জের আহকামেও বলেননি যে, কেউ নবীর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর উম্মতের জন্য সুপারিশ চাওয়া মুস্তাহাব, বা তাঁর নিকট দোয়া চাওয়া মুস্তাহাব, কিংবা উম্মতের ওপর পতিত দুনিয়া ও দ্বীনের বিপদ সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ করা উচিত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর তাঁর সাহাবারা বহু ধরনের বিপদের সম্মুখীন হন—কখনো খরা, কখনো রিজিকের সংকট, কখনো শত্রুর ভয়, কখনো গুনাহ ও অমান্যতা। কিন্তু তাঁদের কেউও নবীর কবরের কাছে এসে বলেননি: "আমরা সময়ের খরা, শত্রুর শক্তি বা গুনাহের আধিক্যের অভিযোগ করছি।" অথবা বলেননি: "আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য বা আপনার উম্মতের জন্য রিজিক চাও, বিজয় চাও, মাফ চাও।"

বরং এই জাতীয় বিষয়াবলি বিদআতের অন্তর্ভুক্ত, যা মুসলিমদের কোনো ইমাম মুস্তাহাব মনে করেননি। অতএব, ইমামদের ইজমা অনুযায়ী, এগুলো না ওয়াজিব, না মুস্তাহাব।

প্রত্যেক বিদআত, যা না ওয়াজিব, না মুস্তাহাব—তা মন্দ বিদআত এবং পথভ্রষ্টতা, মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী। কেউ যদি কোনো বিদআত সম্পর্কে বলে যে এটি 'ভালো বিদআত', তার অর্থ হচ্ছে—যদি শরীয়ত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এটি মুস্তাহাব, তখনই তা ভালো। আর যা শরীয়ত থেকে মুস্তাহাব বা ওয়াজিব প্রমাণিত নয়, কোনো মুসলিম তা আল্লাহর নিকট সন্নিকট হওয়ার ভালো আমল বলে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এমন কিছু দ্বারা সন্নিকট হতে চায় যা শরীয়তে ভালো আমল হিসেবে নির্ধারিত নয়—না ওয়াজিব, না মুস্তাহাব—সে পথভ্রষ্ট, শয়তানের অনুসারী, এবং তার পথ শয়তানের পথ। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য একটি সরল রেখা আঁকলেন, এবং এরপর ডান ও বাম পাশে কিছু রেখা আঁকলেন, তারপর বললেন: "এটি আল্লাহর পথ, আর এইগুলো বিভিন্ন পথ; প্রত্যেক পথের উপরে একটি শয়তান আছে যে লোকজনকে ওই পথে আহ্বান করে।" এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: "আর এই আমার সরল পথ, সুতরাং একে অনুসরণ করো এবং অন্য পথসমূহ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে" (আনআম: ১৫৩)।

এটি একটি সর্বজনীন নিয়ম, যা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি মান্য করবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে ঈমান

এনেছে। কেউ যেন সুপরিচিত সুন্নাহ ও মুহাজির ও আনসারদের অগ্রগামীদের পথ এবং সৎ অনুসারীদের পথে বিরোধিতা না করে এমন কারো অনুসরণ করে, যে সুন্নাহ এবং প্রাথমিক ইজমার বিরোধিতা করছে—বিশেষ করে যদি তার পক্ষে মুসলিম ইমামদের কেউ না থাকে, অথবা কোনো মুজতাহিদ যার মতামত দ্বীনে গ্রহণযোগ্য, কিংবা কোনো এমন ব্যক্তি যার মত ইজমা ও মতভেদে প্রভাব ফেলে। তার বিরোধিতায় ইজমা ভঙ্গ হয় না, এবং তার সম্মতিতেই ইজমা নির্ভর করে না। যদি ধরে নেওয়া হয় কোনো মুজতাহিদ এ বিষয়ে ইখতিলাফ করেন, তবে তাঁকে তাওয়াতুরপ্রাপ্ত সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী ইমামদের ইজমা দ্বারা খণ্ডন করা হবে। তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে, যখন সে মুজতাহিদ নয়, তার কোনো শরয়ি দলীল নেই, বরং সে এমন কারো অনুসরণ করছে যে জ্ঞান ছাড়াই ধর্ম নিয়ে কথা বলছে, এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান, হিদায়াত কিংবা জ্যোতির্ময় কিতাব ছাড়াই বিতর্ক করে।

নিশ্চয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এই কর্মকাণ্ডকে শরীয়তরূপে নির্ধারণ করেননি—সুতরাং তা না ওয়াজিব, না মুস্তাহাব—বরং তিনি তা হারাম করেছেন এবং যা এর দিকে নিয়ে যায় সেটাও নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানানো নিষিদ্ধ করেছেন। সহীহ মুসলিমে জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীরা কবরকে ইবাদতের স্থান বানাতো। সতর্ক হও! তোমরা কবরকে ইবাদতের স্থান বানিও না, আমি তোমাদেরকে তা নিষিদ্ধ করছি।" এবং সহীহ বুখারি ও মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় বলেন: "আল্লাহ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অভিশাপ করুন; তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে"—এতে তিনি তাদের কাজ থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আয়িশা বলেন: "এ কারণে তাঁর কবর প্রকাশ্যে করা হয়নি, কেননা তিনি ঘৃণা করতেন যে তাঁর কবরকে ইবাদতের স্থান বানানো হোক।"

'ইবাদতের স্থান' বানানো অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসহ অন্যান্য ইবাদতের জন্য তা নির্ধারণ করা, যেমন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। যে স্থানকে মসজিদ বানানো হয়, তা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত, সৃষ্টি জগতের কারো কাছে দোয়া করার জন্য নয়। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কবরকে এমন স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন, যে স্থানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত—যদিও সে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদতের নিয়তে তা করে—কারণ এটি শিরকের পথে পৌঁছাতে পারে। যদি কেউ সেই স্থানকে কবরবাসীর নামে, তার নিকট দোয়া, তার মাধ্যমে দোয়া, অথবা তার নিকটে দোয়ার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করে,

তাহলে তো কথাই নেই। সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এজন্যও তা নিষেধ করেছেন যে কেউ তা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করলেও, তা যেন শিরকের মাধ্যম না হয়।

যে কোনো কাজ যদি অনিষ্ট ডেকে আনে এবং এতে যদি বড় কোনো উপকারিতা না থাকে, তবে তা হারাম। যেমন তিনি (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনটি (নিষিদ্ধ) সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, কারণ এতে অনিষ্ট বেশি, আর তা হলো মুশরিকদের সাদৃশ্য গ্রহণ, যা শিরকে পরিণত হয়। আর ঐ সময়ে সালাত আদায়ের নিয়তের মধ্যে এমন কোনো বড় উপকারিতা নেই, যেহেতু অন্য সময়ে নফল সালাত আদায় করা সম্ভব। এজন্যই উলামাগণ এমন সালাত নিয়ে ইখতিলাফ করেছেন যেগুলোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট কারণ আছে; তাদের অনেকে ঐ সময়ে তা বৈধ বলেছেন, এবং এটাই উভয় অভিমতের মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা যখন কোনো নিষেধাজ্ঞা অনিষ্টের মাধ্যম রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হয়, তখন বড় উপকারের কারণে তা বৈধ হয়। যেসব সালাতের পেছনে নির্দিষ্ট কারণ থাকে, সেগুলো ঐ সময়ে আদায় প্রয়োজন হয় এবং তা তখন আদায় না করলে বাদ পড়ে যায়, ফলে তার উপকারিতা নষ্ট হয়। তাই এতে যেহেতু বড় উপকারিতা রয়েছে, এজন্য তা বৈধ হয়েছে; পক্ষান্তরে যেসব সালাতের পেছনে কোনো কারণ নেই, তা অন্য সময়ে আদায় করা সম্ভব, ফলে তা নিষিদ্ধ করলে কোনো বড় উপকারিতাও হারায় না, বরং এতে এমন অনিষ্ট রয়েছে, যার কারণে তা নিষিদ্ধ করা আবশ্যক।

যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময়গুলোতে সালাত নিষিদ্ধ করে থাকেন শিরকের পথে পৌঁছানো রোধ করার উদ্দেশ্যে, যেন কেউ সূর্যের প্রতি সিজদা না করে, সূর্যকে ডাকে বা তার নিকট কিছু চায়—যেমন সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্র পূজাকারীরা এসবকে ডাকে ও তাদের নিকট চায়—তবে এটা তো স্পষ্ট যে সূর্যকে ডাকা ও তার কাছে সিজদা করা নিজের মধ্যেই আরও বড় হারাম, ঐ সালাতের চেয়ে বেশি, যেটা তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন তা থেকে এসবের দিকে ধাবিত হওয়া রোধ করার উদ্দেশ্যে। অনুরূপভাবে, যখন তিনি নবী ও নেককারদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানানো নিষিদ্ধ করেছেন—অর্থাৎ তাদের কবরের নিকট সালাত আদায় করার নিয়ত নিষিদ্ধ করেছেন, যাতে তা তাদেরকে ডাকা বা তাদের নিকট সিজদা করার দিকে না নিয়ে যায়—তবে তাদেরকে ডাকা ও তাদের নিকট সিজদা করাই আরও বড় হারাম, কবরকে ইবাদতের স্থান বানানোর চেয়েও।

এই কারণেই মুসলিমদের কবর যিয়ারত দুই প্রকার: শরীয়াহ্ সম্মত যিয়ারত এবং বিদআতপূর্ণ যিয়ারত।

শরীয়াহ্ সম্মত যিয়ারত হলো, যিয়ারতকারীর নিয়ত মৃতের জন্য দোয়া করা, যেমন জানাজার সালাতে মৃতের জন্য দোয়া করাই উদ্দেশ্য। কবরের পাশে দাঁড়ানোও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন: "তাদের কেউ মারা গেলে কখনোই তার জানাজা পড়ো না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িও না" (সূরা আত-তাওবা: ৮৪)। আল্লাহ তাঁর নবীকে মুনাফিকদের জানাজা পড়া এবং কবরের পাশে দাঁড়ানো থেকে নিষেধ করেছেন কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছিল এবং কুফর অবস্থায় মারা গিয়েছিল। যেহেতু তিনি এই কুফরের কারণে এগুলো নিষেধ করেছেন, এটা প্রমাণ করে যখন এই কারণ থাকে না, তখন নিষেধাজ্ঞাটিও থাকে না। তিনি কেবল তাদেরকে নিষেধ করেছেন, এর মানে হলো অন্যদের (বিশ্বাসীদের) জন্য তা বৈধ, নচেত নিষেধাজ্ঞা সবার ওপরই হতো এবং কুফরের কারণ উল্লেখ করতেন না। এজন্যই মুমিন মৃতদের জানাজা পড়া ও কবরের পাশে দাঁড়ানো সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মৃতদের জানাজা পড়তেন এবং তাঁর উম্মতের জন্য তা বৈধ করেছেন। যখন কোনো ব্যক্তি দাফন হতো, তিনি তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন: "তার জন্য স্থিরতার দোয়া করো, সে এখন জিজ্ঞাসিত হচ্ছে।" (আবু দাউদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন)। তিনি জান্নাতুল বাকি ও উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করতেন এবং সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন—যখন তারা কবর যিয়ারত করত—তাদের কেউ যেন বলে: "হে ঈমানদার ও মুসলিমদের বাসিন্দাগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এবং আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হব। আমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না, এবং তাদের পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না।" এবং সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে গিয়ে বলেছিলেন: "হে ঈমানদার জাতির নিবাসীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এবং আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের অনুসরণ করব।" এ বিষয়ে বহু সহীহ ও সুপরিচিত হাদীস রয়েছে। তাই মুমিনদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো তাদের জন্য দোয়া করা। আর এটা ভিন্ন সেই সাধারণ যিয়ারত থেকে যা কাফিরদের কবরেও বৈধ, যেমনটি সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতে আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতে গিয়েছিলেন, কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। তারপর বললেন: "আমি আমার রবের কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর আমি তাঁর কাছে কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছি, তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" তাই এই যিয়ারত, যা মৃত্যুর স্মরণ করিয়ে

দেয়, তা শরীয়াহ্‌ সম্মত—যদিও মৃত ব্যক্তি কাফির হন—অথচ যিয়ারত যার উদ্দেশ্য মৃতের জন্য দোয়া করা, তা কেবল মুমিনদের জন্যই বৈধ।

আর বিদআতপূর্ণ যিয়ারত হলো, যখন কোনো ব্যক্তি মৃতের নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণ চায়, তাকে দোয়া করার বা সুপারিশ করার অনুরোধ করে, অথবা তার কবরের পাশে দোয়া করার উদ্দেশ্যে যায়—এই ধারণা থেকে যে এতে দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বাড়ে। এসব উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা বিদআত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শরীয়াহ্‌ সম্মত করেননি, সাহাবিগণও করেননি, না তাঁর কবরের ক্ষেত্রে, না অন্য কারো ক্ষেত্রে। এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং শিরকের কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

যদি কেউ নবী বা নেককারদের কবরের পাশে সালাত আদায় করতে চায়, কিন্তু তাদেরকে ডাকা বা তাদের নিকটে দোয়া করার নিয়ত না করে—কেবল তাদের কবরকে সালাতের স্থান বানিয়ে নেয়—তবুও এটি নিষিদ্ধ, হারাম এবং এমন ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের সম্মুখীন হয়, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহর রাগ তীব্র হয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধ্বংস করুন; তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে।"—তিনি তাদের কাজ থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কবরকে ইবাদতের স্থান বানাতো। সাবধান! তোমরা কবরকে ইবাদতের স্থান বানাবে না, আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি।" যদি এটি নিষিদ্ধ হয় এবং আল্লাহর রাগ ও অভিশাপের কারণ হয়, তাহলে যার উদ্দেশ্য মৃতকে ডাকা, তার পাশে ও মাধ্যমে দোয়া করা, এই বিশ্বাসে যে এতে দোয়া কবুল হয়, প্রয়োজন পূরণ হয়—তাহলে তার অবস্থা কত ভয়াবহ! এটি ছিল নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের মাঝে শিরকের প্রথম কারণ এবং মানুষের মাঝে মূর্তিপূজার সূত্রপাত। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আদম ও নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর মাঝে দশটি যুগ ছিল, সকলেই ইসলামে ছিল। এরপর শিরক শুরু হয় তাদের নেককারদের কবরকে অতিরিক্ত সম্মান দেখানোর মাধ্যমে। এটি ইবনে আব্বাসসহ অনেকের থেকে সহীহ বুখারিতে বর্ণিত, এবং তাফসীর ও কাসাসুল আম্বিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতেও আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী: "আর তারা বলল, তোমরা কখনো তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করো না; এবং ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াঊক ও নসরকে পরিত্যাগ করো না" (সূরা নূহ: ২৩)। এরা ছিল নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের নেককার লোকেরা। তারা যখন মারা গেল, তখন লোকেরা তাদের কবরের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিল, অতঃপর তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করল এবং তাদের পূজা করতে লাগল। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: এরপর এই মূর্তিগুলো আরবদের বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

কিছু নাস্তিক দর্শনবিদ শিরকের একটি ভিন্ন দিক সংযুক্ত করেছেন, যা তাঁরা কবর যিয়ারতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন; যেমন ইবনে সীনা (আবূ আলী সিনা) এবং তাঁর অনুসারীরা, যেমন “আল-কুতুব আল-মাদনূন বিহা” (অযোগ্যদের কাছ থেকে গোপন রাখা গ্রন্থসমূহ)-এর লেখক এবং অন্যান্যরা। তাঁরা নিজেদের দর্শনের ভিত্তিতে শাফাআতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেননা, তারা এই বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, কিংবা তিনি খুঁটিনাটি জ্ঞান রাখেন, বান্দাদের আওয়াজ শোনেন বা তাঁদের দোয়া কবুল করেন। সুতরাং, নবী ও সৎ লোকদের শাফাআত তাদের মতে সে রকম নয় যেভাবে ঈমানদাররা জানে—যে তা এক সৎ ব্যক্তির দোয়া যা আল্লাহ কবুল করেন। যেমন বৃষ্টির বর্ষণও তাদের মতে দোয়ার কবুল হওয়ার মাধ্যমে ঘটে না। বরং তারা দাবি করে, জগতের ঘটনাগুলোর প্রভাবক হচ্ছে আত্মিক শক্তি, নাক্ষত্রিক গতি কিংবা প্রাকৃতিক শক্তি। তারা বলে: যখন কেউ কোনো সৎ ব্যক্তিকে ভালোবাসে, বিশেষত মৃত্যুর পর তাঁর কবর যিয়ারত করে, তখন তার আত্মা মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে এক ধরণের সংযোগ স্থাপন করে। অতঃপর, সেই মৃত আত্মার ওপর “আল-‘আক্ল আল-ফাঈয়াল” (তাদের মতে কার্যকর জ্ঞান) বা “আসমানী আত্মা”-র পক্ষ থেকে যা নির্গত হয়, তা সেই যিয়ারতকারী ও শাফাআতকারী আত্মার ওপর প্রবাহিত হয়, আল্লাহ কিছুই জানেন না—এমনকি যার প্রতি শাফাআত করা হচ্ছে সে-ও তা জানে না। তারা একে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে: যখন একটি আয়না সূর্যের দিকে মুখ করে, তখন সূর্যের আলো তা ওপর পড়ে। তারপর যদি আরেকটি আয়না প্রথম আয়নার দিকে মুখ করে, তবে সেই প্রথম আয়না থেকে আলো দ্বিতীয়টির ওপর পড়ে। এরপর কোনো দেয়াল বা পানিও যদি সেই আয়নার মুখোমুখি হয়, তবে আলো তার ওপরও প্রতিফলিত হয়। তাদের মতে শাফাআত এভাবেই ঘটে, এবং এইভাবেই যিয়ারতকারী উপকৃত হয়। এই ধারণার মধ্যে এমন সব কুফরি বিশ্বাস রয়েছে যা একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে গোপন নয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মূর্তিগুলোর নিকট শয়তানদের কর্মকাণ্ড, তাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম ঘটে, যা আদম সন্তানের ভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ। কবরকে মূর্তি বানিয়ে ফেলা শিরকের মূল উৎস। এ কারণেই কবরসমূহের নিকটে কিছু লোক অদ্ভুত আওয়াজ শুনে, ছায়ামূর্তি দেখে কিংবা বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, যা তারা মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে তা জিন বা শয়তানদের পক্ষ থেকে হতে পারে। কেউ কেউ দেখে কবর ফেটে গেছে, মৃতব্যক্তি বেরিয়ে এসেছে, কথা বলেছে কিংবা তাকে আলিঙ্গন করেছে। এটা নবী কিংবা অন্যদের কবরেও ঘটে, অথচ বাস্তবে এটি শয়তান ছাড়া কিছু নয়। কেননা শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে এবং কেউ কেউ দাবি করে—"আমি অমুক নবী" বা "অমুক শাইখ", অথচ সে একজন মিথ্যাবাদী। এই বিষয়ে এত বেশি ঘটনা রয়েছে যে এখানে সব বলা সম্ভব নয়, সংখ্যা অনেক। অজ্ঞ ব্যক্তি

মনে করে, যে কবর থেকে বের হয়ে এসে কথা বলল বা তাকে আলিঙ্গন করল, সে-ই কবরের মধ্যে সমাহিত ব্যক্তি—নবী, সৎ ব্যক্তি বা অন্য কেউ। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার জানে, এটি একটি শয়তান। এটি বোঝার বিভিন্ন উপায় রয়েছে:

প্রথমত: আন্তরিকতার সাথে "আয়াতুল কুরসী" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৫) পড়া। যখন কেউ তা পড়ে, তখন সেই চেহারাটি অদৃশ্য হয়ে যায়, মাটির নিচে ঢুকে পড়ে বা আড়ালে সরে যায়। যদি সে ব্যক্তি সত্যিই সৎ ব্যক্তি, ফেরেশতা বা ঈমানদার জিন হত, তাহলে "আয়াতুল কুরসী" তার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। এটি কেবল শয়তানদের ক্ষতিগ্রস্ত করে, যেমনটি সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে—আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত—যখন জিনি তাঁকে বলেছিল: "রাতের বেলায় শুতে যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পড়ো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার তোমার ওপর থাকবে, এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "সে তোমাকে সত্য বলেছে, যদিও সে একজন মিথ্যাবাদী।"

তাদের মধ্যে একটি উপায় হলো: শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

আরেকটি হলো: শরীয়তের নির্ধারিত দোয়া ও যিকির দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করা। কেননা, শয়তানরা নবীদের জীবদ্দশায় তাদের সম্মুখীন হতো, তাদের কষ্ট দিতে চাইত এবং তাদের ইবাদতকে ব্যাহত করতে চাইত। যেমন জিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগুনের শিখা নিয়ে এসেছিল, তাঁকে পোড়ানোর জন্য, তখন জিবরাঈল (আঃ) একটি প্রসিদ্ধ দোয়া নিয়ে এসেছিলেন, যা আবূ আত-ত্বাইয়াহ হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন: একজন ব্যক্তি 'আবদুর রহমান ইবনে হাবীবশ (যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য পেয়েছেন)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: "যখন শয়তান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, তখন তিনি কী করলেন?" তিনি বললেন: "তারা পাহাড়ি গিরিখাত ও উপত্যকা থেকে তাঁর ওপর নেমে এল, তাদের মধ্যে একজন শয়তান ছিল যে আগুনের শিখা নিয়ে এসেছিল তাঁকে পোড়ানোর জন্য।" তিনি বললেন: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত হলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন: 'হে মুহাম্মাদ, বলো!' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'আমি কী বলব?' জিবরাঈল বললেন: 'বল: আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে, যাকে কোনো সৎ কিংবা অসৎ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না, তাঁর সৃষ্ট সব কিছুর অনিষ্ট থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব

দিয়েছেন এবং রূপ দিয়েছেন; যা আকাশ থেকে নামে, আকাশে উঠে, যা জমিন থেকে বের হয় এবং জমিনে প্রবেশ করে; রাত্রি ও দিনের ফিতনার অনিষ্ট থেকে এবং প্রত্যেক আগতের অনিষ্ট থেকে, যে আসে কেবল কল্যাণ নিয়ে—হে পরম দয়ালু।'" তিনি বলেন: "তাদের আগুন নিভে গেল এবং আল্লাহ, যিনি মহান ও গৌরবান্বিত, তাদের পরাজিত করলেন।"

এটি দুই সহীহে (বুখারী ও মুসলিম) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "গতরাতে এক 'ইফরীত (দুষ্ট জিন) আমার ওপর চড়াও হয়েছিল, আমার নামাজে বিঘ্ন ঘটাতে, কিন্তু আল্লাহ, মহান ও গৌরবান্বিত, আমাকে তার ওপর কর্তৃত্ব দিলেন। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি চেয়েছিলাম তাকে মসজিদের এক স্তম্ভে বেঁধে রাখতে যাতে তোমরা ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখতে পারো। কিন্তু আমি স্মরণ করলাম সূলাইমান (আঃ)-এর দোয়া: 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান কর যা আমার পর কারো প্রাপ্য হবে না।' (সূরা সাদ: ৩৫) ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিলেন।"

'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ছিলেন, তখন শয়তান তাঁর নিকটে এল। তিনি তাকে ধরে ফেললেন, মাটিতে নিক্ষেপ করলেন এবং তাকে চেপে ধরলেন। তিনি বলেন: "আমি তার জিহ্বার ঠাণ্ডা অনুভব করছিলাম আমার হাতে। যদি সূলাইমান (আঃ)-এর দোয়া না থাকত, তবে তাকে বেঁধে রাখা হতো, যাতে লোকেরা সকালে উঠে দেখতে পায়।" এ হাদীস আন-নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারীর শর্ত পূরণ করে, যেমন আবূ 'আবদুল্লাহ আল-মাকদিসী তাঁর "মুখতারা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা "সহীহুল হাকিম"-এর চেয়ে উত্তম।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ পড়ছিলেন, এবং তিনি তাঁর পেছনে ছিলেন। তাঁর ক্বিরাআতে বিঘ্ন ঘটল। নামাজ শেষে তিনি বললেন: "যদি তোমরা আমাকে এবং ইবলিসকে দেখতে তাহলে!" আমি তাকে ধরলাম এবং তাকে চেপে ধরলাম যতক্ষণ না আমি তার লালার ঠাণ্ডা এই দুই আঙুলের মাঝে অনুভব করলাম—বড় ও তার পাশে থাকা আঙুলে। যদি না আমার ভাই সূলাইমানের দোয়া থাকত, তাহলে সে বেঁধে রাখা হতো মসজিদের এক স্তম্ভে, যাতে মদীনার শিশুরা তার সাথে খেলা করতে পারত। অতএব, যে পারে সে যেন কাউকে কিবলার সামনে আসতে না দেয়।" হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর "মুসনাদ"-এ এবং আবূ দাউদ তাঁর "সুনান"-এ বর্ণনা করেছেন।

এবং সহীহ মুসলিমে আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম: "আমি আল্লাহর কাছে তোমার আশ্রয় চাই।" তারপর তিনি বললেন: "আমি তোমাকে আল্লাহর অভিশাপে অভিশপ্ত করি"—তিনবার। এরপর তিনি তাঁর হাত বাড়ালেন যেন কিছু ধরছেন। নামাজ শেষে আমরা বললাম: "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনাকে নামাজে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা পূর্বে কখনো শুনিনি এবং আপনাকে হাত বাড়াতে দেখলাম।" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর শত্রু, ইবলিস, একটি আগুনের শিখা নিয়ে এসেছে আমার মুখে নিক্ষেপ করার জন্য। আমি বললাম: 'আমি আল্লাহর কাছে তোমার আশ্রয় চাই'—তিনবার। তারপর বললাম: 'আমি তোমাকে আল্লাহর পূর্ণ অভিশাপে অভিশপ্ত করি।' তখন সে পালিয়ে গেল। আমি চেয়েছিলাম তাকে ধরে ফেলতে। যদি আমাদের ভাই সুলাইমানের দোয়া না থাকত, তাহলে সে সকালে বেঁধে রাখা অবস্থায় থাকত, যাতে মদীনার শিশুরা তার সঙ্গে খেলতে পারত।"

যদি শয়তানরা নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) কাছে এসে তাঁদের ক্ষতিসাধন ও ইবাদতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দোআ, যিকির, ইবাদত এবং হাতে জিহাদের মতো উপায়ে সাহায্য করে শয়তানদের প্রতিহত করেন—তবে যারা নবীদের থেকে নিচু স্তরের, তাদের অবস্থা কতই না দুর্বল! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের ও জিনের শয়তানদের দমন করেছেন সেই জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করেছেন, যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো সালাত ও জিহাদ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকাংশ হাদীস সালাত ও জিহাদ সম্পর্কিত। যে কেউ নবীদের অনুসরণ করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে সেইসব উপায়েই বিজয় দান করেন, যেসব উপায়ে তিনি নবীদের বিজয় দান করেছেন।

আর যে ব্যক্তি এমন এক দ্বীন উদ্ভাবন করে যা তাঁরা (নবীগণ) বিধান করেননি, এবং তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসুলের আনুগত্যের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা ত্যাগ করে, এবং নবী ও নেককারদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে, ও তাদের মাধ্যমে শিরক করে—তাহলে সে ব্যক্তি শয়তানদের খেলনার মতো হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই তার (শয়তানের) কোন ক্ষমতা নেই তাদের ওপর, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর ভরসা রাখে। তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের ওপরই রয়েছে, যারা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং যারা তার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শিরক করে" (সূরা আন-নাহল: ৯৯-১০০)। এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের ওপর তোমার (শয়তানের) কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না, তবে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের ব্যতীত—যারা বিপথগামী" (সূরা আল-হিজর: ৪২)।

এগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উপায়: যে দর্শন করে (যিনি কিছু দেখেন), তিনি তার রবের (তাআলা) কাছে দোআ করেন এবং তার অবস্থা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন।

এগুলোর মধ্যে আরেকটি: তিনি সেই রূপধারী সত্তার কাছে বলেন, 'তুমি কি অমুক ব্যক্তি?' এবং তাকে কঠিন শপথের মাধ্যমে বাধ্য করেন এবং তার ওপর কুরআনের পরিষ্কার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং এমন আরও উপায় অবলম্বন করেন, যেগুলো শয়তানদের ক্ষতিসাধন করে।

এটা ঠিক যেমন অনেক আরাধনাকারী দেখে থাকেন—কাবা তাদের চারপাশে তাওয়াফ করছে, বা একটি বিশাল সিংহাসনে এক মহান সত্তা বসে আছে, কিংবা কিছু আকৃতি উপরে নিচে উঠানামা করছে—তারা মনে করে এগুলো ফেরেশতা, এবং সেই মহান সত্তা আল্লাহ—তাআলা পবিত্র ও মহান—অথচ এটা বাস্তবে ছিল এক শয়তান। এ ধরনের ঘটনা অনেকের সাথেই ঘটেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে এটি শয়তান ছিল; যেমন, বিখ্যাত কাহিনীতে শাইখ আবদুল কাদের জীলানী রাহিমাহুল্লাহ—তিনি বলেন: "আমি একবার ইবাদতে মগ্ন ছিলাম, তখন আমি এক বিশাল সিংহাসন দেখলাম যার ওপর আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সে আমাকে বলল: 'হে আবদুল কাদের, আমি তোমার প্রভু, আমি তোমার জন্য এমন কিছু হালাল করে দিয়েছি যা অন্যদের জন্য হারাম ছিল।' আমি বললাম: 'তুমি কি সেই আল্লাহ, যাঁর বাইরে আর কোনো উপাস্য নেই? চলে যাও, হে আল্লাহর শত্রু!' তখন সে আলো ছিন্ন হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল এবং সে বলল: 'হে আবদুল কাদের, তোমার দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান, তোমার ইলম এবং তোমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুমি আমার ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছ। আমি এই ঘটনার মাধ্যমে সত্তর জনকে বিভ্রান্ত করেছি।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: 'আপনি কিভাবে জানলেন যে এটা শয়তান?' তিনি বললেন: 'কারণ সে বলেছিল, "আমি তোমার জন্য এমন কিছু হালাল করেছি যা অন্যদের জন্য হারাম," অথচ আমি জানি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীআহ রহিত বা পরিবর্তনযোগ্য নয়। এবং সে বলেছিল, "আমি তোমার প্রভু," কিন্তু বলতে পারেনি, "আমি আল্লাহ, যাঁর বাইরে কোনো উপাস্য নেই।"'"

তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যারা বিশ্বাস করেছিল যে তারা আল্লাহকে দেখেছে, এবং সে ও তার সাথীরা বিশ্বাস করতে লাগল যে তারা জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা-কে দেখেছে। তাদের ভিত্তি ছিল তারা

যা প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা যা বলেছে তাতে তারা সত্যবাদী, কিন্তু তারা জানত না যে এটি ছিল এক শয়তান। এ ঘটনা অনেকবার ঘটেছে অজ্ঞ আরাধনাকারীদের একটি দলের সাথে—তাদের কেউ মনে করেছে সে এই দুনিয়াতেই নিজের চোখে আল্লাহকে দেখেছে, কারণ তাদের অনেকেই এমন কিছু দেখেছে যাকে তারা আল্লাহ মনে করেছে, অথচ সেটা ছিল শুধু এক শয়তান। তাদের অনেকে এমন কাউকে দেখেছে যাকে তারা মনে করেছে নবী, নেককার বা আল-খিদর, অথচ সে ছিল এক শয়তান।

সাহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে, সে আমাকে সত্যভাবেই দেখেছে, কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" এটি স্বপ্নে দেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ স্বপ্নের দৃশ্য হতে পারে সত্য, আবার শয়তানের পক্ষ থেকেও হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ শয়তানকে তাঁর (রাসুলের) রূপ ধারণ করতে দেননি। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় এই দুনিয়াতে কেউ তাঁকে নিজের চোখে দেখতে পারে না। অতএব, যে ব্যক্তি মনে করে সে জাগ্রত অবস্থায় যে মৃত ব্যক্তিকে দেখেছে তা সেই ব্যক্তি, সে কেবল তার অজ্ঞতার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। এজন্য সাহাবাগণ বা তাঁদের সৎ অনুসারীদের কেউ এমন কিছু দেখেননি। তাদের মধ্যে কেউ এমন ছিল, কিংবা এমন ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করেছে, যারা বলেছে, একটি ব্যক্তি একই সময়ে দুই জায়গায় থাকতে পারে—এতে তারা সুস্থ বুদ্ধির বিরোধিতা করেছে। তাদের কেউ বলেছে: 'এটা সেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম রূপ,' অথবা 'এটা তার রূহানিয়াত,' অথবা 'এটা তার অর্থের আকৃতিবদ্ধ রূপ,' অথচ তারা জানত না যে এটি এক জিন, যে তার রূপ ধারণ করেছে। তাদের কেউ মনে করেছে এটি একজন ফেরেশতা। ফেরেশতা ও জিনকে পার্থক্য করার অনেক উপায় আছে। জিনদের মধ্যে কাফির, পাপিষ্ঠ ও অজ্ঞ ব্যক্তি আছে, আবার তাদের মধ্যে এমন মুমিনও আছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যে ইসলামে প্রবেশ করেছে।

অনেকেই যারা জানে না যে এগুলো ছিল জিন ও শয়তান, তারা তাদের ফেরেশতা ভেবে বসেছে। অনুরূপভাবে, যারা তারা, নক্ষত্র বা অন্যান্য মূর্তির নিকট প্রার্থনা করে—তাদের মধ্যে একজনের ওপর একটি আত্মা অবতীর্ণ হয়, যে বলে: 'আমি নক্ষত্রের রূহানিয়াত।' তাদের কেউ কেউ মনে করে এটা ফেরেশতা, অথচ এটি কেবল এক জিন বা শয়তান, যারা মুশরিকদের পথভ্রষ্ট করে।

শয়তানরা তাদের সঙ্গী হয় যারা তাদের পছন্দনীয় কাজ করে, যেমন: শিরক, স্পষ্ট গোনাহ, ও পাপ। কখনও তারা তাকে কিছু গায়েবী তথ্য জানিয়ে দেয়, যেন সে সেগুলো প্রকাশ করে। কখনও তারা তাকে এমন কারও ক্ষতি করে যাকে সে ক্ষতি করতে চায়—যেমন হত্যা, অসুস্থতা সৃষ্টি ইত্যাদি। কখনও তারা তার ইচ্ছাকৃত মানুষদের নিয়ে আসে। কখনও তারা তার জন্য মানুষের মাল থেকে—নগদ, খাবার, কাপড়, ও অন্যান্য

জিনিস চুরি করে—সে ভাবে এটি অলিয়াগণের কারামাত, অথচ এটি চুরি। কখনও তারা তাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'আরাফার বিকেলে মক্কায় পৌঁছে যায় এবং আবার ফিরে আসে—সে মনে করে এটি এক অলৌকিক ঘটনা, অথচ সে মুসলিমদের হজ আদায় করেনি: সে ইহরাম বাঁধেনি, তালবিয়া বলেনি, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেনি, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করেনি। এটা জানা যায় যে এটা বড় ধরনের পথভ্রষ্টতার একটি। তাদের কেউ কেউ মক্কায় কাবা তাওয়াফ করতে আসে কিন্তু শরীআতের নির্ধারিত 'উমরা পালন করে না, ফলে সে যখন মীকাত অতিক্রম করে তখন ইহরাম বাঁধে না। এটা জানা আছে যে, যে কেউ মক্কায় কোনো ইবাদতের নিয়ত করে, তার জন্য ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা বৈধ নয়। এমনকি যদি কেউ ব্যবসা, আত্মীয়স্বজন দর্শন বা ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যেও মক্কায় আসে, তবুও তাকে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কি ওয়াজিব না মুস্তাহাব—এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দুটি প্রসিদ্ধ মত আছে। এটি একটি বিশাল বিষয়। এখান থেকে জাদু ও গণকত্বের বিষয়ও উদ্ভূত হয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।

মুশরিক, মূর্তিপূজক, এবং এ উম্মতের খ্রিষ্টান ও বিদআতীদের মধ্য থেকে যারা তাদের মতো, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে এমন বহু ঘটনা আছে যা বর্ণনা করা অত্যন্ত দীর্ঘ। কেননা, যে-ই হোক না কেন, মৃত ব্যক্তিকে ডেকে অভ্যস্ত হয়েছে এবং তার থেকে সাহায্য চায়—সে নবী হোক বা না হোক—তার কাছে এমন কিছু কিছু ঘটনা পৌঁছেছে, যা তার পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ হয়েছে। যেমন, যারা তাদের অনুপস্থিতিতে ডাক দেয় এবং তাদের থেকে সাহায্য চায়, তারা তাদের আকৃতিতে কাউকে দেখে বা ভাবে সে তাদের আকৃতিতেই এসেছে, সে বলে, "আমি অমুক", তার সাথে কথা বলে এবং তাদের কিছু চাহিদা পূরণ করে। তখন তারা মনে করে, যাকে তারা ডাকছিল এবং যার থেকে সাহায্য চাচ্ছিল, তিনিই তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদের চাহিদা পূরণ করেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ছিল জিন বা শয়তান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, এটা কোনো ফেরেশতা; কিন্তু ফেরেশতারা তো মুশরিকদের সাহায্য করেন না; বরং, তারা হচ্ছে শয়তান, যারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। শিরকের স্থানসমূহে এমন অনেক ঘটনা ও কাহিনী রয়েছে, যা সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা এবং যাদের সাথে এগুলো ঘটেছে, তারা জানে; তবে এগুলো এতই বিস্তৃত যে, তা বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে অজ্ঞ লোকেরা দুই ধরনের বিভ্রান্তিতে পড়ে: একদল পুরো বিষয়টিকে অস্বীকার করে, এবং অপরদল এগুলোকে আল্লাহর অলীদের কারামত বলে মনে করে। প্রথম দল বলে: "এটা তাদের মনে কল্পনা ব্যতীত কিছু নয়, যার বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই।" যখন তারা এ কথা একের পর এক দলকে বলে, তখন

কেউ যখন তা নিজ চোখে দেখে এবং বাস্তবে তা বিদ্যমান বলে সাক্ষ্য পায়, অথবা যারা তা দেখেছে, তাদের থেকে বারবার এই সংবাদ পৌঁছায় এবং একজন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ব্যক্তির মাধ্যমে তা জানতে পারে, তখন এটা ঐসব মুশরিক ও বিদআতীদের জন্য এক বড় ফিতনা ও ধোঁকায় পরিণত হয়, যারা তা দেখে কিংবা বিশ্বস্ত বর্ণনায় জানে। অতঃপর যখন এই অস্বীকারকারী দল নিজেরাই তা দেখে, তখন তারা যার মাধ্যমে এটি ঘটেছে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাকে মান্য করে এবং তাকে আল্লাহর অলী মনে করে, যদিও সে আল্লাহর ফরজ বিধান পালন করে না, এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আদায় করে না, আর আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্ম থেকেও বিরত থাকে না, বরং সে অশ্লীলতা ও জুলুম থেকে বিরত থাকে না। সে এমন এক ব্যক্তি হতে পারে, যে ঈমান ও তাকওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে দূরে, যেভাবে আল্লাহ তাঁর অলীদের সম্পর্কে বলেছেন: "জেনে রাখো! নিশ্চয় আল্লাহর অলীদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে" (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)। অতএব, তারা এমন একজনকে দেখে, যে ঈমান ও তাকওয়া থেকে সবচেয়ে দূরে, অথচ তার কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও কর্ম দেখা যায়, যা তারা আল্লাহর অলীদের কারামত বলে মনে করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামের পথ ত্যাগ করে এবং পশ্চাদপসরণ করে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর অলীদের অন্যতম মনে করে, যে নামাজ পড়ে না, এমনকি রাসুলদের উপর ঈমানও রাখে না, বরং রাসুলদেরকে গালি দেয় ও অপমান করে। কেউ কেউ বিভ্রান্ত, সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে, অর্ধেক কুফরির দিকে এবং অর্ধেক ইসলামের দিকে, বরং তারা কুফরির দিকেই বেশি ঝুঁকে থাকে। এর কারণ হল, তারা অলিত্বের প্রমাণ হিসেবে এমন কিছু গ্রহণ করেছে, যা এর প্রমাণই নয়। কেননা, কাফির, মুশরিক, জাদুকর ও গণকদের সাথে শয়তান থাকে, যারা তাদের হয়ে এর চেয়ে বহু গুণ বেশি কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি কি তোমাদেরকে বলব, শয়তানরা কার উপর নেমে আসে? তারা প্রত্যেক পাপী মিথ্যাবাদীর উপর নেমে আসে" (সূরা আশ-শু'আরা: ২২১-২২২)। এরা শর্তসাপেক্ষভাবে মিথ্যা ও শরী'আতের বিরোধিতা করে; তাদের পাপ ও মিথ্যা সেই পরিমাণে হয়, যেই পরিমাণে তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে বিচ্যুত হয়, যা নিয়ে আল্লাহ তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন। এই শয়তানি অবস্থা তাদের পথভ্রষ্টতা, শিরক, বিদআত, অজ্ঞতা ও কুফরির ফসল, এবং তা তারই প্রমাণ ও চিহ্ন। অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত ব্যক্তি মনে করে, এটি তার ঈমান ও আল্লাহর কাছে অলিত্বের ফসল এবং তার ঈমান ও অলিত্বের চিহ্ন। এর কারণ হল, সে আল্লাহর অলী এবং শয়তানের অলীর মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠি জানত না, যেমন আমরা 'আল্লাহর অলী ও শয়তানের অলীর মধ্যে পার্থক্য' বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করেছি। সে জানত না যে, এই অবস্থা যাকে সে অলিত্বের প্রমাণ মনে করছে, তা কাফির, মুশরিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যেই বেশি ঘটে থাকে। অথচ প্রমাণ যা নির্দেশ করে, তা অবশ্যই তার সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়; তা

অন্য কিছুর সাথে ঘটে না। যদি এগুলো কাফির, মুশরিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তাহলে এগুলো ঈমানের প্রমাণ তো নয়ই, অলিত্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, এগুলো অলিত্বের দলিল হওয়া অসম্ভব। আল্লাহর অলীগণ হলেন মু'মিন ও মুত্তাকী; আর তাদের কারামত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার ফসল, শিরক, বিদআত ও অবাধ্যতার ফসল নয়। সর্বোচ্চ মর্যাদার অলীগণ এসব কারামতকে দীন প্রতিষ্ঠা বা মুসলিমদের কোনো প্রয়োজনে প্রমাণরূপে ব্যবহার করে থাকেন। মাঝারি স্তরের কেউ কেউ তা বৈধ কাজে ব্যবহার করে থাকেন। আর যে কেউ তা গোনাহের কাজে ব্যবহার করে, সে নিজের উপরই জুলুম করে এবং তার রবের সীমালঙ্ঘন করে, যদিও সেই কর্ম ঈমান ও তাকওয়ার কারণে ঘটেছে। যে ব্যক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করে, গনীমত লাভ করে এবং তা শয়তানের পথে ব্যয় করে, তার এই সম্পদ, যদিও নেক কর্মের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, তবুও শয়তানের পথে ব্যয় করলে তা তার জন্য বিপর্যয় হয়। তাহলে কেমন হবে, যদি এই কারামতের কারণই হয় কুফরি, গোনাহ ও বিদ্রোহ, আর তা আরও কুফরি, গোনাহ ও বিদ্রোহের দিকে আহ্বান করে? এ কারণেই তাদের নেতারা স্বীকার করে যে, তাদের অধিকাংশ লোক ইসলাম ব্যতীত অন্য অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র রয়েছে।

এখানে মূল উদ্দেশ্য হল, মুশরিকদের বিভ্রান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হল, তারা মূর্তির নিকটে যা দেখে বা শোনে—যেমন গায়েবি সংবাদ বা চাহিদা পূরণের বিষয়—এ ধরনের কিছু। যখন তাদের কেউ দেখে, কবর বিদীর্ণ হয়ে একটি দীপ্তিমান শাইখ বেরিয়ে আসে, তাকে আলিঙ্গন করে বা তার সাথে কথা বলে, তখন সে ভাবে, এটি সেই নবী বা শাইখ, যিনি কবরস্থ রয়েছেন। অথচ কবর বিদীর্ণ হয়নি; বরং, শয়তান তাকে এমন দৃশ্য দেখিয়েছে, যেমনভাবে সে কাউকে দেয়াল বিদীর্ণ হয়ে তার মধ্য থেকে একজন মানুষের আকৃতি বের হতে দেখায়, অথচ এটি ছিল না, বরং শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে এমনটা দেখিয়েছে। এই জাতীয় লোকদের কেউ কেউ ঐ দেখানো ব্যক্তিকে বলে: "আমরা তো কবরেই থাকি না; বরং, যখন কাউকে দাফন করা হয়, তখনই সে কবর থেকে বেরিয়ে আসে এবং মানুষের মাঝে চলাফেরা করে।" তাদের কেউ কেউ দেখে, মৃত ব্যক্তি জানাজা মিছিলে হাঁটছে এবং তার হাত ধরে আছে; এ থেকে আরও অনেক ধরণের প্রতারণা উদ্ভূত হয়, যা অভিজ্ঞরা জানেন। পথভ্রষ্ট লোকেরা হয় এ ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করে, অথবা আল্লাহর অলীদের কারামত মনে করে; তারা ভাবে ঐ ব্যক্তিই নবী, অথবা নেককার বান্দা, অথবা তার আকৃতিতে এক ফেরেশতা। তারা হয়তো বলে, "এটা তার আত্মিক সত্তা", অথবা "তার লতিফ সত্তা", অথবা "তার গোপন রহস্য", অথবা "তার প্রতিরূপ", অথবা "তার আত্মা আকৃতি ধারণ করেছে"। এমনও হতে পারে যে, কেউ ঐ আকৃতি দুটি স্থানে একসাথে দেখেছে; তখন সে মনে করে, একটি দেহ একই সময়ে দুটি স্থানে থাকতে পারে, অথচ সে জানে না, যে ঐ আকৃতি ধারণ করেছে, সে ঐ ব্যক্তি নয়।

এটি এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়গুলো স্পষ্ট করে যে, যারা নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের কবরস্থানে কিংবা অন্যত্র তাদের কাছে দোয়া করে, তারা সেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করে; যেমন যারা নক্ষত্রের কাছে দোয়া করে এবং যারা ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "কোনো মানুষের (নবীর) জন্য এটা উচিত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হুকুম ও নবুয়ত দান করার পর সে লোকদেরকে বলবে, ‘তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও।’ বরং (সে বলবে), ‘তোমরা রবের জন্য আলেম হও, কারণ তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং তোমরা তা অধ্যয়ন করো।’ সে তোমাদেরকে ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে আদেশ দেবে না। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর কি সে তোমাদেরকে কুফরের নির্দেশ দেবে?" (আল ইমরান: ৭৯-৮০)। এবং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "বল, ‘তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া ডাকো, তাদেরকে ডাকো; তারা তোমাদের থেকে কষ্ট দূর করার কিংবা তা অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।’ যাদেরকে তারা ডাকে, তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করে, তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে নিকটবর্তী হতে পারে, এবং তারা তাঁর রহমত কামনা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে তোমার রবের শাস্তি অত্যন্ত ভয়ংকর" (আল ইসরা: ৫৬-৫৭)। এবং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "বল, ‘তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া ডাকো, তাদেরকে ডাকো।’ তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ধূলিকণার পরিমাণও অধিকার রাখে না, এবং সেখানে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই, এবং তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর কোনো সহায়কও নেই। আর আল্লাহর নিকট শুধু তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তির জন্যই সুপারিশ উপকারে আসে" (সাবা: ২২-২৩)।

এ রকম আরও বহু আয়াত কুরআনে রয়েছে, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দোয়া করা নিষেধ করা হয়েছে—হোক সে ফেরেশতা, নবী কিংবা অন্য কেউ। কেননা এটি শিরক অথবা শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম। এটি তার বিপরীত নয় যে, জীবিত থাকা অবস্থায় কারো নিকট দোয়া বা সুপারিশ চাওয়া হয়েছে, কারণ তা শিরকের দিকে নিয়ে যায় না। কোনো নবী কিংবা সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তাঁর জীবিত অবস্থায় এবং তাঁর উপস্থিতিতে কখনো উপাসনা করা হয়নি, কেননা তিনি এমনটা করলে তা নিষেধ করতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের নিকট দোয়া চাওয়া, শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম, তেমনিভাবে অনুপস্থিত অবস্থায় তাদেরকে ডাকা শিরকের মাধ্যম।

যদি কেউ কোনো নবী বা ফেরেশতাকে দেখে এবং তাকে বলে, "আমার জন্য দোয়া করুন", তবে তা শিরকে

পৌঁছে দেয় না; কিন্তু কেউ যদি অনুপস্থিত অবস্থায় তাকে ডাকে, তাহলে তা শিরকের দিকে নিয়ে যায়, যেমনটি বাস্তবে ঘটেছে। কেননা মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তি শিরককারীকে নিষেধ করে না; বরং যখন হৃদয় তাদের নিকট দোয়া ও সুপারিশ চাওয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন তা তাদেরকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর মানুষ তাদের নিকট দোয়া করে এবং তাদের কবরস্থানে কিংবা তাদের চিত্র বা অন্য কিছুতে যেতে থাকে—যেমনটি মুশরিকদের মধ্যে এবং আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মধ্যে কিছু বিদআতীদের মধ্যে দেখা যায়।

এটা জানা কথা যে, ফেরেশতারা মু'মিনদের জন্য দোয়া করে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "যারা 'আরশ' বহন করে এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসায় তাসবিহ করে, তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, বলে, 'হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করেছ। অতএব যারা তাওবা করেছে ও তোমার পথে চলেছে, তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের রব! তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ, আর তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে, তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর তাদেরকে মন্দ ফলাফলের হাত থেকে রক্ষা করো। আর যাকে তুমি সেদিন রক্ষা করবে, তার প্রতি তুমি দয়া করবে; আর এটাই মহাসাফল্য'" (গাফির: ৭-৯)। এবং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আকাশসমূহ প্রায় তাদের উপরে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর ফেরেশতাগণ তাদের রবের প্রশংসায় তাসবিহ করে ও যমীনবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জানো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে অভিভাবক গ্রহণ করে—আল্লাহ তাদের উপর অভিভাবক, আর তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নও" (আশ-শুরা: ৫-৬)। সুতরাং ফেরেশতারা কেউ তাদের কাছে চায়নি এমন অবস্থায় মুমিনদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। অনুরূপভাবে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্যান্য নবী ও সৎ ব্যক্তিরা তাঁর উম্মাহর শ্রেষ্ঠদের জন্য দোয়া ও সুপারিশ করেন—এটি সে ধরনের বিষয় যার মধ্যে তারা আল্লাহর আদেশে কাজ করে, কেউ তাদেরকে অনুরোধ না করলেও।

যেহেতু ফেরেশতাদের নিকট দোয়া চাওয়া শরীয়তসম্মত নয়, তাই মৃত নবী ও সৎ ব্যক্তিদের নিকটও দোয়া চাওয়া কিংবা তাদের কাছে দোয়া ও সুপারিশ চাওয়া শরীয়তসম্মত নয়— যদি তারা দোয়া করে ও সুপারিশ করে—দুইটি কারণে:

প্রথমত: আল্লাহ যেসব কাজ তাদের উপর ফরজ করেছেন, তারা সেগুলো করে, এমনকি কেউ না চাইলেও। আর যে কাজ তিনি ফরজ করেননি, তারা তা করে না, এমনকি কেউ চাইলে হলেও। সুতরাং তাদের কাছে চাওয়ার কোনো উপকার নেই।

দ্বিতীয়ত: এই অবস্থায় তাদের কাছে দোয়া ও সুপারিশ চাওয়া শিরকের দিকে নিয়ে যায়, এতে এ ধরনের বিপদ রয়েছে। এমনকি যদি এতে কিছু উপকার কল্পনা করাও হয়, তবুও এই বিপদ তার চেয়ে বড়। তাহলে যখন এতে কোনো উপকারই নেই, তখন কেমন হবে? এর বিপরীতে, জীবিত অবস্থায় ও উপস্থিতিতে তাদের কাছে চাওয়া বৈধ, এতে কোনো বিপদ নেই, বরং এতে উপকার রয়েছে—যে তারা তখন সকল সৃষ্টির উপকার করার মাধ্যমে পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। কেননা তারা তখন আমলের ও দায়িত্বের জগতে রয়েছে। আর আখিরাতে তাদের সুপারিশ আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করার প্রকাশস্বরূপ হবে।

জাগতিক প্রয়োজনে এমন কাউকে কিছু চাওয়া, যা তার উপর আবশ্যক নয়, এটি প্রার্থনাকারীর জন্য না ফরজ, না সুন্নত। বরং ফরজ হলো আল্লাহর কাছে চাইতে থাকা, তাঁর কাছে কামনা করা ও তাঁর উপর ভরসা রাখা। সৃষ্টির নিকট চাওয়া মূলত হারাম, তবে প্রয়োজনে তা বৈধ হয়, আর আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তা বর্জন করাই উত্তম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "অতঃপর যখন তুমি অবসর হও, তখন ইবাদতে মনোনিবেশ করো। আর তোমার রবের প্রতি কামনা করো" (আশ-শারহ: ৭-৮)—অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কামনা করো, অন্যের প্রতি নয়। আর তিনি বলেছেন: "যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট হতো এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দেবেন, এবং তাঁর রাসুলও। আমরা তো আল্লাহর প্রতিই কামনা করি'" (আত-তাওবাহ: ৫৯)। তিনি দানকে আল্লাহ ও রাসুলের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, তাঁর বাণী অনুযায়ী: "রাসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো" (আল হাশর: ৭)। কিন্তু পরিতৃপ্তি ও কামনার বেলায় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন: 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট'—'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল' বলার অনুমতি দেননি। এবং বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর প্রতিই কামনা করি'—'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিই' বলার নির্দেশ দেননি। সুতরাং কামনা একমাত্র আল্লাহর প্রতিই হতে হবে। যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে—তারা-ই সফলকাম" (আন-নূর: ৫২)। আনুগত্যকে আল্লাহ ও রাসুলের জন্য করেছেন, কিন্তু ভয় ও তাকওয়া শুধুই

আল্লাহর জন্য রেখেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাসকে বলেছেন: "হে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দেব: আল্লাহকে স্মরণে রাখো, তিনি তোমার হেফাজত করবেন। আল্লাহকে স্মরণে রাখো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। সমৃদ্ধিতে আল্লাহকে চেনো, দুঃসময়ে তিনি তোমাকে চিনবেন। যদি কিছু চাও, আল্লাহর কাছেই চাও; যদি সাহায্য চাও, আল্লাহর কাছেই চাও। তোমার ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে, কলম তা শুকিয়ে ফেলেছে। যদি সারা সৃষ্টি তোমার ক্ষতি করতে চায়, তারা কিছুই করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা লিখে দেন। যদি তুমি আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টির সঙ্গে কাজ করতে পারো, তাহলে তা করো। যদি তা না পারো, তাহলে যেটা অপছন্দনীয় তাতে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক ভালো রয়েছে।"

এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত, যদিও এটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিতও হয়। তাঁর উক্তি: "যদি কিছু চাও, আল্লাহর কাছেই চাও; যদি সাহায্য চাও, আল্লাহর কাছেই চাও"—এটি তাঁর সহীহ হাদীসগুলোর অন্যতম। আহমদের মুসনাদে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর হাত থেকে চাবুক পড়ে যেত, তখন কাউকে বলতেন না, "আমার জন্য উঠিয়ে দাও", আর তিনি বলতেন: "আমার খলীল (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন মানুষের কাছে কিছু না চাই।" সহীহ মুসলিমে আউফ ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবির কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে নিঃশব্দে বললেন: "তোমরা যেন কাউকে কিছু না চাও।" আউফ বলেন: আমি তাদের কাউকে দেখেছি, যার চাবুক পড়ে গেলে সে কাউকে বলত না, "আমার জন্য তা তুলো।" আর সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে আছে: "আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার ব্যক্তি হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তিনি বলেন: "তারা হচ্ছে তারা, যারা রুকইয়াহ চায় না, কপালে আগুন লাগায় না, অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করে না, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন, কারণ তারা রুকইয়াহ চায় না—অর্থাৎ কারো কাছে রুকইয়া করার অনুরোধ করে না। রুকইয়াহ এক প্রকার দোয়া, তাই তারা অন্যের নিকট তা চায় না। যদিও এমন বর্ণণা পাওয়া যায়, "তারা রুকইয়া করে না", কিন্তু এটি ভুল; কেননা তারা অন্যের জন্য কিংবা নিজের জন্য রুকইয়া করলে তা ভালো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নিজের ও অন্যের জন্য রুকইয়া করেছেন। কিন্তু তিনি কখনো রুকইয়া চাননি। তাঁর রুকইয়া করা, তাঁর নিজের ও অন্যের জন্য দোয়া করার মতোই; আর এটি শরীয়তের নির্দেশ। কারণ, সকল নবীই আল্লাহর কাছে চেয়েছেন এবং তাঁর নিকট দোয়া করেছেন, যেমন আল্লাহ আদম, ইবরাহীম, মূসা ও অন্যান্য নবীদের কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন।

যে বর্ণনা করা হয় যে, যখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে মঞ্জনীকে বসিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন: "আপনি চাইলে কিছু চাইতে পারেন", তিনি উত্তরে বললেন: "আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানই আমার চাওয়ার জন্য যথেষ্ট"—এই বর্ণনার কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই এবং এটি মিথ্যা। বরং সহীহ সূত্রে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন: "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক।"

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এটি বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি বলেছিলেন যখন (আল্লাহ তাআলা বলেন): "লোকেরা তাদেরকে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো'" (আলে ইমরান: ১৭৩)। বর্ণিত হয়েছে যে, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: "আপনার কোনো প্রয়োজন আছে কি?" তিনি বলেছিলেন: "আপনার থেকে হলে না।" ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্যরা এটি উল্লেখ করেছেন।

আর ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর তাঁর প্রভু মহামহিম আল্লাহর নিকট দোয়া করা—এটি কুরআনের একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তাহলে তিনি কীভাবে বলতে পারেন, "তিনি আমার অবস্থা জানেন, তাই আমার চাওয়ার প্রয়োজন নেই," যখন আল্লাহ সবকিছুর জ্ঞান রাখেন এবং তিনি বান্দাদেরকে তাঁকে ইবাদত করতে, তাঁর উপর ভরসা করতে এবং তাঁর নিকট চাইতে নির্দেশ দিয়েছেন? কেননা তিনি, মহিমান্বিত তিনি, এসব বিষয়কে এমন কারণরূপে নির্ধারণ করেছেন যার উপর ভিত্তি করে তিনি বান্দাদের পুরস্কৃত করেন এবং প্রার্থনাকারীদের দোয়া কবুল করেন। তিনি, মহিমান্বিত তিনি, সবকিছু তেমনি জানেন যেভাবে তা বাস্তবে ঘটে। তিনি জানেন যে অমুক ব্যক্তি দরিদ্র অথবা পাপী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেন এবং অপরজনকে দোয়া করতে বলেন ও অন্যান্য মাধ্যম অবলম্বনের নির্দেশ দেন যার দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হয়—যেমনভাবে তিনি এক বান্দাকে ইবাদত ও আনুগত্যের নির্দেশ দেন যার মাধ্যমে সে তাঁর মর্যাদা লাভ করে।

তবে কখনো কখনো বান্দাকে দোয়ার চাইতেও উত্তম কোনো কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন হাদীসে এসেছে: "যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণে এতটাই মগ্ন হয়ে যায় যে সে আমার কাছে কিছু চায় না, আমি তাকে তাদের চাইতেও উত্তম জিনিস দান করি যারা আমার কাছে কিছু চায়।" আর তিরমিযীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে এতটাই মগ্ন থাকে যে আমার যিকির ও

দোয়া থেকে বিরত থাকে, আমি তাকে তাদের চাইতেও উত্তম জিনিস দান করি যারা আমার কাছে কিছু চায়।” তিরমিযী বলেন: এটি একটি হাসান গারীব হাদীস।

শরীরিক ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালাত, এতে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দোয়া—সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও স্থান নির্ধারিত। তাকবীরে তাহরিমার পর কিয়ামে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। রুকু ও সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ, বরং সেখানে তাসবীহ ও যিকির করা আদিষ্ট। সালাতের শেষাংশে দোয়া করতে বলা হয়েছে, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের শেষে দোয়া করতেন এবং এ সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন। সিজদায় দোয়া করা উত্তম ও আদিষ্ট। কিয়ামের অবস্থায়ও দোয়া করা বৈধ, এবং রুকুতেও দোয়া করা যায়, যদিও রুকুতে তিলাওয়াত ও যিকিরের আমল উত্তম। মূল কথা হলো, বান্দা যদি শরীয়তসম্মতভাবে তাঁর প্রভুর নিকট কিছু চায়, তবে তা উত্তম ও আদিষ্ট। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং অন্যান্য নবীগণও দোয়া করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেন: “হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু সন্তান-সন্ততিকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট একটি অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করিয়েছি, হে আমাদের প্রতিপালক, যেন তারা সালাত কায়েম করে। আপনি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলমূল দ্বারা রিযিক দিন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আপনি জানেন যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি, আর আল্লাহর নিকট কিছুই গোপন নয়, না পৃথিবীতে, না আকাশে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দোয়া শ্রবণকারী। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও [সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানান], হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমার দোয়া কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করুন সেই দিন, যেদিন হিসাব গ্রহণ করা হবে।” (ইব্রাহীম: ৩৭-৪১)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর স্মরণ করো যখন ইব্রাহীম গৃহের ভিত্তি উত্তোলন করছিলেন এবং ইসমাঈলসহ, বলছিলেন: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট থেকে এটি কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, জ্ঞানী। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার অনুগত বানান এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও একটি অনুগত উম্মত বানান। আমাদের এবাদতের পদ্ধতি আমাদের দেখান এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক!

তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আল-বাকারা: ১২৭-১২৯)

তেমনি করে একজন মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করলে সেটিও উত্তম ও আদিষ্ট। সহীহ হাদীসে আবূ দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "কোনো মুসলিম ব্যক্তি তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দোয়া করলে, আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেন। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, ঐ ফেরেশতা বলে: 'আমীন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ।'" অর্থাৎ, তোমার ভাইয়ের জন্য যা চেয়েছো, তা তোমার জন্যও।

আর কোনো সৃষ্টির নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্য কোনো সৃষ্টিকে চাওয়া অথবা তার নিকট দোয়া করতে বলা—এটি আদিষ্ট নয়; তবে জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বৈধ ও আদিষ্ট, যেমন আল্লাহ বলেন: "যদি তোমরা না জানো, তবে আহলুয যিকরের নিকট জিজ্ঞাসা করো।" (নাহল: ৪৩ / আম্বিয়া: ৭) আর আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতএব যদি তুমি সন্দেহে পড়ো সে বিষয়ে যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যারা তোমার আগে কিতাব পড়ে এসেছে।" (ইউনুস: ৯৪) এবং বলেন: "আর তুমি জিজ্ঞাসা করো তাদেরকে যাদেরকে আমি তোমার আগে পাঠিয়েছিলাম, আমি কি কখনো রহমান ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারণ করেছি কি?" (যুখরুফ: ৪৫)

কারণ, জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; যাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় অথচ সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আগুনের জবজবির লাগাম পরাবেন। আর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা বৃদ্ধি পায়; তা সম্পদের মতো ব্যয়ের মাধ্যমে কমে না। এজন্যই জ্ঞানকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়।

তেমনি করে, যে কারো অন্য কারো কাছে কোনো হক থাকে—হোক তা বস্তুগত বা ঋণ—যেমন আমানত, অংশীদারিত্ব ইত্যাদি, তাহলে মালিকের অধিকার আছে তা দাবি করার। তেমনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা রাষ্ট্রীয় অর্থ যেগুলোর বণ্টন শাসকের দায়িত্ব—সেখানে প্রত্যেকের অধিকার আছে তা চাওয়ার, যেমন ওয়াকফ, উত্তরাধিকার বা উইল থেকে হক দাবি করা যায়, কেননা শাসকের দায়িত্ব হলো হক তার হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়া। এই শ্রেণীতে আসে—যার উপর কারো ভরণপোষণের দায়িত্ব আছে, তার নিকট তা দাবি করা, এবং ভ্রমণকারী মেহমানদের আতিথেয়তা চাওয়া—যেমন মূসা ও খিযির একটি জনপদের লোকদের থেকে

খাদ্য চেয়েছিলেন।

তেমনি, পাওনাদারের অধিকার আছে ঋণগ্রহীতার কাছে তার ঋণ দাবি করার। বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য চাইতে পারে, এবং ক্রেতা বিক্রিত পণ্য চাইতে পারে। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর বাণী: "আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট কিছু চাও, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককেও।" (নিসা: ১)

এটি এবং এ ধরনের বিষয়গুলো স্পষ্ট করে যে, চাওয়া কখনো এমন হতে পারে যা চাওয়াকারীর জন্য আদেশযোগ্য নয়, যদিও যাকে চাওয়া হয়েছে, তার জন্য চাওয়ার জবাব দেওয়া আদেশযোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর প্রার্থনাকারীকে তুমি ফিরিয়ে দিও না" (সূরা আদ-দুহা: ১০)। আবার আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যাদের ধনে নির্ধারিত হক আছে—প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের জন্য" (সূরা আল-মা'আরিজ: ২৪-২৫)। আর আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা তা খাও এবং পরিতুষ্ট গরীব ও চাওয়াকারীকে খাওয়াও" (সূরা আল-হজ্জ: ৩৬)।

এ থেকে প্রমাণিত হয় সেই হাদীসটি: "তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছে কিছু চায়, আর সে তা নিয়ে এমনভাবে ফিরে যায় যেন তার বগলের নিচে জাহান্নাম রয়েছে।" এবং তাঁর এই উউক্তি: "এ লোকটির জবান আমার থেকে কেটে দাও।"

চাওয়া কখনো হারাম হতে পারে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার দিক থেকে হোক বা অপছন্দনীয় হওয়ার দিক থেকে, যদিও যাকে চাওয়া হয়েছে তার জন্য তা পূরণ করা আদেশযোগ্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে, চাওয়াকারীকে দান করতেন। এটা তাঁর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত, এবং তাঁর ক্ষেত্রে এটা হয় আবশ্যক ছিল কিংবা সুপারিশযোগ্য, যদিও চাওয়াকারীর চাওয়াটাই ছিল নিষিদ্ধ। এ কারণেই আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর মতো অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাহাবিগণ কখনো এভাবে তাঁর কাছে কিছু চাননি, কিংবা নিজেদের জন্য বিশেষভাবে দোআ করার অনুরোধ করেননি, যদিও তাঁকে মুসলিমদের জন্য দোআ করার অনুরোধ করেছেন। যেমন এক অভিযানে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসুল! যদি আগামীকাল আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই ক্ষুধার্ত অবস্থায়, তাহলে আমাদের কী হবে? কিন্তু আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে মানুষকে তাঁদের অবশিষ্ট রসদসহ ডেকে আনুন, তাদের একত্রিত করুন এবং আল্লাহর কাছে বরকতের জন্য দোআ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার দোআয়ের মাধ্যমে আমাদের বরকত দেবেন।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার

দোআয়ের মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করবেন।”

বরং কেবল কিছু মুসলিমই এরূপ চাওয়া করেছেন, যেমন অন্ধ ব্যক্তি যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য দোআ চেয়েছিলেন, এবং উম্মু সুলাইম যিনি তাঁর খাদেম আনাসের জন্য দোআ চেয়েছিলেন, এবং আবু হুরায়রা যিনি চাইছিলেন তিনি ও তাঁর মা যেন আল্লাহর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রিয় হয়ে যান—এরকম আরও উদাহরণ রয়েছে।

আর আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "আর তাকওয়াবান ব্যক্তিই তা থেকে (জাহান্নাম থেকে) বেঁচে থাকবে—যিনি নিজের ধন সম্পদ দান করেন নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, আর তা তিনি কাউকে প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্যে দেন না; বরং তিনি তাঁর পরাক্রমশালী প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভই কামনা করেন। আর তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন" (সূরা আল-লাইল: ১৭-২১)।

সহীহ হাদীসের গ্রন্থসমূহে প্রমাণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মানুষদের মধ্যে আমাদের সাহচর্য ও সম্পদের দিক থেকে সবচেয়ে অনুগত ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর। যদি আমি দুনিয়ার লোকদের মধ্যে কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাতাম, তবে আমি আবু বকরকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাতাম।”

সাহাবাদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও ধন-সম্পদ দানের দিক থেকে আবু বকর আস-সিদ্দীকই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এসব করতেন, কোনো সৃষ্টির প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এবং অন্যদের ঈমান ও জ্ঞানের বরকত দান করেছিলেন, আর এ ধরনের বরকতের প্রতিদান দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এর প্রতিদান কেবল আল্লাহই দিতে পারেন। যেমন আল্লাহ বলেন: "আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো কেবল দুনিয়াসমূহের প্রতিপালকের কাছেই" (সূরা আশ-শু'আরা: ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)।

তবে আলী, যায়দ প্রমুখ কিছু সাহাবীর উপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যা তারা প্রতিদান দ্বারা পরিশোধ করতে পারতেন। যেমন যায়দ ছিলেন তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, আর আল্লাহ বলেন: "তুমি সেই ব্যক্তিকে বলেছিলে যার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছো—'তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও'" (সূরা আল-আহযাব: ৩৭)। আর আলী ছিলেন তাঁর ঘরের অন্তর্ভুক্ত, কারণ মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু তালিবের পরিবারকে লাঘব করতে চেয়েছিলেন, তাই

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে নিজের ঘরে নিয়ে নেন এবং আব্বাস জাফরকে নিয়ে যান। এই ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে অন্যত্র এসেছে।

মূল বক্তব্য হচ্ছে, আবু বকর ছিলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহচর্য ও সম্পদে সবচেয়ে অনুগত ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতেন, যেমন নির্যাতিতদের মুক্ত করে দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কিংবা অন্য কারো প্রয়োজন বোধ করতেন না। এমনকি হিজরতের পথে আবু বকর বলেছিলেন: "আমার দুটি উটনী আছে, একটি আপনি নিয়ে নিন।" তখন তিনি বলেছিলেন: "মূল্য দিয়ে নেব।"

তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বোত্তম বন্ধু। তাঁর পূর্ণতা এটাই ছিল যে, তিনি যা কিছু করতেন, তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতেন, কোনো সৃষ্টির প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়—না ফেরেশতা, না নবী, না অন্য কেউ। দোআও একধরনের প্রতিদান। আল্লাহ বলেন: "আমরা তো তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তোমাদের কাছ থেকে আমরা কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না" (সূরা আল-ইনসান: ৯)।

এক হাদীসে এসেছে: "যে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে, তাকে প্রতিদান দাও। যদি তুমি কোনো প্রতিদান না দিতে পারো, তাহলে তার জন্য দোআ করো, যতক্ষণ না মনে হও যে তুমি তাকে প্রতিদান দিয়েছো।"

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন কারো নিকট সদকা পাঠাতেন, তখন দূতকে বলতেন: "দেখো, তারা আমাদের জন্য কী দোআ করে, যেন আমরা তাদের জন্য অনুরূপ দোআ করতে পারি এবং আমাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছেই থেকে যায়।"

সালাফদের কেউ কেউ বলতেন: যখন চাওয়াকারী তোমাকে বলে, "আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন", তখন বলো, "আপনাকেও আল্লাহ বরকত দান করুন।"

যে ব্যক্তি কোনো সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করে—সে নবী হোক, সৎকর্মশীল হোক, রাজা হোক কিংবা ধনী—সে আদিষ্ট হয়েছে তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করার, সৃষ্টির কোনো প্রতিদান বা দোআ কামনা না করার।

আল্লাহ সমস্ত বান্দাকে তাঁর ইবাদতের জন্য এবং তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এটিই ইসলামের ধর্ম, যা আল্লাহ প্রথম ও শেষ সকল রাসুলের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। তিনি এর ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন কারো থেকে গ্রহণ করেন না।

আল্লাহ বলেন: "আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করে, তা কখনোই তার নিকট গ্রহণ করা হবে না, আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা আলে ইমরান: ৮৫)।

নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ঈসা এবং সকল নবীর অনুসারীগণ ইসলামের ওপরই ছিলেন। নূহ বলেন: "আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই" (সূরা ইউনুস: ৭২)।

আল্লাহ ইবরাহিম সম্পর্কে বলেন: "আর কে ইবরাহিমের দ্বীন থেকে মুখ ফিরাবে, সে ব্যক্তি ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ বানায়?" ... “আমি মুসলিম হয়েছি জাহান্নাম সমূহের প্রতিপালকের জন্য” (সূরা আল-বাকারা: ১৩০-১৩২)।

মূসা আ: বলেছিলেন: "হে আমার কওম! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো, তবে তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম হও" (সূরা ইউনুস: ৮৪)।

জাদুকররা বলেছিলেন: "হে আমাদের রব! আমাদের ওপর ধৈর্য বর্ষণ করো এবং আমাদের মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও" (সূরা আল-আ'রাফ: ১২৬)।

ইউসুফ আ: বলেছিলেন: "আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিয়ে দাও" (সূরা ইউসুফ: ১০১)।

আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আমরা তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে পথনির্দেশ ও আলো, নবীগণ, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা দিয়ে বিচার করতেন" (সূরা আল-মায়িদা: ৪৪)।

হাওয়ারীরা বলেছিলেন: “আমরা ঈমান এনেছি, আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমরা মুসলিম” (সূরা আল-মায়িদা: ১১১)।

ইসলামের দ্বীন দুটি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত: এক. আমরা যেন কেবল আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি; দুই. আমরা যেন তাঁর বিধান অনুসারে ইবাদত করি—যা রাসুলগণকে আদিষ্ট করা হয়েছে, আবশ্যক অথবা সুন্নত হিসেবে।

সুতরাং প্রতিটি যুগে আল্লাহ যেভাবে ইবাদত করতে আদেশ করেছেন, সে অনুযায়ী ইবাদত করাই ইসলাম। যখন তাওরাতের শরীয়ত ছিল, তখন যারা তা অনুসরণ করত, তারা মুসলিম ছিল। ইনজিলের শরীয়াহ্‌র ক্ষেত্রেও তাই। ইসলামের প্রারম্ভে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাকদিসের দিকে সালাত আদায় করতেন, তখন সেটাও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে যখন তাঁকে কাবার দিকে ফিরে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন কেবল কাবার দিকেই সালাত ইসলাম হয়ে গেল, আর এর বিপরীত দিককে ফিরিয়ে নেওয়া ইসলামের বাইরে হয়ে গেল। সুতরাং, যে কেউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর আল্লাহর বিধান অনুসারে ফরজ ও সুন্নত আমল করে না, সে মুসলিম নয়। আর ফরজ ও সুন্নত প্রতিটি কাজেই একনিষ্ঠতা অপরিহার্য—তা কেবল আল্লাহর জন্য হতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন: "আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা বিভেদে পড়েছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই; অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল কেবল এই যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে একনিষ্ঠভাবে, হকপন্থী হয়ে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। এটাই সরল দ্বীন" (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৪-৫)।

আর আল্লাহ বলেন: "এই কিতাবের অবতারণা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি। অতএব, আল্লাহর ইবাদত করো একনিষ্ঠভাবে। শুনে রাখো, একনিষ্ঠ দ্বীন তো কেবল আল্লাহরই" (সূরা আয-যুমার: ১-৩)।

অতএব, একজন মুসলিম যা কিছুই করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে—তা ফরজ হোক বা নফল, যেমন: আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান, দেহগত বা আর্থিক ইবাদত, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসা, আর আল্লাহর বান্দাদের উপকার ও ধনসম্পদের মাধ্যমে সদাচরণ—তাহলে সে আদিষ্ট হয়েছে যেন এগুলো সে কেবলমাত্র আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালকের জন্যই করে, কোনো সৃষ্টির নিকট থেকে এর বিনিময়ে কিছু চায় না, সে দোয়া হোক বা দোয়া ছাড়া অন্য কিছু। এগুলো এমন কিছু যার জন্য কোনো সৃষ্টির নিকট থেকে বিনিময় চাওয়া বৈধ নয়—না দোয়ার বিনিময়ে, না অন্য কিছু।

আর কোনো সৃষ্টির নিকট কিছু চাওয়া—যা জ্ঞানের বা নিজের প্রাপ্য হকের চাওয়া নয়—তা ফরজ তো নয়ই, এমনকি মুস্তাহাবও নয়, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ব্যতীত। বরং প্রায় ক্ষেত্রেই প্রার্থিত ব্যক্তিকে চাওয়ার আগেই দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মুমিনদেরকে সৃষ্টির নিকট কিছু চাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়নি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তদপেক্ষাও অধিকভাবে এর উর্ধ্বে, কেননা তিনি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ

এবং আল্লাহর দ্বারা অন্য সকলের থেকে অধিকভাবে সচ্ছল। কেননা, সৃষ্টির নিকট চাওয়ার মধ্যে তিনটি বিপদ রয়েছে:

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রয়োজনীয়তার বোধ—এটি শিরকের এক প্রকার।

২. যিনি চাওয়া হয়েছে, তার উপর কষ্ট চাপিয়ে দেওয়া—এটি সৃষ্টির প্রতি জুলুমের একটি ধরন।

৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে নিজের অপমান প্রকাশ—এটি নিজের উপর জুলুম।

অতএব, এতে তিন প্রকারের জুলুমই একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর রাসুলকে এসব সকল জুলুম থেকে পরিশুদ্ধ করেছেন।

যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের নিকট দোয়ার অনুরোধ করেছেন, সেটি ছিল তাদের কল্যাণের নির্দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে, যেমন তিনি অন্যান্য ফরজ ও মুস্তাহাব আমলের আদেশ দেন। যদিও তাদের দোয়ার মাধ্যমে তিনিও লাভবান হন, তবে তিনি যেসব ইবাদত ও নেক আমলের আদেশ দেন, সেগুলোর মাধ্যমেও তিনি লাভবান হন। কেননা, সহীহ হাদীসে তাঁর পক্ষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানায়, তার জন্য সেইসব লোকদের সমপরিমাণ সওয়াব আছে যারা তার অনুসরণ করে, তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।" আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সেই সকল নেক আমলের দায়ী যা তাঁর উম্মত করে থাকে। অতএব, যা কিছু তারা করে, তার সমপরিমাণ সওয়াব তিনি পান, তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হয় না।

এই কারণেই সালাফদের নিয়ম ছিল না যে, তারা নিজেদের আমলের সওয়াব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দেন, কেননা তিনি তো তা গিফট ছাড়াই পেয়ে থাকেন এবং তাদের সওয়াবও কমে না। এটি পিতামাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কেননা সন্তান যা কিছু করে, তার জন্য পিতা-মাতা সমান সওয়াব পান—এমনটি নয়। বরং পিতা-মাতা লাভবান হন সন্তানের দোয়া ও অনুরূপ কিছু দ্বারা, যার উপকার তাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। যেমন তিনি এক সহীহ হাদীসে বলেছেন: "আদম সন্তানের মৃত্যু হলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি ব্যতিক্রম: সদাকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা থেকে উপকার পাওয়া যায়, আর এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"

অতএব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তাঁর উম্মতের নিকট থেকে দোয়া চেয়েছেন, তা আদেশ ও উৎসাহ প্রদানের রূপে, সরাসরি প্রার্থনা চাওয়া নয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠানোর নির্দেশ। আল্লাহ কুরআনে এর আদেশ দিয়েছেন: "তোমরা তাঁর উপর দরূদ পাঠাও ও সালাম দাও" (আল-আহযাব: ৫৬)। তাঁর পক্ষ থেকে সালাত ও সালামের হাদীসগুলো প্রসিদ্ধ। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, তাঁর জন্য আল-ওয়াসীলাহ, আল-ফাদীলাহ, এবং আল-মাকাম আল-মাহমূদ চাওয়ার আদেশ। সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর হতে প্রমাণিত, তিনি বলেন: "যখন মুয়াজ্জিনের আহ্বান শুনো, তার মতো বলো, তারপর আমার উপর দরূদ পাঠাও। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠাবে, আল্লাহ তার উপর দশবার দরূদ পাঠাবেন। এরপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করো, কারণ এটি জান্নাতে একটি স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র একজনেরই উপযুক্ত, আর আমি আশাবাদী যে সেই ব্যক্তি হব আমি। যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসীলাহ চায়, তার জন্য কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ হালাল হবে।" আর সহীহ বুখারীতে জাবির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় বলে: 'হে এই পূর্ণ আহ্বানের প্রভু এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু, মুহাম্মাদকে দাও ওয়াসীলাহ, ফাদীলাহ ও উচ্চ মর্যাদা, আর তাঁকে উত্থিত কর সেই প্রশংসিত স্থানে, যা তুমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ—নিশ্চয়ই তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না', তার জন্য কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ হালাল হবে।" তিনি মুসলিমদের উৎসাহ দিয়েছেন তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ চাওয়ার ব্যাপারে এবং স্পষ্ট করেছেন যে, যে তাঁর জন্য তা চায়, তার জন্য কিয়ামতের দিনে তাঁর সুপারিশ হালাল হবে; যেমন, যে একবার তাঁর উপর দরূদ পাঠায়, আল্লাহ তার উপর দশবার দরূদ পাঠান, কারণ প্রতিদান কাজের অনুরূপ।

এই শ্রেণীতে পড়ে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী (তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন), এবং ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীস: উমার ইবনুল খাত্তাব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উমরাহর অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন এবং বলেন: "আমার ভাই, আমাদের জন্য দোয়া করতে ভুলো না।" এটি তাঁর উম্মতের নিকট দোয়া চাওয়ার অনুরূপ, যেমন তিনি তাঁদের সালাত ও সালাম পাঠাতে, ওয়াসীলাহ ও উচ্চ মর্যাদা চাওয়ার আদেশ দেন। এটি অন্য সকল নেক আমলের আদেশের মতোই। তাঁর উদ্দেশ্য সেই ব্যক্তির কল্যাণ, দয়া ও উপকার। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তেমনি উপকার পান যখন তিনি তাদের কল্যাণের শিক্ষা দেন এবং সে অনুযায়ী আদেশ করেন, যেমন তিনি লাভবান হন তাদের নেক আমল ও তাঁর

জন্য দোয়ার মাধ্যমে।

এই শ্রেণীতে পড়ে প্রশ্নকারী যে বলেছিল: “আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠাই, তাহলে আমার দোয়ার কতটুকু আপনাকে উৎসর্গ করব?” তিনি বললেন: “যত খুশি।” সে বলল: “এক-চতুর্থাংশ?” তিনি বললেন: “যত খুশি, আর বাড়ালে তা তোমার জন্য উত্তম।” সে বলল: “অর্ধেক?” তিনি বললেন: “যত খুশি, আর বাড়ালে তা তোমার জন্য উত্তম।” সে বলল: “দুই-তৃতীয়াংশ?” তিনি বললেন: “যত খুশি, আর বাড়ালে তা তোমার জন্য উত্তম।” সে বলল: “আমি আমার পুরো দোয়াই আপনাকে উৎসর্গ করব।” তিনি বললেন: “তাহলে তোমার চিন্তা দূর হয়ে যাবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।” এ হাদীস আহমদ, তিরমিযী ও অন্যান্য বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে “জওয়াবুল মাসাইল আল-বাগদাদিয়্যাহ” গ্রন্থে। কারণ ঐ ব্যক্তি একটি দোয়া করতেন, যদি সে দোয়ার পরিবর্তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করত, তাহলে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা দূর করতেন। কেননা, সে যখনই একবার দরূদ পাঠ করত, আল্লাহ তার উপর দশবার দরূদ পাঠাতেন। যদি সে মুমিনদের জন্য দোয়া করত, তাহলে ফেরেশতা বলত: “আমীন, এবং তোমার জন্যও অনুরূপ।” সুতরাং, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দোয়া করা এ থেকে বেশি হকদার।

যে কেউ অন্যকে বলে: “আমার জন্য দোয়া করো”—অথবা “আমাদের জন্য”—এ উদ্দেশ্যে যে, আদিষ্ট ব্যক্তি দোয়ার দ্বারা উপকৃত হবেন, এবং আমরকারী নিজেও তার আদেশের দ্বারা উপকৃত হবেন, আর আদিষ্ট ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করবেন, যেমন তাকে অন্য নেক কাজে আদেশ দেয়—তাহলে সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণকারী ও অনুকরণকারী। এটি অনুচিত চাওয়া নয়। কিন্তু যদি তার উদ্দেশ্য হয় কেবল নিজের প্রয়োজন মেটানো, আদিষ্ট ব্যক্তির কল্যাণ বা উপকারের কোনো নিয়ত ছাড়াই, তাহলে সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণকারী নয়। বরং এটি সেই অনুচিত চাওয়া, যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইচ্ছা রাখা—সৃষ্টির প্রতি ইচ্ছা রাখা ও তার নিকট কিছু চাওয়ার চেয়ে উত্তম। এ সকল কথা জীবিত ব্যক্তির নিকট বৈধ, শরীয়তসম্মত চাওয়ার বিষয়ের মধ্যে পড়ে।

কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট চাওয়া—এটি শরীয়তসম্মত নয়, না ফরজ, না মুস্তাহাব, এমনকি মুবাহও নয়। সাহাবীগণ, তাদের অনুসারী তাবেঈন, বা সালাফদের কেউ কখনো তা করেননি, আর কেউ তা সুন্নত বলেও মনে করেননি। কেননা, এতে ফায়দার চেয়ে ক্ষতির দিক ভারী। শরীয়ত কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বা কল্যাণময়

কাজে আদেশ করে। অথচ এতে কোনো ভারী কল্যাণ নেই; বরং এটি হয় বিশুদ্ধ ক্ষতি, নয়ত ক্ষতিকর দিকই প্রবল, আর এ উভয়ই শরীয়তে অনুমোদিত নয়।

সুতরাং এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু করেছেন অন্যদের নিকট দোয়া চেয়ে—তা মানুষের প্রতি সদাচরণের শ্রেণীতে পড়ে, যা কখনো ফরজ, কখনো মুস্তাহাব। তেমনি তিনি জানাজার সালাত পড়ার, মুমিনদের কবর যিয়ারত করার, তাদের প্রতি সালাম ও তাদের জন্য দোয়া করার যে নির্দেশ দিয়েছেন—তা মৃতদের প্রতি সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত, যা কখনো ফরজ, কখনো মুস্তাহাব। কেননা, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সালাত ও সদকার নির্দেশ দিয়েছেন। সালাত হলো দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর হক, আর সদকা হলো সৃষ্টির হক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে আল্লাহর হক ও বান্দাদের হক পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন—তাঁর ইবাদত করে, আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। সেই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো, মানুষের প্রতি সদাচরণ, যেখানে আল্লাহ আদেশ করেছেন, যেমন জানাজার সালাত পড়া ও মুমিনদের কবর যিয়ারত করা। কিন্তু শয়তান তার অনুসারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, যার ফলে তাদের নিয়ত হয়ে গেছে স্রষ্টার সাথে শিরক করা এবং সৃষ্টির ক্ষতি করা। কেননা, যদি কেউ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য করে শুধুই কবরবাসী নবী বা সৎ ব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়া, অথবা তাদের কাছে চেয়ে (আল্লাহর নিকট) প্রার্থনা করা, কিংবা তাদের প্রতি সালাম না পাঠিয়ে বা তাদের জন্য দোয়া না করে শুধু কিছু চাওয়া—যেমন জানাজার উদ্দেশ্য দোয়া করা—তাহলে সে মুশরিক, ক্ষতিকর ব্যক্তি, প্রার্থিত ব্যক্তির প্রতি জুলুমকারী, এবং নিজের উপরও জুলুমকারী। এভাবে তারা তিন প্রকার জুলুম একত্রিত করেছে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা হলো তাওহীদ, ন্যায়বিচার, সদাচার, নিষ্ঠা ও দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দাদের কল্যাণের জন্য দ্বীন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বিধিবদ্ধ করেননি—ইবাদতের যে সব বিদআত সৃষ্টি করা হয়েছে—তাতে রয়েছে শিরক, জুলুম, অবিচার ও দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দাদের জন্য ক্ষতি ও ধ্বংস। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের আদেশ করেছেন যেন তারা কেবল তাঁকেই ইবাদত করে এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি সদয় হয়, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিও..." (সূরা আন-নিসা: ৩৬)। এটি মহৎ চরিত্র অর্জনের নির্দেশ, আর তিনি (আল্লাহ), যিনি মহান ও পবিত্র, মহৎ চরিত্রকে পছন্দ করেন এবং নিচু চরিত্র অপছন্দ করেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “আমি কেবলমাত্র মহৎ চরিত্র পরিপূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি।” হাকিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ হাদীসে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: “উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।” এবং আরও বলেছেন: “উপরের হাত হলো দানকারী, আর নিচের হাত হলো চাওয়াকারী।” এটি সহীহ হাদীসে সাব্যস্ত।

তাহলে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদয় হওয়া আর তাদেরকে চেয়ে চেয়ে কষ্ট দেওয়া—এই দুটি মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আর আল্লাহর প্রতি ইচ্ছা, আশা, ভরসা ও ভালোবাসার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার তাওহীদ আর তাঁর সঙ্গে সৃষ্টির প্রতি একইরূপ ইচ্ছা, আশা, নির্ভরতা ও আল্লাহর ন্যায় ভালোবাসা স্থাপন করে শরিক করা—এ দুটির মধ্যে ফারাক কোথায়? আর বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি ইবাদতে নিষ্ঠা, বিনয় ও দরিদ্রতার মাধ্যমে অর্জিত ধার্মিকতা এবং সৃষ্টির প্রতি এমনিভাবে দাসত্ব, নম্রতা ও চাওয়ার মধ্যে থাকা দুর্নীতি—এই দুই অবস্থার পার্থক্যই বা কোথায়?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তিনটি গুণের আদেশ করেছেন, যা দুনিয়া ও আখিরাতে তার বাস্তবায়নকারীর কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং তিনি নিষেধ করেছেন সেই তিনটি কর্ম যা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু শয়তান রাসুলের আদেশের বিপরীতটি আদেশ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে আদেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত কোরো না? সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এবং কেবল আমারই ইবাদত করো। এটাই সোজা পথ। অথচ সে তো তোমাদের মধ্য থেকে অনেককে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝলে না?" (সূরা ইয়াসীন: ৬০-৬২)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন: "নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু যেসব পথভ্রষ্ট তোমার অনুসরণ করে তাদের ছাড়া।" (সূরা আল-হিজর: ৪২)। তিনি বলেন: "তোমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত কর, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই সে তাদের উপর কর্তৃত্ব রাখতে পারে না, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। তার কর্তৃত্ব কেবল তাদের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শরিক করে।" (সূরা আন-নাহল: ৯৮-১০০)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "যে ব্যক্তি পরম করুণাময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তার জন্য আমি এক শয়তান নিযুক্ত করি এবং সে হয় তার সাথী। আর তারা মানুষকে পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, অথচ তারা মনে করে তারা সঠিক পথেই আছে।" (সূরা আয-যুখরুফ: ৩৬-৩৭)। পরম করুণাময়ের স্মরণ মানে সেই স্মরণ যা আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যাঁর ব্যাপারে তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আমরাই এ স্মরণ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণকারী।" (সূরা আল-হিজর: ৯)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশ আসে, তখন যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভোগেও পড়বে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরায়, তার জীবন সংকীর্ণ হবে এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" সে বলবে, 'হে আমার পালনকর্তা! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন অথচ আমি তো দেখতে পেতাম?' তিনি বলবেন, 'তোমার কাছে আমার নিদর্শন এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, সুতরাং আজ তুমিও ভুলে যাওয়া হবে।'" (সূরা ত্বাহা: ১২৩-১২৬)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আলিফ, লাম, মীম, ছাদ। এই গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে—তুমি যেন এতে দুঃখবোধ না করো—যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক করতে পারো এবং মুমিনদের জন্য এটি উপদেশ হয়। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা অনুসরণ করো এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।" (সূরা আল-আরাফ: ১-৩)।

তিনি বলেন: "এই গ্রন্থ আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসো—সামর্থ্যবান ও প্রশংসিত আল্লাহর পথে। যাঁর জন্যই আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব। কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা ইবরাহিম: ১-২)।

তিনি বলেন: "এভাবেই আমি তোমার কাছে আমার আদেশ দ্বারা ওহি প্রেরণ করেছি। তুমি তো জানতেই না কিতাব কী এবং ঈমান কী, কিন্তু আমি এটিকে করেছি এক আলো, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সোজা পথে আহ্বান কর—আল্লাহর পথে, যাঁর জন্য আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সব। জেনে রাখো, সব কিছুই আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।" (সূরা আশ-শূরা: ৫২-৫৩)।

সোজা পথ হচ্ছে সেটিই, যা আল্লাহ তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে প্রেরণ করেছেন—আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা এবং যে সকল বিষয়ে রাসুল বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করা। আল্লাহর দিকে যাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই। এটাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পথ, আল্লাহর বিজয়ী দল ও তাঁর সেনাবাহিনীর পথ। এর বিপরীত সবকিছু ভ্রান্ত পথ ও পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত।

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে এ সকল ভ্রান্তি থেকে পবিত্র রেখেছেন। তিনি বলেন: "নক্ষত্রের শপথ যখন তা পতিত হয়, তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) পথভ্রষ্ট হননি, তিনি ভুল করেননি। তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এটা তো এক ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।" (সূরা আন-নাজম: ১-৪)।

আল্লাহ আমাদের নামাযে আদেশ করেছেন বলার জন্য: "আমাদের সোজা পথ দেখাও—তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যারা আপনার রাগের শিকার নয় এবং যারা পথভ্রষ্ট নয়।" (সূরা আল-ফাতিহা: ৬-৭)। তিরমিযি ও অন্যান্য বর্ণনাকারী আদী ইবনু হাতিম থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইহুদিরা হলো যাদের ওপর আল্লাহর রাগ হয়েছে এবং খ্রিষ্টানরা হলো পথভ্রষ্টরা।" তিরমিযি বলেন: এটি সহীহ হাদীস।

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ বলেন: তারা বলতেন, “আমাদের আলিমদের কেউ যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তবে সে ইহুদিদের মতো হয় এবং আমাদের আবেদদের কেউ যদি ভ্রান্ত হয়, তবে সে খ্রিষ্টানদের মতো হয়।” বহু সালাফ বলতেন: “পাপী আলিম ও অজ্ঞ আবেদের ফিতনা থেকে বাঁচো, কেননা তাদের ফিতনাই সর্বসাধারণের জন্য বিপদ।”

যে ব্যক্তি সত্য জানে কিন্তু তা অনুযায়ী কাজ করে না, সে ইহুদিদের মতো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দাও, অথচ নিজেদের ভুলে যাও, অথচ তোমরাই তো কিতাব পাঠ করো? তবুও কি তোমরা বুঝবে না?" (সূরা আল-বাকারা: ৪৪)। আর যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই ইবাদত করে, চরমপন্থা ও শিরকের মধ্যে পড়ে, সে খ্রিষ্টানদের মতো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "হে কিতাবের লোকেরা! তোমরা তোমাদের দীন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতিদের অনুসরণ করো না, যারা বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে এবং নিজেরাও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।" (সূরা আল-মায়িদাহ:

৭৭)।

প্রথম দল বিভ্রান্তদের মধ্যে এবং দ্বিতীয় দল পথভ্রষ্টদের মধ্যে। কেননা বিভ্রান্তি মানে প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং পথভ্রষ্টতা মানে সঠিক পথের অভাব। আল্লাহ বলেন: "তাদের সামনে তুমি সেই ব্যক্তির কথা তুলে ধরো, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে বিমুখ হয়েছিল। ফলে শয়তান তাকে অনুসরণ করল এবং সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। আমি চাইলে তাকে তার মাধ্যমে উন্নীত করতে পারতাম, কিন্তু সে তো পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল। তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো—তুমি তাড়ালেও হাঁপায়, ছেড়ে দিলেও হাঁপায়। এটাই সেই জাতির দৃষ্টান্ত, যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে। অতএব, তুমি উপমাগুলো বিবৃত করো, যেন তারা চিন্তা করে।" (সূরা আল-আরাফ: ১৭৫-১৭৬)।

তিনি আরও বলেন: "যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে, আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে রাখি। তারা সব নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনে না। তারা হিদায়তের পথ দেখলেও গ্রহণ করে না, কিন্তু গোমরাহির পথ দেখলে তাতে চলতে থাকে। এর কারণ হলো, তারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা মনে করেছে এবং তা থেকে গাফেল থেকেছে।" (সূরা আল-আরাফ: ১৪৬)।

যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি—উভয়কে একত্র করে, সে এই দুটি দলের সাদৃশ্য ধারণ করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদের এবং আমাদের সকল ভাইদেরকে সেসব ব্যক্তিদের পথে পরিচালিত করেন, যাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেছেন—নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের পথে। আর তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!

অনুচ্ছেদ

যখন এ বিষয়টি বোঝা যায়, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে 'আল-ওসীলা (উপায় বা মাধ্যম) এবং 'আত-তাওয়াস্সুল' (উপায় গ্রহণ করা) শব্দ দুটি সাধারণ ও বিভ্রান্তিকর অর্থ ধারণ করে, যার প্রকৃত অর্থ জানা আবশ্যক এবং প্রত্যেকটি দিককে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া জরুরি। অতএব, একজনকে জানতে হবে কিতাব ও সুন্নাহতে এ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে এবং তার অর্থ কী; সাহাবাগণ এ বিষয়ে কী বলতেন এবং কী করতেন এবং তার অর্থ কী; এবং বিদআতকারীরা এই পরিভাষা ও তার অর্থে কী নতুন কিছু এনেছে, তাও জানতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তির কারণ এই সাধারণতা ও অর্থের অংশীদারিত্ব, এমনকি দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই এই বিষয়ে চূড়ান্ত মাপকাঠি কী তা জানে না।

'আল-ওসীলা' শব্দটি কুরআনে এসেছে আল্লাহ তা'আলার বাণীতে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে পৌঁছার উপায় অনুসন্ধান করো" (আল-মায়েদা: ৩৫), এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীতে: "বলুন, তোমরা যাদের আল্লাহ ছাড়া আহ্বান কর, তারা তো তোমাদের থেকে কষ্ট দূর করতে পারে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। তারা নিজেরাই তাদের রবের নিকট পৌঁছার উপায় খোঁজে, কে তার নিকটবর্তী হতে পারে, তারা তাঁর রহমত কামনা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভীতিকর" (আল-ইসরা: ৫৬-৫৭)।

সুতরাং, সেই 'ওসীলা' যার প্রতি আল্লাহ মানুষকে আহ্বান করেছেন, এবং যা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে তাঁর ফেরেশতা ও নবীগণ তা খোঁজে, সেটি হলো এমন কাজ যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়, তা ফরজ হোক কিংবা সুন্নত। এই ওয়াসীলা, যার নির্দেশ আল্লাহ ঈমানদারদের দিয়েছেন, তা সকল ফরজ ও সুন্নত আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে। যা ফরজ বা সুন্নত নয়, যেমন হারাম, মাকরূহ বা মুবাহ, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ফরজ ও সুন্নত হলো যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়ত হিসেবে প্রণয়ন করেছেন, ফরজ বা সুন্নত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে। এর ভিত্তি হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা এনেছেন তাতে ঈমান রাখা। অতএব, সেই ওয়াসীলার প্রকৃত অর্থ যার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন, তা হলো আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা এনেছেন, তার অনুসরণ করা। এর বাইরে আল্লাহর দিকে পৌঁছার আর কোনো উপায় নেই।

দ্বিতীয়ত, সহীহ হাদীসসমূহে ‘আল-ওসীলা’ শব্দটি এসেছে, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসীলা চাইবে, কেননা এটি জান্নাতে এমন একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্থান যা শুধুমাত্র আল্লাহর একজন বান্দারই প্রাপ্য এবং আমি আশা করি সেই বান্দা আমি হব। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওয়াসীলা চাইবে, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার জন্য হালাল হবে।" আর তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি আজান শুনে বলে, ‘হে এই পরিপূর্ণ আহ্বানের রব ও কায়েমকৃত সালাতের রব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসীলা ও ফজিলত দান করুন, এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত মর্যাদায় পুনরুত্থিত করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন; নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না’, তার জন্য সুপারিশ হালাল হবে।" এই ‘ওসীলা’ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে এই ওয়াসীলা চাই, এবং তিনি জানিয়েছেন যে এটি আল্লাহর এক বান্দার জন্য নির্দিষ্ট হবে, এবং তিনি আশা করেন যে সেই বান্দা তিনিই হবেন। আমাদেরকে তাঁর জন্য এই ওয়াসীলা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তিনি জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তা চাইবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ হালাল হবে। কারণ প্রতিদান কার্য অনুযায়ীই হয়। যেহেতু তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দোয়া করেছে, সেহেতু তাঁর পক্ষ থেকে তাদের জন্য দোয়া করাও প্রাপ্য হয়ে যায়; আর সুপারিশ দোয়ারই একটি রূপ। যেমন তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার দরূদ পাঠ করেন।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তাওয়াস্সুল এবং সাহাবাদের কথাবার্তায় তাঁর প্রতি মুখ ফেরানোর অর্থ ছিল তাঁর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করা। কিন্তু বহু পরবর্তী যুগের সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রচলিত 'তাওয়াস্সুল' বলতে বোঝানো হয় তাঁর প্রতি কসম করা ও তাঁর দ্বারা চাওয়া, যেমন তারা অন্যান্য নবী ও সৎ ব্যক্তিদের দ্বারাও শপথ করে এবং চায়, যাদের তারা সৎ বলে বিশ্বাস করে। এই ক্ষেত্রে ‘তাওয়াস্সুল’ শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে প্রথম দুটি অর্থ মুসলিমদের সর্বসম্মতিতে সঠিক, আর তৃতীয় অর্থটির কোনো সহীহ সুন্নাহ নেই।

প্রথম দুইটি সঠিক অর্থ হলো:

প্রথমত, তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করা—এটাই ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, তাঁর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করা—যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এই দুইটি অর্থ মুসলিমদের সর্বসম্মতিতে বৈধ। এর একটি উদাহরণ হলো উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি: "হে আল্লাহ! আমরা যখন অনাবৃষ্টিতে পড়তাম, তখন আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে আপনার নিকট তাওয়াস্সুল করতাম, তখন আপনি আমাদের বৃষ্টি দিতেন। এখন আমরা আপনার নিকট আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করছি, অতএব আপনি আমাদের বৃষ্টি দিন।" অর্থাৎ, তিনি আল-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তোমরা তাঁর দিকে পৌঁছার উপায় খোঁজো" (আল-মায়েদা: ৩৫), অর্থাৎ, তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া; আর রাসুলের আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য। আল্লাহ বলেছেন: "যে রাসুলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল" (আন-নিসা: ৮০)। অতএব, তাওয়াস্সুলের এই প্রথম প্রকারটি দ্বীনের ভিত্তি, এবং কোনো মুসলিম এটিকে অস্বীকার করে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল—যেমন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—তিনি আল-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ার মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নয়। এই জন্যই তাঁরা রাসুলের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল না করে তাঁর চাচা আল-আব্বাসের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করেছেন। যদি এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে হতো, তাহলে আল-আব্বাসের পরিবর্তে রাসুলের মাধ্যমেই করা হতো অধিকতর উপযুক্ত। সুতরাং, যখন তাঁরা রাসুলের পরিবর্তে আল-আব্বাসের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করলেন, তখন বোঝা গেল, যা তাঁর জীবদ্দশায় করা যেত, তা তাঁর মৃত্যুর পর আর সম্ভব নয়; বিপরীতে তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল সর্বদা বৈধ।

সুতরাং, 'তাওয়াস্সুল' শব্দটির তিনটি অর্থ হয়:

১. তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল: এটি ফরজ, এবং ঈমান পূর্ণ হয় না তা ছাড়া।

২. তাঁর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল: এটি তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে এবং কিয়ামতের দিনও ঘটবে, যখন মানুষ তাঁর সুপারিশ চাইবে।

৩. তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে শপথ করা এবং তাঁর সত্তার মাধ্যমে চাওয়া: এটি সাহাবারা কখনো করেননি—না জীবিত অবস্থায়, না মৃত্যুর পরে, না কবরস্থলে, না অন্য কোথাও। সাহাবাদের মধ্যে এ ধরনের কোনো পরিচিত দোয়ায় এ বিষয় পাওয়া যায় না। বরং এ জাতীয় কিছু দুর্বল হাদীসেই এসেছে—কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে, কখনো সাহাবাদের নামে, বা এমন ব্যক্তিদের থেকে যাদের বক্তব্য দলীল নয়—যা আমরা পরবর্তীতে আল্লাহ ইচ্ছা করলে উল্লেখ করব। এটাই ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীদের মতামত যে, এটি বৈধ নয় এবং তারা তা নিষেধ করেছেন। যেমন, তারা বলেছেন: "আল্লাহর কাছে কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে কিছু চাওয়া উচিত নয়, কেউ যেন না বলে: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নবীদের হক্কে তোমার কাছে চাই।'" আবু আল-হুসাইন আল-কুদুরী তাঁর প্রসিদ্ধ ফিকহগ্রন্থ 'শরহুল কারখী'-তে, 'মাকরূহ বিষয়াবলী' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: আবু হানিফার বহু সাথী এটিকে বলেছেন। বিশর ইবনুল ওলিদ বলেন: আবু ইউসুফ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আবু হানিফা বলেছেন: আল্লাহ ছাড়া কাউকে মাধ্যম করে দোয়া করা উচিত নয়। আমি অপছন্দ করি কেউ বলুক, 'আমি চাই তোমার আরশের মহিমান্বিত গাঁটের ওসীলা বা তোমার সৃষ্টির হক্কে।'"

এটাই আবু ইউসুফের মতও। তিনি বলেন: "আরশের মহিমান্বিত গাঁট বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহকেই, তাই আমি এটি অপছন্দ করি না। কিন্তু আমি অপছন্দ করি কেউ বলুক, 'অমুকের হক্কে, তোমার নবী-রাসূলদের হক্কে, বা পবিত্র ঘর ও পবিত্র নিদর্শনের হক্কে আমি চাই।'" আল-কুদুরী বলেন: "সৃষ্টির মাধ্যমে চাওয়া বৈধ নয়, কারণ সৃষ্টির আল্লাহর উপর কোনো হক্ক নেই, অতএব এটি সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ।"

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সাহচর্যকারীগণের এই বক্তব্য যে, আল্লাহকে সৃষ্টির মাধ্যমে ডাকা হয় না—এর দুটি দিক রয়েছে। এদের একটি দিক অন্যান্য ইমামদের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা কোনো সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা যদি একটি সৃষ্ট বস্তু দ্বারা আরেকটি সৃষ্ট বস্তু উপর শপথ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়, তবে সৃষ্টি দ্বারা স্রষ্টার উপর শপথ গ্রহণ করা আরও অধিক হারে নিষিদ্ধ ও অনুচিত হবে। এটি আল্লাহর ব্যাপার থেকে ভিন্ন, তিনি, মহান ও পবিত্র, তাঁর কিছু সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ করেছেন, যেমন: "রাত্রি যখন ঢেকে ফেলে" (সূরা আল-লাইল: ১), "আর দিন যখন উদিত হয়" (সূরা আল-লাইল: ২), "সূর্যের শপথ এবং তার দীপ্তির শপথ" (সূরা আশ-শামস: ১), "যারা (ফেরেশতা) কঠোরভাবে প্রাণ সংহার করে তাদের শপথ" (সূরা আন-নাযিআত: ১), "যারা সারিবদ্ধভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তাদের শপথ" (সূরা আস-সাফফাত: ১)। কারণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্ট বস্তুর শপথ গ্রহণের মধ্যে রয়েছে তাঁর কুদরত, প্রজ্ঞা ও একত্বের নিদর্শন প্রকাশ, যা এই শপথকে উপযুক্ত করে তোলে; পক্ষান্তরে কোনো সৃষ্টির দ্বারা শপথ গ্রহণে

এমন কিছু নেই। বরং কোনো সৃষ্টির দ্বারা শপথ গ্রহণ স্রষ্টার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন, যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্নানে বর্ণিত হয়েছে: "যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে শিরক করেছে।" তিরমিযী ও অন্যান্যরা একে সহীহ বলেছেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "সে কুফরি করেছে।" হাকিম একে সহীহ বলেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে তাঁর থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন: "যে কেউ শপথ করে, সে যেন আল্লাহর নামে করে, না হয় চুপ থাকে।" আর তিনি বলেছেন: "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করো না, কেননা আল্লাহ তোমাদেরকে পিতাদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন।" সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরও এসেছে, তিনি বলেছেন: "যে কেউ লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে, সে যেন বলে: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।

মুসলিমগণ একমত যে, কেউ যদি কোনো সম্মানিত সৃষ্টি বা কোনো পবিত্র বস্তুর নামে, যেমন—আরশ, কুরসি, কাবা, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা, নবীর মসজিদ, ফেরেশতা, সৎকর্মশীল ব্যক্তি, বাদশাহ, মুজাহিদদের তরবারি, নবী ও সৎকর্মীদের কবরের মাটি, বল্লম, বীরত্বপূর্ণ পোশাক ইত্যাদির নামে শপথ করে—তাহলে এমন শপথ কার্যকর নয় এবং এর কোনো কাফফারা নেই। সৃষ্টির নামে শপথ করা অধিকাংশ ওলামার মতে হারাম, এবং এটাই আবূ হানীফার মাযহাব ও ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মাযহাবে অন্যতম একটি অভিমত। সাহাবাগণের ইজমাও এতে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ একে অপছন্দনীয় বা বর্জনীয় হিসেবে বললেও প্রথম অভিমতই অধিক সঠিক। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন: "আমি মিথ্যা বলেও আল্লাহর নামে শপথ করি, এটা আমার কাছে অধিক প্রিয়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে সত্য বলেও শপথ করার চেয়ে।" কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা শিরক, আর শিরক মিথ্যার চেয়েও বড় গোনাহ।

শুধু নবীদের নামে কসম করার ব্যাপারে ইখতিলাফ পাওয়া যায়। ইমাম আহমদের থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে শপথ করার বিষয়ে দুইটি বর্ণনা রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, তাঁর নামে শপথ কার্যকর নয়—এটাই অধিকাংশ ওলামা যেমন মালিক, আবূ হানীফা ও শাফেয়ীর মত। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁর নামে শপথ কার্যকর হয়, এবং তাঁর কিছু সাহচর্যকারীগণ যেমন কাযী ও তাঁর অনুসারীরা এ মত গ্রহণ করেছেন। ইবনুল মুনযির এদের সাথে একমত হয়েছেন। তবে অধিকাংশ ই এ ইখতিলাফকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু ইবনু আকীল এ রায়কে অন্যান্য নবীদের ওপরও সম্প্রসারিত করেছেন। তবে কোনো নবীর নাম ধরে শপথ করাকে কাফফারাযুক্ত করা খুব

দুর্বল মত, যা মূলনীতি ও স্পষ্ট দলিলের পরিপন্থী।

অতএব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর উপর শপথ করা, অর্থাৎ শপথের অর্থে তাঁকে মাধ্যমে ধরা, এই বিধির অন্তর্ভুক্ত এবং এটি নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি কোনো সৃষ্টিকে দুআর মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়, যেখানে 'বা' হরফটি শপথের নয়, বরং কারণ বা উসীলার জন্য ব্যবহৃত হয়—তবে এটি ভিন্ন বিষয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম পূরণ করতে আদিষ্ট ছিলেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু বান্দা এমন আছেন, যারা যদি আল্লাহর উপর শপথ করেন, তিনি তা পূরণ করেন।" তিনি এ কথা বলেছিলেন, যখন আনাস ইবনে নাযর বলেছিলেন: "আর-রুবাইয়্যির দাঁত ভাঙা হবে?" তিনি বলেছিলেন: "না, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরিত করেছেন, তার দাঁত ভাঙা হবে না।" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "হে আনাস! আল্লাহর কিতাবে কিসাসের হুকুম রয়েছে।" তারপর ভুক্তভোগী পক্ষ ক্ষমা করে দিল। তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছেন, যারা যদি আল্লাহর উপর শপথ করেন, তিনি তা পূরণ করেন।" আবার বলেছেন: "হয়তো কোনো ধূলিধূসরিত, এলোমেলো চুলবিশিষ্ট ব্যক্তি, যাকে দরজার সামনে থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়—সে যদি আল্লাহর উপর শপথ করে, আল্লাহ তা পূরণ করেন।" মুসলিম ও অন্যান্যরা একে বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি বলেছেন: "আমি কি তোমাদের জানাব না জান্নাতীদের সম্পর্কে? প্রতিটি দুর্বল, বিনয়ী ব্যক্তি; যদি সে আল্লাহর উপর শপথ করে, আল্লাহ তা পূরণ করেন। আমি কি তোমাদের জানাব না জাহান্নামীদের সম্পর্কে? প্রতিটি কঠোর, অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তি।" এটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। আনাস ইবনে নাযরের হাদীস উভয় কিতাবে রয়েছে, অন্যটি শুধু মুসলিমে রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই বক্তব্য—"নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছেন, যারা যদি আল্লাহর উপর শপথ করেন, তিনি তা পূরণ করেন"—সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল-বারা ইবনে মালিক। যখন মুশরিকদের সঙ্গে মুসলিমদের লড়াই তীব্র হয়ে উঠত, তারা বলত: "হে বারা! তোমার প্রতিপালকের উপর শপথ করো।" তখন তিনি আল্লাহর উপর শপথ করতেন এবং মুশরিকরা পরাজিত হতো। যখন তারা আস-sসাস এর একটি সেতুর পাশে ছিল, তারা বলল: "হে বারা! তোমার রবের উপর শপথ করো।" তখন তিনি বললেন: "হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার উপর শপথ করছি যে তুমি আমাদের বিজয় দান করবে এবং আমাকে প্রথম শহীদ বানাবে।" আল্লাহ তাঁর শপথ পূরণ করলেন; শত্রুরা পরাজিত হলো এবং সেই দিন আল-বারা ইবনে মালিক শহীদ হলেন। তিনি ছিলেন আনাস ইবনে মালিকের ভাই; তিনি একাই একশত মানুষ হত্যা করেছিলেন, তার বাইরে যাদের হত্যায় তিনি অংশ নিয়েছেন। মুসাইলামার যুদ্ধে তিনি একটি ঢালের উপর উঠিয়ে বাগানে ছুঁড়ে

দেওয়া হন এবং তিনি দরজা খুলে দেন।

আল্লাহর নামে অন্য কাউকে উপর শপথ করা মানে হলো, শপথকারী অপর ব্যক্তিকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা। যদি সেই ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করে ও তা পূরণ না করে, তাহলে অধিকাংশ ফকীহের মতে কাফফারা শপথকারীর উপরই আবশ্যক হবে, যার নাম করে কাজ করানো হয়েছিল না। এটি এমন যেমন কেউ তার দাস, সন্তান বা বন্ধুকে কোনো কাজের জন্য শপথ করায়, কিন্তু তারা তা করে না—তাহলে কাফফারা ঐ ব্যক্তির উপর আবশ্যক, যে শপথ করিয়েছিল।

আর "আমি আল্লাহর নামে তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি অমুক কাজ করো"—এটি অনুরোধ, শপথ নয়। হাদীসে এসেছে: "যে কেউ তোমাকে আল্লাহর নামে কিছু চায়, তাকে দাও।" যদি তার অনুরোধ পূরণ না করা হয়, তবুও এর কোনো কাফফারা নেই। সৃষ্টিজগতের সবাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, মুমিন ও কাফের উভয়ই। আল্লাহ কাফেরদের দুআও কবুল করেন, যেমন তারা আল্লাহর কাছে রিজিক চায় এবং তিনি তাদের রিজিক দেন, পানি দেন। যখন তারা সমুদ্রে বিপদে পড়ে, তারা কেবল আল্লাহকে ডাকেই—আর সব উপাস্য হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তাদের স্থলে পৌঁছে দেন, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। মানুষ সত্যিই অকৃতজ্ঞ। আর যারা আল্লাহর উপর শপথ করে এবং আল্লাহ তা পূরণ করেন—তারা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি।

দুআর ক্ষেত্রে চাওয়ার রীতি হলো: "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই কারণে যে সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমি আল্লাহ, দানশীল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।" এবং: "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই কারণে যে তুমি এক, অনন্ত আশ্রয়স্থল, তুমি কাউকে জন্ম দাওনি, তোমার কেউ সন্তান নয়, আর তোমার সমতুল্য কেউ নেই।" এবং: "আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার সব নামের মাধ্যমে—যে নাম তুমি নিজেকে দিয়েছো, তোমার কিতাবে প্রকাশ করেছো, তোমার কোনো বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছো, কিংবা তোমার অদৃশ্য জ্ঞানে রেখেছো।" এটি হলো আল্লাহর নিকট তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে চাওয়া, শপথ নয়। কারণ, তাঁর কাজসমূহ তাঁর নাম ও গুণাবলীর দাবী অনুসারেই ঘটে। তাঁর ক্ষমা ও দয়া—এই দুই হলো 'আল-গফুর' ও 'আর-রহীম' নামের পরিণতি। তাঁর ক্ষমা করার কাজ আসে 'আল-আফউ' নামের দাবী অনুযায়ী। এ কারণেই যখন আয়েশা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন: "আমি যদি লাইলাতুল কদরে উপস্থিত হই, তাহলে কী বলবো?" তিনি বললেন: "বলো: হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালোবাসো, সুতরাং আমাকে ক্ষমা

করে দাও।" তাঁর হেদায়েত ও সৎপথ প্রদর্শন হলো 'আল-হাদী' নামের দাবী অনুযায়ী। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন: "হে পথহারা ব্যক্তির পথপ্রদর্শক! আমাকে সৎপথে পরিচালিত করো এবং তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।" আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা কিছু ভালো করেন, তা 'আর-রাব্ব' নামের দাবী অনুযায়ীই করেন। এ কারণে দুআয় বলা হয়: "ইয়া রাব্ব, ইয়া রাব্ব", যেমন আদম বলেছিলেন: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, আর যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো" (সূরা আল-আ'রাফ: ২৩)। এবং নূহ বলেছিলেন: "হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করার থেকে, যার কোনো জ্ঞান আমার নেই। যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো" (সূরা হূদ: ৪৭)। এবং ইবরাহীম বলেছিলেন: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের এক অনাবাদী উপত্যকায় বসবাস করিয়েছি" (সূরা ইবরাহীম: ৩৭)। এবং অন্যান্য নবীগণও একইভাবে দুআ করেছেন। মালিক ও আবু হানীফার সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ইবনে আবী ইমরান এবং অন্যান্যরা বলেছেন, কাউকে দুআয় বলা উচিত নয়: "হে আমার মালিক! হে আমার মালিক!" বরং বলা উচিত: "হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!" যেমন নবীগণ বলতেন। তাঁর নাম "আল-হাইয়্যু আল-কাইয়্যুম" এই নাম ও গুণসমূহের মূলার্থসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআয় একাগ্রচিত্ত হলে এটি বলতেন।

সুতরাং যখন কারো নিকট কিছু চাওয়া হয় এবং 'বা' হরফটি কারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তখন চাওয়া হয় এমন একটি বিষয়ের মাধ্যমে, যা চাওয়ার দাবিকে যুক্তিসংগত করে তোলে। যেমন কেউ বলে: "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই কারণে যে সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি আল্লাহ, দানশীল, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা।" তখন তাঁর গুণাবলী এমন, যা দান করার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করে। প্রশংসাযোগ্য হওয়া তাঁর কাজের দাবী সৃষ্টি করে, এবং তাঁর প্রশংসা করা দুআ কবুলের কারণ হয়। এজন্যই নামাযে বলা হয়: "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ"—এখানে "শোনা" মানে কবুল করা, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাক্য: "আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন জ্ঞানের থেকে যা উপকার দেয় না, এমন অন্তর থেকে যা বিনয়ী নয়, এমন আত্মা থেকে যা তৃপ্ত নয়, এবং এমন দুআ থেকে যা শোনা হয় না"—অর্থাৎ, কবুল হয় না। এ প্রসঙ্গে আছে ইবরাহীমের কথা: "নিশ্চয়ই আমার রব দুআ শ্রবণকারী" (সূরা ইবরাহীম: ৩৯)। আরও আছে: "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের কথায় কান দেয়" (সূরা আত-তাওবা: ৪৭), এবং:

"ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা মিথ্যার প্রতি কান দেয়, এমন লোকদের কথায় কান দেয় যারা তোমার কাছে আসেনি" (সূরা আল-মায়িদা: ৪১)—অর্থাৎ, মিথ্যা কবুল করে এবং এমন লোকদের কথা মানে যারা তোমার নিকট আসেনি। এজন্য নামাযে তাশাহহুদের পর আল্লাহর প্রশংসা করে দুআ করতে বলা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দুআ করতে দেখেন, কিন্তু সে আল্লাহর প্রশংসা করেনি কিংবা তাঁর উপর দরূদ পাঠ করেনি, তখন তিনি বললেন: "এ ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে।" তারপর তিনি তাকে ডেকে বললেন: "তোমাদের কেউ যখন দুআ করে, সে যেন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে, এরপর রাসুলের উপর দরূদ পাঠ করে, তারপর যা ইচ্ছা দুআ করে।" আবূ দাঊদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন, এবং তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন: "আমি নামায পড়ছিলাম, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর তাঁর সাথে ছিলেন। আমি বসার পর আল্লাহর প্রশংসা করলাম, তাঁর রাসুলের উপর দরূদ পাঠ করলাম, তারপর নিজের জন্য দুআ করলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।'" তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।

অতএব, "সাম" (শোনা) শব্দটি দ্বারা শব্দ অনুভব করাকে বোঝানো হতে পারে, আবার এর অর্থ হতে পারে অর্থ অনুধাবনসহ শোনা, এবং এটি এমন গ্রহণযোগ্যতা ও সাড়া দেওয়ার অর্থও দিতে পারে যা অনুধাবনের সঙ্গে যুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ জানতেন, তবে তিনি তাদের শুনিয়ে দিতেন" (আল-আনফাল: ২৩)। তারপর তিনি বলেন: "আর যদি তিনি তাদের শুনিয়ে দিতেন", তাদের এই অবস্থায়, তাহলে তারা সত্য গ্রহণ করত না; বরং "তারা মুখ ফিরিয়ে নিত, আর তারা তো বিমুখ ছিল।" সুতরাং তিনি কুরআন না বোঝার কারণে তাদের নিন্দা করেছেন, এবং (ইঙ্গিত করেছেন যে) এমনকি যদি তারা তা বুঝতও, তারা তবুও তা অনুযায়ী আমল করত না।

যখন একজন জিজ্ঞাসনকারী অন্যকে বলেন, 'আল্লাহর কসম করে জিজ্ঞাসা করছি', তখন সে কেবল আল্লাহর প্রতি তার ঈমানের মাধ্যমে তাকে অনুরোধ করে, এবং এটি তাকে কিছু দান করার জন্য একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা আল্লাহ, যিনি পবিত্র ও মহান, সৃষ্টির প্রতি দয়া পসন্দ করেন, বিশেষ করে যখন চাওয়া হয় জুলুম দূর করার জন্য, কারণ তিনি ন্যায়বিচার করার আদেশ দেন এবং জুলুম নিষেধ করেন। তাঁর আদেশই কর্ম সম্পাদনে সবচেয়ে বড় উদ্দীপক, সুতরাং আল্লাহর আদেশের চেয়ে অধিক উপযুক্ত কোনো কারণ নেই যার দ্বারা কর্ম সম্পাদন আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে এবং ইবনে মাজাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন: ‘আতিয়্যাহ আল-‘আউফি আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি নামাজের জন্য বের হওয়ার সময় এ দোয়া শিখিয়েছিলেন: “...আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আবেদনকারীদের তোমার ওপর যে হক রয়েছে তার মাধ্যমে এবং আমার এই পদচারণার হকের মাধ্যমে, নিশ্চয়ই আমি অহংকার, গর্ব, দেখানোর উদ্দেশ্য বা খ্যাতি কামনার জন্য বের হইনি; বরং তোমার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি।”

যদি এ হাদীস সহীহ হয়, তাহলে আবেদনকারীদের ওপর আল্লাহর কাছে একটি হক রয়েছে যে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিবেন, আর ইবাদতকারীদের হক হচ্ছে তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। এটি এমন এক হক, যা তিনি নিজেই তাদের জন্য নিজের ওপর আবশ্যক করেছেন, যেমন কেউ ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে প্রার্থনা করে, যাকে তিনি দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার কারণ করেছেন; যেমন তিনি বলেন: "আর তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেন" (আশ-শূরা: ২৬)। আর যেমন কেউ তাঁর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে দোয়া করে, কেননা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করা তাঁর দায়িত্ব।

এর উদাহরণ হলো মুমিনদের উক্তি: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, যে ঈমানের দিকে আহ্বান করছিল, ‘তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো’—আর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! সুতরাং তুমি আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদের পাপ মোচন করে দাও এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে মৃত্যু দাও" (আলে ইমরান: ১৯৩)। এবং তিনি বলেন: "নিশ্চয় আমার কিছু বান্দা ছিল যারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদের ক্ষমা করো ও আমাদের প্রতি দয়া করো, আর তুমিই তো সর্বাধিক দয়ালু।’ অথচ তোমরা তাদেরকে উপহাস করতে লাগলে, এমনকি তারা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিলো" (আল-মু’মিনুন: ১০৯-১১১)। এর অনুরূপ হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদরের দিনে তাঁর গভীর মিনতি: “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা ওয়াদা করেছো তা পূর্ণ করো।” তেমনি তাওরাতে আছে, যখন আল্লাহ বনী ইসরাঈলের ওপর রাগান্বিত হলেন, তখন মূসা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং ইবরাহীমের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন; তিনি তাঁকে তার প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রার্থনা করেন।

নেক আমলের মাধ্যমে দোয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো—তিন ব্যক্তির ঘটনা, যারা একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল; প্রত্যেকে আল্লাহর কাছে এমন একটি বড় আমলের মাধ্যমে দোয়া করেছিল যাতে সে আল্লাহর জন্য একান্তভাবে আন্তরিক ছিল, কেননা সেই আমল ছিল আল্লাহর প্রিয় ও সন্তুষ্টিজনক, এমন যা দোয়া কবুলের কারণ হয়। তাদের একজন তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দোয়া করে, আরেকজন সম্পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষা করার মাধ্যমে, আর অন্যজন বিশ্বস্ততা ও সদয়তা দেখানোর মাধ্যমে। তেমনি ইবনে মাসঊদ সাহরীর সময় দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আদেশ করেছিলে, আমি তোমার আদেশ পালন করেছি; তুমি আমাকে আহ্বান করেছিলে, আমি সাড়া দিয়েছি; আর এখন সাহরীর সময়—তাই আমাকে ক্ষমা করো।" এর সঙ্গে সম্পর্কিত হাদীস হলো, ইবনে উমর সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বলতেন: "হে আল্লাহ! তুমি বলেছো—আর তোমার কথা সত্য—'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' (গাফির: ৬০); আর নিশ্চয়ই তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।" তারপর তিনি সাফা পাহাড়ে তাঁর বিখ্যাত দোয়াটি করতেন।

এভাবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেউ যদি বলে: 'আমি তোমার কাছে অমুকের মাধ্যমে প্রার্থনা করছি'—তাহলে এটি দুই প্রকার হয়: কারণ এখানে 'বাআ' (بِ) হতে পারে কসমের জন্য, অথবা হতে পারে কারণের অর্থে। সুতরাং তা আল্লাহর নামে শপথও হতে পারে, অথবা কোনো উপায় বা কারণের মাধ্যমে প্রার্থনাও হতে পারে।

প্রথমটির কথা যদি বলা হয়: সৃষ্টির নামে শপথ খোদ সৃষ্টির ওপরই বৈধ নয়, তাহলে তা সৃষ্টিকর্তার ওপর কীভাবে বৈধ হতে পারে?

দ্বিতীয় প্রকার, যেমন নবীদের হকের মাধ্যমে প্রার্থনা করা—এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। ইতিপূর্বে আবু হানিফা ও তাঁর সাথীদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি বৈধ নয়। কিছু লোক এটিকে বৈধ বলে থাকেন। আমরা বলি: কেউ যদি আল্লাহর কাছে বলে: "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অমুক ফেরেশতা, নবী, সৎব্যক্তি প্রভৃতি ব্যক্তির হকের মাধ্যমে প্রার্থনা করছি" অথবা "অমুকের মর্যাদার মাধ্যমে", অথবা "অমুকের পবিত্রতার মাধ্যমে"—তাহলে এতে ইঙ্গিত থাকে যে, এ ব্যক্তিদের আল্লাহর কাছে একটি মর্যাদা রয়েছে, এবং এটি সত্য। কেননা এ ব্যক্তিদের মর্যাদা, সম্মান ও পবিত্রতা রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করেন, তাদের সম্মান বাড়ান, এবং তারা যখন সুপারিশ করেন, তখন তা গ্রহণ করেন—যদিও তিনি বলেন:

"কে আছেন এমন, যে তার অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?" (আল-বাকারা: ২৫৫)।

তবে এটাও বোঝায় যে, যারা তাদের অনুসরণ করে এবং যেসব বিষয়ে অনুসরণ করা বিধিসম্মত, তাতে তাদেরকে আদর্শ বানায়, তারা সফল হয়; এবং যারা তাদের সেই আদেশ মানে যা তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছায়, তারাও সফল হয়। কিন্তু কেবল তাদের মর্যাদা বা অবস্থান এমন কিছু নয় যার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যার মাধ্যমে কেউ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেই তার দোয়া কবুল হবে—এমনটি নয়। বরং তাদের মর্যাদা তখনই কোনো উপকার বয়ে আনে, যদি কেউ তাদের অনুসরণ করে এবং তারা যে আদেশ এনেছে, তা মান্য করে, অথবা তারা তার জন্য দোয়া বা সুপারিশ করে। কিন্তু যদি এ দুটি কারণের কোনোটিই না থাকে—না তারা দোয়া করছে, না সুপারিশ করছে, না দোয়ার কোনো কারণই প্রার্থনাকারীর পক্ষ থেকে রয়েছে—তাহলে সে তাদের মর্যাদার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেনি এবং তার এই আবেদন কোনো উপকার আনবে না। বরং সে এমন একটি বাইরের বিষয়ের মাধ্যমে প্রার্থনা করছে, যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং যা তার জন্য কোনো উপকারের কারণ নয়।

যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছে, যে ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী, গিয়ে বলে: "আমি তোমার কাছে অমুকের অনুগত্যের মাধ্যমে, এবং তার প্রতি তোমার ভালোবাসার মাধ্যমে, এবং তোমার কাছে তার মর্যাদার মাধ্যমে কিছু চাইছি"—যা তার আনুগত্যের কারণে অর্জিত—তাহলে সে এমন একটি বাইরের বিষয় দিয়ে চাচ্ছে যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তদ্রূপ, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই নির্বাচিত ব্যক্তিদের প্রতি দয়া, তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাঁদের ইবাদত ও আনুগত্য—এইসব বিষয় নিজের মধ্যে এমন কিছু বহন করে না যা এমন ব্যক্তির দোয়ার জবাব দেওয়া আবশ্যক করে তোলে, যে তাঁদের মাধ্যমে প্রার্থনা করে। বরং, যার দোয়া কবুল হওয়া আবশ্যক, তা এমন একটি কারণের ওপর নির্ভর করে যা হয় তার নিজের পক্ষ থেকে হয়, যেমন তাদের আনুগত্য, অথবা তাঁদের পক্ষ থেকে হয়, যেমন তাঁদের সুপারিশ। যদি এ দুটির কোনোটিই না থাকে, তবে কোনো কারণই নেই।

হ্যাঁ, যদি কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য এবং তাঁর অনুসরণ করার দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তবে সে এক মহান কারণ দ্বারা প্রার্থনা করেছে, যা দোয়া কবুল হওয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। নিঃসন্দেহে, এটি সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ ও মাধ্যম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরকালে তাঁর শাফাআত তাওহীদের অনুসারীদের উপকারে আসে, শিরকের অনুসারীদের নয়। এটি তারাই প্রাপ্ত হয়, যারা তাঁর জন্য আল-ওসীলাহ প্রার্থনা করে, যেমন সহীহ

হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন: "তোমরা মুয়াজ্জিনের শব্দ শোনার পর তার কথার অনুরূপ বলো, অতঃপর আমার উপর দরুদ পাঠ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট আল-ওসীলাহ প্রার্থনা করো। কেননা, এটি জান্নাতে একটি মর্যাদার স্থান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর এক বান্দারই উপযুক্ত, আর আমি আশা করি আমি সেই বান্দা হবো। সুতরাং, যে আমার জন্য আল্লাহর নিকট আল-ওসীলাহ প্রার্থনা করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত বৈধ হবে।" এবং সহীহ হাদীসে আছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআতের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবেন?" তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি অন্তর থেকে একনিষ্ঠভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।"

অতএব, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন যে, কিয়ামতের দিনে তাঁর শাফাআতের সবচেয়ে বেশি হকদার হবে সেই ব্যক্তি, যে তাওহীদ ও একনিষ্ঠতায় সর্বাধিক। কেননা, তাওহীদই দ্বীনের মূল, এবং আল্লাহ এমন কাউকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, কিন্তু যাকে ইচ্ছা, তিনি এর চেয়ে নিচু গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অতএব, তিনি, যিনি মহিমান্বিত, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে না। যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাফাআতের অনুমতি দেওয়া হবে, তখন তাঁর প্রভু তাঁর জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করবেন, এবং তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত তাওহীদ ও ঈমান অনুযায়ী। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট আল-ওসীলাহ প্রার্থনা করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন তাঁর শাফাআত বৈধ হয়ে যায়। সুতরাং, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর শাফাআত অর্জিত হয় তাঁর আনীত তাওহীদ ও ঈমান অনুসরণ করার মাধ্যমে এবং সেই দোয়ার মাধ্যমে, যা তিনি আমাদের তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন।

আর 'অমুকের হকের ওসীলায়' কিছু চাওয়া, এটি দুটি মূল বিষয়ের ওপর নির্ভর করে: এক. আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তির কী হক আছে? দুই. আমরা কি সেই হকের দ্বারা আল্লাহর নিকট চাইতে পারি, যেমনভাবে মর্যাদা ও পবিত্রতার মাধ্যমে চাওয়া হয়?

প্রথমটি সম্পর্কে, কিছু লোক বলে: সৃষ্ট জীবের উপর স্রষ্টার একটি হক আছে, যা বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, এবং তারা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে তুলনা টানে, যেমন মতাযিলা ও অন্যরা, যারা এই মত পোষণ করে। আবার কেউ

বলে: কোনো অবস্থাতেই সৃষ্ট জীবের উপর স্রষ্টার কোনো হক নেই; বরং তিনি যা করেন, তা তাঁর প্রতিশ্রুতি ও বর্ণনার ভিত্তিতে জানা যায়, যেমন জাহম, আল-আশআরী এবং অন্যরা যারা নিজেদের সুন্নাহর অনুসারী দাবি করে, তারা বলে থাকে। আর তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলে: বরং আল্লাহ নিজেই তাঁর উপর দয়ার বিধান আরোপ করেছেন এবং তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য একটি হক বাধ্যতামূলক করেছেন, যেমনভাবে তিনি নিজের উপর জুলুম হারাম করেছেন। কোনো সৃষ্ট জীব তা তাঁর উপর বাধ্য করেনি, এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন। বরং, এটি তাঁর রহমত, প্রজ্ঞা এবং ইনসাফের কারণেই তিনি নিজের উপর রহমতের বিধান দিয়েছেন এবং নিজের উপর জুলুম হারাম করেছেন, যেমন সহীহ কুদসী হাদীসে তিনি বলেছেন: "হে আমার বান্দাগণ, আমি আমার উপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও জুলুম হারাম করেছি, সুতরাং তোমরা পরস্পরের উপর জুলুম করো না।" এবং তিনি, যিনি সুমহান, বলেন: "তোমার রব তাঁর উপর রহমতের বিধান দিয়েছেন" (সূরা আল-আন'আম: ৫৪)। এবং তিনি বলেন: "আর মু'মিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব" (সূরা আর-রূম: ৪৭)। এবং সহীহাইন-এ মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে মুআয, তুমি কি জানো, আল্লাহর বান্দাদের উপর কি হক?" আমি বললাম: "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন: "তাঁর হক হলো তারা যেন কেবল তাঁকেই ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে। হে মুআয, তুমি কি জানো, তারা যদি এটা করে, তাহলে আল্লাহর উপর তাদের কী হক হয়?" আমি বললাম: "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন: "তাদের হক হলো তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না।"

এই মতানুসারে, তাঁর নবী ও নেককার বান্দাগণের উপর একটি হক রয়েছে, যা তিনি নিজেই নিজের উপর বাধ্য করেছেন এবং আমাদের তা জানিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, তারা সে সমস্ত পুরস্কারের যোগ্য, যা তিনি ঘটবে বলে জানিয়েছেন, যদিও তা বাধ্যতামূলক না-ও হতে পারে।

অতএব, যে ব্যক্তি বলে, সৃষ্টির এমন কোনো হক নেই যার দ্বারা স্রষ্টার নিকট কিছু চাওয়া যায়—যেমন বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ, যিনি মহান, দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কে বলেছেন: "তোমার পূর্বপুরুষদের আমার উপর কী হক ছিল?"—এটি সঠিক, যদি এর দ্বারা বোঝানো হয় যে সৃষ্ট জীবের কোনো হক নেই, যা স্রষ্টার উপর অপর সৃষ্টির সাথে তুলনা করে আরোপ করা যায়, যেমন এক সৃষ্ট জীবের উপর অপরের হক থাকে। এটি সেই অজ্ঞ লোকদের ধারণা, যারা মনে করে তাদের ইবাদত ও জ্ঞান দ্বারা তারা আল্লাহর উপর কোনো হক অর্জন করে নিয়েছে, যেমন দাসেরা তাদের প্রভু বা রাজাদের সেবা করে তাদের উপকার সাধন করে বা ক্ষতি

রোধ করে, এবং তখন সে তার প্রাপ্য পুরস্কার দাবী করে এবং মালিকের অনাগ্রহ দেখলে বলে: "আমি কি তোমার জন্য অমুক কাজ করিনি?"—সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনকি মুখে না বললেও মনে তা ধারণ করে।

আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা করা মানুষের অজ্ঞতা ও জুলুমের ফল। এ কারণেই তিনি, যিনি মহান, ব্যাখ্যা করেছেন যে মানুষের কর্ম তার নিজের উপকারে আসে, এবং আল্লাহ সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন, যেমন তিনি বলেন: "তোমরা সৎকর্ম করলে, তা নিজেদের জন্যই করো; আর যদি মন্দ কাজ করো, তবে তাও নিজেদের জন্যই করো" (সূরা আল-ইসরা: ৭)। এবং তিনি বলেন: "যে সৎকর্ম করে, তা তার নিজের উপকারে; আর যে মন্দ কাজ করে, তা তার নিজের ক্ষতিতে। আর তোমার রব বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন" (সূরা ফুসলাত: ৪৬)। এবং তিনি বলেন: "তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন" (সূরা আয-যুমার: ৭)। এবং তিনি বলেন: "যে কৃতজ্ঞ, সে কেবল নিজের উপকারেই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ, তাহলে আমার রব অবশ্যই মুখাপেক্ষী নন, দয়ালু" (সূরা নমল: ৪০)। এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাহিনীতে তিনি বলেন: "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের অনুগ্রহ বৃদ্ধি করব; আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।" এবং মূসা বললেন: "যদি তোমরা কুফরি করো, তোমরাও এবং পৃথিবীর সবাই একত্রে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন, প্রশংসার যোগ্য" (সূরা ইবরাহিম: ৭-৮)। এবং তিনি বলেন: "কাফেরদের তাড়াহুড়ো তোমাকে দুঃখিত না করুক। তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৬)। এবং তিনি বলেন: "মানুষের উপর আল্লাহর হক হলো, যে ব্যক্তি কাবা ঘরে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে, তার জন্য হজ্ব করা; আর কেউ যদি কুফরি করে, তাহলে আল্লাহ তো সকল জগতের মুখাপেক্ষী নন" (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)।

তিনি, যিনি মহান, ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনিই বান্দাকে সৎকর্মের তাওফিক দিয়ে অনুগ্রহ করেন, যেমন তিনি বলেন: "তারা ইসলাম গ্রহণ করাকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ মনে করে। বলো, তোমাদের ইসলাম গ্রহণকে আমার উপর অনুগ্রহ মনে করো না; বরং আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যে তিনি তোমাদের ঈমানের দিকে পথনির্দেশ দিয়েছেন—যদি তোমরা সত্যবাদী হও" (সূরা হুজুরাত: ১৭)। এবং তিনি বলেন: "জেনে রাখো, তোমাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহর রাসুল। যদি তিনি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিতেন, তবে তোমরা কষ্টে পড়ে যেতে; বরং আল্লাহ তোমাদের মাঝে ঈমানকে প্রিয় করে তুলেছেন এবং তা

তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন এবং কুফরি, গুনাহ, ও অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। এরা-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (সূরা হুজুরাত: ৭ -৮)। এবং সহীহ কুদসী হাদীসে আছে: "হে আমার বান্দাগণ, তোমরা কখনো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং কখনো কোনো উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা দিনরাত ভুল করো, আর আমি সমস্ত গুনাহ মাফ করি—এবং এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করব। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত, মানবজাতি ও জিনজাতি, কারো সবচেয়ে পাপী হৃদয়ের মতো হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব একটুও কমবে না। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত, মানবজাতি ও জিনজাতি, কারো সবচেয়ে পরহেজগার হৃদয়ের মতো হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব একটুও বাড়বে না। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমরা সবাই একত্র হয়ে এক জায়গায় দাড়িয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করো, এবং আমি প্রত্যেককে তার চাওয়ামতো দিই, তবুও তা আমার রাজত্ব থেকে এতটুকুও কমাবে না, যতটুকু একটি সূঁচ সাগরে ডুবিয়ে তা উঠালে তার ভেজা অংশ কমায়।"

স্রষ্টা, যিনি মহান, এবং সৃষ্টি—এই দুইয়ের মাঝে যে পার্থক্য আছে, তা সামান্য অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কারো কাছেও গোপন নয়।

এর মধ্যে অন্যতম: রব, যিনি মহান, তিনি সর্বপ্রকার প্রয়োজন থেকে মুক্ত; তাঁর জন্য অন্য কারো মুখাপেক্ষী হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, রাজারা ও মনিবেরা তাদের অধীনদের প্রতি প্রয়োজনময়।

তাদের মধ্যে রয়েছে: রব্ব, তিনি মহান ও পবিত্র, যদিও তিনি সৎকর্মকে ভালোবাসেন, তওবাকারীর তওবায় সন্তুষ্ট হন ও আনন্দিত হন—তবুও তিনিই এ সব কিছু সৃষ্টি করেন এবং তা অর্জন সহজ করে দেন। সুতরাং তিনি যা ভালোবাসেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন, তা তাঁর কুদরত ও ইচ্ছা দ্বারাই সংঘটিত হয়। এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর মতানুসারে স্পষ্ট, যারা বলেন—ঈমান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য এক নিয়ামত, কদরিয়াহদের মত নয়। পক্ষান্তরে, মাখলুক তার পছন্দসই কিছু অন্য কারও কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে।

তাদের মধ্যে রয়েছে: রব্ব, তিনি বান্দাদের এমন কাজে আদেশ দিয়েছেন যা তাদের উপকারে আসে, এবং

এমন বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন যা তাদের ক্ষতিসাধন করে। যেমন কাতাদাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের যেসব বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, তা তাদের প্রয়োজন থেকে নয়, আর যেসব বিষয়ে নিষেধ করেছেন, তা তাদের প্রতি কার্পণ্যবশত নয়; বরং তিনি তাদের উপকারের বিষয়েই আদেশ দিয়েছেন এবং ক্ষতির বিষয় থেকেই নিষেধ করেছেন।" এটি মাখলুকের বিপরীত, যে অন্য কাউকে তার প্রয়োজনের জন্য আদেশ দেয় এবং কার্পণ্যবশত কিছু থেকে নিষেধ করে। এটি সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর মতানুসারে স্পষ্ট, যারা তাঁর হিকমত ও রহমতের পক্ষে দলিল উপস্থাপন করেন এবং বলেন: তিনি বান্দাদের এমন কল্যাণকর বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন যা তাদের উপকারে আসে এবং এমন ক্ষতিকর বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন যা তাদের ক্ষতি করে; মুজাব্বিরাহদের মত নয়, যারা বলে যে, আল্লাহ এমন বিষয়ের আদেশ দিতে পারেন যা ক্ষতিকর, এবং নিষেধ করতে পারেন এমন কিছু থেকে যা উপকারী।

তাদের মধ্যে রয়েছে: তিনি, মহিমান্বিত ও পবিত্র, রাসুল প্রেরণ এবং কিতাব নাজিল করার নিয়ামত দানকারী; তিনিই শক্তি, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য উপায় দান করেন, যার মাধ্যমে জ্ঞান ও সৎকর্ম অর্জিত হয়। তিনিই তাঁর বান্দাদের হিদায়াত দানকারী, অতএব তাঁর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই। এজন্য জান্নাতবাসীরা বলবে: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এর দিকে হিদায়াত দিয়েছেন; যদি আল্লাহ আমাদের হিদায়াত না দিতেন, তবে আমরা কখনও হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না। নিশ্চয়ই আমাদের রবের রাসুলগণ সত্যসহ আগমণ করেছিলেন" (আল-আ'রাফ: ৪৩)। কোনো মাখলুক এসবের কিছুই করতে সক্ষম নয়।

তাদের মধ্যে রয়েছে: তাঁর নিয়ামত এত বেশি যে গণনা করা অসম্ভব। যদি ইবাদতকে তাঁর নিয়ামতের প্রতিদান ধরে নেওয়া হয়, তবে ইবাদত এমনকি তাঁর ক্ষুদ্রতম কোনো নিয়ামতের প্রতিদান হিসেবেও যথেষ্ট হতো না—তাহলে কিভাবে যথেষ্ট হবে, যখন ইবাদত নিজেই তাঁর নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত?

তাদের মধ্যে রয়েছে: বান্দারা সর্বদা কমতি করে, তাঁর ক্ষমা ও দয়াপ্রার্থনায় মুখাপেক্ষী। সুতরাং কেউই তার আমলের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর এমন কেউ নেই যার কোনো না কোনো গুনাহ নেই যার জন্য সে আল্লাহর ক্ষমার মুখাপেক্ষী নয়। "আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে যমীনের পিঠে কোনো জীবকেই ছেড়ে দিতেন না" (ফাতির: ৪৫)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমাদের কেউই তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” তারা জিজ্ঞেস করল: “আপনিও না, হে আল্লাহর রাসুল?” তিনি বললেন: “আমিও না, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে

ঢেকে দেন।” আর এক বর্ণনায় রয়েছে: “তাঁর ক্ষমার মাধ্যমে।” এর সাথেই সম্পর্কিত হলো সুনানে বর্ণিত হাদীস, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ যদি আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের শাস্তি দেন, তবে তিনি তাদের শাস্তি দিলেও কোনো জুলুম করবেন না। আর যদি তাদের প্রতি রহম করেন, তবে তাঁর রহম তাদের আমলের চেয়েও উত্তম।” [হাদীস সমাপ্ত]

যে বলে: “বরং মাখলুকের আল্লাহর উপর হক রয়েছে,” এটি তখনই সঠিক, যদি সে এ দ্বারা সেই হকের কথা বোঝায়, যার অবর্তনের বিষয়ে আল্লাহ আমাদের অবহিত করেছেন। কারণ আল্লাহ সত্যবাদী, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তিনি নিজেই তা নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন তাঁর হিকমত, অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে। সেই ব্যক্তি, যিনি এ হকের যোগ্য, যদি তা দ্বারা আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করেন, তবে তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আবেদন করছেন, অথবা এমন সব কারণের মাধ্যমে দোয়া করছেন যেগুলোর সাথে আল্লাহ ফলাফলকে সম্পৃক্ত করেছেন, যেমন সৎকর্ম। এটি উপযুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি এ হকের যোগ্য নয়, সে যখন অন্য ব্যক্তির হক দ্বারা আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তখন তা ঐ ব্যক্তির মর্যাদার মাধ্যমে প্রার্থনার মত হয়; এ ক্ষেত্রে সে এমন এক বিষয়ের দ্বারা দোয়া করছে যা তার নিজের নয়; সে এমন কোনো কারণের মাধ্যমে দোয়া করেনি যা দোয়া কবুলের জন্য উপযুক্ত।

আর আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দ্বারা প্রার্থনা করা—যেগুলোর মাধ্যমে তিনি বান্দাদের জন্য হিদায়াত, রিযিক ও বিজয় সাধন করেন—এটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার দ্বারা আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যায়। সুতরাং যে আপত্তি করে: “নবীদের হক দ্বারা প্রার্থনা করা উচিত নয়, কারণ মাখলুকের উপর খালিকের কোনো হক নেই”—তাঁর এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত। কেননা মু'আয (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দু'টি সহীহে সাব্যস্ত, এবং আল্লাহ বলেছেন: "তোমার রব দয়ার বিধান নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন" (আল-আন'আম: ৫৪), "মু'মিনদের সাহায্য করা আমাদের উপর অবশ্য ছিল" (আর-রূম: ৪৭)। অতএব আপত্তিকারীকে বলা হয়: এখানে আলোচনা দুটি বিষয়ের সম্পর্কিত:

প্রথমত: বান্দাদের আল্লাহর উপর হকের বিষয়।

দ্বিতীয়ত: সেই হকের মাধ্যমে তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করার বিষয়।

প্রথম বিষয়ের ক্ষেত্রে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আল্লাহ, পবিত্র ও মহান, আনুগত্যশীলদেরকে পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং প্রার্থনাকারীদের ডাকে সাড়া দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর তিনি সত্যবাদী যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ বলেন: "আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি—আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্যবাদী?" (নিসা: ১২২), "এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না" (আর-রূম: ৬), "আল্লাহ তাঁর রাসুলদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন—এটা কখনো ভাববেন না" (ইব্রাহীম: ৪৭)। এটি এমন এক বিষয়, যার সংঘটন আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কারণে অপরিহার্য, এবং এ বিষয়ে মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। তবে তারা ইখতিলাফ করেছেন যে, এ প্রতিশ্রুতি ব্যতীত কি আল্লাহর উপর কিছু আবশ্যক হতে পারে? এখানে তিনটি মত রয়েছে—যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে: এক. আল্লাহর উপর কোনো কিছুর দায়িত্ব নয়, যদি না তিনি নিজে তা আবশ্যক করেন। দুই. তাঁর উপরও কিছু ফরজ এবং কিছু হারাম হয়, যেমন বান্দাদের ক্ষেত্রে হয়। তিন. তিনি যা নিজের উপর আবশ্যক করেছেন, তাই তাঁর উপর আবশ্যক; আর যা তিনি নিজের জন্য হারাম করেছেন, সেটাই তাঁর জন্য হারাম। যেমন আবু যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। জুলুম আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব—এ বিষয়ে মুসলিমদের ইজমা রয়েছে; তবে কোন প্রকারের জুলুম অসম্ভব—তা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। কেউ বলেন: এটি স্বভাবত অসম্ভব; আর যা সম্ভব, তা তাঁর পক্ষ থেকে জুলুম নয়। কেননা জুলুম হল অন্যের মালিকানায় অন্যায় হস্তক্ষেপ, অথবা এমন কারো আদেশ অমান্য করা, যার আনুগত্য তাঁর উপর ফরজ—আর এ দুটি তাঁর ক্ষেত্রে অসম্ভব। আবার কেউ বলেন: বান্দার পক্ষ থেকে যা জুলুম, আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাই জুলুম হবে, যদি তিনি করেন। আরেকজন বলেন: জুলুম হল কোনো কিছুকে তার যথাস্থানে না রাখা। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে কোনোভাবেই জুলুম করেন না। তিনি বলেন: "আর যে ঈমানের সাথে সৎকর্ম করবে, সে কোনো যুলুম বা বঞ্চনার ভয় করবে না" (ত্বাহা: ১১২)। মুফাসসিরগণ বলেন: জুলুম হলো—অন্যের গুনাহ চাপিয়ে দেওয়া ও তার নিজের গুনাহ ছাড়া শাস্তি দেয়া; আর বঞ্চনা হলো—তার নেক আমল হ্রাস করা। তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি পরমাণুর ওজন পরিমাণও জুলুম করেন না। আর যদি তা কোনো সৎকর্ম হয়, তবে তিনি তা বহুগুণে বৃদ্ধি করেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে বড় পুরস্কার দেন" (নিসা: ৪০), "আর আমি তাদের ওপর জুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে" (হূদ: ১০১)।

দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাপারে বলা হয়: আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে বিষয়টিকে আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক বলে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটি নিঃসন্দেহে একটি হক। কিন্তু আলোচনা হচ্ছে, ঐ হককে অবলম্বন করে আল্লাহর

কাছে চাওয়া বৈধ কি না। বলা হয়: যদি সেই হক, যার মাধ্যমে কেউ চায়, দোয়া কবুলের জন্য একটি কারণ হয়, তাহলে সেটার মাধ্যমে চাওয়া ভালো—যেমন আল্লাহর ইবাদতকারী ও দোয়া চাওয়াকারীদের হকের মতো। কিন্তু যদি চাওয়াকারী বলে, 'অমুক এবং অমুকের হকের মাধ্যমে,' তাহলে যদি ঐ ব্যক্তিদের আল্লাহর কাছে এমন একটি হক থাকে যার কারণে তিনি তাঁদের শাস্তি দিবেন না, বরং তাঁদেরকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করবেন এবং তাঁদের মর্যাদা উন্নীত করবেন—যেমন তিনি তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং নিজের ওপর তা বাধ্যতামূলক করেছেন—তবুও এই চাওয়াকারীর জন্য তা চাওয়ার উপযোগী কোনো কারণ নয়। কারণ, তারা যে মর্যাদা পেয়েছে, তা আল্লাহর দয়ায় ঈমান ও আনুগত্যের কারণে অর্জন করেছে। এই চাওয়াকারী তো তাদের মতো কিছু অর্জন করেনি। অতএব, আল্লাহ তাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন, তাতে এমন কোনো বিষয় নেই যা এই চাওয়াকারীর দোয়া কবুলের কারণ হতে পারে।

যদি কেউ বলে, 'কারণ হলো ঐ সম্মানিত ব্যক্তির সুপারিশ ও দোয়া,' তাহলে সেটা সঠিক হবে, যদি সে সত্যিই তার জন্য সুপারিশ করে থাকে এবং তার জন্য দোয়া করে থাকে। কিন্তু যদি সে তার জন্য সুপারিশ না করে থাকে এবং তার জন্য দোয়া না করে থাকে, তাহলে এখানে কোনো কারণই নেই। যদি সে বলে, 'কারণ হলো আমার তার প্রতি ভালোবাসা, আমার তার প্রতি ঈমান, এবং তার প্রতি আমার আনুগত্য,' তাহলে এটি শরয়ী একটি কারণ, এবং এতে সে আল্লাহর কাছে নিজের ঈমান, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করছে। তবে এক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসার পার্থক্য করতে হবে। যে ব্যক্তি সৃষ্টিকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে, সে আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপন করেছে, এবং এই ভালোবাসা তার ক্ষতি করে, উপকার করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য, আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসে এবং আল্লাহর নবী ও সৎ বান্দাদের ভালোবাসে শুধু আল্লাহর জন্য, তাহলে আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা সবচেয়ে উপকারী জিনিস। এই দুইয়ের পার্থক্য করা সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

যদি বলা হয়: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান, ভালোবাসা ও আনুগত্য দ্বারা তাওয়াসসুল দুইভাবে হয়ে থাকে—কখনো কেউ তা দ্বারা আল্লাহর পুরস্কার ও জান্নাতের উদ্দেশ্যে তাওয়াসসুল করে, আর এটি সর্বোত্তম মাধ্যম; আবার কখনো কেউ তা দোয়ার সময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, যেমন তুমি তার উদাহরণ দিয়েছ—তাহলে যে ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তোমার কাছে চাই,' সে বলতে চায়: 'আমি তার প্রতি আমার ঈমান ও ভালোবাসার

মাধ্যমে তোমার কাছে চাই,' এবং, 'আমি আমার ঈমান ও ভালোবাসার মাধ্যমে তোমার কাছে তাওয়াসসুল করছি,' ইত্যাদি। আর তুমি তো উল্লেখ করেছ, এটি নিয়ে কোনো মতভেদ নেই যে তা বৈধ।

উত্তর দেওয়া হয়: যে ব্যক্তি এই অর্থ উদ্দেশ্য করে, সে নির্ধারিতভাবে সঠিক এবং এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই। যদি সাহাবীদের মধ্যে যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করেছেন—যেমন কিছু সাহাবী, তাবিয়ীন, ইমাম আহমাদ ও অন্যদের থেকে বর্ণিত—তাদের বক্তব্য এই অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটি ভালো। তখন এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ থাকবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই এই শব্দাবলী ব্যবহার করে অথচ এই অর্থ উদ্দেশ্য করে না। এদের বিরুদ্ধেই আপত্তিকারীরা আপত্তি করেছেন। যেমন সাহাবীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাওয়াসসুল বলতে তাঁর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াসসুলকে বোঝাতেন, এবং এটি নিয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই যে তা বৈধ। কিন্তু আমাদের যুগের অধিকাংশ মানুষ এই শব্দাবলী ব্যবহার করে এই অর্থ উদ্দেশ্য করে না।

যদি বলা হয়: একজন ব্যক্তি আরেকজনকে বলে, 'আত্মীয়তার হকের মাধ্যমে'—তাহলে উত্তর দেওয়া হয়: আত্মীয়তা আত্মীয়ের ওপর এক ধরণের হক আরোপ করে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট কিছু চাও, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে" (সূরা আন-নিসা: ১)। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আত্মীয়তা হলো আর-রাহমান (পরম দয়ালু) থেকে নির্গত একটি শাখা। যে ব্যক্তি তা রক্ষা করে, আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন; আর যে তা ছিন্ন করে, আল্লাহ তার সম্পর্ক ছিন্ন করেন।" আর তিনি বলেন: "যখন আল্লাহ আত্মীয়তা সৃষ্টি করলেন, তা আর-রাহমানের কোমরে আটকে গেল এবং বলল: 'আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি ছিন্ন হওয়ার থেকে।' তিনি বললেন: 'তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব, যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, আর তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব, যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে?' সে বলল: 'হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট।'" আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আমি আর-রাহমান, আমি আত্মীয়তাকে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকেই তার নাম নির্গত করেছি। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে, আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখি, আর যে তা ছিন্ন করে, আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি।'"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তাঁর ভাতিজা যখন জা'ফার (তার পিতা)-এর হকের মাধ্যমে

কিছু চাইতো, তখন তিনি তাকে দিতেন, কারণ জা'ফারের আলীর ওপর এক ধরণের হক ছিল। আত্মীয়ের হক মৃত্যুর পরেও রয়ে যায়, যেমন হাদীসে এসেছে: একজন ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাঁদের প্রতি সদাচরণের কিছু অবশিষ্ট থাকে?" তিনি বলেন: "হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের জন্য মাগফিরাত চাওয়া, তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা যেগুলো শুধু তাদের মাধ্যমেই রয়েছে।" অন্য হাদীসে, হযরত ইবনে উমর বলেন: "সদাচরণের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হলো, একজন মানুষ তার পিতার প্রিয়জনদের সঙ্গে তার মৃত্যুর পর সম্পর্ক বজায় রাখে।" অতএব, মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা পিতামাতার সদাচরণ পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু হানিফা, তাঁর সহচরগণ ও অন্যান্য অনেক আলেম যেটা বলেছেন—যে আল্লাহর কাছে কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে কিছু চাওয়া বৈধ নয়, না নবীদের হকের মাধ্যমে, না অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে—তাতে দুটি বিষয় নিহিত:

প্রথমত: আল্লাহর ওপর কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে কসম খাওয়া। এটি অধিকাংশ আলেমের মতে নিষিদ্ধ, যেমন আগে বলা হয়েছে, যেমন কাবা বা পবিত্র স্থানসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর কসম করা নিষিদ্ধ—এটা সমস্ত আলেমদের ঐক্যমতের বিষয়।

দ্বিতীয়ত: কারো মাধ্যমে চাওয়া। এটি কিছু লোক বৈধ মনে করেছে, এবং এর ব্যাপারে সালাফ থেকে কিছু বর্ণনা এসেছে, এবং অনেক মানুষের দোয়ায় এ ধরনের বাক্য পাওয়া যায়। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে এ বিষয়ে যেসব হাদীস এসেছে, সেগুলো সবই দুর্বল, বরং জাল। এমন কোনো সহিহ হাদীস নেই যা তাদের দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, শুধুমাত্র অন্ধ ব্যক্তি সংক্রান্ত হাদীস ছাড়া—যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন: "তুমি বলো: আমি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাই এবং আপনার মাধ্যমে তাঁর দিকে মুখ ফিরাই।" অন্ধ ব্যক্তির এই হাদীস তাদের জন্য দলিল নয়, কারণ এতে স্পষ্টভাবে আছে যে, সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করেছিল এবং তাঁর সুপারিশ চেয়েছিল। এটি ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে দোয়ার অনুরোধ। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর।" এজন্যই, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন, তখন আল্লাহ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন, এবং এটি ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের

একটি নিদর্শন। অন্য অন্ধ ব্যক্তি যদি তাঁর দোয়া ছাড়া তাওয়াসসুল করত, তাহলে তার অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো হতো না।

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের দোয়া, যা বৃষ্টির নামাজে প্রসিদ্ধ, এবং তিনি বলেছিলেন: “হে আল্লাহ! যখন আমাদের উপর খরা নেমে আসত, তখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতাম, আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে; আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তোমার কাছে তাওয়াসসুল করছি,” এটি প্রমাণ করে যে সাহাবীদের নিকট শরয়ী তাওয়াসসুল বলতে জীবিত ব্যক্তির দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমেই তাওয়াসসুল বোঝানো হতো, ব্যক্তিগতভাবে নবীর মাধ্যমে চাওয়া বোঝানো হতো না। যদি এটি বৈধ হতো, তাহলে উমর, মুহাজিরীন এবং আনসাররা রাসুলের মাধ্যমে তাওয়াসসুল না করে আব্বাসের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন না।

নবী ও সৎকর্মশীলদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করার বিষয়ে মতভেদ ছড়িয়ে পড়ে, তবে তাদের মাধ্যমে কসম খাওয়া বিষয়ে নয়। কারণ দোয়া ও কসমের মধ্যে পার্থক্য আছে। দোয়া হচ্ছে বিনীতভাবে অনুরোধ করা এবং কবুলের উপযুক্ত কোনো মাধ্যম দ্বারা চাওয়া। আর কসম খাওয়া হলো উচ্চতর অবস্থান, যেখানে কসমকারী আল্লাহর কাছে কোনো দাবি জোরালোভাবে উপস্থাপন করে। কসম কেবল তার মাধ্যমেই খাওয়া হয়, যার প্রতি বিশ্বাস থাকে যে, সে সেই কসম পূর্ণ করবে। কিন্তু দোয়া কবুল করা সাধারণ ব্যাপার; আল্লাহ অসহায় ব্যক্তির দোয়া, অত্যাচারিতের দোয়া—এমনকি কাফিরের দোয়াও কবুল করেন।

সহিহ হাদীসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনো ব্যক্তি এমন কোনো দোয়া করে না যাতে গোনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কিছু না থাকে, কিন্তু আল্লাহ তার জন্য তিনটি বিষয়ের একটিতে তা কবুল করে দেন: হয়তো তার দোয়াকে ত্বরিত কবুল করেন, অথবা তার জন্য পরকালে সঞ্চিত করে রাখেন, অথবা তার সমপরিমাণ কোনো অনিষ্ট দূর করে দেন।” সাহাবীরা বলল: “তাহলে আমরা বেশি বেশি দোয়া করব।” তিনি বললেন: “আল্লাহ আরও অধিক (দানকারী)।”

এই যে নবীদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল, অর্থাৎ তাদেরকে মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া—যা আবু হানিফা, তাঁর সাহচর্যগণ ও অন্যদের মতে বৈধ নয়—ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মতের মধ্যে এর বিরোধিতা নেই, তো রাসুলের অসম্মান বা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার বিষয় তো দূরের কথা। যে ব্যক্তি মালিকের তরফ

থেকে এই অর্থে রাসুলের মাধ্যমে তাওয়াসসুলকে বৈধ বলেছেন—অর্থাৎ তাঁর কসম বা মাধ্যমে চাওয়া—তার কাছে মালিক বা তাঁর সাথীদের কোনো দলীল নেই, বরং মালিক থেকে তো এমনটিই জানা যায় যে, তিনি দোয়া চাওয়ার সময় বলা অপছন্দ করতেন: "হে আমার সায়্যিদ, হে আমার সায়্যিদ," বরং বলতেন: "নবীগণ যেমন বলতেন, তেমনি বলো: হে প্রভু, হে প্রভু, হে দয়ালু।" তিনি "হে রহিম, হে ওয়াহাব" বলাও অপছন্দ করতেন, কারণ তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। তাহলে যখন তিনি এমন দোয়া অপছন্দ করতেন, যেগুলো তাঁর মতে শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে প্রমাণিত নয়, তখন কিভাবে বৈধ হতে পারে যে, আল্লাহর কাছে কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে কিছু চাওয়া, হোক তা নবী বা অন্য কেউ?

কারণ সাহাবীগণ যখন 'আম উল-রামাদা (শুকর্ষ বছরের) সময় খরার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তারা কোনো সৃষ্টিকে মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাননি, না নবীর মাধ্যমে, না অন্য কারো মাধ্যমে। বরং উমর বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! যখন আমাদের উপর খরা নেমে আসত, তখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতাম, আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে; আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তোমার কাছে তাওয়াসসুল করছি। অতএব, আমাদের বৃষ্টি দাও।" এবং তাঁদের বৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল।

এছাড়া সহিহ মুসলিমে ইবনে উমর, আনাস ও অন্যদের থেকে প্রমাণিত আছে যে, খরা দেখা দিলে তারা কেবল রাসুলের দোয়া ও সালাতের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন। রাসুলের জীবিত থাকা অবস্থায় কেউ তাঁর মাধ্যমে বা অন্য কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কিছু চেয়েছে—এমন কিছু প্রমাণিত নয়, না ইস্তিস্কা'য়, না অন্য কিছুর সময়। আমরা ইনশাআল্লাহ অন্ধ ব্যক্তির হাদীস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। যদি সাহাবীদের মধ্যে রাসুলের মাধ্যমে তাওয়াসসুল প্রচলিত থাকত, তাহলে তারা উমরকে বলত: "আমরা তো তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতাম, এখন কেন তাঁর চাচার মাধ্যমে করছি? আমরা তো তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করে দোয়া কবুল হতাম, এখন অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদার মাধ্যম গ্রহণ করছি?" অথচ 'আম উল-রামাদা ছিল এক মহাবিপদ, খরার একটি প্রতীক। অতএব, তারা উত্তম মাধ্যম ছেড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মাধ্যম গ্রহণ করত না।

যেভাবে উমর করেছেন, তেমনি মু'আবিয়াও সাহাবী ও তাবিয়ীদের উপস্থিতিতে ইয়াজিদ ইবনে আসওয়াদ আল-জুরাশীর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করেছিলেন, যেমন উমর করেছিলেন আব্বাসের মাধ্যমে। তেমনি ইমাম

শাফি'ই, আহমাদ ও অন্যান্যদের অনুসারীদের মধ্যে যারা ফকীহ ছিলেন, তারা উল্লেখ করেছেন যে, ইস্তিস্কা'-এর সময় সৎ ও ধার্মিক লোকদের দোয়ার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা হয়। তারা বলেন: আর যদি তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে তা আরও উত্তম—উমরের অনুসরণে। কিন্তু কোনো আলেম বলেননি যে, ঐ অবস্থায় কোনো নবী বা অন্য কাউকে আল্লাহর কাছে মাধ্যম করে চাওয়া উচিত।

তদ্রূপ, যে ব্যক্তি ইমাম মালিকের পক্ষ থেকে এ কথা বর্ণনা করে যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কাউকে মৃত্যুর পর ডাকতে অনুমতি দিয়েছেন, অথবা যে ব্যক্তি মুসলিমদের অন্যান্য কোনো ইমামের পক্ষ থেকেও এ কথা বর্ণনা করে—যেমন ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমদ ইত্যাদি—সে তাদের প্রতি মিথ্যার অপবাদ আরোপ করেছে। তবে কিছু অজ্ঞ লোক ইমাম মালিকের পক্ষ থেকে এই কথাটি বর্ণনা করে, একটি জাল ঘটনার ওপর ভিত্তি করে। এমনকি যদি তা সহীহও হতো, তবুও তাতে যে তাওয়াসসুলের কথা এসেছে তা এই ধরণের নয়; বরং তা হলো কিয়ামতের দিনে তাঁর সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াসসুল। কিন্তু কিছু লোক এই বর্ণনাটিকে বিকৃত করেছে, এবং এর উৎস দুর্বল—যেমন আমরা তা ব্যাখ্যা করব, যদি আল্লাহ তা'আলা চান। আল-কাযী ইয়ায তার গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কিত অধ্যায়ে এটি উল্লেখ করেননি; বরং তিনি সেখানে ইমাম মালিক ও তার সাথীদের থেকে যেটি প্রসিদ্ধ, সেটিই উল্লেখ করেছেন। তিনি শুধুমাত্র এই প্রেক্ষিতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা পূর্বের মতোই অপরিহার্য, যেমনটি তাঁর জীবদ্দশায় ছিল, এবং যখনই তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়, তাঁর হাদীস, সুন্নাহ, অথবা তাঁর নাম শোনা হয়।

তিনি ইমাম মালিকের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে আয়্যুব আস-সাখতিয়ানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "আমি যাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি, আয়্যুব তাদের সকলের চেয়ে উত্তম।" তিনি বলেন: "তিনি দুইবার হজ্জ আদায় করেছেন, আমি তাঁকে লক্ষ্য করতাম, এবং তাঁর কাছ থেকে কিছুই শুনিনি, শুধুমাত্র যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করা হতো, তখন তিনি কাঁদতেন, এমনকি আমি তাঁর প্রতি দয়া অনুভব করতাম। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে যা দেখেছি, তা দেখেছি, এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান দেখেছি, তখন আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি।"

মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ বলেন: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম যখন ইমাম মালিকের সামনে উচ্চারণ করা হতো, তখন তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং তিনি এতটা নত হতেন যে, তাঁর সাথীরা বিরক্ত হতেন। একদিন তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: 'তোমরা যদি তা দেখতে যা আমি দেখেছি, তবে আমার কাছ থেকে যা দেখো তা অস্বাভাবিক মনে করতে না। আমি মুহাম্মদ ইবনে আল-মুনকাদিরকে দেখতাম—তিনি ছিলেন ক্বারিদের সর্দার—আমরা তাঁকে হাদীস সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তিনি কাঁদতেন, এমনকি আমরা তাঁর প্রতি করুণা বোধ করতাম। আমি জাফর ইবনে মুহাম্মদকেও দেখেছি—তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল ও কৌতুকপ্রিয়—কিন্তু যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম তাঁর সামনে উচ্চারণ করা হতো, তখন তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত, এবং আমি কখনোই তাঁকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি, শুধুমাত্র পবিত্র অবস্থায়। আমি তাঁর সাহচর্যে ছিলাম কিছুদিন, এবং তাঁকে তিন অবস্থার বাইরে দেখিনি: অথবা নামাযে, অথবা চুপচাপ, অথবা কুরআন পাঠে। তিনি কখনো এমন কোনো বিষয়ে কথা বলতেন না, যা তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত করতো না। তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু আলেম ও ইবাদতগুজারদের একজন।'"

"আর আবদুর রহমান ইবনে আল-কাসিম যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করতেন, তখন তাঁর চেহারা এমন হয়ে যেত যেন তাঁর শরীর থেকে রক্ত নিঃশেষিত হয়ে গেছে, এবং ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে যেত। আমি ‘আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয-জুবায়রের কাছে যেতাম, এবং যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম তাঁর সামনে উচ্চারণ করা হতো, তখন তিনি এতটাই কাঁদতেন যে, চোখে আর অশ্রু অবশিষ্ট থাকত না। আমি ইমাম যুহরীকেও দেখেছি—তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সদাচরণকারী—কিন্তু যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করা হতো, তখন মনে হতো যেন তিনি কাউকে চেনেন না, আর কেউ তাঁকে চেনে না। আমি সফওয়ান ইবনে সুলায়মের কাছে যেতাম—তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ইবাদতকারী ও মুজাহিদ—এবং যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করা হতো, তখন তিনি কাঁদতেন এবং এতক্ষণ কাঁদতেন যে, তাঁর আশপাশের লোকেরা উঠে যেত।"

এই সবকিছু আল-কাযী ইয়ায ইমাম মালিকের সাথীদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি একটি অদ্ভুত ও বিচ্ছিন্ন সানাদে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, যা তিনি একাধিক সূত্রে অনুমতি নিয়ে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন: আবু আল-আব্বাস আহমদ ইবনে উমর ইবনে দিলহাত আমাদের নিকট বর্ণনা

করেছেন: আবু আল-হাসান আলী ইবনে ফিহর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আল-ফারাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: আবু আল-হাসান আবদুল্লাহ ইবনে আল-মুনতাব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে আবু ইস্রাঈল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: ইবনে হুমায়দ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু জা'ফার, আমীরুল মুমিনীন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে ইমাম মালিকের সাথে বিতর্ক করছিলেন। ইমাম মালিক তাঁকে বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! এই মসজিদে কণ্ঠস্বর উঁচু করো না, কেননা আল্লাহ এক জাতিকে শিষ্টতা শেখান এই বলে: 'তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু করো না' (সূরা হুজুরাত: ২)। এবং তিনি এক জাতিকে প্রশংসা করেছেন এই বলে: 'নিশ্চয় যারা রাসুলের সামনে কণ্ঠস্বর নিচু করে' (হুজুরাত: ৩)। এবং তিনি এক জাতিকে তিরস্কার করেছেন এই বলে: 'নিশ্চয় যারা কক্ষের বাইরে থেকে তোমাকে আহ্বান করে' (হুজুরাত: ৪)। এবং অবশ্যই, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মর্যাদা জীবিত অবস্থার মতোই।"

তখন আবু জা'ফার নম্র হয়ে বললেন: "হে আবা আবদিল্লাহ! আমি কি কিবলার দিকে মুখ করে দো'আ করব, না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে?" ইমাম মালিক বলেন: "তুমি কেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, যখন তিনি তোমার এবং তোমার পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য আল্লাহর নিকট মাধ্যম কিয়ামতের দিনে? বরং, তাঁর দিকে মুখ করে তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করো, এবং আল্লাহ তাঁর শাফা'আত তোমার জন্য কবুল করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 'আর যদি তারা নিজেদের ওপর জুলুম করার পর তোমার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, এবং রাসুল তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহকে তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু পেত' (সূরা নিসা: ৬৪)।"

আমি (ইবনে তাইমিয়্যাহ) বলি: এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণিত; কারণ মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ আর-রাজী ইমাম মালিককে দেখেননি, বিশেষ করে আবু জা'ফার আল-মানসুরের যুগে নয়। আবু জা'ফার ১৫৮ হিজরিতে মক্কায় ইন্তিকাল করেন, আর মালিক ১৭৯ হিজরিতে। মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ ২৪৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন, এবং তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করেন বৃদ্ধ বয়সে, তাঁর পিতার সঙ্গে। তা ছাড়া, হাদীসবিদদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে তিনি দুর্বল। আবু জুর'আ ও ইবনে ওয়ারাহ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। সালিহ ইবনে মুহাম্মদ আল-আসাদী বলেন: "আমি তার চেয়ে বড় আল্লাহর বিরুদ্ধে জুলুমকারী কাউকে দেখিনি, এবং না-ই এমন কাউকে দেখেছি, যে তার মতো মিথ্যায় পটু।" ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ বলেন: "সে বহু মংকার রিওয়ায়াত বর্ণনা করে।" নাসাঈ বলেন: "সে বিশ্বস্ত নয়।" ইবনে হিব্বান বলেন: "সে বিশ্বস্ত

বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে রদমূলক রিওয়ায়াত এককভাবে বর্ণনা করে।" ইমাম মালিকের কাছ থেকে সর্বশেষে মুয়াত্তা বর্ণনা করেছেন আবু মুসআব, যিনি ২৪২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। আর ইমাম মালিক থেকে সর্বশেষ বর্ণনাকারী ছিলেন আবু হুছাইফা আহমদ ইবনে ইসমাঈল আস-সহমী, যিনি ২৫৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। এছাড়াও, এই সানাদে এমন লোক রয়েছে যাদের অবস্থা অজ্ঞাত। এই ঘটনাটি ইমাম মালিকের কোনো প্রসিদ্ধ সাথীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি, যারা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন বলে পরিচিত। মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ এমনিতেই দুর্বল যখন সে সানাদসহ বর্ণনা করে; তাহলে সে যদি মুরসালভাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করে, যা কেবল তার মাধ্যমেই পরিচিত, তবে তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? যদি ধরে নেয়া হয় যে সে সত্যিই এটি বর্ণনা করেছে, তাহলেও তার দ্বারা ইমাম মালিকের কোনো ফিকহি মত গ্রহণযোগ্য নয়—এ বিষয়ে তাঁর সাথীরা একমত। বরং, যখন সিরিয়ার বর্ণনাকারীরা যেমন ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম, মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ আত-ত্বাতারী তার কাছ থেকে বর্ণনা করে, তখন তাদের বর্ণনাকেও দুর্বল মনে করা হয়। কেবল মদিনাবাসী ও মিসরীয় বর্ণনাকারীদের কথাই গ্রহণ করা হয়। তাহলে এমন একটি ঘটনার ওপর কিভাবে নির্ভর করা যায়, যা বহু দিক দিয়ে ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মাযহাবের পরিপন্থী, এবং যা একমাত্র খোরাসানী এমন একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যে তাঁকে দেখেনি এবং যে হাদীসবিদদের দৃষ্টিতে দুর্বল?

এ ছাড়াও, তাঁর এই উক্তি—"তিনি তোমার এবং তোমার পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আল্লাহর কাছে মাধ্যম কিয়ামতের দিনে"—এটাও কেবল এটাই প্রমাণ করে যে আদম এবং তার বংশধরগণ কিয়ামতের দিন তাঁর শাফা'আতের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করবেন। এটি কিয়ামতের দিনের শাফা'আতের মাধ্যমে তাওয়াসসুল, এবং এটি সত্য, যেমনটি বহু সহীহ হাদীসে এসেছে—যখন মানুষ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট শাফা'আতের জন্য যাবে, এবং আদম তাদের নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর দিকে, এরপর ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দিকে, এরপর মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর দিকে, এরপর ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর দিকে এবং এরপর তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে রওনা হবে। কেননা তিনি বলেছেন: "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হব, এতে কোনো গর্ব নেই। আদম ও তার অধীনস্থ সকলেই কিয়ামতের দিন আমার পতাকার নিচে থাকবে, এতে কোনো গর্ব নেই।" তবে এই ঘটনার মধ্যে এমন বহু বিষয় রয়েছে, যা ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মাযহাবের বিপরীত।

তার (আবু জা'ফারের) কথিত প্রশ্ন: "আমি কি কিবলার দিকে মুখ করে দোআ করব, না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে মুখ করে দোআ করব?" এবং তার (মালিকের) কথিত জবাব: "তুমি কেন

তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তিনি তো তোমার এবং তোমার পিতা আদমের জন্য ওসীলা।" অথচ মালিক ও অন্যান্য ইমামগণের এবং সাহাবি ও তাবেঈনদের মধ্যে পূর্বসালাফদের থেকে যা প্রসিদ্ধ, তা হলো—যখন কোনো প্রার্থনাকারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দেয়, অতঃপর নিজের জন্য দোআ করতে চায়, তখন সে কিবলার দিকে মুখ করে মসজিদে দোআ করে এবং কবরের দিকে মুখ করে নিজের জন্য দোআ করে না। বরং কেবল সালামের সময়ই কবরের দিকে মুখ করে সালাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দোআ করা হয়। অধিকাংশ আলেমগণের মত এমনই; যেমন মালিকের দুটি বর্ণনার একটিতে, শাফি'ঈ, আহমদ ও অন্যান্যরা। আবু হানিফার অনুসারীদের মতে, সালামের সময়ও কবরের দিকে মুখ করা উচিত নয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: সে যেন ঘরের অবস্থান তার বাম দিকে রাখে—ইবনে ওহ্‌ব মালিক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন—এবং সালাম দেয়। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: বরং সে যেন ঘরের দিকে পেছন করে দাঁড়ায় এবং সালাম দেয়, এবং এটাই তাঁদের মধ্যে অধিক প্রচলিত মত। যদিও এর পরও মালিক কবরের সামনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দোআ করা অপছন্দ করতেন।

আল-কাযী 'ইয়াদ "আল-মাবসুত"-এ মালিক সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি বলেছেন: আমি মনে করি না যে কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দোআ করবে, বরং সালাম দিয়ে চলে যাবে।" তিনি আরও বলেছেন: "নাফি' বলেছেন: ইবনে উমর কবরের সামনে এসে সালাম দিতেন। আমি শতাধিক বার তাকে দেখেছি তিনি কবরের কাছে এসে বলতেন: 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর শান্তি, আবু বকর-এর ওপর শান্তি, আমার পিতার ওপর শান্তি।' তারপর চলে যেতেন। তাঁকে দেখা গেছে, তিনি মিম্বারের সেই স্থানে হাত রাখতেন যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসতেন, তারপর তা নিজের মুখে স্পর্শ করতেন।"

তিনি আরও বলেছেন: "ইবনু আবি কুসাইত ও আল-কাআনাবি থেকে বর্ণিত: যখন মসজিদ ফাঁকা থাকত, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিরা কবরমুখী মিম্বারের গাঁটে ডান হাত রাখতেন, তারপর কিবলার দিকে মুখ করে দোআ করতেন।" তিনি আরও বলেন: "মুওয়াত্তা' গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আল-লায়থীর বর্ণনায় এসেছে যে, ইবনে উমর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর, আবু বকর ও উমরের ওপর দরুদ পাঠ করতেন।" এবং ইবনুল কাসিম আল-মারওয়াযী থেকে বর্ণনা করেছেন: "তিনি আবু বকর ও উমরের জন্য দোআ করতেন।" মালিক ইবনে ওহ্‌ব-

এর বর্ণনায় বলেন: “সে বলবে: ‘আপনার ওপর শান্তি হোক, হে নবী, এবং আল্লাহর দয়া ও বরকতসমূহ।’” এবং "আল-মাবসুত"-এ বলেন: “সে আবু বকর ও উমরের সালাম দেয়।”

আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী বলেন: “আমার মতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দরুদের ভাষায় এবং আবু বকর ও উমরের জন্য সালামের ভাষায় দোআ করা উচিত, কারণ ইবনে উমরের হাদীসের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।” এই দোআ ইবনে ওহ্‌ব-এর বর্ণনার দোআর ব্যাখ্যা। মালিক ইবনে ওহ্‌ব-এর বর্ণনায় বলেন: “যখন কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দেয় ও তাঁর জন্য দোআ করে, তখন সে কবরমুখী হয়ে দাঁড়ায়, কিবলামুখী নয়, এবং কাছে গিয়ে সালাম দেয়, তবে কবর স্পর্শ করে না।” সুতরাং এটি হচ্ছে তাঁর ওপর সালাম ও তাঁর জন্য দোআ করা—দরূদ পাঠের মাধ্যমে—যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তদ্রূপ, তাঁর সঙ্গীদের বর্ণিত প্রতিটি দোআ—যেমন ইবনু হাবীব "আল-ওয়াদিহাহ" ও অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: “মালিক ‘আল-মাবসুত’-এ বলেছেন: মদিনাবাসীদের জন্য কবরের সামনে দাঁড়ানো জরুরি নয়, বরং এটি কেবল ভিনদেশীদের জন্য।” তিনি সেখানে আরও বলেন: “যে ব্যক্তি সফর থেকে এসেছে বা সফরে যাচ্ছে, তার জন্য কবরের সামনে দাঁড়িয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ পাঠ করা, তাঁর জন্য এবং আবু বকর ও উমরের জন্য দোআ করা দোষের নয়।” তাকে বলা হলো: “মদিনার কিছু লোক, যারা না সফর থেকে এসেছে, না সফরে যাচ্ছে, তারা দিনে একবার বা একাধিকবার এমনটা করে, এমনকি শুক্রবার বা অন্যান্য দিনে এক বা দুইবার বা তার চেয়েও বেশি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম ও দোআ করে।” মালিক বলেন: “আমাদের নগরীর ফকীহদের মধ্যে এমন কিছু আমার জানা নেই, বরং এটি পরিহার করা বৈধ। উম্মাহর শেষাংশকে যা সঠিক করবে, তা-ই তার প্রথমাংশকে সঠিক করেছিল। আমাদের এই উম্মাহর প্রথমাংশ ও পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে আমার কাছে এ রকম কিছু পৌঁছেনি যে, তারা তা করত। এটি অপছন্দনীয়, কিন্তু সফর থেকে আগত বা সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ব্যক্তি ছাড়া।”

ইবনুল কাসিম বলেন: “আমি মদিনার লোকদের দেখেছি, যখন তারা নগরী ছাড়ত বা প্রবেশ করত, তারা কবরের কাছে এসে সালাম দিত।” তিনি বলেন: “এই কারণেই তিনি মত দেন…”

আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী বলেন: “তিনি মদিনাবাসী ও ভিনদেশীদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, কারণ

ভিনদেশীরা এই উদ্দেশ্যেই এসেছেন, অথচ মদিনাবাসীরা এখানে বাস করেন এবং কবর ও সালামের উদ্দেশ্যে আগমন করেননি।" তিনি বলেন: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'হে আল্লাহ! আমার কবরকে কোনো উপাস্য প্রতিমা বানিও না।' আল্লাহর রোষ তীব্র হয় তাদের ওপর, যারা তাদের নবীদের কবরকে উপাসনার স্থান বানিয়েছে।" তিনি বলেন: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা আমার কবরকে উৎসব বানিও না।'"

তিনি আরও বলেন: "আহমদ ইবনু শু'বা-র গ্রন্থে এসেছে—যে কবরের সামনে দাঁড়ায়, সে যেন কবর আঁকড়ে না ধরে, স্পর্শ না করে এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে না থাকে।" এবং 'উতবিয়্যাহ'-তে (অর্থাৎ মালিক থেকে) এসেছে: "সালামের পূর্বে, নবীর মসজিদে প্রবেশ করে রুকু দিয়ে শুরু করবে। সেখানে নফল নামাজের জন্য সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো সেই জায়গা যেখানে সুগন্ধি খুঁটি অবস্থিত—যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করতেন। আর ফরজ নামাজের জন্য উত্তম হচ্ছে সামনের কাতারে অগ্রসর হওয়া।" তিনি বলেন: "এবং নফল নামাজের জন্য ভিনদেশীদের জন্য মসজিদে নামাজ আদায় করা আমার কাছে বাড়িতে নফল নামাজের চেয়ে বেশি প্রিয়।"

এটি মালিক ও তাঁর সাথীদের মত এবং তাঁরা সাহাবিদের কাছ থেকে যা পেয়েছেন, তা-ই প্রমাণ করে যে, তারা কবরের কাছে যেতেন শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানানোর ও তাঁর জন্য দোআ করার উদ্দেশ্যে। মালিক কবরের সামনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার বিষয় অপছন্দ করতেন, এবং মদিনাবাসীদের প্রতি মসজিদে প্রবেশ ও প্রস্থানকালে তা করা অপছন্দ করতেন; বরং কেবল ভিনদেশী এবং আগত/প্রস্থানেরত ব্যক্তিদের জন্য তা বৈধ, কেননা এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাম প্রদর্শন। আর কেউ যখন নিজের জন্য দোআ করতে চায়, তখন সে মসজিদে কিবলামুখী হয়ে দোআ করবে, যেমন সাহাবিদের থেকে এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এমনটি কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়নি যে, তারা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের জন্য দোআ করতেন, বরং এমনটিও পাওয়া যায় না যে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দীর্ঘ সময় কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দোআ করতেন—নিজেদের জন্য তো দূরের কথা।

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে দোআ করা, তাঁর কাছে প্রয়োজন চাওয়া, তাঁর কবরের পাশে বা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর মাধ্যমে ওসীলা কামনা করা, যেমন: "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি

আমার জন্য সুপারিশ করুন," "আমার জন্য দোআ করুন," অথবা তাঁর কাছে দুনিয়া বা দ্বীনের কোনো বিপদ জানানো, কিংবা তাঁকে অথবা অন্য কোনো নবী বা সজ্জন বা অদৃশ্য ফিরিশতাদের কাছে সুপারিশ কামনা করা অথবা বিপদ-বালা জানানো—এসব কিছু খ্রিস্টান ও অন্যান্য মুশরিকদের পদ্ধতি, এবং তাদের অনুকরণকারী এই উম্মাহর বিদআতি গোষ্ঠীর আচরণ; এটি সাহাবায়ে কেরাম, মুহাজির ও আনসার এবং যারা তাদের অনুসরণে উৎকৃষ্ট, তাদের কোনো কাজ নয়। এমনকি মুসলিমদের কোনো ইমামও এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেননি, যদিও তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দিতেন, কেননা নিকটবর্তী ব্যক্তির সালাম তিনি স্বয়ং শুনতে পান এবং দূরের ব্যক্তির সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামগণ প্রমাণ হিসেবে এমন একটি হাদীস পেশ করেছেন, যা আহমাদ ও আবু দাউদ উত্তম সনদে হাইওয়াহ ইবনে শুরাইহ আল-মিসরী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু শাখর আমাদের নিকট ইয়াযীদ ইবনে কুসাইত থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এবং তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "কেউ আমার উপর সালাম প্রেরণ করলে , আল্লাহ আমার রূহ আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।"

এই হাদীসটির উপর ভিত্তি করেই ইমামগণ তাঁর কবরের নিকট সালাম প্রেরণ করার বৈধতা গ্রহণ করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। কিন্তু তাঁর কবর যিয়ারত সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সব দুর্বল, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর উপর নির্ভর করা যায় না। এজন্যই সহীহ ও সুনান সংকলনের ইমামগণ সেগুলো বর্ণনা করেননি। বরং সেগুলো কেবল তারাই বর্ণনা করেছেন, যারা দুর্বল হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, যেমন দারাকুতনী, বাযযার প্রমুখ।

এই হাদীসগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম যেটি, তা হলো আবদুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমারী থেকে বর্ণিত — অথচ তিনি দুর্বল, এবং এতে মিথ্যার চিহ্ন স্পষ্ট — যেমন, তাঁর এ উক্তি: "যে কেউ আমার মৃত্যুর পরে আমাকে যিয়ারত করে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করল।"

এই কথার মিথ্যা হওয়া স্পষ্ট, কারণ তা মুসলিমদের দ্বীনের বিরোধিতা করে।[7] কেননা, যে ব্যক্তি রাসুল

[7] শাইখ নাসির ইবনে হামাদ আল-ফাহদ (পৃষ্ঠা ১৭) বলেন:
সংকলক রাহিমাহুল্লাহ যে তিনি (এবং তিনি দুর্বল, এবং এতে মিথ্যা স্পষ্ট) বাক্যাংশটি দুটি স্থানের মধ্যে

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর যিয়ারত করেছে এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, সে ছিল তাঁর সাহাবী, বিশেষত যদি সে হিজরত করে তাঁর নিকট আসত এবং তাঁর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করত। এবং এটা তাঁর থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না, কেননা, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও তা তাদের একজনের (সওয়াবের) সমান হবে না, এমনকি তার অর্ধেকও নয়।"

এটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত।

সুতরাং, সাহাবীদের পরে আগত কেউ হজ্জ, জিহাদ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ প্রেরণ — এসব ফরয ও আদিষ্ট আমলের মাধ্যমে সাহাবীদের সমতুল্য হতে পারে না। তাহলে কীভাবে এমন এক আমলের মাধ্যমে, যা মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী ফরয নয়, সাহাবীদের মতো হওয়া সম্ভব? বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টভাবে সফর করাকে শরীয়াহ্‌তে অনুমোদিতও করা হয়নি; বরং তা নিষিদ্ধ।

তবে, তাঁর মসজিদে সালাতের উদ্দেশ্যে সফর করা এবং মসজিদুল আকসায় সালাতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নত ও মুস্তাহাব। আর কাবার উদ্দেশ্যে হজ্জের সফর করা ফরয। যদি কেউ ফরয ও সুন্নত সফরসমূহ সম্পন্ন করে, তবুও সে তাদের মতো হতে পারে না যারা জীবিত অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সফর করেছে। তাহলে কীভাবে এমন সফরের তুলনা করা যায় যা নিষিদ্ধ?

ইমামগণের ইজমা হলো, কেউ যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর বা অন্য নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মান্নত করে, তবে তার সে মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব নয়; বরং তা পালন করা নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে বা মসজিদুল আকসায় সালাতের উদ্দেশ্যে মান্নত করে, তাহলে ইমাম শাফি'র দুটি মত রয়েছে: তার মধ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ মত হলো, তা পূরণ করা ওয়াজিব। এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের মতও বটে।

অপর মত হলো, তা ওয়াজিব নয় — এটি ইমাম আবু হানিফার মত, কেননা তাঁর মূলনীতি অনুযায়ী, মান্নতের

স্থাপন করেছেন, তা এই বিভ্রান্তিকর ধারণা সৃষ্টি করে যে, শাইখ [ইবনে তাইমিয়্যাহ]-এর উক্তি (এবং এতে মিথ্যা স্পষ্ট) আল-উমারীর দিকেই ফিরে যায়। এটি সঠিক নয়; আল-উমারী দুর্বল হলেও তিনি মিথ্যাবাদী নন। শাইখ [ইবনে তাইমিয়্যাহ] দুর্বলতার বিষয়টি আল-উমারী (বর্ণনাকারী)-এর প্রতি, এবং মিথ্যার বিষয়টি হাদীসের বক্তব্যের প্রতি প্রযোজ্য করতে চেয়েছেন।

মাধ্যমে কেবল সেই আমলই ওয়াজিব হয় যা আগে থেকেই শরীয়াহ্‌তে ওয়াজিব। যেহেতু ঐ দুই মসজিদে আগমণ স্বয়ং শরীয়ত দ্বারা ওয়াজিব নয়, তাই তা মান্নতের মাধ্যমেও ওয়াজিব হবে না।

অন্যদিকে, অধিকাংশ আলেম বলেন, এটি আল্লাহর আনুগত্যের কাজ, এবং সহীহ বুখারীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: "যে কেউ আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে, আর যে কেউ আল্লাহর অবাধ্যতার মান্নত করে, সে যেন অবাধ্যতা না করে।"

তাহলে, নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের মান্নত কোনো মাযহাবেই ওয়াজিব নয়, কেননা এটি আনুগত্যের কাজ নয়। তাহলে এমন কেউ কীভাবে তাঁর সাহাবীদের মতো হতে পারে?

এবং এটি হচ্ছেন ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ), যিনি পছন্দ করতেন না যে কেউ বলুক: "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করেছি", এবং তিনি একে গুরুতর বিষয় মনে করতেন। কেউ কেউ বলেন, এটি সাধারণভাবে কবর যিয়ারতের প্রতি অনুচিততা নির্দেশ করে। আবার কেউ বলেন, কারণ এই বাক্যে বোঝায় যে, যিয়ারতকারীকে যিয়ারতকৃত ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হচ্ছে।

এই দুই ব্যাখ্যাই মালিকী মাযহাবের সাথীদের দৃষ্টিতে দুর্বল। সঠিক মত হলো, কারণ এই বাক্যটি সাধারণ এবং এতে শরীয়ত-বিরোধী, বিদআতপূর্ণ যিয়ারতের রূপ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যা শিরকের এক ধরন। কেননা নবী এবং অন্যান্য সকল মুমিনের কবর যিয়ারত দুই প্রকার — একটি শরীয়াহ্‌ সম্মত যিয়ারত এবং অপরটি বিদআতপূর্ণ যিয়ারত, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ যিয়ারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কবরবাসীদের প্রতি সালাম জানানো এবং তাদের জন্য দোয়া করা, যেমন কেউ মৃত্যুর পরে কারো জানাজা পড়ার নিয়তে যায়। এটাই শরিয়তসম্মত যিয়ারত। দ্বিতীয়টি হল মুশরিক ও বিদআতিদের যিয়ারতের মতভাবে কবর যিয়ারত করা— মৃতদের নিকট দোয়া করা ও তাদের নিকট চাহিদা পূরণের অনুরোধ জানানো; অথবা এই বিশ্বাস রাখা যে, তাদের কবরের নিকটে দোয়া করা মসজিদ ও ঘরে দোয়া করার চেয়ে উত্তম; অথবা আল্লাহর নামে তাদের মাধ্যমে কসম খাওয়া ও আল্লাহর নিকট তাদের মাধ্যমে চাওয়া এমন একটি শরিয়তসম্মত বিষয় যা দোয়া কবুল হওয়ার উপায়— এই ধরণের যিয়ারত বিদআত এবং হারাম। যেহেতু "যিয়ারত" শব্দটি একটি সাধারণ শব্দ, যা সত্য ও মিথ্যার উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তাই এমন এক শব্দের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, যেমন "তাদের প্রতি সালাম জানানো" বলা। ইমাম মালিকের বিরুদ্ধে কেউ তাঁর কবর যিয়ারতের বা

মৃত্যুর পর তাঁকে যিয়ারতের যে সকল বর্ণনা এসেছে, তার ভিত্তিতে যুক্তি পেশ করতে পারে না, কেননা সেগুলো সবই দুর্বল হাদীস, বরং জাল, যেগুলোর কোনোটিই শরীয়তের বিধান প্রমাণ করার ভিত্তি হতে পারে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝখানে জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান রয়েছে।" এটা সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। যদিও কেউ কেউ অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা করে বলেছেন "আমার কবর"। কিন্তু তিনি যখন এই কথা বলেন, তখনো তাঁকে কবর দেওয়া হয়নি— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কারণেই সাহাবীগণ যখন তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে তা নিয়ে ইখতিলাফ করেন, তখন কেউ এই বর্ণনাটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। যদি "আমার কবর" শব্দটি থাকত, তাহলে তা মতভেদের মীমাংসার চূড়ান্ত প্রমাণ হতো। কিন্তু তাঁকে 'আয়িশার ঘরে দাফন করা হয়েছিল—সেই স্থানেই যেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন— আমার মা-বাবা তাঁর জন্য কুরবান হোক, আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন।

পরে যখন খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়, এবং মদিনায় তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন উমর ইবনে আব্দুল আজীজ, তখন তিনি তাঁকে আদেশ দেন কক্ষগুলো ক্রয় করে মসজিদে সংযুক্ত করার জন্য। সেই কক্ষগুলো ছিল পূর্ব ও কিবলার দিকে, ফলে সেগুলো মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং আয়িশার ঘর সেই সময় থেকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন বাইরের দেয়ালকে তির্যকভাবে ও বাঁকা আকারে নির্মাণ করা হয়, কেননা সহীহ মুসলিমে আবূ মারসাদ আল-গানাভী থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "কবরের উপর বসো না এবং তার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ো না।" কেননা তা সিজদার অনুরূপ হয়ে যায়, যদিও নামাজ আদায়কারী কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নামাজ পড়ে থাকে।

যেমন কবরগুলোকে মসজিদ বানানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে সেগুলোর কাছে ইবাদতের নিয়তে যাওয়া, যদিও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই দোয়া করা, তাও নিষিদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি নবীগণ ও সৎকর্মপরায়ণদের কবরের নিকট ইবাদত ও দোয়ার উদ্দেশ্যে যায়, সে এক নিষিদ্ধ কাজেরই নিয়ত করে যার পথসমূহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল বন্ধ করে দিয়েছেন। এটি শরিয়তসম্মত সালামের চর্চার বিপরীত, যেটা আগে উল্লেখ হয়েছে।

সুফিয়ান আস-সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে আস-সায়িব থেকে, যিনি যাধান থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমাকে পৌঁছান।" এটি নাসাঈ ও আবূ হাতিম তাঁর সহীহ-এ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আবূ হুরায়রা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে দূরবর্তী ব্যক্তির সালাম ফেরেশতাগণ পৌঁছে দেন। আবূ আল-আশআস আস-সানআনী, আওস ইবনে আওস থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "প্রতি জুমাবারে আমার উপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করো, কেননা সে দিনে আমার উম্মতের দুরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়। যারা আমার প্রতি বেশি দুরুদ পাঠ করে, তারা আমার নিকটতম হবে।"

আর ইমাম আহমদের মুসনাদে এসেছে: শুরাইহ আমাদেরকে বর্ণনা করেন: আবদুল্লাহ ইবনে নাফি, ইবনে আবি যিব থেকে, তিনি আল-মাকবুরী থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমার কবরকে ঈদের স্থান বানিয়ো না এবং তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিয়ো না। যেখানে থাকো সেখান থেকেই আমার উপর দুরুদ পাঠ করো, নিশ্চয়ই তোমাদের দোয়া আমাকে পৌঁছায়।" এটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

কাযী ইয়ায বলেন: আবূ বকর ইবনে আবি শাইবাহ, আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট থেকে দুরুদ পাঠ করে, আমি তা শুনি। আর যে দূর থেকে পাঠ করে, তা আমাকে পৌঁছানো হয়।" এটিকে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান আস-সুদি, আল-আমাশ থেকে, তিনি আবূ সালেহ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন। এটি আস-সুদি আসগর, এবং তিনি বিশ্বাসযোগ্য নন, এবং এটি আল-আমাশের হাদীস নয়।

আবূ ইয়ালা আল-মাওসিলি তাঁর মুসনাদে মূসা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবূ বকর আল-হানাফি থেকে, তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে নাফি আমাদেরকে বর্ণনা করেন: আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান বলেন: আমি আল-হাসান ইবনে আলীকে বলতে শুনেছি: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিও না এবং আমার ঘরকে ঈদের স্থান বানিও না। আমার উপর দুরুদ পাঠ করো এবং সালাম পাঠাও, নিশ্চয়ই তোমাদের দোয়া ও সালাম আমার নিকট

পৌঁছে।"

সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর "সুনান"-এ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর বারবার যিয়ারত করতে দেখেন। তিনি তাকে বললেন: "হে ব্যক্তি! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আমার কবরকে ঈদের স্থান বানিয়ো না, যেখানে থাকো সেখান থেকেই আমার উপর দুরুদ পাঠ করো, কেননা তা আমাকে পৌঁছায়।' সুতরাং তুমি এবং আন্দালুসে থাকা এক ব্যক্তি— উভয়েই আমার নিকট দোয়ার ক্ষেত্রে সমান।"

এই অর্থটি আলী ইবনে আল-হুসাইন জয়নুল আবিদীন তাঁর পিতা থেকে, তিনি আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসি আল-হাফিয এটি তাঁর "মুখতারাহ"-এ উল্লেখ করেছেন, যা আল-হাকিমের "সহীহ" থেকে অধিক বিশুদ্ধ।

কাযী ইয়ায বলেন: আল-হাসান ইবনে আলী বলেন: "যখন তোমরা প্রবেশ করো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাও, কেননা তিনি বলেছেন: 'আমার ঘরকে ঈদের স্থান বানিও না এবং তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিও না। যেখানেই থাকো, আমার উপর দুরুদ পাঠ করো, নিশ্চয়ই তা আমাকে পৌঁছে।'"

মালিকের নাম যুক্ত এই গল্পকে আরও দুর্বল করে দেয় যে, তাতে এসেছে: "তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাও, কেননা তিনি তোমার ও তোমার পিতা আদমের কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ওসীলা।" এটা সত্য যে, কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশের মাধ্যমে মানুষ ওসীলা গ্রহণ করবে, যেমন বহু সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তবে দুনিয়ায় তাঁর কবরের নিকট ওসীলা নেওয়া যদি বৈধ হতো, তাহলে এটি সুন্নাহ হতো; অথচ তিনি তা আদেশ দেননি, সাহাবীগণ ও তাবেঈন তা করেননি, কোনো ইমাম তা সুপারিশ করেননি— মালিকও না, অন্য কেউও না। সুতরাং এমন কথা ইমাম মালিক বলেছেন— এটা কেবল একজন অজ্ঞ ব্যক্তি বলতে পারে, যিনি শরয়ি দলীল জানেন না এবং শরিয়তের বিধানগুলো বুঝেন না।

আর যখন বলা হয়: "তাঁর মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করো, তাহলে আল্লাহ তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করবেন", তখন

ভাষাগতভাবে এর অর্থ হয়— তাঁর নিকট সুপারিশ চাওয়া, যেমন কিয়ামতের দিন তাঁকে বলা হবে সুপারিশ করতে, কিংবা জীবদশায় সাহাবীগণ যেমন তাঁর নিকট দোয়া চাইতেন। কিন্তু ভাষা ও শরিয়তের দিক থেকে এর সঠিক রূপ হলো: "তিনি কারো জন্য সুপারিশ করলেন এবং তাঁর সুপারিশ কবুল হলো।" কারণ, তিনি সুপারিশকারী, তাঁর সুপারিশ কবুল হবে— অনুরোধকারী নয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ! আমার সুপারিশ কবুল করো।" অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করতেন— অন্যদের নয়। অতএব, এমন কথা যে বলবে: "তাঁর মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করো এবং আল্লাহ তোমার সুপারিশ কবুল করবেন", সে রাসুল ও সাহাবীদের ভাষা বুঝে না। কেননা, 'তুমি' তো সুপারিশকারী নও, বরং সুপারিশ চাইছ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেই ব্যক্তি, যাঁর সুপারিশ কবুল হয়।

আরও বলা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁর কবরের নিকটে গিয়ে তাঁর সুপারিশ, দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা মুসলিমদের কোনো ইমামের মতে শরীয়াহ্‌র বিধান নয়। চার ইমামের কেউ এবং তাঁদের প্রাথমিক অনুসারীদের কেউ এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি। বরং কিছু পরবর্তী আলেম কেবল এটি উল্লেখ করেছেন—তাঁরা আল-'উত্বী নামক ব্যক্তির একটি কাহিনি বর্ণনা করেন, যাতে বলা হয়, তিনি এক বেদুইনকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের পাশে এসে একটি আয়াত পাঠ করতে দেখেন এবং পরে স্বপ্নে দেখেন যে, আল্লাহ তাকে (বেদুইনকে) ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ কোনো অনুসৃত মাযহাবের মুজতাহিদ, যাঁদের মতামত দ্বারা ফাতওয়া দেওয়া হয়, এ বিষয়ে কিছু বলেননি। যাঁরাও বলেছেন, তাঁরা শরীয়াহ্‌র কোনো দলিল উল্লেখ করেননি। এটি জানা কথা যে, যদি তাঁর কবরের নিকটে গিয়ে তাঁর দোআ, সুপারিশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়াহ্‌র বিধান হতো, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের অনুগামী উত্তম তাবিঈগণ একথা ভালোভাবে জানতেন এবং অন্যদের আগেই তা করতেন। এবং মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ তা উল্লেখ করতেন। ইমাম মালিকের এই কথাটি কত চমৎকার: "এই উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্মকে শুধুমাত্র তাই সংশোধন করতে পারবে, যা তার প্রাথমিক প্রজন্মকে সংশোধন করেছিল।" তিনি আরও বলেন: "এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম এবং প্রাথমিক যুগ থেকে আমার কাছে এটি পৌঁছেনি যে, তারা এরূপ করত।" তাহলে, কিভাবে এমন একজন ইমাম এমন একটি ইবাদত নির্ধারণ করতে পারেন, যা সালাফ থেকে বর্ণিত হয়নি, এবং উম্মাহকে আদেশ দিতে পারেন যে, তারা রাসুল ও নেককার ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের কবরের নিকটে গিয়ে তাদের থেকে দোআ, সুপারিশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করুক—যখন এমনটি উম্মাহর সালাফ কেউই করেননি?

তবে এই বর্ণনার বাক্যরীতি সাধারণ লোকদের বাক্যরীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা ‘সুপারিশ’ শব্দটি ‘তাওয়াসসুল’ অর্থে ব্যবহার করে। তাদের একজন বলে: “হে আল্লাহ! আমরা অমুক ও তমুকের মাধ্যমে তোমার কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করছি”, অর্থাৎ, আমরা তার মাধ্যমে তোমার নিকট ওসিলা চাইছি। এবং তারা বলে, যে কেউ রাসুল বা অন্য কারও মাধ্যমে তার দোআয় ওসিলা করল: “সে অমুকের মাধ্যমে সুপারিশ করল”, যদিও যার মাধ্যমে সুপারিশ করা হলো সে তার জন্য দোআ করেনি বা সুপারিশ করেনি। বরং সে হয়তো উপস্থিতই নেই, তার কথা শোনেনি, এমনকি জানেও না যে, কেউ তার কাছে কিছু চেয়েছে। এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর, তাঁর সাহাবাগণের বা উম্মাহর আলেমদের ভাষা নয়; বরং আরবদের ভাষাও নয়। কেননা, ইস্তিশফা অর্থ হলো সুপারিশ চাওয়া। সুপারিশকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে চাহেতার সহায়তা করে, চাহেতা যেটি চায় তা প্রার্থিতের নিকট থেকে চায়। আর যে ব্যক্তি এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে সুপারিশ চায়, যে তার হয়ে কোনো সুপারিশ করেনি, তার প্রয়োজন চায়নি, এমনকি তার অনুরোধের কথা জানেও না—এটি ভাষাগত অর্থে বা জ্ঞানীদের ভাষায় কোনোভাবেই ইস্তিশফা নয়। হ্যাঁ, এটি তার মাধ্যমে প্রার্থনা বা দোআ করা, তবে এটি তার দ্বারা সুপারিশ চাওয়া নয়। কিন্তু যেহেতু এই লোকেরা ভাষা পরিবর্তন করে দিয়েছে—যেমন তারা শরীয়াহ্ও বিকৃত করেছে—এবং তারা এই কাজকে ‘ইস্তিশফা’ বলতে শুরু করেছে, অর্থাৎ, সুপারিশকারী দ্বারা প্রার্থনা করা, তারা বলতে লাগল: "তার দ্বারা সুপারিশ করো, আল্লাহ তোমার সুপারিশ কবুল করবেন", অর্থাৎ, তার মাধ্যমে করা অনুরোধ আল্লাহ কবুল করবেন। এতে বোঝা যায়, এই গল্পটি একজন শরীয়াহ্ ও ভাষাজ্ঞানহীন ব্যক্তি গঠন করেছে এবং এর বাক্যরীতি ইমাম মালিকের ভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়। হ্যাঁ, এর মূলে সত্য থাকতে পারে, এবং ইমাম মালিক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ করেছেন, যেমন ‘উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলাকে নিষেধ করতেন। এবং মালিক সম্মান ও শ্রদ্ধার যে আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন, তার অনুসরণে অনুরূপ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকবেন, যা মালিকের মতো ব্যক্তির পক্ষেই শোভনীয়।

যে ব্যক্তি সাহাবাগণের ভাষা জানে না, যেটা দিয়ে তারা একে অপরের সাথে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সম্বোধন করতেন, এবং তাদের কথাবার্তার রীতি না জানে, সে অবশ্যই শব্দের অর্থ বিকৃত করে ফেলবে। কারণ বহু মানুষ তাদের জাতি ও সমাজের পরিভাষা ও রীতিতে বড় হয়, তারপর তারা এসব শব্দ আল্লাহ, রাসুল, বা সাহাবাগণের কথায় দেখে, এবং তারা মনে করে, আল্লাহ, রাসুল, বা সাহাবাগণ ওই শব্দ দ্বারা তাদের (নিজদের) মতোই অর্থ বুঝিয়েছেন; অথচ প্রকৃত অর্থ ভিন্ন। এ ধরণের বিভ্রান্তি বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে দেখা যায়—বাদশাহী, ফকীহ, ব্যাকরণবিদ, সাধারণ জনগণসহ আরও অনেকের মধ্যে।

অন্যদের মধ্যে কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নবী ও তাঁদের অনুসারীদের শব্দকে এমন অর্থে ব্যবহার করে, যা তাদের (প্রকৃত) অর্থের পরিপন্থী। তারপর তারা সেই শব্দগুলো উচ্চারণ করে, নিজেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে, এবং বলে: "আমরা নবীদের কথার সাথে একমত।" এমনটি অনেক নাস্তিক, দার্শনিক, ইসমাঈলিয়াহ এবং তাদের অনুরূপ নাস্তিক কালামবিদ ও সুফিদের মধ্যে পাওয়া যায়। এর উদাহরণ হলো, যারা 'নব সৃষ্টি', 'সৃষ্টি করা', এবং 'গঠন করা' অর্থ দেয় এমন কিছুকে এমন জিনিস বলে, যা তাদের মতে 'সর্বদা অস্তিত্বশীল'—এবং একে বলে 'আসল সৃষ্টিজনিত'। তারপর তারা বলে: "আমরা বলি যে, জগত সৃষ্টি", কিন্তু এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরই সংজ্ঞা বোঝায়। অথচ এটা জানা কথা যে, 'মুহদাস' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, যা আগে ছিল না পরে এসেছে। একইভাবে তারা 'ফেরেশতা' বলতে বোঝায় বুদ্ধি, আত্মা এবং আত্মার শক্তিসমূহ। এবং 'জিন' ও 'শয়তান' বোঝায় আত্মার কোনো কোনো শক্তি। তারপর তারা বলে: "আমরা নবীদের তথ্য ও জনগণের স্বীকৃতির ভিত্তিতে ফেরেশতা, জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করি।"

যে ব্যক্তি নবীদের উদ্দেশ্যকৃত অর্থ এবং দার্শনিকদের অর্থ জানে, সে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে বুঝবে যে, এ দুটি এক নয়। যেমন, তারা 'প্রথম বুদ্ধি' বলতে বোঝায়—এটি সর্বদা ও স্থায়ীভাবে আল্লাহর সঙ্গে ছিল, এবং এটি ছাড়া আর যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছে, অথবা এর মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। এবং তাদের মতে 'সক্রিয় বুদ্ধি' হলো যা চাঁদের নিচের সবকিছুর উৎস। কেউ যখন নবীদের দ্বীন থেকে জানে, তখন নিশ্চিতভাবে সে জানবে—এমন কোনো ফেরেশতা নেই, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর রব, কিংবা চাঁদের নিচের সকল কিছুরও রব, অথবা এমন কেউ নেই, যার অস্তিত্ব শুরু থেকেই ছিল এবং থাকবে। এবং সে জানবে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে: "আল্লাহ প্রথমে 'আক্ল' সৃষ্টি করেছেন", এটি জাল। আর যদি এটি সত্যও হতো, তবে তা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতো। কেননা, এতে এসেছে: "আল্লাহ প্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হলো 'আক্ল'। তিনি তাকে বললেন, 'এসো', সে এল; আবার বললেন, 'ফিরে যাও', সে ফিরে গেল।" এরপর তিনি বললেন: "আমার মহিমার কসম! আমি তোমার চেয়ে সম্মানিত কিছু সৃষ্টি করিনি। তোমার দ্বারা আমি গ্রহণ করি, তোমার দ্বারা আমি দান করি, তোমার জন্য রয়েছে পুরস্কার, তোমার উপর রয়েছে শাস্তি।" অপর বর্ণনায় আছে: "যখন আল্লাহ 'আক্ল' সৃষ্টি করলেন..." অর্থাৎ, 'আক্ল' সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে তিনি তাকে সম্বোধন করলেন। অর্থাৎ, 'আক্ল' অন্য সকল কিছুর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল, এবং এই চারটি বিষয় তার দ্বারা সম্পাদিত হয়, সব সৃষ্টি নয়। আর মুসলিমদের ভাষায় 'আক্ল' হলো 'আকালা-ইয়াআকিলু-আকলান' ক্রিয়া থেকে নির্গত একটি মাসদার, যার অর্থ হলো, যে বোধশক্তির মাধ্যমে মানুষ বুঝে, এবং সে উপলব্ধি ও কর্ম যা এর দ্বারা উৎপন্ন হয়। এটি কোনো ভাষায় এমন এক অস্তিত্বশীল বস্তু

বোঝায় না, যা নিজের অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমরা অন্যত্র প্রমাণ করেছি, যে তারা যেসব বিমূর্ত সত্তা ও বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি সম্পর্কে বলে, তা যুক্তির দৃষ্টিতে বাতিল। শেষ পর্যন্ত তাদের বক্তব্য এমন এক আত্মার স্বীকৃতিতে পৌঁছে, যা মৃত্যুর পর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং আত্মার ধারণ করা বিমূর্ত বিষয়গুলোকে স্বীকার করে, যেগুলো তার মধ্যে অবস্থান করে। এই পরিমাণ সত্যই কেবল তারা স্বীকার করে।

মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বহু কথা এমন লোকেরা বলে, যারা দার্শনিকদের পথ অনুসরণ করে, এবং তারা সেই কথা থেকে দার্শনিকদের মানে বুঝায়, রাসুলের মানে নয়। এটি আল-গাজালীর নামে যে "আল-কুতুব আল-মাদনূন বিহা" গ্রন্থ আছে, তার লেখকের বর্ণনায় দেখা যায়। যেমন তিনি 'লাওহে মাহফূজ'কে আকাশী আত্মা মনে করেছেন, 'কলম'কে প্রথম বুদ্ধি বলেছেন, এবং 'মালাকূত', 'জাবারূত' ও 'মুল্ক' শব্দগুলোকে আত্মা ও বুদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন। আর 'সুপারিশ' শব্দকে এমন এক উৎসের প্রবাহ বলেছেন, যা সুপারিশকারী থেকে প্রার্থনাকারীর দিকে প্রবাহিত হয়—এমনকি যদি সুপারিশকারী জানেও না। তিনি এসব বিষয়ে ইবনে সীনা-র পথ অনুসরণ করেছেন।

মূল উদ্দেশ্য হলো, ভাষার প্রতি না খেয়াল করেই তারা এসব করে। যেমন 'কাদীম' শব্দ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআনের ভাষায় এটি নতুনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত, যদিও এটি অন্য কিছুর পরে আসতে পারে। যেমন: "এটি পুরনো বাঁকা খেজুর গাছের ডাল হয়ে ফিরে আসে" (ইয়াসীন: ৩৯), অথবা "তোমরা তো সেই পুরনো ভুলেই আছো" (ইউসুফ: ৯৫), অথবা "তোমরা এবং তোমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা যাদের এবাদত করো" (আশ-শু'আরা: ৭৫-৭৬)। অথচ কালামবিদদের মতে, এটি এমন কিছুকে বোঝায়, যার অস্তিত্ব চিরকাল ছিল, অথবা যা কখনো ছিল না, এমন নয়। তারা এই ব্যবহারে ইস্তিআরা বা রূপক মনে করে। আর 'মুহদাস' শব্দ কুরআনের ভাষায় 'কাদীম'-এর বিপরীত।

একইভাবে, 'কালিমাহ' শব্দটি কুরআন, হাদীস এবং আরবী ভাষায় পূর্ণ বাক্য বোঝায়। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "দুইটি বাক্য যা দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রিয়, জিহ্বায় হালকা, পাল্লায় ভারী: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম।" আবার বলেন: "কবিরা যা বলেছে তার মধ্যে সবচেয়ে সত্য বাক্য হলো লাবীদের উক্তি: 'আল্লাহ ছাড়া সবই মিথ্যা।'" অনুরূপভাবে: "তারা মুখ দিয়ে যা বলে তা কত

ভয়াবহ বাক্য! তারা তো মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না" (আল-কাহফ: ৫), অথবা: "আসো, এক বাক্যের দিকে..." (আলে ইমরান: ৬৪), অথবা: "কাফিরদের বাক্য নিচে নামিয়ে দিলেন, আর আল্লাহর বাক্য সর্বোচ্চ" (আত-তাওবাহ: ৪০)। আরবী ভাষায় 'কালাম' শব্দ কেবল এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যাকরণবিদরা একক নাম, ক্রিয়া বা হরফকে 'কালিমাহ' বলেন। কেউ কেউ বলেন: কখনো 'কালিমাহ' দ্বারা 'কালাম' বোঝায়। এর ফলে কেউ ভুল করে মনে করে এটিই আরবদের ভাষা।

একইভাবে 'উলুল কারাবাত' শব্দ কুরআন ও সুন্নাহতে বাবা-মা উভয়ের দিক থেকে সম্পর্কিত আত্মীয়দের বোঝায়—যারা ওয়ারিস হন বা না হন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরবর্তীতে ফকীহদের পরিভাষায় এটি বিশেষভাবে ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়দের বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে। যে শুধু এই পরিভাষা জানে, সে মনে করতে পারে, কুরআন, রাসুল এবং সাহাবার কথায় এর মানেও তাই। এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে।

'তাওয়াসসুল', 'ইস্তিশফা' ইত্যাদি শব্দগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাগণের ভাষা থেকে এতটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, ধর্ম ও ভাষায় ভুল করা লোকেরা এদের কারণে ভুল করেছে।

জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন সহীহ রেওয়ায়াত এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধি। সালাফ ও আলেমদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা বুঝতে হলে যেমন তার সূত্রের সত্যতা জানতে হয়, তেমনি তার অর্থও বুঝতে হয়; যেমনটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথার ক্ষেত্রেও হয়। এই কাহিনির সাথে সম্পর্কিত বিষয় ছিল এতটুকুই।

কিতাব ও সুন্নাহর পাঠসমূহ একে অপরকে সমর্থন করে যে, আল্লাহ আমাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাত প্রেরণ ও সালাম পাঠাতে আদেশ করেছেন সর্বত্র, আর এ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে। তদ্রূপ, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে আল্লাহ আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন ও তাগিদ দিয়েছেন যেন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা ও ফদীলাহ প্রার্থনা করি এবং যেন তিনি তাঁকে সেই প্রশংসিত মাকাম (মাকাম মাহমুদ)-এ পুনরুত্থিত করেন, যার প্রতিশ্রুতি তিনি তাঁকে দিয়েছেন। এই ওসীলা, যার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বিধিবদ্ধ, যেমনভাবে আমরা তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠাতে বিধিবদ্ধ—এটি তাঁর হক, যেমনভাবে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠানোও তাঁর হক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

যে ওসীলা আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দিকে খোঁজার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটি হলো তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে

আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া। এর অন্তর্ভুক্ত হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা কিছু আদেশ করেছেন তার সবকিছু। এই ওসীলা অর্জনের একমাত্র উপায় হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর আনুগত্য করা। এই অর্থে তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক।

তাঁর দু'আ ও শাফা'আতের মাধ্যমে তাওয়াসসুল—যেমন কিয়ামতের দিনে মানুষ তাঁর নিকট শাফা'আতের অনুরোধ করবে, এবং যেমন সাহাবিরা তাঁর শাফা'আতের মাধ্যমে ইসতিস্কা ও অন্যান্য বিষয়ে তাওয়াসসুল করতেন, যেমন অন্ধ ব্যক্তি তাঁর দু'আর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করে, যার ফলে আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন—এটি তাওয়াসসুলের তৃতীয় ধরণ। এটি সেই শ্রেণিভুক্ত, যেখানে আল্লাহ তাঁর মর্যাদার কারণে তাঁর দু'আ ও শাফা'আত কবুল করেন। অতএব, যাঁর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফা'আত করেন ও দু'আ করেন, তিনি তাঁর তুলনায় ভিন্ন, যাঁর জন্য তিনি কিছুই করেননি।

কিন্তু কিছু মানুষ মনে করেছে সাহাবিরা তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা মানে হলো তারা তাঁর নামে শপথ করতেন ও তাঁকে মাধ্যম বানিয়ে চাইতেন। তাই তারা ধারণা করে বসেছে যে, এটি সকলের জন্য সব অবস্থায় শরীআতে বৈধ—তাঁর জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরও। তারা মনে করেছে এটি নবী, ফেরেশতা, এমনকি সৎব্যক্তি ও যাঁদের সৎ মনে করা হয় তাদের সম্পর্কেও বৈধ—এমনকি যদি তারা বাস্তবে সৎ না-ও হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে কোনো হাদীস মুসলিমদের নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলনসমূহে নেই—না সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে, না সুনান গ্রন্থসমূহে, না নির্ভরযোগ্য মুসনাদসমূহে যেমন ইমাম আহমদের মুসনাদ ও অনুরূপ। এটি কেবল এমনসব গ্রন্থে পাওয়া যায়, যা মিথ্যা, জাল হাদীসে পরিপূর্ণ, যেগুলো মিথ্যাবাদীরা উদ্ভাবন করেছে—যদিও কেউ কেউ ভুল করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেননি।

এই দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাকারীদের হাদীস সুনান ও ইমাম আহমদের মুসনাদে পাওয়া যায়, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলাদের থেকে ইমাম আহমদ কিছুই বর্ণনা করেননি। এজন্যই হাফিজ আবু আল-আলা আল-হামাযানী ও শায়খ আবু আল-ফারাজ ইবনুল জাওযী এই বিষয়ে বিতর্ক করেন—মুসনাদে কি কোনো জাল হাদীস আছে কি না। হাফিজ আবু আল-আলা বলেন, মুসনাদে কোনো জাল হাদীস নেই, আর আবু আল-ফারাজ বলেন, এতে কিছু মিথ্যা হাদীস রয়েছে এবং তিনি প্রমাণসহ দেখিয়েছেন যে সেগুলো মিথ্যা।

এই দুই মতের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, ‘জাল’ শব্দের অর্থ আবু আল-ফারাজের পরিভাষায় এমন হাদীস যার মিথ্যা প্রমাণিত, যদিও বর্ণনাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেননি বরং ভুল করেছেন। এজন্যই তিনি তাঁর জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে এধরনের অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। অনেক আলিম তাঁর এই মতের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেন, এসব হাদীস মিথ্যা বলে প্রমাণিত নয়; বরং কিছু হাদীসের সহীহতা প্রমাণ করেছেন।

তবে তাঁর গ্রন্থ "আল-মাওদু‘আত"-এ যা কিছু রয়েছে তার অধিকাংশই আলেমদের ইজমা অনুযায়ী মিথ্যা। আর হাফিজ আবু আল-আলা এবং তাঁর মতো অন্যরা যখন ‘জাল’ বলেন, তখন এর দ্বারা বোঝান সেই হাদীস যা উদ্ভাবিত, গঠিত, এবং যার রাবী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেছে। সালাফদের যুগে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার খুবই বিরল ছিল।

সাহাবাদের মধ্যে—আলহামদুলিল্লাহ—এমন কাউকে জানা যায় না, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করেছেন। তেমনি তাঁদের মধ্যে কাউকে জানা যায় না, যিনি খারেজি, রাফেজি, কাদরিয়া, মুরজিয়া—এই বিদআতী ফিরকাগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এসব গোষ্ঠী তাঁদের মধ্যে পরিচিত ছিল না। তাঁদের মধ্যে কেউ এমনও ছিলেন না, যিনি বলতেন যে, আল-খিযর তাঁর নিকট এসেছেন। কারণ মূসা আলাইহিস সালামের খিযর ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেমনটি অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনেক মানুষ যাঁকে খিযর বলে মনে করে, তিনি আসলে একজন জিন, যিনি মানুষের রূপ ধারণ করেছেন, অথবা একজন মিথ্যাবাদী মানুষ। একজন ফেরেশতা 'আমি খিযর' বলার দাবী করে মিথ্যা বলবে না, কারণ ফেরেশতারা মিথ্যা বলেন না; বরং কেবল জিন ও মানুষই মিথ্যা বলে। আমি এমন ঘটনা জানি যেখানে খিযর হিসেবে একজন জিন উপস্থিত হয়েছিল, তবে তা এখানে বর্ণনা করলে দীর্ঘ হয়ে যাবে। সাহাবারা এতটাই বিজ্ঞ ছিলেন যে, এধরনের ধোঁকায় তারা পড়তেন না। তেমনি তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন না, যাঁকে জিনেরা মক্কায় নিয়ে গিয়েছে এবং তাঁকে আরাফাতে হাজির করেছে, যেমনটি তারা অনেক অজ্ঞ লোক, সাধক ইত্যাদির সঙ্গে করেছে। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন না, যাঁর জন্য জিনেরা মানুষের মালামাল বা খাদ্য চুরি করে এনে দিত, এবং তা একটি কারামত বলে প্রতীয়মান হতো—যেমনটি অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাবেঈনদের মধ্যে মক্কা, মদিনা, শাম ও বসরার লোকদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার জানা যায় না। তবে শিয়াদের মধ্যে মিথ্যাচার ব্যাপকভাবে পরিচিত। মিথ্যাচার পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে বিভিন্ন দল-মতের মধ্যে

দেখা যায়।

কিন্তু ভুল করাকে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সাহাবাদের মধ্যেও কেউ কেউ মাঝে মাঝে ভুল করেছেন, যেমন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও। এজন্যই 'সহীহ' হিসেবে রচিত হাদীস গ্রন্থসমূহে কিছু হাদীস আছে, যেগুলোকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও সহীহাইনের অধিকাংশ হাদীস নির্ভুল। হাফিজ আবু আল-আলা এসব ভুল চিনতেন, এবং ইমাম আহমদ নিজেই তা ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি এসব হাদীস সংরক্ষণ করেছেন যেন তা পরিচিত হয়, মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের হাদীসের মতো নয়।

এজন্যই আহমদ তাঁর মুসনাদে সেসব বর্ণনাকারীদের হাদীস পরিহার করেছেন, যাদের থেকে সুনান সংকলকেরা হাদীস গ্রহণ করেছেন, যেমন: কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আওফ আল-মুযানী—যিনি তাঁর পিতা থেকে, আর পিতা দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন। যদিও আবু দাউদ এটি তাঁর সুনানে সংকলন করেছেন, আহমদের মুসনাদের মানদণ্ড আবু দাউদের সুনান থেকে উন্নততর।

মূল কথা হলো: এই ধরনের বর্ণনাগুলি সেইসব অস্বাভাবিক, প্রত্যাখ্যাত, বরং জাল হাদীসের মতোই, যেগুলো এমনসব লোকের দ্বারা বর্ণিত যারা ফাযায়েল ও গুণাবলি সংক্রান্ত গ্রন্থে মূল্যবান ও অমূল্য উভয় ধরনের হাদীস একত্র করেছেন। সময়, ইবাদত, নবী, সাহাবী, স্থান ইত্যাদির ফযীলত সম্পর্কিত অধ্যায়গুলোতে সহীহ, হাসান, দুর্বল ও জাল হাদীস সকলই পাওয়া যায়। শরীআতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করা বৈধ নয়, যদি তা সহীহ বা হাসান না হয়। তবে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল এবং অন্যান্য উলামাগণ কিছু আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে এমন হাদীস বর্ণনা করাকে বৈধ বলেছেন, যা মিথ্যা বলে প্রমাণিত নয়। কারণ, যদি কোনো আমল শরীআতপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, এবং তার ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়, যার মিথ্যা হওয়া জানা যায় না, তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে উক্ত প্রতিদান সত্য। কোনো ইমাম বলেননি যে, দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে কিছু ফরয বা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা যায়। যে তা বলে, সে ইজমার বিরোধিতা করে। যেমনভাবে, শরীআতপ্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু হারাম করা যায় না।

তবে যদি কোনো কিছু নিষিদ্ধ হওয়া জানা যায়, এবং এ সম্পর্কে কোনো হাদীস আসে যাতে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, এবং সেটি মিথ্যা প্রমাণিত না হয়, তাহলে সেটি বর্ণনা করা বৈধ। সুতরাং উৎসাহ প্রদান ও

সতর্কীকরণমূলক বিষয়ে এমন হাদীস বর্ণনা করা বৈধ যা মিথ্যা নয়, তবে শুধু সেসব বিষয়ে, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ অন্য প্রমাণ দ্বারা উৎসাহ বা সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এটি ইস্রাঈলীয়াতের মতো—এগুলো থেকে যা মিথ্যা নয়, তা উৎসাহ ও সতর্কতা প্রদানের জন্য বর্ণনা করা বৈধ, যদি তা আমাদের শরীআতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে কেবল ইস্রাঈলীয়াতের উপর ভিত্তি করে কোনো শরীআত প্রণয়ন করা বৈধ নয়। এমনটি কোনো আলিম বলেননি, না আহমদ ইবনু হাম্বল, না তাঁর মতো অন্যান্য ইমাম।

যারা ইমাম আহমদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এমন দুর্বল হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন যা সহীহ বা হাসান নয়, তারা তাঁর সম্পর্কে ভুল করেছেন।

তবে ইমাম আহমদ এবং পূর্ববর্তী উলামাদের সাধারণ ব্যবহার ছিল, হাদীসকে দুই ভাগে বিভক্ত করা: সহীহ ও দুর্বল। দুর্বল হাদীস আবার দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল: এক ধরনের দুর্বল হাদীস যা পরিত্যাজ্য, দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়; আরেকটি দুর্বল হাদীস যা গ্রহণযোগ্য। যেমন, একজন রোগীর দুর্বলতা কখনো গুরুতর হয়, যা মূলধন দানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, আবার কখনো তা সামান্য হয়, যা বাধা সৃষ্টি করে না।

প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—সহীহ, হাসান ও দুর্বল—তিনি হলেন আবু ঈসা আত-তিরমিযী তাঁর "জামি'" গ্রন্থে। তাঁর মতে হাসান হাদীস এমন, যার একাধিক সনদ রয়েছে, যার সনদে কোনো অভিযুক্ত রাবী নেই এবং যা শায নয়। এই ধরনের হাদীস ও তার অনুরূপগুলোকে আহমদ দুর্বল বলে অভিহিত করতেন, তবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

এজন্যই আহমদ কিছু দুর্বল হাদীস উদাহরণ হিসেবে দিয়েছেন যা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, যেমন: আমর ইবনু শু'আইবের হাদীস, ইব্রাহীম আল-হাজারীর হাদীস এবং অনুরূপ। এটি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ—অর্থাৎ সৃষ্টি জীবের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে চাওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস—দুর্বল, ভিত্তিহীন বরং জাল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের কোনো ইমামকে এই হাদিসগুলিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে কিংবা এদের উপর নির্ভর করতে দেখা যায়নি। যেমন: আবদুল মালিক ইবনে হারূন ইবনে আনতারাহ তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: "আবূ বকর আস-সিদ্দীক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন: 'আমি কুরআন শিখছি, কিন্তু তা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তুমি বলো: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই

তোমার নবী মুহাম্মাদের মাধ্যমে, তোমার বন্ধু ইব্রাহীমের মাধ্যমে, তোমার মুখাপেক্ষী মূসার মাধ্যমে, তোমার রূহ ও বাণী ঈসার মাধ্যমে, মূসার তাওরাত, ঈসার ইনজীল, দাউদের যবূর, মুহাম্মাদের ফুরকান, এবং তোমার প্রত্যেক ওহী ও ফয়সালার মাধ্যমে...' তারপর তিনি হাদিসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন। এ হাদিসটি রাযীন ইবনে মু'আবিয়াহ আল-'আবদারী তার 'জামি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এবং ইবনুল আসীর 'জামি' উল উসূল'-এ তা বর্ণনা করেছেন। তবে এই দু'জনেই তা মুসলিমদের কোনো প্রামাণ্য কিতাবে সংযুক্ত করেননি। তবে যারা রাত-দিনের আমল সম্পর্কিত গ্রন্থ সংকলন করেছেন, যেমন: ইবনুস সুন্নী এবং আবূ নু'আইম, তারাই এটি বর্ণনা করেছেন। এসব গ্রন্থে অনেক জাল হাদিস রয়েছে, যেগুলোর উপর শরী'আতের ক্ষেত্রে নির্ভর করা বৈধ নয়—এতে আলেমদের ঐক্যমত রয়েছে। শাইখ আসবাহানী তার 'ফাযায়িলুল আ'মাল' নামক গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন, যেখানে বহু মিথ্যা ও জাল হাদিস রয়েছে। আবূ মূসা আল-মাদীনি এটি যাইদ ইবনুল হুবাব থেকে আবদুল মালিক ইবনে হারূন ইবনে আনতারাহ থেকে বর্ণনা করেন এবং বলেন: 'এটি হাসান হাদিস', যদিও এটি মুরসাল। আবূ মূসা বলেন: 'মুহরিয ইবনে হিশাম এটি আবদুল মালিক থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি আস-সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল মালিক শক্তিশালী নয় এবং তিনি রায় শহরে ছিলেন। তবে তার পিতা ও দাদা বিশ্বাসযোগ্য।'

আমি (ইবনে তাইমিয়্যাহ) বলি: আবদুল মালিক ইবনে হারূন ইবনে আনতারাহ একজন সুপরিচিত মিথ্যাবাদী। ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন বলেন: 'সে মিথ্যাবাদী।' আস-সা'দী বলেন: 'একজন দজ্জাল, মিথ্যাবাদী।' আবূ হাতিম ইবনে হিব্বান বলেন: 'সে হাদিস বানিয়ে নেয়।' আন-নাসায়ী বলেন: 'পরিত্যক্ত।' আল-বুখারী বলেন: 'তার হাদিস প্রত্যাখ্যাত।' আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন: 'দুর্বল।' ইবনু 'আদী বলেন: 'তার এমন হাদিস রয়েছে যেগুলোর কোনো তাবি বা সমর্থনকারী নেই।' আদ-দারাকুতনী বলেন: 'সে এবং তার পিতা—দু'জনেই দুর্বল।' আল-হাকিম 'কিতাবুল মাদখাল'-এ বলেন: 'আবদুল মালিক ইবনে হারূন ইবনে আনতারাহ আশ-শাইবানী তার পিতা থেকে জাল হাদিস বর্ণনা করতেন।' আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী এটি 'আল-মাওদূ'আত' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাফিয আবূ মূসা যখন বলেন: 'এটি মুনকাতি (সংকুচিত/অব্যাহত)'—এর মানে হলো, বর্ণনাকারীরা বিশ্বাসযোগ্য হলেও সনদ বিচ্ছিন্ন। আবদুল মালিক এমন আরও হাদিস বর্ণনা করেছে যেগুলো এ প্রসঙ্গে উপযুক্ত মনে হয়—যেমন আহলে কিতাব তার মাধ্যমে বিজয় লাভের দো'আ করতো—যা পরে উল্লেখ করা হবে। কিন্তু সে ব্যাপারে মুফাসসির ও সীরাতকারগণের সাধারণ বর্ণনা এবং কুরআনের ইঙ্গিতাবলীর বিরোধিতা করে। এটি প্রমাণ করে যে, সে পরিত্যক্ত—হোক তা ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারের কারণে

কিংবা দুর্বল স্মৃতির কারণে। ফলে এটি স্পষ্ট হয় যে, না এই হাদিসে, না অপরটিতে কোনো দলীল নেই।

এর অনুরূপ আরেকটি হাদিস: আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত এবং উমরের উক্তি হিসেবেও এসেছে: "যখন আদম (আলাইহিস সালাম) ভুল করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মাদ-এর হক দিয়ে ক্ষমা চাই।' আল্লাহ বলেন: 'তুমি মুহাম্মাদকে কীভাবে জানলে?' তিনি বলেন: 'তুমি যখন আমাকে তোমার হাত দিয়ে সৃষ্টি করলে এবং তোমার রূহ থেকে আমার মাঝে ফুঁকল, আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম আরশের স্তম্ভে লেখা: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। তখন আমি জানলাম, তুমি তোমার নামের সাথে কাউকে যুক্ত করবে না, যতক্ষণ না সে তোমার নিকট সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়।' তখন তিনি বলেন: 'তুমি সত্য বলেছ, হে আদম! যদি মুহাম্মাদের জন্য না হতো, তবে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।'" এ হাদিসটি হাকিম তার 'মুস্তাদরাক'-এ বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম আল-'আউফী থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনে সালামাহ থেকে, তিনি আবদুর রহমান থেকে। হাকিম বলেন: 'এটাই আমি এ গ্রন্থে আবদুর রহমান সম্পর্কে প্রথম হাদিস বর্ণনা করেছি।' হাকিম বলেন: 'এটি সহীহ।' শাইখ আবূ বকর আল-আজুররী 'কিতাবুশ শরী'আহ' গ্রন্থে এটি 'উমর (রাযি.)-এর মাওকূফ হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবী মারইয়াম থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম থেকে। আল-আজুররী আরও একটি সূত্রে এটি বর্ণনা করেন: আবদুর রহমান ইবনে আবী যিনাদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, যেটি মাওকূফ। তিনি বলেন: হারূন ইবনে ইউসুফ আত-তাজির আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি আবূ মারওয়ান আল-'উসমানী থেকে, তিনি আবূ উসমান ইবনে খালিদ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবী যিনাদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, যিনি বলেন: "আল্লাহ যে বাক্য দ্বারা আদমের তওবা কবুল করেন, তা হলো: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মাদের হক দিয়ে তোমার উপর চাই।" আল্লাহ বলেন: "তুমি মুহাম্মাদ সম্পর্কে কী জানো?" তিনি বলেন: "হে রব! আমি মাথা উঠিয়ে দেখি তোমার আরশে লেখা: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। তখন আমি বুঝলাম তিনি তোমার সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি।"

আমি (ইবনে তাইমিয়্যাহ) বলি: হাকিমের এ হাদিস বর্ণনা তার দুর্বল দিকগুলোর অন্যতম; কেননা তিনি নিজেই 'কিতাবুল মাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহ মিনাস সাকীম' গ্রন্থে বলেন: আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম তার পিতা থেকে জাল হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা হাদিসের বিশেষজ্ঞদের নিকট গোপন নয়

যারা এতে চিন্তা করেন, এবং যার দায়ভার তার উপর বর্তায়।

আমি বলি: আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম সবার মতে দুর্বল; সে প্রচুর ভুল করে। আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূ যুর'আহ, আবূ হাতিম, আন-নাসায়ী, আদ-দারাকুতনী এবং অন্যান্যরা তাকে দুর্বল ঘোষণা করেছেন। আবূ হাতিম ইবনে হিব্বান বলেন: 'সে ভুলক্রমে বর্ণনা পরিবর্তন করত, যা তার মাঝে এত বেশি প্রচলিত হয়েছিল যে, সে মুরসালকে মারফূ করে দিত এবং মাওকূফকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকে সম্বন্ধ করত। এজন্য তাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।' হাকিম যখন এ ধরনের হাদিসকে সহীহ বলেন, এটি তার এমন ভুলগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর জন্য তাকে ইমামগণ সমালোচনা করেছেন। তারা বলেন: হাকিম এমন হাদিসকে সহীহ বলেন, যেগুলো মিথ্যা এবং বিশেষজ্ঞদের মতে জাল। যেমন: তিনি জুরায়ব ইবনে বারথমলীর হাদিসকে সহীহ বলেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, মাসীহের একজন উত্তরসূরি আসবেন; অথচ এটি সকল হাদিস বিশেষজ্ঞদের মতে মিথ্যা। যেমন আল-বায়হাকী, ইবনুল জাওযী প্রমুখ ব্যাখ্যা করেছেন। হাকিমের 'মুস্তাদরাক'-এ বহু হাদিস আছে, যেগুলো তিনি সহীহ বলেছেন, অথচ তা ইমামদের মতে জাল। এদের মধ্যে এমন হাদিসও আছে, যেগুলো মাওকূফ অথচ তিনি তা মারফূ করেছেন। এজন্য হাদিস বিশারদগণ কেবল হাকিমের সহীহ ঘোষণার উপর নির্ভর করেন না, যদিও তিনি যেগুলো সহীহ বলেছেন তার অধিকাংশই সহীহ।

তবে সহীহ ঘোষণাকারীদের মধ্যে হাকিম এমন এক রাবি, যিনি নির্ভরযোগ্য হলেও অনেক ভুল করেন, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ঠিকই থাকেন। যারা সহীহ ঘোষণা করেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাকিমের চেয়ে উচ্চতর; যেমন আবূ হাতিম ইবনে হিব্বান আল-বাসতীর সহীহ ঘোষণা হাকিমের তুলনায় উত্তম। তিরমিযী, দারাকুতনী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে মানদা প্রমুখের সহীহ ঘোষণা এ ক্ষেত্রেও অধিক নির্ভরযোগ্য। যদিও তারা কোনো কোনো হাদিসে ইখতিলাফ করেছেন, তবে তারা হাকিমের তুলনায় এ বিষয়ে অধিক নিখুঁত। এদের সহীহ ঘোষণা মুসলিমের সহীহ ঘোষণার সমপর্যায়ের নয়, আর মুসলিমের সহীহ ঘোষণা বুখারীর সমপর্যায়ের নয়। বরং বুখারীর গ্রন্থই এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। বুখারী হাদিস ও তার ত্রুটি সম্পর্কে আল্লাহর সৃষ্টি জগতে অন্যতম অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিরমিযী বলেন: তিনি বুখারীর চেয়ে বেশি ইলাল (ত্রুটি) সম্পর্কে জানে এমন কাউকে দেখেননি। এজন্য বুখারী যখন কোনো হাদিস বর্ণনা করতেন, যার সনদ বা শব্দে মতভেদ রয়েছে, তখন সে মতভেদও উল্লেখ করতেন, যাতে কেউ এ ধারণা না করে যে তিনি একমত অবস্থায় তা উল্লেখ করেছেন। এই কারণেই যারা বুখারীর সহীহ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন, তাদের তুলনায়

বুখারীর মত অধিক গ্রহণযোগ্য। অথচ মুসলিম ইবনুল হজ্জাজের বিষয়ে অনেক হাদিসে ইখতিলাফ রয়েছে, এবং সেসব ক্ষেত্রে বিরোধীদের মতই গ্রহণযোগ্য। যেমন: সূর্যগ্রহণের হাদিসে তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রুকু এবং চার রুকু সহকারে নামাজ আদায় করেছেন, আবার দু' রুকু সহকারেও করেছেন। কিন্তু সঠিক মত হলো, তিনি শুধু দু' রুকু সহকারে আদায় করেছিলেন এবং একবারই এ নামাজ আদায় করেছিলেন—যেদিন তার পুত্র ইব্রাহীম মারা যান। ইমাম শাফি'ঈ তা ব্যাখ্যা করেছেন, এবং এটি ইমাম বুখারী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতের অন্যতম। যারা তিন বা চার রুকুর হাদিস বর্ণনা করেছেন, তারাও বলেছেন, এটি সেই দিন আদায় করেছিলেন যেদিন ইব্রাহীম মারা যান। অথচ জানা যায়, ইব্রাহীম দুই দিন সূর্যগ্রহণে মারা যাননি, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি পুত্র ইব্রাহীমও ছিল না। যারা বলেছে, তিনি মাসের দশ তারিখে মারা যান—তারা মিথ্যা বলেছে। মুসলিম বর্ণনা করেছেন: "আল্লাহ মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে"—যা ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন, বুখারী প্রমুখ এ হাদিসের উপর আপত্তি করেছেন এবং বলেন, এটি ভুল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি নয়।

প্রমাণ তাদের পক্ষেই, কেননা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বশেষ সৃষ্টি করেছেন আদমকে, আর তিনি শুক্রবারে সৃষ্টি হন। অথচ ঐ হাদিসে সাত দিনের কথা বলা হয়েছে। এর চেয়ে সহীহ সনদে এসেছে যে, সৃষ্টি রবিবারে শুরু হয়েছে। একইভাবে মুসলিম বর্ণনা করেছেন: আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উম্মে হাবীবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং মু'আবিয়াহকে কুতুব বানানোর অনুরোধ করেন। হাদিস বিশেষজ্ঞদের একটি দল বলেন, এটি ভুল। তবে সহীহাইনের অধিকাংশ হাদিস ইমামগণের মধ্যে গৃহীত, এবং তারা সেগুলোকে নিশ্চিতভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বিস্তারিত আলোচনা অন্য স্থানে আসবে।

উপরোক্ত আদম (আলাইহিস সালাম)-সম্পর্কিত হাদীসটি একদল লেখক সূত্র ছাড়া উল্লেখ করেছেন, এর সঙ্গে অনুরূপ কিছু বর্ণনা এবং আরও কিছু অতিরিক্ত তথ্যও রয়েছে। যেমন আল-কাযী ইইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন: আবু মুহাম্মদ আল-মাক্কী, আবু আল-লায়স আস-সামরকন্দী এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, আদম (আলাইহিস সালাম) যখন অমান্যতা করলেন, তখন বললেন: "হে আল্লাহ! মুহাম্মদের মর্যাদার উসিলায় আমার গোনাহ মাফ করে দিন"—এবং বর্ণিত হয়েছে: "আমার তওবা কবুল করে নিন।" তখন আল্লাহ তাঁকে বললেন: "তুমি মুহাম্মদকে কোথা থেকে জানলে?" তিনি বললেন: "আমি জান্নাতের প্রতিটি স্থানে লিখিত দেখেছি— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'।" তিনি বললেন এবং বর্ণিত হয়েছে: "মুহাম্মাদ আমার বান্দা এবং আমার রাসুল।" "আমি বুঝে গেলাম, তিনিই আপনার সৃষ্টি সমূহের মধ্যে

সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি; ফলে আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

এধরনের বর্ণনাসমূহের উপর শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং তা দ্বীনের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়—মুসলিমদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী। কারণ এটি ইস্রাঈলিয়াত প্রকারভুক্ত, যার প্রামাণ্যতা প্রমাণিত নয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা ছাড়া। যদি এগুলো কা'ব আল-আহবার, ওাহব ইবনে মুনাব্বিহ ও তাঁদের মতো ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত হতো—যাঁরা সৃষ্টির সূচনা ও পূর্ববর্তী জাতির কিতাবি কাহিনী বর্ণনা করতেন—তাহলেও মুসলিমদের শরিয়াহর দলীল হিসাবে তা গ্রহণযোগ্য হতো না, মুসলিমদের সর্বসম্মত মতে। তাহলে কিভাবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যদি তা এমন ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয়, যে না কিতাবি লোক, না মুসলিমদের বিশ্বাসযোগ্য আলেম; বরং এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, যাকে মুসলিমগণ দুর্বল মনে করেন, যার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, এবং যিনি বর্ণনায় বিভ্রান্ত ছিলেন, যা প্রমাণ করে যে তিনি হাদীসটি সঠিকভাবে মুখস্থ করেননি? এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য মুসলিম আলেম থেকে এ ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায় না, যাঁর বর্ণনার উপর নির্ভর করা হয়। এটি কেবল ইসহাক ইবনে বিশরের মতো লোকদের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, যারা সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন।

যদি এ জাতীয় বর্ণনাগুলো নবীগণের মাধ্যমে প্রমাণিত হতো, তাহলে তা তাঁদের শরিয়াহ হিসেবে গণ্য হতো। সেই ক্ষেত্রে তা দলীল হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হতো, যদি পূর্ববর্তী জাতির শরিয়াহ আমাদের জন্যও শরিয়াহ হয় কিনা—এ বিষয়ে যে মতভেদ আছে। তবে ইমামগণের ও অধিকাংশ আলেমের মত হলো: পূর্ববর্তী শরিয়াহ আমাদের জন্যও প্রযোজ্য, যতক্ষণ না আমাদের শরিয়াহ তার বিপরীত কিছু নিয়ে এসেছে। তবে এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়, অথবা পূর্ববর্তী জাতি থেকে প্রসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়, এ ধরনের দুর্বল বা অবিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত কিছু দ্বারা নয়। কারণ শরিয়াহর দলীল হিসেবে কোনো মুসলিমের জন্য এ জাতীয় বর্ণনাকে গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এই প্রকারভুক্ত একটি হাদীস হচ্ছে, যা মূসা ইবনে আবদুর রহমান আস-সান'আনী, তাফসীরকারক, তাঁর সনদে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্বন্ধ করে বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি চাইবে যে আল্লাহ তাকে কুরআনের হিফজ ও বিভিন্ন জ্ঞানের হিফজ দান করুন, সে যেন এই দো'আটি পরিষ্কার পাত্রে বা কাচের ফলকে মধু, জাফরান ও বৃষ্টির পানি দিয়ে লিখে খালি পেটে পান করে। সে যেন তিন দিন রোযা রাখে এবং ইফতারও এটিই দিয়ে করে এবং নামায

শেষে এই দো'আ করে: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই কারণে যে, তুমি যাঁর কাছে প্রার্থিত, তাঁর মত কেউ প্রার্থিত হয়নি এবং হবেও না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, মুহাম্মদ তোমার নবী, ইবরাহীম তোমার খলীল, মূসা তোমার কালীম, 'ঈসা তোমার রূহ, বাক্য ও সম্মানিতজন—এইসবের উসিলায়...'।" এরপর বাকি দো'আ উল্লেখ করেন।

এই মূসা ইবনে আবদুর রহমান ছিলেন একজন মিথ্যাবাদী। আবু আহমদ ইবনে আদী বলেছেন: "তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত।" আবু হাতিম ইবনে হিব্বান বলেন: "একজন দাজ্জাল, যিনি হাদীস জাল করতেন। তিনি 'আতা থেকে ইবনে আব্বাস হয়ে ইবনে জুরাইজ-এর নামে একটি তাফসীর রচনা করেছেন, যা আল-কালবী ও মোকাতিলের বক্তব্য থেকে সাজানো।"

এর অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা (রোযা ছাড়াই) ইবনে মাস'উদ থেকে এসেছে, যার সনদ মূসা ইবনে ইব্রাহীম আল-মারওয়াযীর মাধ্যমে: ওয়াকী' আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, উবাইদাহ, শাকীক, ইবনে মাস'উদ থেকে। এই মূসা ইবনে ইব্রাহীম সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন বলেন: "মিথ্যাবাদী।" আদ-দারাকুতনী বলেন: "পরিত্যাজ্য।" ইবনে হিব্বান বলেন: "তিনি অসতর্ক ছিলেন, প্ররোচিত হলে প্ররোচণায় সাড়া দিতেন, তাই পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্য।"

এই অনুরূপ একটি বর্ণনা উমর ইবনে আবদুল আজীজ থেকে মুজাহিদ ইবনে জাবির, তারপর ইবনে মাস'উদ পর্যন্ত এসেছে, যার সনদ আগেরটির চেয়েও দুর্বল। আবু আশ-শাইখ আল-আসবাহানী এটি আহমাদ ইবনে ইসহাক আল-জাওহারীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন: আবু আল-আশআস, যুহাইর ইবনে আল-আলা' আল -উত্বী, ইউসুফ ইবনে ইয়াযীদ, তারপর ইমাম যুহরী থেকে মারফূ হিসেবে বর্ণিত—যিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি হিফজ করতে চায়, সে যেন সাত দিন রোযা রাখে, এবং সপ্তম দিন ইফতারে এই দো'আ দ্বারা ইফতার করে।"

আমি (ইবনে তাইমিয়্যাহ) বলি: এগুলোর সনদ দুর্বোধ্য এবং এর দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। আবু মূসা আল-মাদীনী তাঁর 'আমালী'তে এটি বর্ণনা করেছেন এবং আবু আবদিল্লাহ আল-মাকদিসীও বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মতো বর্ণনাকারীদের রীতিমত—যাঁরা এ জাতীয় সকল বর্ণনা বর্ণনা করেন, তা সহীহ হোক বা দুর্বল, যেমনটা অধিকাংশ পরবর্তী হাদীস বিশারদদের রীতি হয়েছে: তাঁরা যেকোনো বিষয় সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত আছে, সব কিছুই বর্ণনা করেন, এবং তার দায়ভার চাপান বর্ণনাকারীর উপর। এটি সেই সব হাদীস সংকলকদের

সাধারণ রীতি, যারা সময়, স্থান, ব্যক্তি ও ইবাদতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস সংকলন করেছেন।

যেমন আবু আশ-শাইখ আল-আসবাহানী 'ফাযায়িলুল আমাল'-এ, যিনি প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে বহু সহীহ, হাসান, দুর্বল, জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস মিশ্রিত। তেমনিভাবে খাইসামাহ ইবনে সুলায়মান ‘ফাযায়িলুস সাহাবা’য়, এবং আবু নু‘আইম আল-আসবাহানী 'ফাযায়িলুল খুলাফা'-তে এবং 'হিলয়াতুল আওলিয়া'র শুরুতে যা বর্ণনা করেছেন, এবং আবু লায়স আস-সামরকন্দী, আব্দুল আজীজ আল-কিনানী, আবু আলী ইবনে আল-বান্না এবং অনুরূপ অন্যান্য শাইখগণ, এবং আবু বকর আল-খতীব, আবু আল-ফযল ইবনে নাসির, আবু মূসা আল-মাদীনী, আবু আল-কাসিম ইবনে আসাকির, হাফিয আব্দুল গনী এবং তাঁদের মতো হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেন। তাঁরা তাঁদের সংকলনে যেসব কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুই উল্লেখ করেন যাতে বিষয় সম্পর্কিত হাদীসসমূহ জানা যায়—না যে তা সবকিছু শরিয়াহর দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

তাঁদের কেউ কেউ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন, যেমন: “অস্বাভাবিক”, “প্রত্যাখ্যাত”, “দুর্বল”, অথবা মন্তব্য না -ও করতে পারেন। এটা হাদীসের ইমামদের মতো নয়, যারা হাদীসের উপর শরিয়াহর বিধান নির্ভর করান, যেমন: ইমাম মালিক ইবনে আনাস, শুআ‘বাহ ইবনে আল-হজ্জাজ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, সুফিয়ান ইবনে উয়নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ওয়াকী‘ ইবনে আল-জাররাহ, আশ-শাফিই, আহমাদ ইবনে হানবাল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আলী ইবনে আল-মাদিনী, আল-বুখারী, আবু যুর‘আহ, আবু হাতিম, আবু দাউদ, মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াযী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে আল-মুন্দির, দাউদ ইবনে আলী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী প্রমুখ।

এঁরাই হলেন সেইসব ইমাম যাঁরা হাদীসের উপর বিধান নির্ভর করান এবং সহীহ ও দুর্বল হাদীস পার্থক্য করতে এবং রাবিদের যাচাই করতে সচেষ্ট থাকেন। তেমনিভাবে যাঁরা হাদীস ও রাবিদের নিয়ে সমালোচনা করেছেন যাতে হাদীস সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা যায়—যেমন আবু আহমাদ ইবনে আদী, আবু হাতিম আল-বুসতী, আবু আল-হাসান আদ-দারাকুতনী, আবু বকর আল-ইসমাঈলী, এবং যাঁরা সম্ভবত করেছেন—যেমন আবু বকর আল-বাইহাকী, আবু ইসমাঈল আল-আনসারী, আবু আল-কাসিম আয-যানজানী, আবু উমর ইবনে আব্দুল বার, আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম ও তাঁদের সমগোত্রীয়রা।

এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র রয়েছে। আমরা তাঁদের কথা উল্লেখ করিনি, যারা কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেন—যেমন 'ওসীলাতুল মুতা'আব্বিদীন' গ্রন্থের রচয়িতা উমর আল-মুল্লা আল-মাওসিলী এবং 'আল-ফিরদাউস' এর রচয়িতা শহরইয়ার আদ-দায়লামী ও তাঁদের মতো অন্যান্যরা। কারণ এঁরা পূর্বোক্ত পর্যায়েরও নিচে এবং তাঁদের বর্ণিত মিথ্যাগুলো গুরুতর।

মূল কথা এই যে: এই বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্বন্ধ করে বর্ণিত একটি হাদীসও শরিয়াহর দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়—তাঁর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন আলেমদের সর্বসম্মত মতে। বরং এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, হাদীস বিশারদগণ জানেন, তা হয় মনগড়া রচনা, নয়তো ভুলের ফলে উদ্ভূত বর্ণনা। এই বিষয়ে সালাফ থেকে কিছু বর্ণনা আছে, যার অধিকাংশই দুর্বল।

তাদের মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে চার ব্যক্তির, যারা কাবার প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন; তারা হলেন—আব্দুল্লাহ ও মুসআব, যুবায়রের পুত্রদ্বয়, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর এবং আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান। ইবনু আবী দুনইয়া তাঁর "মুজাবী আদ-দু'আ" গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন এবং ইসমাঈল ইবনু আবান আল-গানাওয়ীর সূত্রে সুফিয়ান আস-সাওরী, তিনি তারিক ইবনু আবদুল আজীজ, তিনি আশ-শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: "আমি এক আশ্চর্য বিষয় দেখেছি। আমরা কাবার আঙিনায় ছিলাম—আমি, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আয-যুবায়র, মুসআব ইবনু আয-যুবায়র এবং আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান। তারা আলোচনা শেষ করার পর একে অপরকে বলল: 'তোমাদের প্রত্যেকে দাঁড়াও, ইয়ামানী কোণ আঁকড়ে ধরো এবং আল্লাহর নিকট নিজের প্রয়োজনে দোয়া করো; তিনি তা প্রাচুর্যে দান করবেন।' অতঃপর তারা বলল: 'ওহে আব্দুল্লাহ ইবনু আয-যুবায়র, তুমি দাঁড়াও; কারণ হিজরতের পর ইসলামে জন্মগ্রহণকারী তুমি প্রথম।' তিনি দাঁড়ালেন, ইয়ামানী কোণ আঁকড়ে ধরলেন এবং বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি মহান, প্রতিটি মহান বিষয়ে আপনারই আশায় থাকে; আমি আপনার মুখমণ্ডলের পবিত্রতা, আপনার আরশের পবিত্রতা এবং আপনার নবীর পবিত্রতার ওসীলায় আপনার নিকট দোয়া করছি, যেন আপনি আমাকে এই দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করাবেন না যতক্ষণ না আপনি আমাকে হিজাযের শাসন দান করেন এবং আমাকে খেলাফতের অভ্যর্থনা জানানো হয়।' এরপর তিনি ফিরে বসে পড়লেন।

এরপর মুসআব দাঁড়ালেন, ইয়ামানী কোণ আঁকড়ে ধরলেন এবং বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি সকল কিছুর রব, এবং সকল কিছু আপনারই নিকট ফিরে যায়। আমি আপনার সেই ক্ষমতার ওসীলায় আপনার নিকট দোয়া করছি যা দ্বারা আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, যেন আপনি আমাকে এই দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করাবেন না যতক্ষণ না আপনি আমাকে ইরাকের শাসন দান করেন এবং আমাকে সুকাইনা বিনতে আল-

হুসাইনকে বিয়ে করান।' এরপর আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান দাঁড়ালেন, ইয়ামানী কোণ আঁকড়ে ধরলেন এবং বললেন: 'হে আল্লাহ! সাত আকাশের রব এবং সেই পৃথিবীর রব যা বন্ধ্যাত্বের পর উদ্ভিদ জন্মায়, আমি আপনার সেই দোয়ার মাধ্যমে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যা আপনার অনুগত বান্দারা আপনাকে করে থাকে, এবং আমি আপনার সৃষ্টির উপর আপনার হক্ক এবং যারা আপনার আরশের তাওয়াফ করে তাদের হকের ওসীলায় প্রার্থনা করছি...'—শেষ পর্যন্ত।

আমি (ইবনু তাইমিয়্যাহ) বলি: ইসমাঈল ইবনু আবান, যিনি এই রেওয়ায়েতটি সুফিয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একজন মিথ্যাবাদী। আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন: "আমি তার থেকে লিখেছিলাম, তারপর সে জাল হাদীস বর্ণনা করতে লাগল, ফলে আমরা তাকে পরিত্যাগ করি।" ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বলেছেন: "সে আল-মামুনকে বোঝাতে আল-আব্বাসের সপ্তম বংশধরের সবুজ পোশাক পরিধানের বিষয়ে একটি জাল হাদীস গড়ে তোলে।" বুখারী, মুসলিম, আবূ জুরআহ এবং আদ-দারাকুতনী বলেন: "পরিত্যক্ত।" আল-জুজাজানী বলেন: "তার মিথ্যাচার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।" আবূ হাতিম বলেন: "মিথ্যাবাদী।" ইবনু হিব্বান বলেন: "সে বিশ্বাসযোগ্য রাবীদের উপর মিথ্যাচার করে।"

তারিক ইবনু আবদুল আজীজ, যাকে আস-সাওরী হতে বর্ণনা করা হয়েছে, অজ্ঞাত। তিনি বলেন: "পরিচিত তারিক ইবনু আবদুল আজীজ, যার থেকে ইবনু 'আজলান বর্ণনা করেছেন, তিনি এই যুগের নন।"

এক ভিন্ন রেওয়ায়েতও আছে: আবূ নু'আইম এটি আত-তাবারানী থেকে বর্ণনা করেছেন: আহমাদ ইবনু যায়দ ইবনু আল-জারীশ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন: আবূ হাতিম আস-সিজিস্তানী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন: আল-আস্মাঈ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আব্দুর রহমান ইবনু আবী যিনাদ আমাদেরকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুসআব, উরওয়াহ এবং আব্দুল্লাহ—যুযুবায়রের তিন পুত্র এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উমর হিজর (কাবার অভ্যন্তরের অংশ) এ একত্রিত হয়েছিলেন। তারা বলল: 'ইচ্ছা প্রকাশ করো।' আব্দুল্লাহ ইবনু যুযুবায়র বললেন: 'আমার ইচ্ছা খেলাফতের।' উরওয়াহ বললেন: 'আমার ইচ্ছা যে জ্ঞান যেন আমার থেকে গৃহীত হয়।' মুসআব বললেন: 'আমার ইচ্ছা ইরাকের শাসন এবং আমি যেন 'আয়িশা বিনতে তলহা ও সুকাইনা বিনতে আল-হুসাইনকে বিয়ে করতে পারি।' আব্দুল্লাহ ইবনু উমর বললেন: 'আমার ইচ্ছা ক্ষমা।' তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তাদের সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে এবং হয়তো ইবনু উমরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

আমি বলি: এই সানাদটি পূর্বের সানাদের চেয়ে উত্তম, আলেমদের সর্বসম্মত মতানুসারে, এবং এতে সৃষ্টজিনিস দ্বারা ওসীলার উল্লেখ নেই।

এই প্রসঙ্গে কিছু লোকের স্বপ্ন দেখার কাহিনী আছে যেখানে তাদেরকে বলা হয়েছিল: "এমন ও এমন দোয়া করো।" এই ধরনের বিষয়সমূহ দলিল হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়, আলেমদের সর্বসম্মতিতে। এই ধরনের কিছু কাহিনী দোয়ার গ্রন্থকারগণ উল্লেখ করেছেন। একটি বর্ণনা সালাফ থেকে এসেছে, যেমনটি ইবনু আবী দুনইয়া তাঁর "মুজাবী আদ-দু'আ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ হাশিম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন: আমি কাসীর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর ইবনু রিফাআহ-কে বলতে শুনেছি: এক ব্যক্তি আব্দুল মালিক ইবনু সাঈদ ইবনু আবজারের নিকট এল। তিনি তার পেট পরীক্ষা করলেন এবং বললেন: "তোমার এক অসাধ্য রোগ হয়েছে।" সে জিজ্ঞাসা করল: "কোন রোগ?" তিনি বললেন: "দুবাইলা (অভ্যন্তরীণ ফোঁড়া)।" তখন লোকটি ফিরে গেল এবং বলল: "আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ আমার রব, আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার নবী মুহাম্মাদ, দয়ালু নবীর ওসীলায় ফিরে আসছি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার মাধ্যমে আপনার এবং আমার রবের নিকট ফিরে আসছি, যেন তিনি আমার উপর দয়া করেন এই রোগের বিষয়ে।" তিনি (আব্দুল মালিক) তার পেট আবার পরীক্ষা করলেন এবং বললেন: "তুমি আরোগ্য লাভ করেছো; তোমার কোন রোগ নেই।"

আমি বলি: এই দোয়া ও এজাতীয় দোয়াগুলো সালাফদের কেউ কেউ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনু হাম্বাল থেকে আল-মারওয়াযীর মানাসিক গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় দোয়ার অনুমতি বর্ণিত হয়েছে, যদিও অন্যরা এটিকে নিষিদ্ধ করেছেন। যদি ওসীলা গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য হয় তাঁর প্রতি ঈমান, ভালোবাসা, অনুগত্য ও আনুগত্যের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ, তাহলে উভয় দলের মাঝে কোন ইখতিলাফ নেই। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা ওসীলা, তবে সেটাই ইখতিলাফ পূর্ণ বিষয়। যে বিষয় নিয়ে ইখতিলাফ হয়, তা আল্লাহ ও রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটি শুধু এই কারণে যে, কোনো দোয়ার মাধ্যমে কারো উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে, এর দ্বারা শরিয়তে তার বৈধতা প্রমাণ হয় না। কারণ বহু লোক আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের নিকট দোয়া করে, যেমন নক্ষত্র, সৃষ্টজিনিস, এবং তাও তারা উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। কিছু লোক মূর্তি, গির্জা, ও অন্য জায়গায় গিয়ে দোয়া করে এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। কিছু লোক এমন দোয়া করে যা মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ, তবুও তারা উদ্দেশ্য অর্জন করে। কারো উদ্দেশ্য কোনো একটি মাধ্যমে পূর্ণ হওয়া মানেই সেই মাধ্যম বৈধ—এমনটি নয়, যদিও উদ্দেশ্য

বৈধ হয়। কারণ ঐ কার্যটিতে এমন ক্ষতি থাকতে পারে যা তার উপকারিতা ছাড়িয়ে যায়। শরিয়তের উদ্দেশ্য হল উপকারিতা অর্জন ও পরিপূর্ণ করা এবং ক্ষতি দূরীকরণ ও হ্রাস করা। অন্যথায়, সব নিষিদ্ধ বিষয়—শিরক, মদ্যপান, জুয়া, অশ্লীলতা, জুলুম—এসব কিছু তাদের কর্তা ব্যক্তিকে কিছু উপকার বা উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে; কিন্তু যেহেতু এসবের ক্ষতি উপকারের তুলনায় অধিক, তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন অনেক ইবাদত, জিহাদ, এবং সম্পদ ব্যয় করা—এসব কিছুতে ক্ষতি আছে, কিন্তু যেহেতু এতে উপকারিতা ক্ষতির চেয়ে বেশি, তাই শরিয়ত এগুলোকে আদেশ করেছে। এটি একটি মূলনীতি যা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। কোনো কিছুকে ফরজ বা সুন্নত বলা যাবে না, যতক্ষণ না শরিয়তের দলিল তা ফরজ বা সুন্নত হওয়ার জন্য প্রমাণ করে। ইবাদত শুধু ফরজ বা সুন্নত হতে পারে। যা ফরজ বা সুন্নত নয়, তা ইবাদত নয়।

দোয়া, যখন তা আল্লাহর নিকট হয় এবং বৈধ কিছু অর্জনের জন্য হয়, তখন তা ইবাদত। সারাংশ হলো, সালাফ ও কিছু আলেমদের কাছ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় দোয়া করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, তবে মৃত বা অনুপস্থিত নবী, ফেরেশতা ও নেককারদের নিকট দোয়া করা, তাদের সাহায্য চাওয়া, তাদের কাছে অভিযোগ করা—এটি এমন কিছু যা সাহাবাগণ ও তাদের অনুসরণকারীরা কখনো করেননি, এবং কোনো মুসলিম ইমামও এটিকে বৈধ বলেননি।

অন্ধ ব্যক্তির হাদীস, যা আত-তিরমিযী ও আন-নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, এটি দ্বিতীয় ধরণের তাওয়াস্সুলের অন্তর্ভুক্ত—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার মাধ্যমে তাওয়াস্সুল। কারণ, অন্ধ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে আল্লাহর নিকট দোআ করেন। তখন তিনি (রাসুল) তাঁকে বললেন: "তুমি চাইলে ধৈর্য ধরো, আর চাইলে আমি দোআ করব।" তিনি বললেন: "বরং আপনি তাঁর নিকট দোআ করুন।" অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অজু করতে, তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে, দুই রাকআত সালাত আদায় করতে এবং এ দোআ পড়তে আদেশ দেন:

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার নবীর মাধ্যমে প্রার্থনা করছি—করুণা বর্ষণকারী নবী। হে মুহাম্মাদ, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রভুর নিকট এই প্রয়োজনে ফিরে আসছি যেন তিনি তা পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ! তার সুপারিশ আমার জন্য কবুল করুন।"

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোআ ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াস্সুল। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোআ করেছিলেন। এজন্যই তিনি বলেন: "তার সুপারিশ আমার জন্য কবুল করুন।" তিনি আল্লাহর নিকট তাঁর রাসুলের সুপারিশ কবুল করার আবেদন করেছেন, যা মূলত তাঁর দোআ-ই।

আলেমগণ এই হাদীসকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা, তাঁর কবুলকৃত দোআ, এবং এমন অলৌকিক ঘটনা ও রোগ নিরাময়ের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর দোআর বরকতে সংঘটিত হয়েছে। কারণ, এই অন্ধ ব্যক্তির জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোআ করেছিলেন এবং আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এই হাদীস—অন্ধ ব্যক্তির হাদীস—পয়গম্বরত্বের প্রমাণ সংকলনে আল-বাইহাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। আল-বাইহাকী এটি ‘উসমান ইবনে ‘উমর থেকে, তিনি শু‘বাহ থেকে, তিনি আবু জা‘ফার আল-লাইথী থেকে, তিনি বলেন: আমি ‘উমারাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে সাবিতকে ‘উসমান ইবনে হুনাইফ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি:

"এক অন্ধ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল: ‘আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোআ করুন যাতে তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন।’ তিনি বললেন: ‘তুমি চাইলে আমি তা বিলম্বিত করব, আর এটা তোমার জন্য উত্তম; আর তুমি চাইলে আমি দোআ করব।’ সে বলল: ‘আপনি দোআ করুন।’ তখন তিনি তাকে অজু করতে, তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে, দুই রাকআত সালাত আদায় করতে এবং এই দোআ পড়তে বললেন:

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরে আসছি আপনার নবী মুহাম্মাদ—করুণা বর্ষণকারী নবীর মাধ্যমে। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রভুর নিকট এই প্রয়োজনে ফিরে আসছি যেন তিনি তা আমার জন্য পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ! তাঁর সুপারিশ আমার জন্য কবুল করুন এবং আমার পক্ষ থেকেও তাঁর জন্য সুপারিশ কবুল করুন।’

তিনি বলেন: সে দাঁড়াল এবং তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিল।"

এই সনদে আত-তিরমিযী হাদীসটি ‘উসমান ইবনে ‘উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। আন-নাসাঈ ও ইবনু

মাজাহও এটি থেকে বর্ণনা করেছেন। আত-তিরমিযী বলেন: "এই হাদীস হাসান সহীহ গরীব; আমরা এটি কেবল এই সনদে আবু জা'ফার থেকে জানি, আর তিনি আল-লাইথী নন।" এটিই আত-তিরমিযীতে বর্ণিত, তবে অন্যান্য আলেম বলেন—এখানে আবু জা'ফার হলেন আবু জা'ফার আল-খাতমী, এবং সেটাই সঠিক। আত-তিরমিযী ও তাঁর সঙ্গে অন্যরা এই হাদীসের পূর্ণ পাঠ উল্লেখ করেননি; বরং তাঁরা কেবল এই পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন: "হে আল্লাহ! তাঁর সুপারিশ আমার জন্য কবুল করুন।"

আত-তিরমিযী বলেন: মাহমূদ ইবনে গাইলান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, 'উসমান ইবনে 'উমর আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, শু'বাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু জা'ফার থেকে, তিনি 'উমারাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে সাবিত থেকে, তিনি 'উসমান ইবনে হুনাইফ থেকে:

"একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল: 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাকে আরোগ্য দেন।' তিনি বললেন: 'তুমি চাইলে ধৈর্য ধরো, আর এটা আখিরাতের জন্য উত্তম; আর চাইলে আমি তোমার জন্য দোআ করব।' সে বলল: 'না, বরং আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন।' তখন তিনি তাকে অজু করতে, দুই রাকআত সালাত আদায় করতে এবং এই দোআ পড়তে বললেন:

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরে আসছি আপনার নবী মুহাম্মাদ, করুণা বর্ষণকারী নবীর মাধ্যমে। হে মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহর নিকট আপনার মাধ্যমে ফিরে আসছি এই প্রয়োজনে, যাতে তা আমার জন্য পূর্ণ হয়, এবং আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন এবং আল্লাহ তা কবুল করুন।' তিনি বলেন: সে তা করল এবং সে আরোগ্য লাভ করল।"

আল-বাইহাকী এটিও বর্ণনা করেছেন শাবীব ইবনে সাঈদ আল-হাবাতী থেকে, তিনি রাওহ ইবনে আল-কাসিম থেকে, তিনি আবু জা'ফার আল-মাদানী থেকে—যিনি আল-খাতমী—তিনি আবু উমামাহ ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ থেকে, তিনি 'উসমান ইবনে হুনাইফ থেকে, যিনি বলেন:

"আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শুনেছি, যখন এক অন্ধ ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর কথা বলল। সে বলল: 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার কোনো পথপ্রদর্শক নেই এবং আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তুমি অজুর স্থানে যাও, অজু করো, তারপর দুই রাকআত সালাত আদায় করো, এরপর বলো:

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরে আসছি আপনার নবী, করুণা বর্ষণকারী নবীর মাধ্যমে। হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রভুর নিকট ফিরে আসছি যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। হে আল্লাহ! তাঁর সুপারিশ আমার জন্য কবুল করুন এবং আমার পক্ষ থেকেও নিজের জন্য সুপারিশ কবুল করুন।’

‘উসমান ইবনে হুনাইফ বলেন: আল্লাহর কসম! আমরা তখনও আলাদা হইনি, বরং কথাবার্তাও দীর্ঘ হয়নি—তার আগেই সে এমনভাবে আমাদের মাঝে প্রবেশ করল যেন তার কোনো অসুবিধাই ছিল না।"

শাবীব থেকে রাওহ, রাওহ থেকে আবু জা'ফার আল-লাইথীর বর্ণনা শু'বাহ ও হাম্মাদ ইবনে সালামাহর বর্ণনার সঙ্গে সনদ ও পাঠে ভিন্ন। কারণ, প্রথমটিতে আবু জা'ফার তা ‘উমারাহ ইবনে খুযাইমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আর এতে তিনি তা আবু উমামাহ ইবনে সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রথমটিতে বলা হয়েছে: "তার সুপারিশ আমার জন্য কবুল করুন এবং আমার পক্ষ থেকেও তার জন্য সুপারিশ কবুল করুন", আর এতে বলা হয়েছে: "আমার পক্ষ থেকেও নিজের জন্য সুপারিশ কবুল করুন।"

তবে এই সনদের আরেকটি সহীহ সমর্থন রয়েছে—হিশাম আদ-দাস্তওয়াই আবু জা'ফার থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-বাইহাকী এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে এমন একটি ঘটনা রয়েছে যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁর মাধ্যমে তাওয়াস্সুল করার দলিল হিসেবে কেউ পেশ করতে পারে—যদি তা সহীহ হয়।

তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনে শাবীব ইবনে সাঈদ আল-হাবাতী থেকে, তিনি শাবীব ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি রাওহ ইবনে আল-কাসিম থেকে, তিনি আবু জা'ফার আল-মাদানী থেকে, তিনি আবু উমামাহ ইবনে সাহল থেকে—এক ব্যক্তি ‘উসমান ইবনে ‘আফফানের দরবারে বারবার যাচ্ছিলেন একটি প্রয়োজনে, কিন্তু ‘উসমান তাঁর দিকে খেয়াল করতেন না এবং তাঁর প্রয়োজন বিবেচনায় নিতেন না। সেই ব্যক্তি ‘উসমান ইবনে হুনাইফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার অভিযোগ করেন। তখন ‘উসমান ইবনে হুনাইফ বলেন:

"তুমি অজুর স্থানে যাও, অজু করো, তারপর মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করো, এরপর বলো: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরে আসছি আমাদের নবী

মুহাম্মাদ—করুণা বর্ষণকারী নবীর মাধ্যমে। হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রভুর নিকট ফিরে আসছি যেন তিনি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করেন।' এরপর তোমার প্রয়োজন উল্লেখ করো। তারপর ফিরে এসো, আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

সে ব্যক্তি তা করল, এরপর 'উসমান ইবনে 'আফফানের দরবারে গেল। দারওয়ান তাকে নিয়ে গেল, তার হাত ধরে তাকে ভেতরে প্রবেশ করাল, তাকে নিজের পাশে বসাল এবং বলল: 'তোমার কী প্রয়োজন?' সে তার প্রয়োজন বলল, এবং 'উসমান তা পূর্ণ করলেন। পরে সে 'উসমান ইবনে হুনাইফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল: 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক! তিনি তো আমার কোনো প্রয়োজনে খেয়ালই করতেন না, আপনি তার সঙ্গে কথা বলার পর তিনি আমার ব্যাপারে মনোযোগী হলেন।' তখন 'উসমান ইবনে হুনাইফ বললেন: 'আমি তো তাঁর সঙ্গে কিছুই বলিনি, তবে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—যখন এক অন্ধ ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর কথা বলল, তখন রাসুল বললেন: 'তুমি কি ধৈর্য ধরবে?' সে বলল: 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার কোনো পথপ্রদর্শক নেই এবং এটি আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।' তখন তিনি বললেন: 'তুমি অজু করো, তারপর দুই রাকআত সালাত আদায় করো, এরপর বলো:

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরে আসছি আপনার নবী মুহাম্মাদ—করুণা বর্ষণকারী নবীর মাধ্যমে। হে মুহাম্মাদ! আমি আমার প্রভুর নিকট ফিরে আসছি যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। হে আল্লাহ! তাঁর সুপারিশ আমার জন্য কবুল করুন এবং আমার পক্ষ থেকেও নিজের জন্য সুপারিশ কবুল করুন।'

'উসমান ইবনে হুনাইফ বলেন: আল্লাহর কসম! আমরা তখনও পৃথক হইনি, বরং কথাবার্তাও দীর্ঘ হয়নি—তার আগেই সেই ব্যক্তি আমাদের মাঝে প্রবেশ করল যেন তার কোনো অসুবিধা ছিলই না।"

আল-বাইহাকী বলেন: আহমদ ইবনে শাবীব ইবনে সাঈদ এটি তাঁর পিতা থেকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি ইয়াকুব ইবনে সুফইয়ান থেকে, তিনি আহমদ ইবনে শাবীব ইবনে সাঈদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন: হিশাম আদ-দাস্তুওয়াইও এটি আবু জা'ফার থেকে, তিনি আবু উমামাহ ইবনে সাহল থেকে, তিনি তাঁর চাচা—যিনি 'উসমান ইবনে হুনাইফ—থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে এই রেওয়ায়েতে সনদের বিস্তারিত বর্ণনা করেননি।

আমি বলি: আন-নাসাঈ 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ' কিতাবে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: মু'আয ইবনে হিশাম হতে, তার পিতার সূত্রে, আবূ জা'ফার হতে, আবূ উমামাহ (ইবনে) সহল ইবনে হুনায়ফ

হতে, তাঁর চাচা উসমান ইবনে হুনায়ফ থেকে। তিনি শু'বাহ ও হাম্মাদ ইবনে সালামার সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, দুজনেই আবূ জা'ফার হতে 'উমারাহ ইবনে খুযাইমাহ থেকে। এদের কারো—না তিরমিযী, না আন-নাসাঈ, না ইবনে মাজাহ—এই অদ্ভুত সূত্রে, যাতে একটি অতিরিক্ত অংশ আছে, অর্থাৎ শাবীব ইবনে সাঈদ হতে রাওহ ইবনে আল-কাসিম পর্যন্ত, বর্ণনা করেননি।

তবে আল-হাকিম তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উভয় সূত্রেই এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উসমান ইবনে উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন: শু'বাহ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ জা'ফার আল-মাদানী বলেন: আমি 'উমারাহ ইবনে খুযাইমাহকে উসমান ইবনে হুনায়ফ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি: "একজন অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো এবং বলল: 'আল্লাহর কাছে দো'আ করুন যেন আমাকে আরোগ্য দেন।' তিনি বললেন: 'তুমি যদি চাও, আমি তা বিলম্বিত করব, এবং এটি তোমার জন্য উত্তম; আর যদি চাও, আমি দো'আ করব।' সে বলল: 'দো'আ করুন।' অতঃপর তিনি তাকে ওযূ করতে, উত্তমরূপে ওযূ করতে, দুই রাকআত সালাত আদায় করতে এবং এই দো'আটি করতে আদেশ দিলেন: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই এবং আপনার প্রতি আপনার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে ফিরে আসি। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের নিকট আমার এই প্রয়োজন নিয়ে আসলাম। হে আল্লাহ! তাঁর পক্ষ হতে আমার জন্য শাফা'আত কবুল করুন এবং আমার পক্ষ হতে তাঁর জন্য শাফা'আত কবুল করুন।'" আল-হাকিম বলেন: "এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ।" এরপর তিনি শাবীব ইবনে সাঈদ আল-হাবাটি ও আউন ইবনে উমারার সূত্রে রাওহ ইবনে আল-কাসিম থেকে, আবূ জা'ফার আল-লায়থী আল-মাদানী থেকে, আবূ উমামাহ (ইবনে) সহল ইবনে হুনায়ফ থেকে, তাঁর চাচা উসমান ইবনে হুনায়ফ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "একজন অন্ধ লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর বিষয়ে অভিযোগ করল এবং বলল: 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার কোনো পথপ্রদর্শক নেই এবং আমার উপর বিষয়টি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।' তিনি বললেন: 'ওযূ করার স্থানে যাও, ওযূ করো, এরপর দুই রাকআত সালাত আদায় করো, অতঃপর বলো: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই এবং আপনার প্রতি আপনার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে ফিরে আসি। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসেছি যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। হে আল্লাহ! তাঁর পক্ষ হতে আমার জন্য শাফা'আত কবুল করুন এবং আমার পক্ষ হতে আমার জন্য শাফা'আত কবুল করুন।'" উসমান বলেন: "আল্লাহর শপথ, আমরা এখনো বিদায় নিইনি, কথাবার্তাও দীর্ঘ হয়নি, এমন সময় লোকটি আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হল যেন সে কোনো দুঃখেই ভুগেনি।" আল-

হাকিম বলেন: “এই হাদীস বুখারীর শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ।”

এই শাবীব একজন সত্যবাদী ব্যক্তি; আল-বুখারী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে (ইবনে ‘আদী উল্লেখ করেছেন যে) ইবনে ওয়াহ্ব রাওহ ইবনে আল-ফারাজের মাধ্যমে তাঁর থেকে মওযু‘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং ধারণা করা হয় তিনি তাতে ভুল করেছেন। তবে বলা যেতে পারে, এরূপ সমালোচনা তখনই প্রযোজ্য যখন তিনি এমন কোনো হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেন, যা বিশ্বস্ত ও মজবুত হাফিযগণের বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, যেমন শু‘বাহ, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ ও হিশাম আদ-দাস্তুয়াই—যদি কোনো অতিরিক্ত অংশ বর্ণিত হয়, তাহলে সেটিকে তাঁর বিরুদ্ধে গণ্য করা হবে। বিশেষ করে যখন এই সূত্রে তিনি বলেছেন: ‘আমার জন্য তাঁর শাফা‘আত কবুল করুন এবং আমার জন্য আমার শাফা‘আত কবুল করুন।’ অথচ অপর সূত্রগুলোতে বলা হয়েছে: ‘আমার জন্য তাঁর শাফা‘আত কবুল করুন এবং তাঁর জন্য আমার শাফা‘আত কবুল করুন।’ তাঁর এই বক্তব্য ‘তাঁর জন্য আমার শাফা‘আত কবুল করুন’ অর্থ হল: (তাঁর দো‘আ ও আবেদন সম্পর্কিত) তাঁর দো‘আ সম্পর্কে আমার দো‘আ কবুল করুন, যা ‘আমার জন্য তাঁর শাফা‘আত কবুল করুন’ এই কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আবূ আহমাদ ইবনে ‘আদী তাঁর ‘আল-কামিল ফী আসমা আর-রিজাল’ নামক কিতাবে—যার অনুরূপ এই শাস্ত্রে আর কিছু নেই—বলেছেন: “শাবীব ইবনে সাঈদ আল-হাবাটি আবূ সাঈদ আল-বাসরী আত-তামীমী: ইবনে ওয়াহ্ব তাঁর থেকে মওযু‘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইউনুস হতে ইমাম যুহরীর ‘নুসখা’ (সংগ্রহ) বর্ণনা করেছেন, যেগুলো সহীহ হাদীস।” তিনি ‘আলী ইবনে আল-মাদানীর থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: “তিনি একজন বিশ্বাসযোগ্য বাসরী, ইউনুসের সঙ্গী। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিশরে যেতেন এবং একটি সহীহ কিতাব সঙ্গে আনতেন।” তিনি বলেন: “তাঁর পুত্র আহমাদ ইবনে শাবীব তা তাঁর থেকে লিখে রাখেন।” ইবনে ‘আদী রাওহ ইবনে আল-ফারাজের মাধ্যমে শাবীব থেকে ইবনে ওয়াহ্বের বর্ণনায় দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন: একটি ইবনে ‘আকীল হতে সাবিক ইবনে নাজিয়াহ থেকে, তিনি ইবনে সালাম হতে, যিনি বলেন: “এক ব্যক্তি আমাদের পাশে দিয়ে গেল, তারা বলল: এই ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিল।” দ্বিতীয়টি তাঁর থেকে, রাওহ ইবনে আল-ফারাজ থেকে, আবদুল্লাহ ইবনে আল-হুসাইন হতে, তাঁর মা ফাতিমা হতে, মসজিদে প্রবেশ করার হাদীস। ইবনে ‘আদী বলেন: “এই হাদীসে এভাবেই বলা হয়েছে: আবদুল্লাহ ইবনে আল-হুসাইন তাঁর মা ফাতিমা বিন্তুল হুসাইন হতে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা হতে।”

ইবনে ‘আদী বলেন: “শাবীব ইবনে সাঈদের কাছে যুহরীর নুসখা ছিল, যেটি ইউনুস হতে যুহরী হতে, এবং সেগুলো সহীহ হাদীস। ইবনে ওয়াহ্ব তাঁর থেকে মওযু‘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাওহ ইবনে আল-ফারাজের মাধ্যমে যে দুই হাদীস আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলো ইবনে ওয়াহ্ব শাবীব হতে বর্ণনা করেছেন। যখন শাবীব যুহরীর নুসখা তাঁর পুত্র আহমাদ ইবনে শাবীবের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তখন তিনি সেই শাবীব নন, যাঁর থেকে ইবনে ওয়াহ্ব ভুল হাদীস বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত শাবীব যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিশরে ছিলেন, তখন ইবনে ওয়াহ্ব তাঁর থেকে মুখস্থভাবে লিখে নেন, ফলে তিনি ভুল করেন। আমি আশা করি এই শাবীব ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেননি।”

আমি বলি: যে দুটি হাদীস ইবনে ‘আদী তাঁর থেকে অস্বীকার করেছেন, তা রাওহ ইবনে আল-কাসিমের সূত্রে ছিল। তেমনি অন্ধ ব্যক্তির হাদীসটিও তিনি রাওহ ইবনে আল-কাসিম হতে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসও তার সন্তানদের মতো করে নয়, বরং ইবনে ওয়াহ্ব এটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে শব্দগুলো যথাযথভাবে হেফাযত করেননি। এটিই ইবনে ‘আদীর বক্তব্যকে সমর্থন করে। ফলে প্রমাণিত হয়, এটি তাঁর (শাবীবের) থেকে হেফাযতকৃত। ইবনে ‘আদী ভুলের দায় তাঁর উপরই আরোপ করেছেন, ইবনে ওয়াহ্বের উপর নয়। তবে যদি ধরে নেওয়া হয়, শাবীব এই ক্ষেত্রে ভুল করেছেন, তাহলে এটি সম্ভব যে, তিনি রাওহ ইবনে আল-কাসিমের বর্ণনায়ও ভুল করেছেন। যদিও রাওহ ইবনে আল-কাসিম একজন বিশ্বস্ত, প্রসিদ্ধ রাবী; বড় হাদীসকারগণ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এজন্য তাঁকে ভুলের দায়ী করা হয়নি।

কোনো রাবী একজন শায়খের হাদীস সঠিকভাবে হেফাযত করতে পারেন, আর অন্যজনের থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করতে পারেন, যেমন: ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ হিজাযীদের বর্ণনায় ভুল করেন, অথচ শামীদের থেকে বর্ণনায় ঠিক থাকেন। আবার সুফিয়ান ইবনে হুসাইন যুহরী থেকে বর্ণনায় ভুল করেন। এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। অতএব এটি সম্ভব যে, এই শাবীব রাওহ ইবনে আল-কাসিমের থেকে বর্ণনায় ভুল করেছেন—যদি ইবনে ‘আদীর বক্তব্য সত্য হয়—এবং এটি গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

আত-তাবারানী তাঁর ‘আল-মু‘জাম’-এ এই হাদীসটি ইবনে ওয়াহ্ব থেকে শাবীব ইবনে সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আসবাগ ইবনে আল-ফারাজ থেকে: আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব আমাদেরকে শাবীব ইবনে সাঈদ আল-মাক্কী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাওহ ইবনে আল-কাসিম থেকে, আবূ জা‘ফার আল-

লায়থী আল-মাদানী থেকে, আবূ উমামাহ (ইবনে) সহল ইবনে হুনায়ফ থেকে, তাঁর চাচা উসমান ইবনে হুনায়ফ থেকে: "এক ব্যক্তি উসমান ইবনে 'আφφানের দরবারে বারবার তার প্রয়োজন নিয়ে আসতেন... [ঘটনার বর্ণনা পূর্বের মতো চলতে থাকে] ...যতক্ষণ না তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললে।" উসমান ইবনে হুনায়ফ বলেন: "আল্লাহর শপথ, আমি তাঁর সাথে কোনো কথা বলিনি, তবে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, একজন অন্ধ লোক তাঁর নিকট এসে দৃষ্টিশক্তি হারানোর অভিযোগ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: 'তুমি কি ধৈর্য ধারণ করবে?' সে বলল: 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার কোনো পথপ্রদর্শক নেই এবং বিষয়টি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'ওযূর স্থানে যাও, ওযূ করো, এরপর দুই রাকআত সালাত আদায় করো, অতঃপর এই শব্দগুলো দ্বারা দো'আ করো।'" উসমান ইবনে হুনায়ফ বলেন: "আল্লাহর শপথ, আমরা এখনো আলাদা হইনি, এমনকি কথাবার্তাও দীর্ঘ হয়নি, এমন সময় লোকটি আমাদের নিকট এমনভাবে এসে হাজির হল যেন সে কখনো দৃষ্টিশক্তি হারায়নি।" আত-তাবারানী বলেন: "শু'বাহ এই হাদীসটি আবূ জা'ফার হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর নাম 'উমায়র ইবনে ইয়াজীদ, এবং তিনি বিশ্বস্ত রাবী। উসমান ইবনে উমার শু'বাহ থেকে এই হাদীস বর্ণনায় একক ছিলেন।" আবূ 'আবদিল্লাহ আল-মাকদিসী বলেন: "এই হাদীস সহীহ।"

আমি বলি: আত-তাবারানী তাঁর জ্ঞানানুযায়ী এককতার কথা বলেছেন, কিন্তু রাওহ ইবনে উবাদাহর সূত্রে শু'বাহ থেকে বর্ণনাটি তাঁর নিকট পৌঁছেনি। এটি একটি সহীহ সনদ, যা প্রমাণ করে যে, উসমান ইবনে উমার এই হাদীস বর্ণনায় একক ছিলেন না। ইবনে ওয়াহ্বের সূত্র এই তথ্যকে সমর্থন করে যা ইবনে 'আদী বলেছেন, কারণ তিনি তাঁর দুই ছেলের মতো করে বর্ণনার শব্দগুলো যথাযথভাবে বলেননি। বরং তিনি সেখানে উল্লেখ করেন যে, অন্ধ ব্যক্তি সেই শব্দগুলো দ্বারা দো'আ করেছে যেগুলো উসমান ইবনে হুনায়ফ অপর ব্যক্তিকে শিখিয়েছিলেন, অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং অন্ধ ব্যক্তির হাদীসে বলা হয়েছে: 'হে আল্লাহ! তাঁর পক্ষ হতে আমার জন্য শাফা'আত কবুল করুন এবং আমার জন্য তাঁর পক্ষ হতে শাফা'আত কবুল করুন'—অথবা বলা হয়েছে—'আমার পক্ষ হতে আমার জন্য।' ইবনে ওয়াহ্ব তাঁর বর্ণনায় এটি উল্লেখ করেননি। তাই এটি খুবই সম্ভব যে, ইবনে ওয়াহ্ব মুখস্থ থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন ইবনে 'আদী বলেছেন, এবং বর্ণনাটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেননি।

আবূ বকর ইবনে আবী খাইসামাহ তাঁর 'তারীখ'-এ হাম্মাদ ইবনে সালামাহর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুসলিম ইবনে ইবরাহীম আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন: হাম্মাদ ইবনে সালামাহ

আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন: আবূ জা'ফার আল-খাতমী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন 'উমারাহ ইবনে খুযাইমাহ হতে, তিনি উসমান ইবনে হুনায়ফ থেকে: "একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল: 'আমার দৃষ্টিতে সমস্যা হয়েছে, অতএব আমার জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করুন।' তিনি বললেন: 'যাও, ওযূ করো, দুই রাকআত সালাত আদায় করো, অতঃপর বলো: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই এবং আপনার প্রতি ফিরে আসি আমার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের নিকট শাফা'আত কামনা করি যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার শাফা'আত কবুল করুন এবং আমার নবীর পক্ষ হতে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে শাফা'আত কবুল করুন। এবং যদি কারো প্রয়োজন হয়, তাহলে একই পদ্ধতি অনুসরণ করুক।' আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।" ইবনে আবী খাইসামাহ বলেন: "এবং এই আবূ জা'ফার—যাঁর থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন—তাঁর নাম 'উমায়র ইবনে ইয়াজীদ, এবং তিনিই সেই আবূ জা'ফার যাঁর থেকে শু'বাহ হাদীস বর্ণনা করেন।" এরপর তিনি উসমান ইবনে উমারের সূত্রে শু'বাহ থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি বলি: এই বর্ণনাপথে রয়েছে "আমার জন্য তাঁর শাফাআত কবুল করো" — যেমনটি রাওহ ইবনে আল-কাসিমের বর্ণনায় এসেছে — এবং এতে আরেকটি অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে, তা হলো: "যদি প্রয়োজন হয়, তবে এমন করো" — অথবা তিনি বলেছিলেন — তিনি এমন করেছিলেন। বলা যেতে পারে, এই অতিরিক্ত অংশ 'উসমান ইবনে হুনাইফের উক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তবে শুআ'বা ও রাওহ ইবনে আল-কাসিম, হাম্মাদ ইবনে সালামাহর চেয়ে অধিক হিফজশক্তিসম্পন্ন। বর্ণনাভেদ থেকে বোঝা যায়, এটি হয়তো অর্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উক্তি "যদি প্রয়োজন হয়, তিনি এমন করেছিলেন" হতে পারে 'উসমানের বাণী, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়; কেননা এখানে বলা হয়নি "যদি তোমার প্রয়োজন হয়, তুমি এমন করো", বরং বলা হয়েছে "যদি প্রয়োজন হয়, তিনি এমন করেছিলেন"। সারকথা, যদি এই অতিরিক্ত অংশ প্রমাণিত হয়ও, তবু এতে দলিল নেই। এর চরমতর ইঙ্গিত এটুকু যে, 'উসমান ইবনে হুনাইফ হয়তো মনে করেছিলেন, এই দোয়া আংশিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে পূর্ণরূপে না হলেও; কেননা তিনি (হজরত উসমান রাযি.) যিনি খলিফার নিকট সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন, তাকে পূর্ণ শরয়ি দোয়া বলেননি, বরং কেবল তার একাংশ বলেছেন। এবং তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরও এটি শরয়ি রয়েছে। অথচ হাদীসের শব্দ তার বিরোধিতা করে, কেননা হাদীসে অন্ধ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং দোয়াতে তাঁকে বলতে আদেশ দিয়েছিলেন: "হে আল্লাহ, তাঁর শাফাআত আমার জন্য কবুল করো"। এই দোয়া একমাত্র তখনই বলা যায়, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করছেন ও শাফাআত করছেন; যে কারো জন্য এমনটি না হলে, সে ব্যক্তি এ দোয়া করতে পারে না। এই দোয়া উপযুক্ত তার শাফাআত ও দোয়ার সঙ্গে, যা তিনি দুনিয়াতে জীবিত অবস্থায় মানুষের জন্য করতেন এবং কিয়ামতের দিনও করবেন।

এতে রয়েছে এই বাক্য: "এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য শাফাআত কবুল করো"। অর্থ এই নয় যে, অন্ধ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো প্রয়োজনে তাঁর জন্য শাফাআত করছে; যদিও আমাদেরকে তাঁর প্রতি সালাম ও দোয়া পাঠাতে এবং আল-ওসীলাহ চাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীতে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আজান শোনার সময় বলে: 'হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বানের এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব, মুহাম্মাদকে ওসীলাহ এবং ফযীলত দান করো, এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত অবস্থানে পৌঁছাও, যা তুমি তাঁকে ওয়াদা করেছো' — কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত হালাল হবে।"

এবং সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা মুয়াযিজনকে শোনো, তার মতো বলো, তারপর আমার প্রতি দুরুদ পাঠাও; কেননা যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দুরুদ পাঠায়, আল্লাহ তার প্রতি দশবার দুরুদ পাঠান। এরপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য আল-ওসীলাহ চাও, কেননা তা জান্নাতে এমন এক মর্যাদা, যা কেবল আল্লাহর এক বান্দার উপযোগী; এবং আমি আশা করি আমিই সে হবো। যে ব্যক্তি আমার জন্য আল-ওসীলাহ চায়, তার জন্য আমার শাফাআত হালাল হবে।"

উম্মাহর পক্ষ থেকে   ওসীলাহ চাওয়া হলো তাঁর জন্য দোয়া করা, এবং এটিই শাফাআতের প্রকৃত অর্থ। এজন্য প্রতিদান কর্ম অনুযায়ী: যে ব্যক্তি তাঁর উপর দুরুদ পাঠায়, আল্লাহ তার উপর দুরুদ পাঠান; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য আল-ওসীলাহ চায় (যা তাঁর শাফাআত অন্তর্ভুক্ত), রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য শাফাআত করেন। অনুরূপভাবে, অন্ধ ব্যক্তি তাঁর শাফাআত চেয়েছিল, তাই তিনি তাকে এই শাফাআত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতে বলেছিলেন—এটি শাফাআতের জন্য শাফাআতের দোয়া স্বরূপ। এজন্য তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহ, তাঁর শাফাআত আমার জন্য কবুল করো

এবং আমার শাফাআত তাঁর জন্য কবুল করো।" কেননা এমন ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া কবুল হওয়া তাঁর রবের নিকট মর্যাদার দলীল। এজন্যই এটি তাঁর নিদর্শন ও নবুওতের প্রমাণ গণ্য হয়েছে। এটি কিয়ামতের দিনের তাঁর শাফাআতের মতো।

এজন্য তিনি দোয়া প্রার্থীকে বলেছিলেন: "তাঁর শাফাআত আমার জন্য কবুল করো এবং আমার শাফাআত তাঁর জন্য কবুল করো", কিন্তু বলেননি: "আমার নিজের জন্য আমার শাফাআত কবুল করো" — কেননা এ শব্দ কোনো অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি, শুধু এই অদ্ভুত সূত্রেই এসেছে। তাঁর এই উক্তি "আমার শাফাআত তাঁর জন্য কবুল করো" শুআ'বা থেকে দুইজন প্রসিদ্ধ রাবী বর্ণনা করেছেন: উসমান ইবনে উমর এবং রাওহ ইবনে উবাদাহ। শুআ'বা হলেন এ হাদীসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। উসমান ইবনে উমর থেকে শুআ'বার মাধ্যমে এ হাদীস তিনজন বর্ণনা করেছেন: তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ। তিরমিযী তা বর্ণনা করেছেন মাহমুদ ইবনে গাইলান থেকে, যিনি উসমান ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ তা বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে সাইয়ার থেকে, যিনি উসমান ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। আহমদ তা মুসনাদে বর্ণনা করেছেন রাওহ ইবনে উবাদাহ থেকে, যিনি শুআ'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, তারা হাদীসের শব্দ বেশি সংরক্ষণ করেছেন।

আর যদি বলা হয়: "আমার নিজের জন্য আমার শাফাআত কবুল করো", এবং এটা সহীহ হয়, তবে তা সেই অর্থে যে, তিনি নিজেই তাঁর নিজের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার সাথে শাফাআত চেয়েছেন। যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া না করতেন, তবে তিনি হতেন কেবল একজন দোয়াকারী, আর দশজন দোয়াকারীর মতো। এরূপ কিছুকে শাফাআত বলা হয় না; শাফাআত তখনই হয়, যখন দুইজন একসাথে কিছু চায় এবং একজন অপরজনের জন্য সুপারিশ করে। একক প্রার্থনাকারী যার জন্য কেউ সুপারিশ করে না, তা শাফাআত নয়।

সুতরাং এই অতিরিক্ত অংশ ('উসমান ইবনে হুনাইফের কাহিনী) বিভিন্ন দিক থেকে দুর্বলতা রাখে: যেমন, এই বর্ণনায় শাবীব একাই তা বর্ণনা করেছেন, যা শ্রেষ্ঠ ও অধিক হিফজশক্তিসম্পন্ন রাবীদের বিরোধী; সুন্নাহ সংকলনকারীরা তা বর্জন করেছেন; এতে শব্দগত বিভ্রান্তি রয়েছে; এবং এই রাবী রাওহ ইবনে আল-কাসিম থেকে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে পরিচিত। এসব কারণে এতে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। অতএব, এতে কোনো দলিল নেই; বরং দলিল গ্রহণযোগ্য তখনই, যখন সাহাবী যা বর্ণনা করেছেন, তা দিয়ে

বুঝা যায় তাদের উপলব্ধি—যদি তারা যে অর্থ বুঝেছেন, তার বিপরীত অর্থ বর্ণনার শব্দে প্রকাশিত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এটি স্পষ্ট যে, যদি কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর বলেন: "হে আল্লাহ, তাঁর শাফাআত আমার জন্য কবুল করো এবং আমার শাফাআত তাঁর জন্য কবুল করো", অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করেননি, তবে এটি ফাঁপা কথা হবে। আরও স্পষ্ট যে, 'উসমান ইবনে হুনাইফ তাকে বলেননি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু চাইতে, কিংবা "তাঁর শাফাআত আমার জন্য কবুল করো" বলতে। তিনি পূর্ণরূপে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া শেখাননি, কেবল একাংশ বলেছেন। এবং সেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো শাফাআতই হয়নি, এমনকি শাফাআতের কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। যদি কেউ মৃত্যুর পর বলেন: "তাঁর শাফাআত কবুল করো", তবে তা অর্থহীন হবে—এজন্যই 'উসমান তা বলেননি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে দোয়া বর্ণিত হয়েছে, তা এখানে বলা হয়নি; এবং যা বলা হয়েছে, তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়। এরূপ কিছুর দ্বারা শরয়ি বিধান প্রমাণ হয় না, যেমন সাহাবীগণ থেকে এককভাবে ইবাদত, অনুমোদন, নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিষয় বর্ণিত হলে—যদি অপর কোনো সাহাবী তা অনুমোদন না করে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা প্রমাণিত, তা এর বিরোধী হয়—তবে তা সুন্নাহ হবে না যা অনুসরণযোগ্য। বরং, তার সর্বোচ্চ মর্যাদা হলো, এটি ইজতিহাদের বিষয় বা উম্মাহর মধ্যে বিতর্কিত বিষয়, যা আল্লাহ ও রাসুলের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এ ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে: যেমন, ইবনে উমর ওযু করার সময় চোখে পানি দিতেন এবং কানে আলাদা পানি নিতেন; আবু হুরাইরা কনুই পর্যন্ত নয়, উর্ধ্ব বাহু পর্যন্ত হাত ধুতেন এবং বলতেন: "যে যতদূর আলো সম্প্রসারিত করতে পারে, করুক"। তাঁর থেকে বর্ণিত যে, তিনি গলা মুছতেন এবং বলতেন: "এটি শেকলের স্থান"। যদিও কিছু আলেম তাঁকে অনুসরণ করে তা সুপারিশ করেছেন, কিন্তু অন্যরা বলেছেন: অন্যান্য সাহাবী এরূপ ওযু করেননি। সহীহ হাদীসসমূহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে ওযু বর্ণিত হয়েছে, তাতে আলাদা পানি কানে ব্যবহার, কনুই ও টাখনার ঊর্ধ্বে ধোয়া, কিংবা গলা মুছার উল্লেখ নেই। তিনি বলেননি: "যে যতদূর আলো প্রসারিত করতে পারে, করুক" — বরং এটি আবু হুরাইরার বাণী, যা কিছু হাদীসে সংযুক্ত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল বলেছেন: "তোমরা কিয়ামতের দিন

ওযুর চিহ্নে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও অঙ্গ নিয়ে আসবে”। তিনি বাহু ও পায়ের উর্ধ্ব অংশ পর্যন্ত ওযু করতেন; আবু হুরাইরা বলেন: “যে যতদূর আলো সম্প্রসারিত করতে পারে, করুক”। কেউ কেউ ধারণা করেন, উর্ধ্ব বাহু ধোয়াকে আলো সম্প্রসারণ বলা হয়েছে—কিন্তু এর অর্থ নেই, কেননা আলো মুখে, হাতে বা পায়ে হয়; মাথায় ধোয়া হয় না, এবং সেখানে কোনো আলো নেই। হিজলাহ বৃদ্ধি করা সুপারিশযোগ্য নয়; এটি বিকৃতি।

তেমনি, ইবনে উমর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথে গেছেন, সেই পথে চলতেন, যেখানে থেমেছেন সেখানে থামতেন, তিনি যেখানে ওযু করেছেন সেখানে ওযু করতেন, যে গাছে পানি ঢেলেছেন সেখানে পানি ঢালতেন ইত্যাদি। যদিও কিছু আলেম এটি সুপারিশ করেছেন, তবে অধিকাংশ আলেম তা করেননি। যেমন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, মু'আয ইবনে জাবাল প্রমুখ কেউ তা সুপারিশ করেননি বা করেননি। যদি তারা তা সুপারিশযোগ্য মনে করতেন, তবে করতেন, কেননা তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে অতিশয় আগ্রহী ছিলেন।

আনুসরণ মানে হলো যা তিনি করেছেন, যেভাবে করেছেন, আমরাও সেভাবে করি। তিনি যদি কোনো কাজ ইবাদতের নিয়তে করেন, তবে আমরাও তা ইবাদতরূপে করবো। তিনি যদি কোনো স্থান বা সময় নির্দিষ্ট করেন ইবাদতের জন্য, আমরাও তা নির্দিষ্ট করবো। যেমন, তিনি কা'বার চারপাশে তাওয়াফ করেছেন, হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন, মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে সালাত পড়েছেন। তিনি মদিনার মসজিদের একটি স্তম্ভের পাশে সালাত পড়তে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি আস-সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠতেন, সেখানে দোয়া ও আল্লাহর স্মরণ করতেন; আরাফা, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানেও।

কিন্তু যা তিনি কেবল ঘটনাচক্রে করেছেন—কোনো স্থানে থেমেছেন বা সালাত পড়েছেন, তা নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্য ছাড়াই—আমরা যদি ইচ্ছা করে ঐ স্থানকে নির্দিষ্ট করি, তবে তা অনুসরণ নয়; বরং তা নব উদ্ভাবন, যা উমর ইবনে খাত্তাব নিষিদ্ধ করতেন। এটি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত: শুআ'বা থেকে সুলাইমান আত-তাইমী থেকে আল-মা'রুর ইবনে সুয়াইদ থেকে বর্ণিত।।

মা'রূর ইবনু সুয়াইদ বর্ণনা করেন: 'এর কোনো অর্থ নেই, কারণ জ্বলন্ত দাগ মুখমণ্ডলে হয়, হাত বা পায়ে নয়; হাত ও পায়ে যে জ্যোতি দেখা যায়, তা আলাদা। জ্বলন্ত দাগ বিস্তৃত হতে পারে না, কারণ পুরো মুখ ধোয়া হয়; কিন্তু মাথা ধোয়া হয় না এবং মাথায় কোনো জ্বলন্ত দাগ থাকে না। অতএব, হিজলাহ (জ্বলন্ত অংশ)

বাড়ানো প্রশংসনীয় নয়; বরং এটি বিকৃত করা।'"

তদ্রূপ, ইবনু উমর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথ পাড়ি দিতেন, সেই পথেই চলতেন, তিনি যেখানে থামতেন সেখানে থামতেন, সফরের সময় তিনি যেখানে ওযু করতেন, সেখানে ওযু করতেন, এবং যেখানে পানি ঢেলেছিলেন, সেই গাছে পানি ঢালতেন এবং অনুরূপ কাজ করতেন—যা কিছু আলেমের একটি দল পছন্দনীয় মনে করতেন, কিন্তু অধিকাংশ আলেম তা পছন্দ করতেন না। যেমন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, ইবনু মাসঊদ, মু'আয ইবনু জাবাল ও অন্যান্য সাহাবিগণও তা পছন্দ করেননি, এবং ইবনু উমরের মতো করেননি। যদি তারা একে সুন্নত বা পছন্দনীয় মনে করতেন, তবে তারাও করতেন, কারণ তারা তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ ও অনুকরণে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

এ কারণেই বলা হয়, অনুসরণ হলো যেভাবে তিনি করেছেন, সেভাবেই করা। তিনি যদি কোনো কাজ ইবাদত হিসেবে করে থাকেন, তাহলে আমরাও তা ইবাদত হিসেবে করব। যদি তিনি কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা সময়কে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করে থাকেন, তবে আমরাও তা নির্ধারণ করব। যেমন তিনি কাবার চারপাশে তাওয়াফ করতেন, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন, মাকামে ইবরাহিমের পেছনে নামাজ পড়তেন। তিনি মদিনার মসজিদের একটি নির্দিষ্ট স্তম্ভে নামাজ পড়তেন, সাফা ও মারওয়ায় উঠে দোয়া ও যিকির করতেন এবং আরাফা, মুযদালিফা ও অন্যান্য স্থানে যেতেন। কিন্তু তিনি যদি হঠাৎ কোনো স্থানে থেমে নামাজ পড়তেন, অথচ সেই স্থান নির্দিষ্ট করার কোনো উদ্দেশ্য না থাকত, আর আমরা যদি সে স্থানকে নির্দিষ্ট করে সেখানে নামাজ পড়ি বা থামি, তাহলে এটা অনুসরণ নয়; বরং এটি বিদআত, যা উমর ইবনু খাত্তাব নিষেধ করতেন।

এটি প্রমাণিত হয়েছে সাহীহ সনদে শু'বাহ থেকে, সুলাইমান আত-তাইমি থেকে, ইবনু উমরের হাদীস দ্বারা: "কিতাবীদের (ইহুদি-নাসারা) নারীদের বিয়ে করা বৈধ নয়।" এবং মু'আয ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) একজন মুসলিমকে কাফিরের থেকে উত্তরাধিকার লাভ করার অনুমতি দিতেন।

এবং উমর ও ইবনু মাসঊদের সেই বক্তব্য—যাতে তাঁরা বড় ধরনের অপবিত্রতার অবস্থায় থাকা ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করতে নিষেধ করেছেন। এবং আলী, যায়েদ ও ইবনু উমরের বক্তব্য—বিনা মোহর নির্ধারণে বিয়ে করা কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে, সে নারীর কোনো মোহর থাকবে না। আর আলী ও ইবনু আব্বাসের বক্তব্য—গর্ভবতী বিধবার জন্য দুই ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘ, সেটিই পালন করতে হবে। এবং ইবনু উমর ও অন্যান্য সাহাবীদের বক্তব্য—যে ব্যক্তি ইহরামের অবস্থায় মারা যায়, তার ইহরাম বাতিল হয়ে যায় এবং তাকে

এমনভাবে দাফন করা হবে যেন সে ইহরামে ছিল না। এবং ইবনু উমর ও অন্যান্য সাহাবীর বক্তব্য—হজে শর্তারোপ করা বৈধ নয়। এবং ইবনু আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবীর বক্তব্য—বিধবাকে বাসায় অবস্থান করতে বাধ্য করা হবে না। এবং উমর ও ইবনু মাসউদের বক্তব্য—তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী, যদি তা চূড়ান্ত ও অনুলজ্জনীয় (বাইন) তালাক হয়, তবে তার বাসস্থান ও খোরপোশের অধিকার থাকবে। সাহাবীদের মধ্যে এ ধরনের বহু মতবিরোধপূর্ণ বিষয় রয়েছে; এসব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি রুজু করাই আবশ্যক। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। উম্মতের জন্য শরিয়ত কেবল সেটিই, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধিবদ্ধ করেছেন।

যেসব আলিম বলেছেন—"সাহাবীর বক্তব্য দলীল", তাঁরা কেবল তখনই তা বলেছেন যখন অন্য কোনো সাহাবী তার বিরোধিতা করেননি এবং কোনো স্পষ্ট দলীলও তার বিপরীত কিছু জানায়নি। এরপর, যদি তা প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং কেউ তা প্রত্যাখ্যান না করে, তাহলে এটি মৌনসম্মত ঐক্যমতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হয়। বলা যেতে পারে: "এটি হলো মৌনসম্মত ইজমা"—যদি জানা যায় যে তাঁরা সেটিকে অনুমোদন করেছেন এবং কেউ তার বিরোধিতা করেননি, এবং তাঁরা কখনো মিথ্যার অনুমোদন দেন না। তবে যদি তা প্রসিদ্ধ না হয়, এবং জানা যায় যে অন্য কেউ তার বিরোধিতা করেননি, তাহলে বলা যেতে পারে—"এটি দলীল হতে পারে"। কিন্তু যদি জানা যায় যে অন্য কেউ তার বিরোধিতা করেছেন, তবে তা দলীল নয়—এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। আর যদি জানা না যায় কেউ এর পক্ষে না বিপক্ষে ছিলেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে না। আর যখন সুন্নাহ কোনো মতের বিপরীত কিছু প্রমাণ করে, তখন প্রমাণ একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহতেই থাকে—এ বিষয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

এই ভিত্তিতে, যদি উসমান ইবনে হুনাইফ বা অন্য কারও তরফ থেকে এমন কিছু প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুলকে শরিয়তসম্মত ও সুন্নত মনে করতেন—যদিও তিনি (রাসুল) তাঁর জন্য কোনো দোয়া করেননি বা সুপারিশ করেননি, তাহলে আমরা জানি, উমর এবং প্রধান সাহাবিগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাওয়াসসুলকে তাঁর জীবিত অবস্থার মতো শরিয়তসম্মত মনে করতেন না। বরং, তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের পর তাঁরা তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করেননি। বরং উমর, সেই প্রখ্যাত দোয়াতে যা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত এবং যা মুহাজির ও আনসারদের উপস্থিতিতে খ্যাতিমান "আমুল রামাদা" (ছারার বছর)-এ সম্পন্ন হয়েছিল—যখন কঠিন খরা দেখা দেয় এবং

উমর কসম করে বলেন, তিনি ততদিন ঘি খাবেন না যতদিন না মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছে—তখন তিনি আল-আব্বাসের মাধ্যমে বৃষ্টির দোয়া করেন এবং বলেন: "হে আল্লাহ! আমরা যখনই খরায় পতিত হতাম, তখন আমাদের নবীর মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করতাম, আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করছি, অতএব আমাদের বৃষ্টি দাও।" তখনই বৃষ্টি বর্ষণ হয়। এ দোয়াতে সাহাবিদের কেউ আপত্তি করেননি, যদিও তা খুবই প্রসিদ্ধ। এটি হলো মৌনসম্মত ইজমার সবচেয়ে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানও তাঁর খিলাফতকালে বৃষ্টির জন্য সালাতে একইরূপ দোয়া করেছেন।

যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা জীবিত অবস্থার তাওয়াসসুলের মতো হতো, তবে তারা বলত: "আমরা কীভাবে আল-আব্বাস, ইয়াজীদ ইবনে আসওয়াদ ও তাদের মতদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করি আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তাওয়াসসুল থেকে বিরত থাকি? অথচ তিনিই তো আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম!" যেহেতু কেউ এ কথা বলেনি, এবং জানা যায় যে তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবিরা কেবল তাঁর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন, এবং মৃত্যুর পর তাঁরা অন্যদের দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করেছেন—তাহলে এটা স্পষ্ট যে সাহাবিদের মতে শরিয়তসম্মত ছিল দোয়াকারীর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াসসুল, তার ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে নয়।

অন্ধ লোকের হাদীস উমর ও সাধারণ সাহাবিদের পক্ষে দলীল—কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কেবল তাঁর সুপারিশ ও দোয়ার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতে বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে নয়। তিনি তাকে দোয়ায় এ কথা বলতেও বলেছেন: "হে আল্লাহ! তুমি তাঁর (রাসুলের) সুপারিশ আমার পক্ষে গ্রহণ করো।"

যদি অনুমান করা হয়, কোনো সাহাবী অপর সাহাবীকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতে বলেছিলেন, তাঁর সুপারিশের মাধ্যমে নয়, এবং তিনি শরিয়তপ্রণীত দোয়া না বলে শুধু একটি অংশ বলেন—যেখানে ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে তাওয়াসসুল রয়েছে, তাহলে উমর ইবনুল খাত্তাব যা করেছেন সেটাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর যিনি উমরের বিরোধিতা করবেন, তাঁর বিরোধিতা করা হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ দ্বারা। এবং উসমান ইবনে হুনাইফ যে হাদীস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

সেটাই তার বিরুদ্ধে দলীল হবে, পক্ষে নয়। এবং আল্লাহই সর্বোত্তমভাবে জানেন।

তাওয়াসসুল নামে পরিচিত তৃতীয় প্রকার—যাতে আল্লাহ তা'আলার নামে নবী ও নেককারদের কসম করে বা তাঁদের মাধ্যমে কিছু চাওয়া হয়—এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে এমন কিছু বর্ণনা করা যায় না যা আলিমগণ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন—যেমন পূর্বে বিস্তারিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহর নামে নবী বা নেককারদের কসম করে, কিংবা তাঁদের দ্বারা কিছু চাওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকে এমন কিছু প্রমাণিত নয়, না তাঁর নিজের বিষয়ে, না অন্য সৃষ্টির বিষয়ে। যদিও কিছু আলিম এটিকে বৈধ বলেছেন, তবে বহু আলিম এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এটি একটি ইখতিলাফ পূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা হয়েছে। যেসব বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে, সেসব বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক, এবং প্রত্যেক পক্ষ তাদের দলীল উপস্থাপন করে, যেমন অন্যান্য সব ইখতিলাফ পূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়।

এটি এমন কোনো বিষয় নয় যাতে শাস্তি দেওয়া যায়—এ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে ইজমা রয়েছে। বরং যে ব্যক্তি এ জন্য শাস্তি দেয়, সে সীমালঙ্ঘনকারী, অজ্ঞ, এবং যুলুমকারী। কারণ, যে ব্যক্তি এ মত পোষণ করে, সে এমন কিছু বলেছে যা পূর্ববর্তী আলিমগণও বলেছেন (অর্থাৎ এটি একটি বিদ্যমান, যদিও সংখ্যালঘু, ফিকহি মত)। আর যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করছে, তার হাতে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই যা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে—না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকে, না সাহাবিদের তরফ থেকে।

এটি প্রমাণিত যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা বৈধ নয়—না নবী, না অন্য কেউ। এবং আলোচনার মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলিমগণ একমত যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা বৈধ নয়—না নবীর নামে, না অন্য কারো নামে। বরং এমন মানত শিরক এবং তা পূরণযোগ্য নয়। তদ্রূপ, সৃষ্টির নামে শপথ করলে তা বাধ্যতামূলক হয় না, এবং এর কোনো কাফফারাও নেই। এমনকি কেউ যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামেও শপথ করে, তবু তা বাধ্যতামূলক নয়, এবং অধিকাংশ আলিমের মতে এর কোনো কাফফারাও নেই—যেমন ইমাম মালিক, আশ-শাফিই, আবু হানিফা, এবং আহমদ ইবনে হাম্বালের একটি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত। বরং, এমন শপথ করা হারাম। যদি কোনো ব্যক্তি এর দ্বারা কোনো সৃষ্টির ওপর শপথ করতে না পারে, তবে কীভাবে সে আল্লাহর ওপর তা করবে?

আর কেউ যদি তাঁর মাধ্যমে কিছু চায় কিন্তু শপথ না করে, তবে সেটিও একাধিক আলিমের মতে নিষিদ্ধ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে প্রমাণিত সহীহ সুন্নাহসমূহ এ বিষয়ে নির্দেশ করে। কেননা, মানুষ কেবল এই বিশ্বাসেই তা করে যে এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি উপায় এবং আনুগত্যের একটি কাজ, এবং এটি এমন বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা দোয়া কবুল হয়। এ ধরনের কোনো কিছু অবশ্যই বা তোয়াক্কা না করে বললে, হয় তা ফরজ, না হয় মুস্তাহাব হতে হবে। আর ইবাদত ও দোয়ার ক্ষেত্রে যা কিছু ফরজ বা মুস্তাহাব, তা অবশ্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য শরীয়াহ্ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যদি তিনি তা নির্ধারণ না করে থাকেন, তবে তা ফরজ নয়, মুস্তাহাবও নয়, নৈকট্য লাভের মাধ্যম নয়, আনুগত্যের কাজ নয় এবং দোয়া কবুল হওয়ার কোনো উপায়ও নয়। এ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে (সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে প্রার্থনা করা বা তাদের কসম খাওয়ার বিষয়ে) এ বিশ্বাস পোষণ করে, সে ভ্রান্ত এবং তার এই বিদআত জঘন্য বিদআতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সহীহ হাদীসসমূহ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অবস্থা থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাদের মতে এটি শরীয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরন্তু, এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটি আল্লাহর নিকট এমন একটি কারণের মাধ্যমে প্রার্থনা, যা দোয়া কবুলের জন্য উপযুক্ত নয়, এবং এটি কাবা, তূর পাহাড়, কুরসী, মসজিদসমূহ এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে প্রার্থনার মতোই। এটা সুস্পষ্ট যে, সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা শরীয়াহ্সিদ্ধ নয়; যেমনটি তাদের দ্বারা কসম খাওয়াও শরীয়াহ্সিদ্ধ নয়; বরং এটি নিষিদ্ধ। সুতরাং যেমন কারো জন্য সৃষ্ট জীবের কসম খাওয়া বৈধ নয়, তেমনি তার জন্য আল্লাহর উপর কোনো সৃষ্ট জীবের কসম খাওয়াও বৈধ নয়, কিংবা কোনো সৃষ্ট জীবের দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাও বৈধ নয়। মানুষ কেবল দোয়া কবুলের উপযুক্ত কারণসমূহের মাধ্যমেই প্রার্থনা করে থাকে, যেমন পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তবে, কিছু আলেম থেকে এমন কিছু বর্ণনা ও বক্তব্য পাওয়া যায়, যাতে তা বৈধ বলা হয়েছে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হিসেবে এ ব্যাপারে কিছুই নেই; বরং সবই জাল। আর যাদের বক্তব্য শরীয়াহ্র দলিল নয়, তাদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিছু সত্য, কিছু অসত্য। যেমন আহমদ ও ইবনু মাজাহ যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে আছে: "আপনার কাছে প্রার্থনাকারীদের হকের এবং আমার এ চলার হকের ওসিলায়"—এটি আহমদ বর্ণনা করেছেন ওয়াকী' থেকে, তিনি ফুদাইল ইবনে মারজূক থেকে, তিনি আতিয়্যাহ থেকে, তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী থেকে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় বলে: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনাকারীদের হকের এবং আমার এ চলার হকের ওসিলায় প্রার্থনা করছি। আমি অহংকার, আত্মপ্রদর্শন, সুনাম কামনার উদ্দেশ্যে বের হইনি; বরং আপনার অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপত্তা চাওয়ার জন্য ও আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়েছি। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, জান্নাতে প্রবেশ করান এবং আমার গুনাহ মাফ করুন, কারণ আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেন না'—তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সঙ্গে বের হয় এবং তার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ তার দিকে মুখ ফেরান যতক্ষণ না সে নামায শেষ করে।"

এই হাদীসটি আতিয়্যাহ আল-আউফী থেকে আবূ সাঈদের বর্ণনায়, আর আতিয়্যাহ সম্পর্কে সর্বসম্মতভাবে আলেমদের মত হলো যে, তিনি দুর্বল। এটি অন্য একটি সূত্র থেকেও বর্ণিত হয়েছে, সেটিও দুর্বল। এর বক্তব্যে কোনো দলিল নেই (সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে প্রার্থনার পক্ষে), কারণ প্রার্থনাকারীদের হক হলো আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করবেন, আর বান্দাদের হক হলো আল্লাহ তাদের সওয়াব দিবেন। এটি এমন এক হক, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহিমান্বিত সত্তার উপর বাধ্যতামূলক করেছেন, তাঁর সত্য ওয়াদার মাধ্যমে, যা আলেমদের ঐক্যমতের মাধ্যমে ও একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁর নিজের উপর ফরজ করেছেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

এটি ঐ তিন ব্যক্তির মত যারা গুহায় আটকে গিয়ে তাদের আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিল: একজন তার পিতা-মাতার প্রতি তার অসাধারণ সদাচরণের মাধ্যমে, অন্যজন তার চরম পবিত্রতা ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে, আরেকজন তার আমানতের পরিপূর্ণতার মাধ্যমে। কারণ এগুলো এমন আমল যা আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং এগুলোর জন্য সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এটি আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্কে বর্ণিত আয়াতের মত, যেখানে তিনি বলেন: "হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীকে শুনেছি, যে ঈমানে আহ্বান করছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো'—তাহলে আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দাও, আমাদের দোষসমূহ মোচন করে দাও, এবং আমাদের সৎলোকদের সাথে মৃত্যু দাও" (সূরা আলে ইমরান: ১৯৩)।

তিনি আরও বলেন: "নিশ্চয় আমার কিছু বান্দা ছিল, যারা বলতো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'" (সূরা আল-মু'মিনূন: ১০৯)।

তিনি আরও বলেন: "বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে জানাবো যা এর চেয়ে উত্তম? যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিচে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, এবং থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা'—যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর'" (সূরা আলে ইমরান: ১৫-১৬)।

ইবনে মাসঊদ সাহারীর সময় বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ডাকলেন, আমি সাড়া দিলাম; আপনি আদেশ করলেন, আমি পালন করলাম; এবং এখন সাহারীর সময়, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।"

এই বিষয়ের মূলনীতি হলো: আল্লাহর উপর কোনো সৃষ্টির কসম খাওয়া বা তার মাধ্যমে প্রার্থনা করা — এটি হয় আদেশপ্রাপ্ত, নয় নিষিদ্ধ, নয়ত বৈধ। যদি কেউ বলে এটি আদেশপ্রাপ্ত বা বৈধ, তবে হয় তাকে এক সৃষ্টির সাথে আরেক সৃষ্টির পার্থক্য করতে হবে, অথবা বলতে হবে: বরং তা মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্ট জীবদের মাধ্যমে (বা তাদের কেউ কেউ দ্বারা) বৈধ। যে কেউ বলে এটি সব সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে বৈধ, তার এই বক্তব্য এই অর্থ বহন করে যে, মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা শয়তান, তাদের মাধ্যমেও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা বৈধ—এমন কথা কোনো মুসলিম বলে না।

আর যদি বলা হয়: বরং মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্ট জীবদের মাধ্যমে প্রার্থনা করা বৈধ, যেমন যাদের দ্বারা আল্লাহ তাঁর কিতাবে কসম খেয়েছেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রার্থনা করা যাবে—"রাত্রি যখন সবকিছু ঢেকে দেয়", "দিবস যখন আলোকিত হয়", "পুরুষ ও নারী", "সূর্য ও তার দীপ্তি", "চাঁদ যখন তার অনুসরণ করে", "আকাশ ও যিনি তা নির্মাণ করেছেন", "পৃথিবী ও যিনি তা বিস্তৃত করেছেন", "প্রাণ ও যিনি তাকে সুষম করেছেন"—এসবের মাধ্যমে।

এছাড়াও প্রার্থনা ও কসম খাওয়া যাবে—"যারা পিছিয়ে আসে", "যারা ছুটে চলে", "রাত্রি যখন অন্ধকার করে", "ভোর যখন শ্বাস নেয়", "যারা ছড়িয়ে দেয়", "যারা বোঝা বহন করে", "যারা সহজে চলে", "যারা আদেশ

বিতরণ করে", "তূর পাহাড়", "একটি লিখিত কিতাব", "গণবহুল গৃহ", "উঁচু ছাদ", এবং "পূর্ণ সমুদ্র"—এসবের মাধ্যমে। আরও প্রার্থনা করা যাবে—"সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণ" ও আল্লাহ যাদের দ্বারা তাঁর কিতাবে কসম করেছেন তাদের সকলের মাধ্যমে।

কারণ, আল্লাহ যাদের দ্বারা কসম করেছেন, তারা হলো তাঁর নিদর্শন এবং সৃষ্ট জীব। তারা তাঁর রব্বীয়াত, উলূহিয়াত, একত্ববাদ, জ্ঞান, কুদরত, ইচ্ছা, দয়া, হিকমত, মহত্ব ও ক্ষমতার প্রমাণ। অতএব, আল্লাহ তাদের দ্বারা কসম করেন, কেননা এতে তিনি নিজেই মহিমান্বিত হচ্ছেন।

কিন্তু আমরা, যারা সৃষ্টি, আমাদের জন্য তাদের দ্বারা কসম খাওয়া বৈধ নয় — এ বিষয়ে স্পষ্ট দলিল ও ইজমা রয়েছে। বরং একাধিক আলেম কসম না খাওয়ার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বর্ণনা করেছেন। বরং এটি শিরক এবং হারাম।

যে ব্যক্তি সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তার বক্তব্য এমন কিছু প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে—যেমন প্রতিটি নারী-পুরুষ, প্রতিটি প্রাণ যাকে তিনি তাঁর অনুপ্রেরণায় তার পাপ ও পূণ্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন, হাওয়া, মেঘ, তারা, সূর্য, চাঁদ, রাত্রি, দিবস, তীন, জয়তুন, সিনাই পর্বত, নিরাপদ শহর (মক্কা), কাবা, সাফা, মারওয়া, আরাফা, মুযদালিফা, মিনা ইত্যাদি।

এছাড়াও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে এমন সব সৃষ্টির মাধ্যমে, যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য মনে করে—যেমন সূর্য, চাঁদ, তারা, ফেরেশতা, মসীহ, উজায়ের ও অন্যরা—এবং যাদের উপাসনা করা হয়নি এমন সৃষ্টির মাধ্যমে।

এটা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের প্রার্থনা বা কসম ইসলামে সবচেয়ে জঘন্য বিদআতের অন্তর্ভুক্ত, যা আলেম ও সাধারণ উভয়ের দৃষ্টিতেই ঘৃণ্য।

এতে অনুমোদন দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি কসম করার, সেই সমস্ত তাবিজ ও ঝাড়ফুঁকের কসম ও মন্ত্রসমূহ দ্বারা, যা তুরুকীয়্যাহ (সূফি তরীকা) ও ঝাড়ফুঁকার কারিগরদের লিখিত তাবিজে লেখা থাকে। বরং বলা হবে: যদি আল্লাহ্র প্রতি অনুরোধ ও কসম করা বৈধ হয় তাদের মাধ্যমে, তবে সৃষ্টির উপর কসম করা তো আরও সহজ হবে। এই যুক্তি ইসলামের দীন থেকে বিদায় ও কুফরকে আবশ্যক করে তোলে; বরং এটি সমস্ত নবীদের দ্বীনের বিরোধী।

যদি কেউ বলে: বরং আমি আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরোধ করি বা তাঁর প্রতি কসম করি এক সম্মানিত সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যের পরিবর্তে—হোক তা নবীগণের মধ্যে কোনো এক জন, অথবা কেবল নবীগণ ব্যতীত অন্য কেউ নয়—যেমন কিছু লোক অনুমতি দিয়েছে নবী বা সৎব্যক্তিদের মাধ্যমে কসম করার, অন্যদের বাদ দিয়ে।

তবে তাকে বলা হবে: যদিও কিছু সৃষ্টি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবুও তারা সবাই এই বিষয়ে সমান যে, আল্লাহ্ তায়ালার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের কাউকেই বানানো যাবে না। অতএব, কাউকে ইবাদত করা যাবে না, তার উপর ভরসা করা যাবে না, তাকে ভয় করা যাবে না, তার সম্মানে সেজদা করা যাবে না, তার জন্য রোযা রাখা যাবে না, তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না, আর কোনো সৃষ্টিকে কসম করার অধিকারও দেওয়া যাবে না; যেমন সহীহ হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "যে কসম করবে, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অথবা নীরব থাকে।" আর তিনি বলেছেন: "আল্লাহ ছাড়া কারো নামে কসম করো না।" আর সুন্নানে এসেছে: "যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে, সে শিরকে লিপ্ত হয়।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ ও স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো সৃষ্টির নামে কসম করা বৈধ নয়। এতে ফেরেশতা, নবী, সৎব্যক্তি কিংবা অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, বরং এক নবী আরেক নবীর চেয়েও কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকে সমান গণ্য করেছেন শিরকের নিন্দার ব্যাপারে, যদিও তারা সম্মানিত হোক না কেন। তিনি বলেন: "এটা কোনো মানুষের জন্য উচিত নয়—আল্লাহ তাকে কিতাব, হুকুম ও নবুয়ত দান করলে—তারপর সে লোকদেরকে বলবে, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও।' বরং সে বলবে, 'তোমরা হউ প্রভুর জন্য আলেম, কারণ তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়েছো এবং তা অধ্যয়ন করেছো।' আর সে তোমাদেরকে আদেশ দেবে না ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে। সে কি তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর কুফর করতে বলবে?" (সূরা আলে ইমরান: ৭৯-৮০)

আর তিনি বলেন: "বল, 'তোমরা তাদেরকে ডাকো যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া উপাস্য মনে করো; তারা তোমার দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে বা তা সরিয়ে দিতে কোনো ক্ষমতা রাখে না।' তারা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারাও তাদের প্রভুর দিকে নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজে—কে তার নিকটতম হয়—এবং তারা তাঁর রহমতের আশা রাখে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর শাস্তি ভীষণ ভয়ের

বিষয়।" (সূরা বনি ইসরাইল: ৫৬-৫৭)

সালাফদের একটি দল বলেছেন: এমন কিছু লোক ছিল যারা ঈসা (আলাইহিস সালাম), উযাইর, ও ফেরেশতাদের ডেকেছিল। আল্লাহ্ বলেন: এরা যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা আমারই বান্দা; তারা যেমন আমার রহমতের আশা রাখে, তেমনি আমার শাস্তিকেও ভয় করে এবং তারা আমার নৈকট্য লাভে চেষ্টা করে, যেমন তোমরাও করো।

তিনি বলেন: "যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে—তারাই সফলকাম।" (সূরা আন-নূর: ৫২) তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য; কারণ রাসুলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। ভয় ও তাকওয়াও কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত; আল্লাহ কখনো কোনো সৃষ্টিকে ভয় করতে কিংবা শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে বলেননি।

তিনি বলেন: "যদি তারা সন্তুষ্ট হতো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে, এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দিবেন এবং তাঁর রাসুলও দিবেন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর প্রতিই আকাঙ্ক্ষা করি।'" (সূরা আত-তাওবাহ: ৫৯)

আর তিনি বলেন: "অতএব, যখন তুমি অবসর হও, তখন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করো। আর তোমার প্রতিপালকের দিকেই আকাঙ্ক্ষা করো।" (সূরা আশ-শারহ: ৭-৮)

এ আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তারা যা পেয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকেই পেয়েছে—কারণ রাসুল হলেন আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, হালাল, হারাম, ওয়াদা ও ভীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। হালাল হল যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হালাল করেছেন, হারাম হল যা তাঁরা হারাম করেছেন, এবং দ্বীন হল যা তাঁরা শরী'আত করেছেন।

এই কারণে তিনি বলেন: "রাসুল যা কিছু তোমাদেরকে দেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা আল-হাশর: ৭) কেউ হালাল সম্পদ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণের অধিকার রাখে না,

বিশেষ করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা সদকার মতো সম্মিলিত সম্পদে। সেখানে প্রত্যেকের তার প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তিনি বলেন: "আর বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'", কিন্তু বলেননি "ও তাঁর রাসুল", কারণ "হাসব" বা "পর্যাপ্ত" একমাত্র আল্লাহই। তিনি বলেন: "হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্যও।" (সূরা আল-আনফাল: ৬৪)

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট তোমার ও তোমার অনুসারীদের জন্য। এটি সালাফ ও খালাফের অধিকাংশের মতে সহীহ ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ যথেষ্ট তাঁর রাসুল ও তাঁর অনুসারীদের জন্য—তাঁরাই আল্লাহর হিদায়াতপ্রাপ্ত, সাহায্যপ্রাপ্ত, ও রিযিকপ্রাপ্ত। এরপর তিনি বলেন: "আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দিবেন এবং তাঁর রাসুলও", এখানে "ফযল" বা অনুগ্রহের মাধ্যম করে দুজনের দান উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহরই। তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর প্রতিই আকাঙ্ক্ষা করি", এখানে আকাঙ্ক্ষা কেবল আল্লাহর প্রতিই নির্ধারিত হয়েছে, রাসুল বা অন্য কোনো সৃষ্টির প্রতি নয়।

এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সব সৃষ্টিকে এই বিষয়ে সমান করেছেন—তিনি কাউকে কসম করার, ভরসা করার, আকাঙ্ক্ষা করার, ভয় করার বা শ্রদ্ধায় মাথা নত করার অধিকার দেননি—হোক তা নবী, ফেরেশতা কিংবা অন্য কেউ। তিনি বলেন: "বল, 'তোমরা ডাকো যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া উপাস্য মনে করো।' তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণও মালিকানার অধিকার রাখে না, তাদের জন্য তাতে কোনো অংশীদারত্ব নেই, এবং তাদের কেউই আল্লাহর কোনো সাহায্যকারী নয়। আর সুপারিশ কেবল তার জন্যই উপকারী হবে, যাকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন।" (সূরা সাবা: ২২-২৩)

আল্লাহ যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদের ডাকে তাদেরকে শাস্তির হুমকি দিয়েছেন, এবং বর্ণনা করেছেন যে তাদের কাছে আল্লাহর কোনো মালিকানা, অংশীদারিত্ব, কিংবা সাহায্যকারীর মর্যাদা নেই। তিনি এভাবে সৃষ্টি জগতে মানুষের হৃদয়কে কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন—ভরসা, ইবাদত, আশা ও সাহায্যের ক্ষেত্রে। কেবল একটি বিষয় ছেড়ে রেখেছেন—সুপারিশ—যা সত্য। তবে আল্লাহ বলেন: "সুপারিশ কেবল তার পক্ষেই উপকারী হবে, যাকে তিনি অনুমতি দেবেন।"

এবং সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে: কিয়ামতের দিন মানুষ যাবেন আদম, তারপর দৃঢ় সংকল্পের নবীরা—নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)—তারা একে অপরের প্রতি রেফার করবেন, যতক্ষণ না তারা ঈসা (আ.) এর কাছে পৌঁছাবেন, তিনি বলবেন: "তোমরা মুহাম্মাদের কাছে যাও, এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তারা আমার কাছে আসবে, আমি আমার রবের কাছে যাব, তাঁকে দেখলেই সেজদায় পড়ে যাব এবং এমন প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে শেখাবেন—যা আমি এখন জানি না। তখন আমাকে বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! মাথা তোলো, বলো, তোমার কথা শোনা হবে; অনুরোধ করো, তোমাকে দেওয়া হবে; সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

তিনি বলেন: এরপর আল্লাহ আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করবেন, আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

তিনি বাকিটুকুও উল্লেখ করেন। ঈসা (আ.) ব্যাখ্যা করেছেন যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সেই সুপারিশকারী, যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য, কারণ তিনি আল্লাহর সেই বান্দা, যার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এবং মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সম্মানিত সুপারিশকারী, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান—তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও সেজদা করবেন, তারপর অনুমতি পেলে সুপারিশ শুরু করবেন। বলা হবে: "মাথা তোলো! বলো—শোনা হবে, চাও—দেওয়া হবে, সুপারিশ করো—গ্রহণ করা হবে।" তিনি বলবেন, তাঁর জন্য একটি সীমা নির্ধারিত হবে, আর তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এসবই প্রমাণ করে, সমস্ত বিষয় একমাত্র আল্লাহরই অধীনে। তিনি সম্মান দেন সুপারিশকারীকে অনুমতি দিয়ে; এবং তিনি কেবল তাদের পক্ষেই অনুমতি দেন, যাদের জন্য তিনি চান। তারপর তিনি সীমা নির্ধারণ করেন, এবং সুপারিশকারী তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান। কাজেই সমস্ত ব্যাপার নির্ভর করে আল্লাহর ইচ্ছা, কুদরত ও বেছে নেওয়ার উপর। যে ব্যক্তি আল্লাহর সর্বাধিক অনুগত, সবচেয়ে অনুতপ্ত, এবং তাঁর প্রিয় আমলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—তাঁকেই আল্লাহ অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেন, পছন্দ করেন এবং নির্বাচন করেন।

যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, তার দিকে আকর্ষণ করা, তাকে ভয় করা, তাকে ভীতি ও

ভক্তিতে শ্রদ্ধা করা এবং এ জাতীয় বিষয়সমূহ সেই সকল বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে সমস্ত সৃষ্টি সমান, তাই কোনো সৃষ্টিরই এ অধিকার নেই যে তার নামে শপথ করা হোক, কিংবা তাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হোক, অথবা তার উপর ভরসা করা হোক—এমনকি যদি সে সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠতম হয়। ফেরেশতা ও নবীগণও এর উপযুক্ত নন, আর যারা শাইখ বা সৎলোক তাদের তো বলা দূরের কথা।

অতএব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কোনো সৃষ্টিকে ওসীলা বানিয়ে কিছু চাওয়া যদি ঐ সমস্ত সৃষ্টির মাধ্যমে হয়ে থাকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ শপথ করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন, তাহলে সবার মাধ্যমেই চাওয়া বৈধ হতো। আর যদি তা বৈধ না হয়, তাহলে কারো মাধ্যমেই চাওয়া বৈধ নয়। কারো সম্মানিত অবস্থানকে কেন্দ্র করে এক জনের মাধ্যমে চাওয়া বৈধ আর অন্যজনের মাধ্যমে চাওয়া অবৈধ—এই পার্থক্য যেভাবে বাতিল, সেই একইরকমভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে শপথ করার ক্ষেত্রে কিছু সৃষ্টিকে বৈধ এবং অন্যদেরকে অবৈধ বলা যে পার্থক্য করা হয়, সেটিও বাতিল।

কেউ যদি বলেন যে, আমি যাদের প্রতি ঈমান রাখি এবং যাদের প্রতি ঈমান রাখি না, তার মধ্যে পার্থক্য করি—তাহলে তাকে বলা হবে: ফেরেশতা ও নবীগণের প্রতি ঈমান রাখা ফরজ, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বর্ণনা করেছেন, যেমন—মুনকার ও নকীর, ডাগর চোখের হূরেরা, যুবকেরা ও অন্যান্য বিষয়—এসবের প্রতিও ঈমান রাখা ফরজ। তাহলে কি এ কারণে এ সকল সৃষ্টির নামে শপথ করা বৈধ হবে? অথবা এদের ওসীলায় কিছু চাওয়াও বৈধ হবে?

এতে স্পষ্ট হয় যে, কোনো মাধ্যমকে ওসীলা বানিয়ে কিছু চাওয়া যদি এমন হয় যে, সেই মাধ্যমটি দোয়া কবুলের উপায় নয়, তাহলে এক সৃষ্টিকে ওসীলা করা আর অন্য সৃষ্টিকে ওসীলা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; যেভাবে এক সৃষ্টির নামে শপথ করা আর অন্য সৃষ্টির নামে শপথ করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এসব কিছুই অবৈধ। অতএব, এটা স্পষ্ট যে, এটা বৈধ নয়—যেমনটা সে সমস্ত উলামা বলেছেন, যারা একে অবৈধ বলেছেন। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল্লাহ তাআলার এ বাণী সম্পর্কে: "তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই বিজয় প্রার্থনা করত" (সূরা আল-বাকারা: ৮৯),—এখানে বোঝানো হয়েছে, ইহুদিরা মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলত: "এই নবী অচিরেই প্রেরিত হবেন, আমরা তাঁর সাথে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং তোমাদের হত্যা করব।" তারা রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তাকে ওসীলা করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইত না, কিংবা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করত না। বরং তারা বলত: "হে আল্লাহ! এই উম্মী নবীকে পাঠাও, যেন আমরা তাঁকে অনুসরণ করে এদেরকে হত্যা করতে পারি।"

তাফসীরের আলেমদের মতে এ কথাই প্রমাণিত এবং কুরআনের বক্তব্যও তা প্রমাণ করে, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই বিজয় প্রার্থনা করত।" 'ইস্তিফতাহ' অর্থ হল বিজয় ও সাহায্য কামনা করা, অর্থাৎ ফতেহ ও বিজয় চাওয়া। তাঁর মাধ্যমে বিজয় কামনা করা মানে হলো, তিনি প্রেরিত হবেন এবং তারা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং এর মাধ্যমে তারা বিজয় অর্জন করবে। এটি এমন নয় যে, তারা তাঁর নামে শপথ করত বা তাঁকে ওসীলা করে দোয়া করত। যদি এমন হতো, তবে যখনই তারা তাঁর নামে শপথ করত বা তাঁকে ওসীলা বানিয়ে দোয়া করত, তখনই বিজয় লাভ করত। অথচ বিষয়টা এমন ছিল না। বরং যখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করলেন, তখন যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং তাঁর সাথে জিহাদ করল, আল্লাহ তাদেরকেই বিজয় দিলেন।

যে সকল তাফসীরকারক বলেছেন যে, তারা তাঁর নামে শপথ করত বা তাঁকে ওসীলা করত—এ বক্তব্য একটি বিচ্ছিন্ন ও অস্বীকৃত বর্ণনা, যা সুপ্রচলিত, প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহের বিরোধিতা করে। আমরা "দালায়িলুন নুবুয়্যাহ" ও "আল-ইস্তিগাসাহ আল-কাবীর" গ্রন্থে এর একটি অংশ উল্লেখ করেছি। সীরাহ, দালায়িলুন নুবুয়্যাহ ও তাফসীরের কিতাবসমূহ এই বিষয়ে ভরপুর।

আবু আল-আলিয়া ও অন্যান্যরা বলেন: যখন ইহুদিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা বানিয়ে আরব মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করত, তখন তারা বলত: "হে আল্লাহ! এই নবীকে প্রেরণ কর, যার বিবরণ আমাদের নিকট লিখিত আকারে রয়েছে, যেন আমরা মুশরিকদের পরাভূত করতে পারি এবং তাদের হত্যা করতে পারি।" কিন্তু যখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করলেন এবং তারা দেখল যে তিনি তাদের মধ্য থেকে নন, তখন তারা হিংসাবশত আরবদের প্রতি ঈর্ষা করে তাঁর প্রতি কুফরি করল, যদিও তারা জানত যে, তিনি আল্লাহর রাসুল। ফলে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন: "অতঃপর যখন তাদের নিকট এমন কিছু এল, যা তারা চিনে ফেলেছিল, তারা তা অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহর লানত কাফিরদের উপর।" (সূরা আল-বাকারা: ৮৯)

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ‘আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদাহ আল-আনসারী থেকে তার জাতির কিছু লোকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যারা বলত: “আমাদের ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ ছিল, আল্লাহর দয়া ও হিদায়াতের পাশাপাশি, আমরা যা ইহুদিদের মুখে শুনতাম তা। আমরা ছিলাম মুশরিক ও মূর্তিপূজারী, আর তারা ছিল আহলে কিতাব এবং আমাদের ছিল না এমন জ্ঞান তাদের ছিল। আমাদের ও তাদের মাঝে শত্রুতা ছিল। যখনই আমরা তাদের কষ্ট দিতাম, তারা বলত: ‘একজন নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমরা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে ‘আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় ধ্বংস করব।’ আমরা তাদের থেকে এই কথাগুলো অনেক শুনতাম। তারপর যখন আল্লাহ তাঁর রাসুল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পাঠালেন এবং তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন, তখন আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী তাঁকে চিনে ফেললাম। ফলে আমরা তাদের আগেই তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম, আর তারা কুফরি করল। আমাদের ও তাদের সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়: ‘আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব এল, যা তাদের কাছে যা ছিল, তা সত্যায়ন করছিল—যদিও পূর্বে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত—তখন যখন তাদের নিকট এমন কিছু এল, যা তারা চিনে ফেলেছিল, তারা তা অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহর লানত কাফিরদের উপর।’” (সূরা আল-বাকারা: ৮৯)

ইবনু আবি হাতিম ও অন্যান্য তাফসীরের সালাফ থেকে বর্ণনাকারীগণ কেবল এই অর্থটিই বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা করে কিছু চাওয়ার কথা উল্লেখ করেননি; বরং তারা শুধু তাঁর আগমনের কথা বলেছে অথবা আল্লাহর নিকট তাঁর প্রেরণ প্রার্থনার কথা বলেছে।

ইবনু আবি হাতিম আবু রাজীন থেকে, তিনি আদ-দাহহাক থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন: “তারা ক্ষমতা ও বিজয় চাইত; তারা বলত, ‘আমরা মুহাম্মদের পক্ষ থেকে সাহায্য করব।’ কিন্তু তারা এমন ছিল না; তারা মিথ্যা বলত।”

মা‘মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর এই বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন: “তারা বলত, ‘একজন নবী অচিরেই আগমন করবেন।’ তারপর যখন তাদের নিকট এমন কিছু এল, যা তারা চিনত, তখন তারা তা অস্বীকার করল।”

ইবনু ইসহাকের সূত্রে মুহাম্মদ ইবনু আবি মুহাম্মদ বর্ণনা করেন: আমাকে ইকরিমাহ (বা সাঈদ ইবনু জুবাইর) ইবনু আব্বাস থেকে খবর দিলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বে ইহুদিরা আওস ও খাজরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে তাঁকে ওসীলা বানিয়ে সাহায্য চাইত। যখন আল্লাহ তাঁকে আরবদের মধ্য থেকে প্রেরণ করলেন, তখন তারা ঈর্ষাবশত কুফরি করল এবং পূর্বে যে কথা বলত তা অস্বীকার করল। তখন মু'আয ইবনু জাবাল, বিশর ইবনু বারা ইবনু মা'রূর এবং দাউদ ইবনু সালামা বললেন: "হে ইহুদিদের দল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ইসলাম কবুল করো। তোমরাই তো আমাদের শিরকী অবস্থায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা বানিয়ে সাহায্য চাইতে এবং তাঁর আগমন ও গুণাবলি বর্ণনা করতে।"

তখন সালাম ইবনু মিশকাম (বনু নাদীর গোত্রের) বলল: "তিনি আমাদের কিছুই আনেননি, যা আমরা চিনতে পারি, আর তিনি সেই ব্যক্তি নন, যাঁর কথা আমরা তোমাদের বলতাম।" এরপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন: "আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব এল, যা তাদের কাছে যা ছিল, তা সত্যায়ন করছিল—যদিও পূর্বে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত—তখন যখন তাদের নিকট এমন কিছু এল, যা তারা চিনে ফেলেছিল, তারা তা অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহর লানত কাফিরদের উপর।" (সূরা আল-বাকারা: ৮৯)

ইবনু ইসহাকের সূত্রে, রবীই ইবনু আনাস থেকে, তিনি আবু আল-আলিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন: ইহুদিরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা বানিয়ে আরব মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইত, বলত: "হে আল্লাহ! এই নবীকে প্রেরণ কর, যাঁর বিবরণ আমাদের নিকট লিখিত রয়েছে, যেন আমরা মুশরিকদের শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হত্যা করতে পারি।" কিন্তু যখন আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে প্রেরণ করলেন এবং তারা দেখল যে তিনি তাদের মধ্য থেকে নন, তখন তারা ঈর্ষাবশত তাঁকে অস্বীকার করল, যদিও তারা জানত যে, তিনি আল্লাহর রাসুল। ফলে আল্লাহ বললেন: "তখন যখন তাদের নিকট এমন কিছু এল, যা তারা চিনে ফেলেছিল, তারা তা অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহর লানত কাফিরদের উপর।"

আর যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে 'আবদুল মালিক ইবনু হারূন ইবনু আনতারাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি বলেন: "খায়বারের ইহুদিরা সাকিনাহ (বাকসু)-এর মাধ্যমে যুদ্ধ করত। যখন তারা যুদ্ধে পরাজিত হত, তখন এই দোয়ায় শরণ নিত: 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সেই মুহাম্মদ, উম্মী নবীর হক্কে চাই, যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদের শেষ যামানায় পূর্ণ করো, যেন তুমি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করো।' এই দোয়া করলে তারা গাতাফান গোত্রকে

পরাজিত করত। কিন্তু যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তারা তাঁকে অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন: 'আর তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই বিজয় প্রার্থনা করত—তখন যখন তাদের নিকট এমন কিছু এল, যা তারা চিনে ফেলেছিল, তারা তা অস্বীকার করল।'" এই হাদীস হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে সংকলন করেছেন এবং বলেছেন: "প্রয়োজনে এটি গ্রহণ করা হয়েছে।" কিন্তু ইলমে রিজাল-এর ইমামগণ এ হাদীসটি সমালোচনা করেছেন, কারণ 'আবদুল মালিক ইবনু হারূন ছিল দুর্বল, বরং পরিত্যক্ত, বরং মিথ্যাবাদী। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন ও অন্যান্য ইমামগণ তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি (ইবনু তাইমিয়্যাহ) বলি: এই হাদীস তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা দুর্বল বা জাল বর্ণনার অন্তর্গত; এবং অনুরূপভাবে, পূর্বে উল্লিখিত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসটিও তাই। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তারা তো আগে থেকেই কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়ের প্রার্থনা করত" — এই আয়াতটি তাফসীর ও সিরাহ শাস্ত্রের সকল আলেমদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে, মদীনার আশেপাশে অবস্থানকারী ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল; যেমন—বনী কাইনুকা, কুরায়যাহ এবং নাদীর। এরা ছিল আওস ও খাজরাজ গোত্রের মিত্র, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। পরে তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করলে তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। প্রথমে তিনি বনী কাইনুকা-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তারপর নাদীরের সঙ্গে—যাদের প্রসঙ্গে সূরা হাশর নাযিল হয়—এরপর খন্দকের বছরে কুরায়যাহর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাহলে কীভাবে বলা যেতে পারে যে, এটি খায়বারের ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যেমনটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন? এটি একজন অজ্ঞ মিথ্যাবাদীর বর্ণনা, যে এমনকি সঠিকভাবে মিথ্যা বলতেও জানত না। আরও স্পষ্ট করে যে, সে উল্লেখ করেছে যে, ইহুদীরা গাতফানদের উপর বিজয় লাভ করেছিল যখন তারা এই দোআর মাধ্যমে প্রার্থনা করেছিল। অথচ এই বিষয়টি তার ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেনি। যদি এটি সত্য হতো, তবে সত্যবাদীরা অবশ্যই তা প্রচার করত।

এটা জানা উচিত যে, এমনকি যদি ওই বর্ণনার ভাষ্য অনুযায়ী, তারা তার মাধ্যমে আল্লাহর শপথ করত কিংবা তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত—তবুও শরীয়তগত কোনো হুকুম স্থির করার জন্য এটির উপর নির্ভর করা যাবে না, কারণ প্রথমত এটি প্রমাণিত নয়, এবং দ্বিতীয়ত, আয়াতে এর কোনো ইঙ্গিতও নেই। আর যদি এটি প্রমাণিতও হতো, তবুও এটা অবধারিত নয় যে, এটি আমাদের জন্য শরীয়ত হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাই ও পিতামাতার সেজদার কথা বলেছেন, এবং

কাহফবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, যখন তারা বলেছিল: "আমরা অবশ্যই তাদের উপরে একটি উপাসনালয় নির্মাণ করব" (সূরা কাহফ: ২১)। অথচ আমাদেরকে কবরের উপর উপাসনালয় নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতে কেবল বলা হয়েছে: "তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়ের প্রার্থনা করত—অতঃপর যখন তাদের কাছে আসল যা তারা চিনে ফেলেছিল, তারা তাতে ঈমান আনেনি।" এটি আল্লাহর অন্য বাণীর অনুরূপ: "তোমরা যদি বিজয় চেয়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই বিজয় তোমাদের নিকট এসেছে" (আল-আনফাল: ১৯)। "ইস্তিফতাহ" অর্থ বিজয় প্রার্থনা করা, যার মানে বিজয়। এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি হাদীস এসেছে: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরীব মুহাজিরদের মাধ্যমে বিজয় প্রার্থনা করতেন", অর্থাৎ তিনি তাদের দোআ দ্বারা সাহায্য চাইতেন; যেমন তিনি বলেছেন: "তোমরা তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে রিযিক ও বিজয় লাভ করো—তাদের দোআ, প্রার্থনা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে।"

এই (ইহুদীদের বিজয়) বোঝানো হতে পারে যে, তারা আল্লাহর নিকট এই দোআ করত যেন তিনি শেষযুগের নবীকে পাঠিয়ে দেন, যেন তারা তাঁর মাধ্যমে শত্রুদের উপর বিজয়ী হতে পারে; এমন নয় যে তারা আল্লাহর নামে শপথ করত বা তাঁর মাধ্যমে প্রার্থনা করত। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন: "অতঃপর যখন তাদের নিকট আসল যা তারা চিনে ফেলেছিল, তারা তাতে ঈমান আনেনি। সুতরাং কাফিরদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।" এমনকি যদি এই অর্থ বোঝানো কোন বর্ণনা না-ও আসত, তবুও কোনো ব্যক্তির জন্য ওই বিতর্কিত ব্যাখ্যা দিয়ে আয়াতকে ব্যাখ্যা করা বৈধ হতো না, কারণ আয়াতে এর কোনো ইঙ্গিত নেই। তাহলে কেমন করে বৈধ হবে যখন এমন বর্ণনাও এসেছে যা এই অর্থকেই সমর্থন করে?

যেসব কথা পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা বিজয়ী হয়েছিল—আমরা প্রমাণ করেছি যে, এটি ব্যতিক্রমী এবং এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ইহুদীদের আরবদের উপর বিজয় লাভ করার কোনো ইতিহাস নেই; বরং তারা আরবদের অধীনেই ছিল এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মিত্রতা গঠন করত; যেমন কুরায়যাহ ছিল আওসের মিত্র এবং নাদীর ছিল খাজরাজের মিত্র। কিন্তু ইহুদীদের আরবদের উপর বিজয় লাভ—এটি অজানা; বরং এর বিপরীতটাই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা যেখানেই পাওয়া যাবে; আল্লাহর দয়া ও মানুষের সাথে চুক্তির ব্যতীত। এবং তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়েছে ও দারিদ্র্যতায় নিপতিত হয়েছে। এর কারণ হলো, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহে কুফর করেছে এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এ কারণেই তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত" (আলে ইমরান: ১১২)। যেহেতু ইহুদীদের উপর সর্বত্র লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা নিজেদের শক্তিতে আরবদের বা অন্যদের উপর বিজয়ী হয়নি; বরং ইসলাম-পূর্ব যুগে তারা কেবল

মিত্রদের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করত। মসীহ (আলাইহিস সালাম) প্রেরিত হওয়ার পর থেকে, তারা তাঁকে অস্বীকার করার পর থেকেই তাদের উপর এই লাঞ্ছনা চাপানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে তুলে নেব, তোমার কাছে নিয়ে যাব, এবং তোমাকে কুফরকারীদের থেকে পবিত্র করব এবং যারা তোমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে কুফরকারীদের উপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিজয়ী করব" (আলে ইমরান: ৫৫)। এবং তিনি বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মারিয়াম তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে?' শিষ্যরা বলল, 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী।' অতঃপর বনি ইসরাঈলের একটি দল ঈমান আনল, আর একটি দল কুফর করল। অতঃপর আমরা ঈমানদারদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল" (আস-সাফ: ১৪)। তারা ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়াসহ অন্যান্য নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) হত্যা করেছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, এবং তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়েছে। কারণ তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে কুফর করেছে এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এ কারণেই তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত" (বাকারা: ৬১)।

অতএব, যদি সাহাবায়ে কেরাম, যেমন উমর ইবনু খাত্তাব ও অন্যান্যগণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশা ও মৃত্যুর পরও তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে শপথ না করে কেবল তাঁর আনুগত্য ও তাঁর সুপারিশের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন—তাহলে মৃত বা অনুপস্থিত সৃষ্টি, হোক সে নবী, ফেরেশতা বা অন্য কেউ—তাদের উদ্দেশ্যে দোআ করাটা কীভাবে বৈধ হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা বলেন: "বল, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া ডাকো, তাদেরকে আহ্বান করো, তারা তোমাদের কষ্ট দূর করতে পারে না এবং তা অন্যদিকে সরিয়েও দিতে পারে না।' যাদেরকে তারা ডাকে, তারাও তাদের রবের দিকে সান্নিধ্যের উপায় খোঁজে—তাদের মধ্যে কে বেশি নিকটবর্তী হতে পারে—এবং তারা আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ" (আল-ইসরা: ৫৬–৫৭)। সালাফদের একটি দল বলেন: কিছু লোক ফেরেশতা ও নবীদেরকে ডাকত—যেমন ঈসা, উযাইর ও অন্যদের। আল্লাহ তা নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, এরা নিজেরাই আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করে, শাস্তিকে ভয় করে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে, এবং তারা ডাকার ব্যক্তিদের কষ্ট দূর করার কিংবা অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তিনি বলেন: "এটা কোনো মানবের জন্য উপযুক্ত নয়—আল্লাহ তাকে কিতাব, হুকুম ও নবুয়ত দান করার পর—যে সে লোকদেরকে বলবে, 'তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিবর্তে'; বরং সে বলবে, 'তোমরা প্রভুর জ্ঞানী বান্দা হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়েছ এবং তা অধ্যয়ন করেছ।' এবং সে কখনোই তোমাদেরকে ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভু বানাতে

বলবে না। সে কি তোমাদেরকে ইসলামের পর কুফরে আহ্বান করবে?" (আলে ইমরান: ৭৯–৮০)।

এই কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবরকে ইবাদতের স্থান বা উৎসবের স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় বলেন: “আল্লাহর লানত হোক ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের ওপর; তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছিল”, তিনি তাদের কাজ থেকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। এটি বুখারী ও মুসলিম দুই সহীহ কিতাবে বর্ণিত। তিনি বলেন: “হে আল্লাহ! আমার কবরকে এমন মূর্তি বানিও না যার উপাসনা করা হয়। আল্লাহর গজব তীব্রতর হয় সেই জাতির উপর, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছিল।” ইমাম মালিক এটি তাঁর মুয়াত্তা'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “তোমরা আমাকে অতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনু মরিয়মের প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করেছিল। আমি তো একজন দাস, অতএব বলো: আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল।” এটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ের সম্মত হাদীস। তিনি বলেন: “তোমরা বলো না: ‘আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ যা চান।’ বরং বলো: ‘আল্লাহ যা চান, অতঃপর মুহাম্মদ যা চান।’” কিছু বেদুঈন বলেছিল: “আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান।” তিনি বলেন: “তোমরা কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানালে? বরং বলো: ‘আল্লাহ যা চান একমাত্র তাই।’”

আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেছেন: “বলুন, আমি নিজের উপকার বা ক্ষতির মালিক নই, তবে আল্লাহ যা চান তাতেই তা ঘটে। যদি আমি গায়েব জানতাম, তাহলে আমি অনেক কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনো অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না।” (সূরা আরাফ: ১৮৮)।

আর তিনি বলেন: “বলুন, আমি নিজের উপকার বা ক্ষতির মালিক নই...” (সূরা ইউনুস: ৪৯)। এবং তিনি বলেন: “তুমি যাকে পছন্দ কর, তাকে তুমি সৎপথে চালাতে পারো না, বরং আল্লাহ যাকে চান তাকেই হিদায়াত দেন।” (সূরা কাসাস: ৫৬)। এবং তিনি বলেন: “এই বিষয়ে তোমার কোনো সিদ্ধান্ত নেই।” (সূরা আলে ইমরান: ১২৮)।

এটাই হচ্ছে তাওহীদের বাস্তবতা, যদিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাবারানী তাঁর “মুআ’জামুল কবীর”-এ বর্ণনা করেছেন: “একজন মুনাফিক মুসলিমদের কষ্ট দিত। আবু বকর বলেন: চলো, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে

গিয়ে এই মুনাফিক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাহায্য চাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: নিশ্চয় সাহায্য আমার মাধ্যমে চাওয়া হয় না; সাহায্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাওয়া হয়।"

সহীহ মুসলিমে আছে, মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে তিনি বলেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কবরগুলোকে ইবাদতের স্থান বানিয়ে ফেলত। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে ইবাদতের স্থান বানিও না, কেননা আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি।" আবার সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে, তিনি বলেন: "কবরের উপর বসো না, আর তার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করো না।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে—এবং আরও অনেক সাহাবীর সূত্রে—তিনি বলেন: "তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা উচিত নয়: এই মসজিদ (মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে আকসা।"

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর জিয়ারতের মান্নত করেছিল। কেউ ইমাম মালিককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: "যদি সে কবর জিয়ারতের মান্নত করে থাকে, তাহলে সে যেন না যায়। আর যদি মসজিদের মান্নত করে থাকে, তাহলে সে যেতে পারে।" তারপর তিনি ওই হাদীস উল্লেখ করেন: "তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা উচিত নয়।" কাজী ইসমাঈল তাঁর "মাবসুত"-এ এটিকে উল্লেখ করেছেন।

যদি কেউ মাখলুকের হক দ্বারা কসম করে, তবে তা শপথ হিসেবে গৃহীত হবে না। এ বিষয়ে নবী, ফেরেশতা বা অন্য কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ, যিনি পরম পবিত্র ও মহান, এমন একমাত্র সত্তা, যাঁর হক এমন যা অন্য কারো সঙ্গে ভাগ করা যায় না—না নবীদের, না অন্য কারো। নবীদের একটি হক আছে, মুমিনদের একটি হক আছে, এবং তাদের কেউ কেউ অন্যদের ওপর হক রাখে। কিন্তু আল্লাহর হক হলো, তারা যেন তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে তাঁকে ইবাদত করে—যেমনটি মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে।

তাঁর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো—তিনি যেন একমাত্র উদ্দেশ্য হন, তাঁর ওপর নির্ভর করা হয়, তাঁর দিকেই

আকাঙ্ক্ষা করা হয় এবং আল্লাহর কোনো সমকক্ষ স্থাপন না করা হয়—না ভালোবাসায়, না ভয়ে, না দোয়া করার ক্ষেত্রে, না সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করতে করতে মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: "সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি?" তিনি বললেন: "তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" কেউ বলল: "আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান।" তিনি বলেন: "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানালে? বরং বলো: 'শুধু আল্লাহ যা চান।'"

আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করেন।" (সূরা নিসা: ৪৮)। আবার বলেন: "তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ করো না।" (সূরা বাকারা: ২২)। "আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দুই উপাস্য স্থাপন করো না; তিনিই একমাত্র উপাস্য, অতএব তোমরা কেবল আমারই ভয় করো।'" (সূরা নাহল: ৫১)। "সুতরাং শুধু আমাকেই ইবাদত করো।" (সূরা আনকাবুত: ৫৬)। তিনি আরও বলেন: "তোমরা যখন কাজ শেষ করো, তখন ইবাদতের জন্য উঠো। আর তোমার রবের দিকেই আকাঙ্ক্ষা করো।" (সূরা ইনশিরাহ: ৭-৮)।

তিনি সূরা ফাতিহায় বলেন: "আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই।" (সূরা ফাতিহা: ৫)। আবার বলেন: "মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ বানায়; তারা তাদের ভালোবাসে, যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। কিন্তু মুমিনরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অধিক দৃঢ়।" (সূরা বাকারা: ১৬৫)। "সুতরাং মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় করো।" (সূরা মায়েদা: ৪৪)। তিনি বলেন: "যারা আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয় এবং তাঁকে ভয় করে, এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।" (সূরা আহযাব: ৩৯)।

এই কারণেই যখন মুশরিকরা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-কে ভয় দেখাতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ বলেন: "তার জাতি তার সাথে বিতর্ক করেছিল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্ক করো, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন? আমি ভয় করি না যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরিক করো, যদি না আমার রব কিছু চান। আমার রব সমস্ত কিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টিত করেছেন; তাহলে কি তোমরা চিন্তা করবে

না? আমি কিভাবে ভয় করব যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক করেছ, অথচ তোমরা ভয় করো না, যে আল্লাহর সাথে তোমরা এমন কিছু শরিক করেছ, যার জন্য তিনি কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি? তাহলে কোন দল বেশি নিরাপদে থাকবে—যদি তোমরা জেনো? যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানে জুলুম মিশ্রিত করেনি—তারাই নিরাপত্তা পাবে এবং তারাই সঠিক পথে চলেছে।'" (সূরা আনআম: ৮০-৮২)।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়—'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি' (আনআম: ৮২)—তখন সাহাবিগণ বললেন: 'আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের ওপর জুলুম করেনি?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'এখানে জুলুম বলতে শিরক বোঝানো হয়েছে—যেমন সৎ বান্দা (লুকমান) বলেছিলেন: "হে বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক একটি মহা জুলুম।" (সূরা লুকমান: ১৩)।

আল্লাহ আরও বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর প্রতি সচেতন থাকে—তারাই সফলকাম।" (সূরা নূর: ৫২)।

আল্লাহ আনুগত্য নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ ও রাসুলের জন্য। আর যিনি রাসুলের আনুগত্য করে, তিনিই আল্লাহর আনুগত্য করেছে। তবে ভয় ও তাকওয়া একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং কাউকে ভয় করা উচিত নয়, আল্লাহ ছাড়া। তিনি বলেন: "সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না।" (সূরা মায়েদা: ৪৪)। তিনি বলেন: "তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (আলে ইমরান: ১৭৫)।

তিনি বলেন: "যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকত এবং বলত: 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদের দেবেন, এবং তাঁর রাসুলও। আমরা তো কেবল আল্লাহর প্রতিই আকাঙ্ক্ষী।'" (সূরা তওবা: ৫৯)। তিনি প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে একত্রে উল্লেখ করেছেন, যেমন বলেছেন: "রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর: ৭)। তবে অনুগ্রহের মালিক আল্লাহ একাই এবং আকাঙ্ক্ষা একমাত্র তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ। তিনি একাই তাদের জন্য যথেষ্ট, তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

সহীহ বুখারীতে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর বাণী সম্পর্কে: “আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।” (আলে ইমরান: ১৭৩)—তিনি বলেন: “ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এটি বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি বলেছিলেন যখন মুনাফিকরা বলেছিল: ‘নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে, তাই তাদের ভয় করো।’ কিন্তু এটা তাদের ঈমান আরও বাড়িয়ে দিল, এবং তারা বলল: ‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।’” (আলে ইমরান: ১৭৩)।

তিনি বলেন: “হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্যও।” (সূরা আনফাল: ৬৪)। এর অর্থ—সালাফ ও খালাফ উভয়ের অধিকাংশের মতে—আল্লাহ একাই আপনার জন্য যথেষ্ট, এবং যাঁরা আপনার অনুসরণ করেছেন তাদের জন্যও যথেষ্ট। যেমনটি প্রমাণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ রাসুলগণ (আলাইহিমুস সালাম) আমাদের ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী, তাঁর আদেশ, নিষেধ, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ব্যাপারে। হালাল তা-ই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হালাল করেছেন, হারাম তা-ই যা তাঁরা হারাম করেছেন, এবং দীন তা-ই যা তাঁরা শরীআত হিসেবে দিয়েছেন।

অতএব, আমাদের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করা, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সন্তুষ্ট করা। তিনি, অতি মর্যাদাশালী, বলেন: "তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদের অধিক হকবান, যাতে তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, যদি তারা ঈমানদার হয়ে থাকে" (সূরা আত -তাওবাহ: ৬২)। এবং তিনি বলেন: "আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো" (সূরা আন-নূর: ৫৪)। এবং তিনি বলেন: "যে রাসুলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো" (সূরা আন-নিসা: ৮০)। এবং তিনি বলেন: "বলুন, (হে মুহাম্মদ), যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, সেই ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসা যাতে তোমরা ক্ষতির আশঙ্কা কর, এবং সেই ঘরবাড়ি যা তোমাদের পছন্দনীয়—এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং তাঁর পথে জিহাদের তুলনায় তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ কার্যকর করেন..." (সূরা আত-তাওবাহ: ২৪)।

দুই সহীহ গ্রন্থে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সব কিছুর চেয়ে অধিক ভালোবাসে; যে কাউকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে; এবং যে ব্যক্তি

কুফরিতে ফিরে যেতে ততটাই অপছন্দ করে যতটা সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" তিনি, অতি মর্যাদাশালী, বলেন: "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে ঈমান আনো, তাঁকে (রাসুলকে) সম্মান করো ও শ্রদ্ধা করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো" (সূরা আল-ফাতহ: ৮-৯)।

ঈমান হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি; সম্মান ও শ্রদ্ধা রাসুলের জন্য—তাঁকে সম্মান করা মানে তাঁকে সাহায্য ও রক্ষা করা; আর সকাল-সন্ধ্যার মহিমা ঘোষণা শুধু আল্লাহর জন্য, কেননা এটি আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, আর ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। অতএব, সালাত কেবল আল্লাহর জন্য, রোজা কেবল আল্লাহর জন্য, হজ কেবল আল্লাহর ঘরে, সফরও কেবল তিনটি মসজিদের জন্য বৈধ, কেননা এই মসজিদসমূহ আল্লাহর নবীগণ আল্লাহর নির্দেশে নির্মাণ করেছিলেন। মান্নত করা কেবল আল্লাহর জন্য, কসম করা কেবল আল্লাহর নামে, দোয়া করা কেবল আল্লাহর কাছে, এবং সাহায্য প্রার্থনাও কেবল আল্লাহর কাছে।

আল্লাহ, যিনি মর্যাদাসম্পন্ন, যেসব জীবজন্তু, উদ্ভিদ, বৃষ্টি, মেঘ এবং অন্যান্য সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন, তিনি সেই সৃষ্টিতে অন্য বান্দাদেরকে মধ্যস্থতাকারী করেননি, যেমন তিনি রাসুলদেরকে বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী করেছেন। বরং, তিনি যা ইচ্ছা, তা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো উপায়েই সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু নেই যা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে; বরং, প্রতিটি কারণের জন্য অপর কোনো কারণের সহযোগিতা আবশ্যক হয়, এবং বিরুদ্ধ উপাদানসমূহ থেকে রক্ষা পেতে হয়, আর এই সব কিছুর উপর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। সুতরাং, যা আল্লাহ চান, তা হয়, আর যা তিনি না চান, তা হয় না।

কিন্তু বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে, রাসুলই একমাত্র আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তাঁর বার্তার মধ্যস্থতাকারী। আর বান্দাদের অন্তরে হিদায়াত দান করা আল্লাহর কাজ, রাসুলের নয়। যেমন তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহ যাকে চান, তাকেই হিদায়াত দেন" (সূরা আল-কাসাস: ৫৬)। এবং তিনি বলেন: "আপনি যদি তাদের হিদায়াতে অত্যন্ত আগ্রহী হন, তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তাকে তিনি হিদায়াত দেন না" (সূরা আন-নাহল: ৩৭)।

তেমনি, নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) দোয়া, ক্ষমাপ্রার্থনা এবং শাফাআত তখনই উপকারে আসে যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে তাতে গ্রহণযোগ্য করে দেন। নচেৎ, যদি রাসুল মুনাফিক ও কাফেরদের জন্য ক্ষমা

চান, তবুও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন: "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা চাইলেন বা না চাইলেন, তাদের কোনো উপকার হবে না; আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না" (সূরা আল-মুনাফিকূন: ৬)।

রাসুলগণ হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধ, প্রতিশ্রুতি-ভয়ভীতি, ও বার্তার ক্ষেত্রের মধ্যস্থতাকারী। সুতরাং, আমাদের কর্তব্য হলো—তাঁদের প্রদত্ত সকল সংবাদকে বিশ্বাস করা, তাঁদের প্রদত্ত সব বিধান ও নির্দেশ মান্য করা। আমাদের উপর দায়িত্ব হলো আল্লাহর সব নবীতে ঈমান আনা, তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করা। যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে গালি দেয়, সে একজন কাফের, ধর্মত্যাগী, যার রক্ত হালাল।

যখন আমরা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বলি, তখন আমরা পরিষ্কার করে বলি যে, নবীগণ ও অন্য মাখলুক আল্লাহর সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। তাই তাঁদেরকে শরীক করা হয় না, তাঁদের উপর ভরসা করা হয় না, তাঁদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় না, আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদেরকে শরীক করা হয় না, তাঁদের ব্যক্তিত্বকে ভিত্তি করে তাওয়াসসুল করা হয় না। বরং, তাওয়াসসুল হয় তাঁদের প্রতি ঈমান, তাঁদের ভালোবাসা, তাঁদের আনুগত্য, তাঁদের প্রতি ওয়ালা, তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, তাঁদের শত্রুদের প্রতি শত্রুতা রাখা, তাঁদের নির্দেশ মানা, তাঁদের সংবাদের প্রতি ঈমান, তাঁদের হালাল করা বিষয় হালাল গণ্য করা, আর হারাম করা বিষয় হারাম গণ্য করার মাধ্যমে।

এই তাওয়াসসুল দুই প্রকার:

প্রথমত: দোয়ার কবুল এবং চাহিদার পূর্ণতার জন্য মাধ্যম হিসেবে তাওয়াসসুল, যেমন সেই তিন ব্যক্তির হাদীস যারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা নিজেদের নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, যাতে আল্লাহ তাদের বিপদ দূর করেন। এর ব্যাখ্যা পূর্বে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর সওয়াব, জান্নাত এবং সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাওয়াসসুল। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নেক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোই পার্থিব ও পরকালীন সফলতার পরিপূর্ণ মাধ্যম। এর একটি উদাহরণ হলো মুমিনদের বক্তব্য: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি, যে বলছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো', অতএব আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গোনাহ মাফ করে দাও, আমাদের

অপরাধ দূর করে দাও এবং আমাদের সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে মৃত্যু দান করো" (সূরা আলে ইমরান: ১৯৩)। তারা দোয়ার পূর্বে ঈমানের কথা বলেছে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের একটি দল ছিল যারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'" (সূরা আল-মু'মিনূন: ১০৯)। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তেমনি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া ও শাফাআতের মাধ্যমেও তাওয়াসসুল করা হয় দুইভাবে:

প্রথমত: তাঁকে দোয়া ও শাফাআতের অনুরোধ করা, যাতে তিনি দোয়া করেন ও শাফাআত করেন; যেমন জীবিত অবস্থায় তাঁকে অনুরোধ করা হতো, এবং কিয়ামতের দিনও করা হবে, যখন মানুষ আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস সালাম এর নিকট যাবে, তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শাফাআতের জন্য যাবে।

দ্বিতীয়ত: তাঁর শাফাআত ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাওয়াসসুল করা, যেমন অন্ধ ব্যক্তির হাদীসে আছে—তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দোয়া ও শাফাআতের অনুরোধ করেছিলেন, তিনি তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন ও শাফাআত করেছিলেন এবং তাঁকে এ দোয়া করতে বলেন: "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার মাধ্যমে চাই এবং তার মাধ্যমে তোমার দিকে ফিরে আসি। হে আল্লাহ! তার শাফাআত আমার জন্য কবুল করো।" তিনি তাঁকে আল্লাহর কাছে তার শাফাআত কবুলের দোয়া করতে বলেন।

এটি সেই ব্যক্তির মতো নয়, যে রাসুলের দোয়া ও শাফাআতের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করে অথচ রাসুল তার জন্য দোয়া করেননি বা শাফাআত করেননি। এটি হলো এমন কিছুর মাধ্যমে তাওয়াসসুল, যা বাস্তবে নেই। তাওয়াসসুল কেবল তখনই বৈধ যখন তিনি দোয়া করেন ও শাফাআত করেন।

এ শ্রেণীতে পড়ে আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ইস্তিসকার সময়ের ঘটনা—তাঁর ও মুসলিমদের তাওয়াসসুল ছিল আল-আব্বাসের দোয়ার মাধ্যমে, এবং তাঁরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরা সবাই মিলে শাফাআতের অনুরোধ করেছিলেন; শুধু আল-

আব্বাস একা দোয়া করেননি।

অতএব, রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে তাওয়াসসুল এবং তাঁর শাফাআতের মাধ্যমে তাওয়াসসুল—উভয়ই ঘটে দোয়া ও চাওয়ার মাধ্যমে, এবং এসব ছাড়া ঘটে না। এই চারটি পদ্ধতি শরীয়াহ্‌তে প্রতিষ্ঠিত, এবং জ্ঞান ও ঈমানসম্পন্নদের মধ্যে কেউ তা অস্বীকার করে না।

ইসলামের ভিত্তি দুটি, তা হলো—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" সাক্ষ্য বাস্তবায়ন। প্রথমটি হলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ না করা—কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর মতো ভালোবাসা না করা, আল্লাহর মতো তার কাছে আশা না করা, আল্লাহর মতো তার ভয় না করা। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে সৃষ্টিকে আল্লাহর সমান মনে করে, সে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে, তার প্রতিপালকের সাথে শিরক করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া আরেক ইলাহ গ্রহণ করেছে—এমনকি যদি সে বিশ্বাস করে যে আসমান ও জমিন একমাত্র আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

কারণ, আরবের মুশরিকরা স্বীকার করতো যে, আসমান ও জমিন আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন: "তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাস করো, 'কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে?', তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'" (সূরা লুকমান: ২৫, সূরা যুমার: ৩৮)। তবুও তারা মুশরিক ছিল, তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছিল। তিনি বলেন: "তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য আছে? বলো, 'আমি সাক্ষ্য দিই না'" (সূরা আনআম: ১৯)। এবং তিনি বলেন: "মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ মনে করে। তারা তাদের ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসায় অধিকতর দৃঢ়" (সূরা আল-বাকারা: ১৬৫)। তারা শিরক করেছিল এই কারণে যে তারা আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই অন্যকে ভালোবাসত, এই কারণে নয় যে তারা বলেছিল তাদের উপাস্যরা আল্লাহর মতো সৃষ্টি করে।

তিনি বলেন: "তারা কি আল্লাহর এমন শরীক সাব্যস্ত করেছে যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের কাছে উভয়ের সৃষ্টি একইরূপ মনে হয়েছে?" (সূরা রা'দ: ১৬)। এটি একটি অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন, যার অর্থ হচ্ছে, না—তারা এমন কোনো শরীক মানেনি যারা আল্লাহর মতো সৃষ্টি করে। তারা স্বীকার করত যে, তাদের উপাস্যরা আল্লাহর মতো সৃষ্টি করতে পারে না। তারা শুধু তাদেরকে সুপারিশকারী ও মধ্যস্থতাকারী মনে করত। তিনি বলেন: "তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে উপাস্য বানিয়েছে যা তাদের কোনো ক্ষতি বা

উপকার করতে পারে না এবং তারা বলে, 'এগুলোই আমাদের আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাও যা তিনি জানেন না আকাশমণ্ডলীতে বা পৃথিবীতে?' তিনি পবিত্র ও মহান, তাঁরা যাদেরকে তাঁর শরীক করে" (সূরা ইউনুস: ১৮)।

ইয়াসীনে বলেন: "আমি কেন উপাসনা করব না সেই সত্তার, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে? আমি কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন উপাস্য গ্রহণ করব, যাঁদের সুপারিশ আমাকে কোনো কাজে আসবে না যদি দয়াময় আমার জন্য কোনো বিপদ চান, আর তাঁরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না? নিশ্চয়ই আমি তাহলে স্পষ্ট পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমাকে শুন" (সূরা ইয়াসীন: ২২-২৫)।

দ্বিতীয়টি হলো—আমরা তাঁর ইবাদত করব তাঁর রাসূলদের মুখে যা বিধিবদ্ধ করেছেন তার মাধ্যমে। আমরা তাঁর ইবাদত করব কেবল সে সমস্ত বিষয়ে যা ফরয বা মুস্তাহাব। আর যা মুবাহ, যদি কেউ তা আনুগত্যের উদ্দেশ্যে করে, তবে তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। দু'আ হল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যে ব্যক্তি মৃতদের বা অনুপস্থিতদের কাছে দু'আ করে এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে—যদিও এ বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ফরয বা মুস্তাহাব হিসেবে আদেশ দেননি—সে ব্যক্তি দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজনকারী এবং জাহান্নাম ও বিশ্বের প্রতিপালকের সঙ্গে শিরককারী, মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য এক পথ অনুসরণকারী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর সৃষ্টজীবদের মাধ্যমে চায় কিংবা সৃষ্টজীবদের কসম দিয়ে তাঁর কাছে কসম করে, সে ব্যক্তি দ্বীনে এমন একটি বিদআতের সূচনা করে যার কোনো দলীল আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি। যদি সে তার বিরোধীদের নিন্দা করে এবং তাদের শাস্তির চেষ্টা করে, তবে সে একজন যালিম, অজ্ঞ ও সীমালঙ্ঘনকারী। যদি সে এসব ভিত্তিতে বিচার করে, তবে সে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিচার করে, এবং মুসলিমদের সর্বসম্মত মতে, তার এ বিচার বাতিল। তাকে এ বিচারের বাস্তবায়নের চেয়ে এ বিচারের জন্য তাওবা করানো এবং তাকে এজন্য শাস্তি দেওয়াই বেশি প্রয়োজন। এ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই; চার ইমামসহ অন্য কারো মধ্যেও কোনো ইখতিলাফ নেই। এ সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বহু খণ্ডে এসেছে, যার মধ্যে এমন একটি গ্রন্থ রয়েছে যাতে আমরা বিচারকদের হুকুমসমূহ, কী দ্বারা তারা বিচার করতে পারে এবং কী দ্বারা করা নিষিদ্ধ, তা নিয়ে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছি। এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, যা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে; তবে এ খণ্ডে তার কোনো অংশ উদ্ধৃত করা উপযুক্ত নয়, কারণ এ আলোচনাটি তাওহীদের মূলনীতি ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর জন্য নির্ধারিত। যার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং যার অধ্যায়সমূহ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তা পৃথক কাগজপত্রে উপস্থাপন করা হবে, যা চিন্তাশীল পাঠক অধিকতর উপকার ও এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানার প্রয়োজনে পর্যালোচনা করতে পারেন।

আর তাওফিক একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

অনুচ্ছেদ

যখন আমি ৭১১ হিজরী সনে মিশরের অঞ্চলে ছিলাম, তখন আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তাওয়াসসুল সম্পর্কে একটি ফাতওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়। আমি সে বিষয়ে একটি বিস্তারিত উত্তর লিখেছিলাম এবং তাতে যে অতিরিক্ত উপকার রয়েছে, সে কারণে আমি তা এখানে সংযুক্ত করতে চাচ্ছি। কেননা এই মূলনীতি—যেগুলো তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং শির্ক ও বাড়াবাড়ির মূল ছেদন করার সঙ্গে সম্পর্কিত—তাদের ব্যাখ্যা যত বেশি হবে এবং তাদের শব্দাবলী যত পরিষ্কার করা হবে, তা ততই "নূরের উপর নূর" হবে। এবং আল্লাহই সাহায্যপ্রার্থী।

প্রশ্ন:

ইসলামের ইমাম, আলিম এবং শাইখদের নিকট যে বিষয়টি চাওয়া হয় তা হলো: নবী ও সৎকর্মশীলদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল ও শাফাআত চাওয়া সম্পর্কে কী বৈধ এবং কী অবৈধ, তা স্পষ্ট করা।

উত্তর:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। মুসলিমরা একমত যে, কিয়ামতের দিন মানুষ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সুপারিশ কামনা করবে এবং আল্লাহ তাঁকে সুপারিশের অনুমতি দিবেন, তখন তিনি সৃষ্টির জন্য শাফাআত করবেন। অতঃপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ঐ বিষয়ে একমত যা সাহাবায়ে কেরাম একমত ছিলেন এবং যা সুন্নত দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রমাণিত: তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের মধ্যে বড় গুনাহগারদের জন্য শাফাআত করবেন, এবং সাধারণ সৃষ্টির জন্যও শাফাআত করবেন। তাঁর এমন কিছু শাফাআত আছে, যা কেবল তাঁর জন্য নির্ধারিত, অন্য কেউ তাতে অংশীদার নয়; এবং কিছু শাফাআত আছে, যাতে অন্যান্য নবী ও নেককারগণ তাঁর সঙ্গে অংশীদার হন, তবে তাতেও তাঁর অংশ সবার চেয়ে উত্তম, কারণ তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর প্রতিপালকের নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। আল্লাহ তাঁকে এমন বহু গুণে ভূষিত করেছেন যা অন্য কোনো নবীকে দেননি; এ

বিষয় বিস্তারিত করা এই স্থানে সম্ভব নয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো "মাকাম মাহমূদ", যাকে সকল প্রথম ও শেষ মানুষ ঈর্ষা করবে। শাফাআতের হাদীসসমূহ বহু, সহিহ ও ব্যাপক; দুই সহীহ (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে বহু হাদীস রয়েছে, এবং সুনান ও মাসানিদ গ্রন্থে তো আরও বিপুল পরিমাণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যাহা ওয়াঈদিয়াহ খারেজী ও মু'তাযিলা দলভুক্ত, তারা বলেছে যে, শাফাআত শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য, তাও কেবল তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য; এবং তাদের কেউ কেউ তো শাফাআত সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। জ্ঞানের লোকেরা সর্বসম্মতভাবে একমত যে, সাহাবাগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর মাধ্যমে শাফাআত ও তাওয়াসসুল করতেন। যেমন সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালিক থেকে প্রমাণিত, 'উমর ইবনুল খাত্তাব, যখন খরা হতো, তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে, আর বলতেন: "হে আল্লাহ! আমরা যখন খরায় পড়তাম, তখন তোমার কাছে আমাদের নবীর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতাম, আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে; এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করছি, সুতরাং আমাদের বৃষ্টি দাও"—অতঃপর বৃষ্টি হতো। সহীহ বুখারীতেই আছে: ইবনে 'উমর বলেন, "আমি যেন এখনো সেই কবির কথা মনে করতে পারি—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি চাচ্ছেন, আর তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে আছেন, যতক্ষণ না প্রতিটি নালা বয়ে যেতে শুরু করে—" 'এক শুভ্র মুখাবয়ব, যার চেহারার কারণে বৃষ্টির মেঘ কামনা করা হয়, এতিমদের আশ্রয়স্থল, বিধবাদের রক্ষাকারী।' 'উমর ইবনুল খাত্তাব কর্তৃক উল্লেখিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা ইস্তিসকার বাকি হাদীসগুলিতে ব্যাখ্যা সহ এসেছে, এবং তা তাঁর মাধ্যমে শাফাআত চাওয়ার মতোই। অর্থাৎ, তাঁকে দোয়ার অনুরোধ জানানো, তাঁর শাফাআত কামনা করা, এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করা যেন তিনি তাঁর দোয়া ও শাফাআত গ্রহণ করেন। আমরা তাঁকে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী ও প্রার্থনাকারী হিসেবে পেশ করি—আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোন—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তদ্রূপ, মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান যখন শামে খরার সম্মুখীন হন, তখন তিনি ইয়াজীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-জুরাশীর মাধ্যমে বৃষ্টির দোয়া করলেন, আর বললেন: "হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সুপারিশ করছি—এবং তোমার নিকট তাওয়াসসুল করছি—আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির মাধ্যমে। হে ইয়াজীদ, তুমি তোমার হাত উঠাও!" তিনি হাত উঠালেন, দোয়া করলেন, এবং সকলেই দোয়া করল—অতঃপর বৃষ্টি হলো।

এই কারণেই উলামাগণ বলেছেন: ধর্মপ্রাণ ও নেককারদের মাধ্যমে বৃষ্টির দোয়া চাওয়া সুন্নত; আর যদি তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বাইতভুক্ত হয়, তবে তা আরও উত্তম। এই তাওয়াসসুল ও শাফাআত চাওয়া আসলে তাঁর দোয়ার মাধ্যমে তাওয়াসসুল; অর্থাৎ, তিনি যিনি তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করছেন, তাঁর জন্য দোয়া করবেন, এবং লোকজন তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে দোয়া করবে। যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে খরার সময় এক বেদুইন এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসুল! ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে, পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের মুক্তি দেন।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত তুললেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! আমাদের মুক্তি দাও! হে আল্লাহ! আমাদের মুক্তি দাও! হে আল্লাহ! আমাদের মুক্তি দাও!" তখন আকাশে একটিও মেঘ ছিল না, কিন্তু সাগরের দিক থেকে মেঘ উত্থিত হলো, এবং এক সপ্তাহ ধরে এমন বৃষ্টি হলো যে তারা সূর্য দেখতে পায়নি। পরে সেই বেদুইন বা অন্য কেউ এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসুল! রাস্তা কেটে গেছে, ভবন ধ্বসে পড়েছে; আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি এটি আমাদের উপর থেকে সরিয়ে দেন।" তখন তিনি হাত তুলে বললেন: "হে আল্লাহ! আমাদের চারপাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলায়, গিরিখাতে, গাছপালা ও উপত্যকার উপর বর্ষণ করো।" অতঃপর তা মদিনা থেকে এমনভাবে সরে গেল যেন কোনো কাপড় সরিয়ে নেওয়া হয়। এই হাদীস দুই সহীহ ও অন্যান্য গ্রন্থে সুপরিচিত।

আরেকটি হাদীসে, যা সুনান আবূ দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে, তাতে আছে: একজন লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বলল: "আমরা আল্লাহর মাধ্যমে আপনার নিকট সুপারিশ চাই, এবং আপনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সুপারিশ চাই।" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন, এমনকি তাঁর সাহাবাদের মুখমণ্ডলে ক্ষোভ প্রকাশ পেল, এবং তিনি বললেন: "তোমার ধ্বংস হোক! তোমরা কি জানো আল্লাহ কী? নিশ্চয়ই আল্লাহর মাধ্যমে তাঁর কোনো সৃষ্টির নিকট সুপারিশ চাওয়া যায় না। আল্লাহর মর্যাদা এতটাই মহান।" এটি প্রমাণ করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের বক্তব্যে কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে তাওয়াসসুল চাওয়ার অর্থ হলো, তাঁর দোয়া ও শাফাআতের মাধ্যমে তাওয়াসসুল চাওয়া; এটি তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে চাওয়া নয়। কারণ যদি এটি ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে হতো, তবে আল্লাহর মাধ্যমে সৃষ্টিকে চাওয়াই বেশি উপযুক্ত হতো, সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহকে চাওয়ার চেয়ে। কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য ছিল দোয়া চাওয়া, তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আমরা আল্লাহর মাধ্যমে তোমার নিকট সুপারিশ চাই"—এই কথাটি তিনি অপছন্দ করলেন; কিন্তু বললেন "আমরা তোমার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সুপারিশ চাই"—এ কথাটি তিনি অপছন্দ করলেন না।

কারণ, সুপারিশকারী সেই ব্যক্তিকে অনুরোধ করে, যাঁর নিকট সুপারিশ করা হচ্ছে, যেন তিনি দরখাস্তকারী ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করেন; আর আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, কখনোই তাঁর সৃষ্টির কারো নিকট অন্য সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণ করার অনুরোধ করেন না। যদিও কিছু কবি আল্লাহর মাধ্যমে সুপারিশ চাওয়ার কথা বলেছে, যেমন কেউ বলেছে: "আমার সুপারিশকারী তোমার নিকট আল্লাহ, যাঁর কোনো রব নেই, আর কোনো উপায় নেই এই সুপারিশকারীকে ফিরিয়ে দেওয়ার।" এটা নিন্দনীয় কথা, কোনো আলিম তা বলেননি। তদ্রূপ, কিছু ইত্তিহাদবাদী বলেছে যে, তারা আল্লাহর মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সুপারিশ চায়। এ উভয়টি ভুল ও গোমরাহী। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-ই হলেন যাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়, যাঁকেই ডাকা হয়, যাঁকে আকাশ ও জমিনের সবকিছু প্রার্থনা করে। তিনি, বরকতময় ও মহান, তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দেন, আর তারা তা পালন করে। সৃষ্টির মধ্যে যাঁর আনুগত্য আবশ্যক, তা কেবল এজন্য যে, সেটি আল্লাহর আনুগত্য। রাসুলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ পৌঁছে দেন; যে তাঁদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল; আর যে তাঁদের আনুগত্যের অঙ্গীকার করল, সে আল্লাহর সঙ্গেই অঙ্গীকার করল। আল্লাহ বলেন: "আর আমরা কোনো রাসুলকে পাঠাইনি, কিন্তু এই কারণে যে, সে যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য করা হয়" (আন-নিসা: ৬৪)। এবং তিনি বলেন: "যে রাসুলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে" (আন-নিসা: ৮০)। আলিমদের ও শাসকগণের মধ্যে যারা দায়িত্বে, তাদের আনুগত্য কেবল তখনই আবশ্যক যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহীহ হাদীসে বলেন: "একজন মুসলিমের উপর শোনা ও মান্য করা আবশ্যক, তার কষ্ট ও স্বস্তিতে, উৎসাহ ও অনীহায়, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেওয়া হয়। আর যদি তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে না শোনার আছে, না মানার।" এবং তিনি বলেন: "সৃষ্টির অবাধ্যতায় স্রষ্টার কোনো আনুগত্য নেই।"

যাহোক, যিনি সুপারিশ করেন, তিনি একজন অনুরোধকারী, যার অনুরোধ মানা অপরিহার্য নয়—এমনকি যদি তিনি মহান ব্যক্তিও হন। সহীহ হাদীসে এসেছে: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাহকে তাঁর স্বামীকে রেখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং আলাদা না হতে বলেছিলেন, যখন বারীরাহ মুক্তি পান এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পছন্দের স্বাধীনতা দেন। তিনি তাঁর স্বামীর থেকে আলাদা হওয়াকেই বেছে নেন। তাঁর স্বামী তাঁকে ভালোবাসতেন এবং কাঁদতে শুরু করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বামীকে রেখে দেওয়ার জন্য বলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বলেন: 'না, আমি শুধু অনুরোধ করছি।' তিনি কেবল জিজ্ঞেস করেন: 'আপনি কি আদেশ দিচ্ছেন?' আর তিনি বলেন: 'আমি তো শুধু অনুরোধ করছি।' কারণ, মুসলিমদের মধ্যে এটি

সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তাঁর আদেশ মানা অপরিহার্য, কিন্তু তাঁর অনুরোধ মানা অপরিহার্য নয়। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুরোধ না মানার কারণে বারীরাহকে দোষারোপ করেননি। অতএব, অন্য সৃষ্টির অনুরোধ মানা তো আরো অনুরূপভাবে অপরিহার্য নয়।

স্রষ্টার ব্যাপারে—তাঁর আদেশ এত উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ যে, তিনি কোনো সৃষ্টির কাছে অনুরোধকারী হন, তা কল্পনাও করা যায় না। বরং, তিনি—পরম পবিত্র তিনি—এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে, কেউ তাঁর কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত সুপারিশ করতে পারে না যতক্ষণ না তিনি অনুমতি দেন। তিনি বলেছেন: "তারা বলে, 'রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র—বরং তারা তো সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে কোনো কথা বলেনা, এবং তারা তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে আছে এবং যা কিছু তাদের পশ্চাতে আছে, এবং তারা শুধু তার পক্ষেই সুপারিশ করতে পারে যাকে তিনি অনুমোদন দেন, আর তারা তাঁর ভয়ে শঙ্কিত। আর তাদের কেউ যদি বলে, 'আমি তো তাঁর পাশাপাশি এক উপাস্য,' তবে তাকে আমরা জাহান্নাম দিয়ে প্রতিদান দেব। এভাবেই আমরা জালিমদের প্রতিদান দেই।" (সূরা আম্বিয়া: ২৬-২৯)।
উপরোক্ত হাদীসটি ইঙ্গিত করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতেন—অর্থাৎ, তাঁকে অনুরোধ করা হতো যেন তিনি তাঁর প্রভুর নিকট দোয়া করেন—এ দুনিয়ায় ও আখিরাতে। আখিরাতে সৃষ্টিরা তাঁকে অনুরোধ করবে যেন তিনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন যাতে তিনি বিচার করেন এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান। তিনি তাঁর উম্মতের বড় গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করবেন; কিছু লোকের জন্য যাদের জাহান্নামে প্রবেশ প্রাপ্য ছিল, যেন তারা এতে প্রবেশ না করে, আবার কিছু লোক যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদের যেন বের করে আনা হয়।

উম্মতের অধিকাংশের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্যশীল ও সওয়াবপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করবেন। তবে অনেক বিদআতপন্থী, যেমন খারিজি ও মু'তাজিলারা, বড় গুনাহগারদের জন্য তাঁর সুপারিশ অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে: তিনি বড় গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করবেন না। কারণ, তাদের মতে, আল্লাহ বড় গুনাহগারদের ক্ষমা করেন না, এবং তাদের জাহান্নাম থেকে বের করেন না, না সুপারিশের মাধ্যমে, না অন্য কোনোভাবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, মুসলিমদের ইমামগণ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করবেন, এবং ঈমানদারদের কেউ চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না; বরং যার অন্তরে একটি পরমাণু পরিমাণ বা সরিষা দানার সমান ঈমান থাকবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

তাঁর জীবদ্দশায় মানুষ তাঁর কাছে দোয়া চেয়েছে, এবং তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। তাই তাঁদের তাওয়াসসুল ছিল তাঁর দোয়ার মাধ্যমে; এবং তাঁর মাধ্যমে ইস্তিশফা ছিল তাঁর কাছে সুপারিশ চাওয়া—আর সুপারিশ হল দোয়া।

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে তাওয়াসসুল—হাঁজির সময়, অনুপস্থিতির সময়, বা ওফাতের পর—যেমন তাঁর শানে কসম খাওয়া, অথবা তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে চাওয়া, তাঁর দোয়ার মাধ্যমে নয়—এ ধরনের কাজ সাহাবা ও তাবেয়ীনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বরং, যখন খরা দেখা দিত, তখন উমর ইবনে খাত্তাব, মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান ও তাঁদের সঙ্গী সাহাবা ও তাবেয়ীন জীবিতদের মাধ্যমে বর্ষণ চেয়েছেন, যেমন আল-আব্বাস ও ইয়াজিদ ইবনে আসওয়াদ। তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের নিকট গিয়ে তাঁর মাধ্যমে বর্ষণ চাওয়া, তাওয়াসসুল বা সুপারিশ করেননি। বরং, তাঁরা বিকল্প হিসেবে জীবিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে চেয়েছেন। দোয়ায় তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ পাঠ করতেন। উমর বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করতাম, আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করছি, অতএব আমাদের বৃষ্টি দাও।" তাঁরা এটিকে পূর্বের বিকল্প বানিয়েছেন, কারণ পূর্বের সেই শরঈ পদ্ধতিতে তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা তখন আর সম্ভব ছিল না।

তাঁরা চাইলে তাঁর কবরের কাছে গিয়ে তাওয়াসসুল করতে পারতেন, অথবা মরুভূমিতে দোয়ার সময় বলতে পারতেন, "তোমার নবীর মাধ্যমে আমরা চাই" বা "তোমার নবীর মর্যাদার কসম করে চাই" ইত্যাদি—যেমন অনেক লোক করে থাকে। কেউ কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে যে তিনি বলেছেন: "যদি আল্লাহর কাছে কিছু চাও, তাহলে আমার মর্যাদার কসম করে চাও; কারণ আমার মর্যাদা আল্লাহর কাছে মহান।" কিন্তু এই হাদীসটি মিথ্যা। মুসলিমদের নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস গ্রন্থে এটি নেই, কোনো মুহাদ্দিস এটি উল্লেখও করেননি। যদিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা আল্লাহর কাছে সকল নবী ও রাসূলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি পবিত্র আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন যে, মূসা ও 'ঈসা (আলাইহিমাস সালাম) তাঁর কাছে সম্মানিত ছিলেন। তিনি বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মূসার প্রতি যেরূপ কষ্ট দিয়েছিলে, সে রকম করো না; অতঃপর আল্লাহ তাঁকে যেটা তারা বলেছিল তার থেকে মুক্ত করলেন। আর তিনি আল্লাহর কাছে সম্মানিত ছিলেন।" (সূরা আহযাব: ৬৯)। এবং তিনি বলেন: "যখন ফেরেশতারা বলেছিল, 'হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি শব্দের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে 'মসীহ ঈসা ইবনে

মারইয়াম'—তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান এবং আল্লাহর নিকটবর্তী।'" (সূরা আলে ইমরান: ৪৫)

যদি মূসা ও ঈসা আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হন, তাহলে তো আদম সন্তানের নেতা—যিনি প্রশংসিত মাকামের অধিকারী, যেটির জন্য প্রথম ও শেষ সকলেই তাঁকে হিংসা করবে; যিনি কাউসারের অধিকারী, যাঁর হাউজের পানির পাত্রগুলো আকাশের নক্ষত্রসমান; যার পানি দুধের চেয়ে শুভ্র ও মধুর চেয়ে মিষ্টি—এবং যে একবার পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না—তাঁর মর্যাদা তো অনন্য। তিনি কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবেন, যখন আদম ও 'উলুল 'আযম নবীরা—নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)—সুপারিশ থেকে বিরত থাকবেন, তখন তিনি এগিয়ে আসবেন। তিনি পতাকার অধিকারী হবেন—আদম ও তাঁর পরে যারা আছে, সবাই তাঁর পতাকার নিচে থাকবে। তিনি আদম সন্তানের নেতা ও আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। নবীগণ একত্র হলে তিনিই তাঁদের ইমাম হবেন এবং প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলবেন। তাঁর মর্যাদা মহান। তাঁর ওপর ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

তবে, সৃষ্টির মর্যাদা স্রষ্টার নিকট যেমন, তেমন আরেক সৃষ্টির কাছে তার মর্যাদা নয়। কেউ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে না: "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে রহমানের কাছে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন এবং নির্ভুলভাবে হিসাব করেছেন।" (সূরা মারইয়াম: ৯৩-৯৪)

এছাড়া তিনি বলেন: "মসীহ কখনো আল্লাহর বান্দা হওয়াকে অসম্মানজনক মনে করেননি, এবং নিকটবর্তী ফেরেশতারাও নয়। আর যারা তাঁর ইবাদতকে অবজ্ঞা করে ও অহংকার করে, তিনি তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্রিত করবেন। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাদের পুরস্কার সম্পূর্ণরূপে প্রদান করবেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদের আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা অবজ্ঞা করে ও অহংকার করে, তিনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তারা আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা নিসা: ১৭২-১৭৩)

একজন সৃষ্টি অপর সৃষ্টির নিকট অনুমতি ছাড়াই সুপারিশ করতে পারে, তাই সে তার সাথে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে অংশীদার হয়। কিন্তু আল্লাহ, পরম পবিত্র তিনি—তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি বলেন: "বলুন, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য মনে করো, তাদের ডাকো।' তারা আসমান ও জমিনে পরিমাণমাত্রও

ক্ষমতার অধিকারী নয়, এবং সেখানে তাদের কোনো অংশ নেই, এবং তাদের মধ্য থেকে তাঁর কোনো সাহায্যকারীও নেই। আর সুপারিশ কোনো উপকারে আসবে না, তবে তার জন্য যার জন্য তিনি অনুমতি দেন।" (সূরা সাবা: ২২-২৩)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক সহীহ হাদীসে এসেছে, যাতে তিনি কবরগুলোকে উপাসনার স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন, এবং যারা তা করে তাদের উপর লা'নত করেছেন, এবং তাঁর কবরকে উৎসবের স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। কারণ, আদম সন্তানের মধ্যে প্রথম শিরক হয়েছিল নূহ আলাইহিস সালামের কওমের মাঝে। ইবনে আব্বাস বলেন: "আদম ও নূহের মাঝে দশ প্রজন্ম ছিল, এবং সবাই ইসলামের উপর ছিল।" দুই সহীহ গ্রন্থে প্রমাণিত যে, নূহ হলেন প্রথম রাসূল যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর কওম সম্পর্কে বলেছেন: "তারা বলল, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনো ত্যাগ করো না, আর ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূস, ইয়াঊক ও নসরকেও ত্যাগ করো না।' তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে।" (সূরা নূহ: ২৩-২৪)

সালাফদের মধ্যে একাধিক জন বলেছেন: এরা ছিল নূহের কওমের নেককার লোক।

যখন তারা মারা গেল, তখন জীবিতরা তাদের কবরগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। সময় অতিবাহিত হলে তারা তাদের পূজা করতে লাগল। সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এ মূর্তিগুলো আরবদের মধ্যে পৌঁছেছিল এবং তিনি সেইসব আরব গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে এসব মূর্তি ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) যখন জেনে গেলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে ইবাদতের স্থান বানানো নিষিদ্ধ করে শিরকের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন—যদিও নামায আদায়কারী শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করুক—যেমন তিনি সূর্য উদয় হওয়ার সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ করেছেন, যেন কেউ সূর্যপূজারীদের অনুরূপ না হয়, যদিও নামায আদায়কারী কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে—আর যেহেতু যে ব্যক্তি মৃতের মাধ্যমে বা তার কবরের নিকটে দোয়া করতে চায়, সে সেই ব্যক্তির তুলনায় শিরকের অধিক নিকটবর্তী, যে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নামায আদায় করে, তাই সাহাবায়ে কিরাম তা করেননি।

তদ্রূপ, সাহাবায়ে কিরাম জানতেন যে, তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল শুধু তাঁর প্রতি ঈমান, তাঁর আনুগত্য, তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি ওয়ালায়াতের মাধ্যমে হয়, অথবা তাঁর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে। এজন্য তাঁরা কেবল তাঁর ব্যক্তিকে আলাদা করে (ঈমান বা দোয়া ছাড়া) মাধ্যম বানিয়ে তাওয়াসসুল করেননি। যেহেতু

সাহাবায়ে কিরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) এগুলোর কিছুই করেননি এবং এমন কোনো দোয়াও করেননি—অথচ তাঁরা আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কী পছন্দ করেন তা অধিক জানেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে দোয়াগুলো করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে অধিক জানেন, এবং কোন দোয়া অধিক কবুলযোগ্য তাও জানেন—বরং তাঁরা আল-আব্বাস ও অন্যদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন, অথচ তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমান ছিলেন না—তাঁরা যেহেতু উত্তমের পরিবর্তে নিম্নকে মাধ্যমে নিয়েছেন, তা প্রমাণ করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল শরীয়তসম্মত ছিল না।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "হে আল্লাহ! আমার কবরকে এমন মূর্তি বানিও না যা পূজিত হয়। আল্লাহর গজব তীব্রতর হয় সেই জাতির উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে।" মালিক তাঁর মুওয়াত্তা'য় এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: "আমার কবরকে উৎসবস্থল বানিও না, বরং তোমরা যেখানে আছ, সেখান থেকেই আমার উপর দরুদ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে যায়।" সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় বলেছিলেন: "আল্লাহর লানত সেই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর, যারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে।" তিনি যা করেছিলেন, তার থেকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "যদি এই আশঙ্কা না থাকত, তাহলে তাঁর কবর উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো, কিন্তু তিনি অপছন্দ করতেন তা ইবাদতের স্থান বানানো হোক।" সহীহ মুসলিমে জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলেছিলেন: 'আমি আল্লাহর সামনে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে খলীল বানানো থেকে। যদি আমি কাউকে খলীল বানাতাম, তবে আবু বকরকে খলীল বানাতাম। বরং আল্লাহ আমাকে খলীল বানিয়েছেন যেমন তিনি ইবরাহীমকে খলীল বানিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীরা কবরগুলোকে ইবাদতের স্থান বানাতো। জানো! তোমরা কবরগুলোকে ইবাদতের স্থান বানিও না, আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি।'"

সহীহ হাদীসে তিনি বলেন: "তোমরা আমার প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করো না যেমন খ্রিস্টানরা 'ঈসা ইবনু মারইয়াম'-এর প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করেছিল। আমি তো কেবল একজন বান্দা। তাই বলো: 'আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল।'" তিরমিযীতে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

একজন মানুষকে দোয়া শিখিয়েছিলেন: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে তোমার নিকট তাওয়াসসুল করি। হে মুহাম্মাদ! হে আল্লাহর রাসুল! আমি তোমার মাধ্যমে আমার প্রয়োজনে আমার প্রতিপালকের নিকট তাওয়াসসুল করছি, যেন তিনি তা পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ! তাঁর পক্ষ থেকে আমার জন্য সুপারিশ কবুল করো।'" নাসাঈ একই দোয়ার অনুরূপ শব্দ বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ-এ উসমান ইবনু হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: "একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল: 'হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করে দেন।' তিনি বললেন: 'যদি তুমি চাও, আমি দোয়া করবো, আর যদি তুমি ধৈর্য ধরো, তবে সেটাই তোমার জন্য উত্তম।' সে বলল: 'আপনি দোয়া করুন।' অতঃপর তিনি তাকে ওযু করতে বললেন, ভালোভাবে ওযু করতে বললেন, তারপর এই দোয়া পড়তে বললেন: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। হে আল্লাহর রাসুল! হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার মাধ্যমে আমার প্রয়োজনে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরছি যেন তা পূর্ণ হয়। হে আল্লাহ! তাঁর পক্ষ থেকে আমার জন্য সুপারিশ কবুল করো।'" তিরমিযী বলেন: "এই হাদীস হাসান সহীহ।" নাসাঈ উসমান ইবনু হুনাইফ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: "এক অন্ধ ব্যক্তি বলল: 'হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।' তিনি বললেন: 'যাও, ওযু করো, তারপর দুই রাকাআত নামায পড়ো, তারপর বলো: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার মাধ্যমে আমার প্রভুর নিকট ফিরছি যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। হে আল্লাহ! তাঁর পক্ষ থেকে আমার জন্য সুপারিশ কবুল করো।'" সে ফিরে এলো, আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে বলেন: রাওহ আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, শু'বা আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন উমাইর ইবনু ইয়াজীদ আল-খাতমী আল-মাদানী থেকে, তিনি বলেন: আমি উমারাহ ইবনু খুজাইমাহ ইবনু সাবিতকে উসমান ইবনু হুনাইফ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি: "একজন অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল: 'হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করে দেন।' তিনি বললেন: 'যদি তুমি চাও, আমি তা বিলম্বিত করব, আর তা তোমার আখিরাতের জন্য উত্তম। আর যদি তুমি চাও, আমি দোয়া করবো।' সে বলল: 'না, বরং আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।' অতঃপর তিনি তাকে ওযু করতে বললেন, দুই রাকাআত নামায পড়তে বললেন, তারপর এই দোয়া

করতে বললেন: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার মাধ্যমে আমার প্রয়োজনে আমার প্রভুর নিকট ফিরে আসছি যেন তা পূর্ণ হয়। হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে তাঁর সুপারিশ কবুল করো এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমার সুপারিশ কবুল করো।' তিনি বলেন: লোকটি তা করল এবং সুস্থ হয়ে গেল।"

এই হাদীসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দোয়ায় তাওয়াসসুল করা হয়েছে। কিছু লোক বলে: এর দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে সব অবস্থায় তাওয়াসসুলের অনুমতি প্রমাণিত হয়, জীবিত থাকুক বা ইন্তিকালের পর। যারা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সত্তার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করে, তারা এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে। তারা মনে করে, অন্ধ লোকটি ও সাহাবীগণ জীবিত অবস্থায় তাঁর মাধ্যমে যে তাওয়াসসুল করতেন, তা ছিল আল্লাহর কাছে তাঁর শপথ করে চাওয়া, বা তাঁর সত্তার মাধ্যমে প্রার্থনা করা। তারা মনে করে, তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করার জন্য তাঁর দোয়া চাওয়া কিংবা তাঁর আনুগত্য জরুরি নয়। তাই তাদের মতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করুক বা না করুক, উভয় অবস্থাতেই তাওয়াসসুল সঠিক; তারা উভয়েই তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করেছে। তারা মনে করে, যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, সে সেই অন্ধ লোকটির মতোই তাওয়াসসুল করেছে এবং এই দোয়া সকলের জন্য শরীয়তসম্মত।

তাদের এই বক্তব্য শরীয়ত ও বাস্তবতা—উভয়ের বিরোধী। এটি না আল্লাহর শরীয়তের সাথে মিল রাখে, না আল্লাহর সৃষ্টির প্রকৃতির সাথে।

মানুষদের মধ্যে এমন কেউ বলে: এটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনা। এ ঘটনার উপর ভিত্তি করে সে ধরনের ঘটনায় হুকুম প্রয়োগ হবে, যা মূল বিষয়ে এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। শরীয়ত ও বাস্তবতা উভয় দিক থেকেই এমন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন এবং যার জন্য করেননি। তাদের সমান করা বৈধ নয়। অন্ধ লোকটির জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করেছিলেন, এজন্য সে তার দোয়ায় বলেছে: "হে আল্লাহ! তাঁর সুপারিশ আমার জন্য কবুল করো।" এতে প্রমাণিত হয়, তিনি তার জন্য সুপারিশকারী ছিলেন। তার উক্তি: "যদি তুমি চাও, ধৈর্য ধরো, আর যদি চাও, আমি তোমার জন্য দোয়া করবো"—এবং অন্ধ ব্যক্তির উক্তি: "আপনি আমার জন্য দোয়া করুন"—এতে প্রমাণ হয়, সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দোয়ার আবেদন করেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজেও নামায ও দোয়া করতে বলেছিলেন এবং নিজের দোয়ায় এ কথা বলতে বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! তাঁর সুপারিশ আমার জন্য কবুল

করো।” এটি প্রমাণ করে, “আমি তোমার কাছে চাই এবং তোমার নবী মুহাম্মাদের মাধ্যমে তোমার দিকে ফিরে আসছি”—এই বাক্যের অর্থ হল: তাঁর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে, যেমন উমর বলেছিলেন: “হে আল্লাহ! যখন আমাদের উপর খরা দেখা দিত, আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতাম এবং তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে।” উভয় হাদীসের অর্থ একই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবিত অবস্থায় একজন মানুষকে তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল শিখিয়েছিলেন, যেমন উমর বলেছিলেন, আমরা খরার সময় তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতাম। অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করার পর তাঁরা তাঁর পরিবর্তে অন্যদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন। যদি জীবিত ও ইন্তিকালের পর তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল সমান হতো, এবং যে ব্যক্তি তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করছে অথচ তিনি তার জন্য দোয়া করেননি, সে সেই ব্যক্তির সমান হতো যার জন্য তিনি দোয়া করেছিলেন, তাহলে সাহাবাগণ তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতেন না—অথচ তিনি সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর প্রভুর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি।

তদ্রূপ, যদি কোনো অন্ধ ব্যক্তি তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করতো অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোআ না করতেন, এবং এই ব্যক্তি সেই অন্ধ ব্যক্তির অনুরূপ হতেন যার জন্য তিনি দোআ করেছিলেন, তাহলে সাহাবিদের মধ্যকার অন্ধ ব্যক্তিরা, অথবা তাদের কেউ কেউ, সেই অন্ধ ব্যক্তির মতোই করতেন। কিন্তু তারা এটা না করে অন্য কিছু করেছেন—যদিও তারা অগ্রগামী সালাফ, মুহাজির ও আনসার এবং তাদের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত, যারা আমাদের চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হক, কোন দোআ শরীয়াহ্ সম্মত ও উপকারী, কোনটি নয় এবং কোনটি অন্যটির তুলনায় অধিক উপকারী—এসব বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন। তারা এমন এক সময়ে ছিলেন যখন দরকার ছিল, ছিল দুর্ভিক্ষ ও খরা, ছিল বিপদ মোচনের, কষ্ট লাঘবের ও বৃষ্টির জন্য সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন। এই অবস্থায় তাদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত হয়, তা হলো: শরীয়াহ্ সম্মত হলো তারা যা করেছিল, না যে তারা যা পরিত্যাগ করেছিল।

এই কারণেই ফিকহবিদগণ তাঁদের ইস্তিস্কা সংক্রান্ত গ্রন্থে সাহাবিদের কর্মকে উল্লেখ করেছেন, তাদের পরিত্যাগকৃত কাজকে নয়। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা মানে তাঁর কাছে দোআ ও সুপারিশ চাওয়া, আর এটি এমনই এক প্রকার যা শরীয়াহ্ অনুমোদিত। মুসলিমরা তাঁর জীবদ্দশায় বারবার তাঁর নিকট দোআ চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবিরা তাঁর কাছে কোনো দোআ চাননি—না তাঁর কবরের পাশে, না অন্য কোথাও—যেমনটি বহু লোক নেককারদের কবরের পাশে করে থাকে; তাদের কেউ মৃতের নিকট নিজের প্রয়োজন চায় অথবা আল্লাহর

নামে মৃতের মাধ্যমে শপথ করে, ইত্যাদি।

যদিও পরবর্তী যুগের কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তবুও দোআ চাওয়া মুসলিমদের একে অপরের কাছে চাওয়ার বিষয় এবং তা শরীয়াহ্   সম্মত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন—যখন তিনি ওমরাহর অনুমতি চাইছিলেন—"হে আমার ভাই, আমাদেরকে তোমার দোআ থেকে ভুলে যেয়ো না"—যদি হাদীসটি সহীহ হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইস আল-কারনীর ব্যাপারেও বলেছিলেন যে তাকে দোআ চাওয়া হোক, যদিও যিনি তা চাচ্ছিলেন (উমর) তিনি উয়াইসের চেয়ে উত্তম ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সহীহ হাদীসে বলেছেন: "যখন মুয়াজ্জিনের ধ্বনি শুনবে, তার কথার অনুসরণ করো, এরপর আমার উপর দরুদ পাঠ করো, কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার দরুদ পাঠ করেন। এরপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য আল-ওয়াসীলাহ চাও, কেননা এটি জান্নাতে এমন একটি মর্যাদা যা কেবল আল্লাহর এক বান্দার উপযোগী, আর আমি আশা করি আমি সেই বান্দা হবো। সুতরাং যে আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ চায়, তার জন্য কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ হালাল হবে।"

তবে তাঁর উম্মাহর কাছে দোআ চাওয়া কোনো সৃষ্টির কাছে প্রয়োজন চাওয়ার মতো নয়; বরং এটা তাঁর উম্মাহকে শিখানো—যা তাদের দ্বীনের জন্য উপকারী। এই শিক্ষা এবং তাতে আমলের ফলে আল্লাহ তাঁর পুরস্কার বৃদ্ধি করেন। আমরা যখন তাঁর উপর একবার দরুদ পাঠ করি, আল্লাহ আমাদের উপর দশবার দরুদ পাঠ করেন, আর আমরা যখন আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ওয়াসীলাহ চাই, তখন কিয়ামতের দিনে আমাদের জন্য তাঁর সুপারিশ বৈধ হয়ে যায়। আমাদের আমলের জন্য আমরা যে সাওয়াব পাই, তিনি তা সমপরিমাণ সাওয়াব পান, আমাদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমে না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সৎ পথে ডাকে, তার জন্য থাকবে অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব, তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমবে না।" তিনি তাঁর উম্মাহকে সর্বপ্রকার কল্যাণের দিকে আহ্বান করেছেন। তাই তাঁর উম্মাহ যত নেক কাজ করে, তিনি তার সমপরিমাণ সওয়াব পান, কিছুই কমে না।

এই কারণেই সাহাবিগণ ও সালাফগণ নিজেদের আমলের সাওয়াব তাঁর নামে উৎসর্গ করতেন না, তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতেন না, দান করতেন না, কুরআন পড়তেন না এবং তার সাওয়াব উৎসর্গ করতেন না।

কারণ, মুসলিমরা নামাজ, রোযা, হজ্জ, দান-সদকা ও কুরআন তিলাওয়াত যা কিছু করে, তিনি তার সমপরিমাণ সওয়াব পান, এতে কিছুই কমে না। কিন্তু পিতা-মাতার ক্ষেত্রে তা নয়; মুসলিম যা কিছু নেক কাজ করে, সব সময় তা তাদের পিতা-মাতাকে সাওয়াব দেয় না। এজন্য পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের জন্য সাওয়াব উৎসর্গ করা হয়।

এটা জানা যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের আদেশের প্রতি আনুগত্যশীল, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতএব যখন অবসর হও, তখন উপযুক্ত ইবাদতে রত হও। আর তোমার প্রতিপালকেরই অভিমুখী হও।" (সূরা ইনশিরাহ ৭-৮) তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে মনোনিবেশ করেন না।

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "আমার উম্মতের সত্তর হাজার ব্যক্তি হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হলো—যারা রুকইয়া চায় না, আগুন দিয়ে চিকিৎসা করে না, কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তারা তাদের রবের উপর নির্ভর করে।"

তারা তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন যে তারা রুকইয়া চায় না। ইস্তিরক্কা হলো—অন্য কাউকে নিজের জন্য রুকইয়া করতে অনুরোধ করা। আর রুকইয়া একধরনের দোআ। তিনি নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য রুকইয়া করতেন, কিন্তু কাউকে নিজে কখনো রুকইয়া করতে বলেননি। যারা বর্ণনা করেছেন যে "তারা রুকইয়া করে না"—এই রেওয়ায়েতটি দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ।

এটি তাঁর উম্মাহকে দোআ করার আদেশের প্রকৃত সত্যকে স্পষ্ট করে: এটি সেই পর্যায়ের নয় যেখানে এক সৃষ্টিকে অন্য সৃষ্টির নিকট প্রার্থনা করা হয়, বরং এ পর্যায়ে তো প্রার্থনা না করাই উত্তম। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চায় না—বরং কেবল আল্লাহর কাছেই চায়—সে উত্তম, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম সন্তানের নেতা। গায়েব থাকা ব্যক্তির গায়েব ব্যক্তির জন্য দোআ অধিক কবুল হয়, কেননা এতে বেশি খাঁটি ইখলাস থাকে এবং শিরকের আশঙ্কা কম থাকে। এক ব্যক্তি অন্যের জন্য অনুরোধ না করেই দোআ করছে—এটা কিভাবে এমন কারো দোআর সমতুল হতে পারে যে উপস্থিত থাকায় তাকে অনুরোধ করে দোআ চাওয়া হয়েছে?

হাদীসে আছে: "সবচেয়ে বেশি কবুলযোগ্য দোআ হলো গায়েব থাকা ব্যক্তির গায়েব ব্যক্তির জন্য দোআ।" সহীহ মুসলিমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: "কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য গায়েব অবস্থায় দোআ করে না, কিন্তু আল্লাহ তার জন্য একটি ফেরেশতা নিযুক্ত করেন; সে যখনই তার ভাইয়ের জন্য দোআ করে, ফেরেশতা বলে: 'আমীন, এবং তোমার জন্যও তদ্রূপ।'"

কারণ, একটি সৃষ্টির অপর সৃষ্টির নিকট চাওয়া—সৃষ্টির সাধ্যরে মধ্যে পড়ে, এবং সে আল্লাহর কাছে দোআ করে এবং চায়। এজন্য দোআ চাওয়া বৈধ, যেমনটা তার থেকে এমন কাজ চাওয়া বৈধ যা সে করতে সক্ষম।

কিন্তু যে কাজ কেবলমাত্র আল্লাহই করতে পারেন, তা কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া বৈধ। ফেরেশতা, নবী কিংবা অন্য কেউ তা দিতে পারে না। কেউ বলতেও পারে না: "আমাকে ক্ষমা করো", "আমাদের জন্য বৃষ্টি দাও", "কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় দাও", "আমাদের অন্তর সঠিক পথে চালাও"—এসব কিছু একমাত্র আল্লাহর কাছেই বলা যাবে।

এই কারণেই তাবারানী তাঁর মুআ'জামে বর্ণনা করেছেন: "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক মুনাফিক মুসলিমদের কষ্ট দিচ্ছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 'চলো, আমরা এই মুনাফিকের বিরুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সাহায্য চাই।' তারা তাঁর কাছে এলো, তখন তিনি বললেন: 'নিশ্চয়ই, আমার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া হয় না; সাহায্য কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া যায়।'"

এই বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার বিধানও একই। মানুষের সাধ্যের মধ্যে যা আছে তা এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ বলেন: "তোমরা যখন তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্য চেয়েছিলে, তখন তিনি তা কবুল করেছিলেন।" (সূরা আনফাল: ৯)

মূসা আলাইহিস সালাম দোআ করেছেন: "হে আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য, অভিযোগ আপনার কাছেই, সাহায্য আপনার কাছেই চাওয়া হয়, সাহায্য আপনার দ্বারাই পাওয়া যায়, আপনার উপরই নির্ভর করা হয়; এবং শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আপনারই।"

আবু ইয়াজিদ আল-বাস্তামী বলেন: "একজন সৃষ্টির আরেক সৃষ্টির কাছে সাহায্য চাওয়া মানে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি আরেক ডুবন্তের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া।" আবু আবদুল্লাহ আল-কুরায়শী বলেন: "একজন সৃষ্টির আরেক সৃষ্টির নিকট সাহায্য চাওয়া মানে এক বন্দীর আরেক বন্দীর নিকট সাহায্য চাওয়া।"

আল্লাহ বলেন: "বলো, 'যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আহ্বান করো, তাদের আহ্বান করো; তারা তোমাদের কষ্ট দূর করতে সক্ষম নয় এবং তা স্থানান্তরও করতে পারে না।' তারা যাদের আহ্বান করে, তারাও তাদের রবের দিকে ধাবিত হয়, কে তাঁর কাছে বেশি নিকটবর্তী হতে পারে এ চেষ্টা করে, তাঁর রহমতের আশা রাখে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই, তোমার রবের শাস্তি ভয়ংকর।" (সূরা ইসরা: ৫৬-৫৭)

সালাফদের একটি দল বলেছেন: কিছু মানুষ ফেরেশতা ও নবীদের আহ্বান করত। আল্লাহ বলেন: "তারা তো আমার বান্দা, যেমন তোমরাও আমার বান্দা; তারা আমার রহমতের আশায় থাকে, যেমন তোমরাও থাকো, আমার শাস্তিকে ভয় করে, যেমন তোমরাও করো, এবং তারা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় থাকে, যেমন তোমরাও থাকো।"

তাই তিনি ফেরেশতা ও নবীদের আহ্বান করা নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও ফেরেশতারা আমাদের জন্য দোআ ও মাগফিরাত চায়—এ কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তবুও আমরা তাদের নিকট তা চাইতে পারি না।

তদ্রূপ, নবী ও নেককাররাও: তারা কবরস্থ অবস্থায় জীবিত হলেও, ধরে নেওয়া গেল তারা জীবিতদের জন্য দোআ করছেন এবং তা নিয়ে কিছু বর্ণনাও থাকলেও, কারো পক্ষেই তাদের নিকট তা চাওয়া বৈধ নয়। সালাফদের কেউ তা করেননি, কেননা এটি তাদের মাধ্যমে শিরকের পথে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উপাসনার ক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়।

এটি এমন নয় যেমন কেউ জীবিত অবস্থায় কারো নিকট কিছু চায়, কারণ এতে শিরকের সম্ভাবনা থাকে না। আর ফেরেশতা, নবী ও নেককাররা মৃত্যুর পর যা কিছু করেন তা তো তাকদির বা আদেশের মাধ্যমে ঘটে; এর উপর দোআকারীর দোআর কোনো প্রভাব নেই, আর জীবিত অবস্থায় দোআ চাওয়া হলে তারা তার জবাব দেয়, কারণ তা তখন তাদের উপর দায়িত্ব।

আল্লাহ্, মহান ও পবিত্র যিনি, বলেছেন: "কোনো মানুষের (নবীর) পক্ষে এটি সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হুকুম ও নবুয়ত দান করুন, তারপর সে লোকদের বলবে: 'তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হও।' বরং সে বলবে: 'তোমরা আল্লাহর জন্য রাব্বানী আলেম হও, কারণ তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়েছ এবং তা অধ্যয়ন করেছ।' আর সে তোমাদেরকে ফিরিশতা ও নবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করতে আদেশ করবে না। তিনি কি তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর তোমাদেরকে কুফরের আদেশ দেবেন?" (আলে ইমরান: ৭৯-৮০)। তিনি, মহান ও পবিত্র তিনি, ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে কেউ ফিরিশতা ও নবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে, সে কাফির। তিনি, মহান ও পবিত্র তিনি, বলেছেন: "বলুন: 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য মনে করো, তাদের ডাকো।' তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ذর ার পরিমাণ ক্ষমতার মালিক নয়, সেখানে তাদের কোনো অংশীদারিত্বও নেই, এবং তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো সুপারিশ উপকারে আসে না।" (সাবা: ২২-২৩)। তিনি, মহান ও পবিত্র তিনি, বলেছেন: "কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?" (বাকারা: ২৫৫)। তিনি বলেছেন: "তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোনো সুপারিশকারী নেই।" (ইউনুস: ৩)। এবং বলেছেন: "...তোমাদের জন্য তাঁর বাইরে

কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী নেই।" (সাজদা: ৪)। এবং বলেছেন: "তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে উপাসনা করে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এবং তারা বলে: 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' বলুন: 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাও, যা তিনি আসমানসমূহে বা জমিনে জানেন না?' তিনি মহান ও পবিত্র, তারা যাদেরকে তাঁর সঙ্গে শরিক করে, সে সমস্ত কিছু থেকে তিনি উর্ধ্বে।" (ইউনুস: ১৮)। তিনি বলেছেন ইয়াসীনবাসীর সঙ্গীর সম্পর্কে: "'আমি কেন তাঁর ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে? আমি কি তাঁকে ছেড়ে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব, যাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না, যদি পরম দয়ালু আমাকে কোনো কষ্ট দিতে চান, এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না? তাহলে তো আমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ে যাব। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন।'" (ইয়াসীন: ২২-২৫)। এবং বলেছেন: "তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো সুপারিশ উপকারে আসে না।" (সাবা: ২৩)। এবং বলেছেন: "সেদিন কোনো সুপারিশ উপকারে আসবে না, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির যার প্রতি পরম দয়ালু অনুমতি দিয়েছেন এবং যার কথা তিনি গ্রহণ করেছেন।" (তাহা: ১০৯)। এবং বলেছেন: "তারা কেবল তার পক্ষেই সুপারিশ করতে পারবে, যাকে তিনি অনুমোদন করবেন, এবং তারা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।" (আম্বিয়া: ২৮)।

সুপারিশ দুই প্রকার:

প্রথমটি: যেটি আল্লাহ অস্বীকার করেছেন, যেমন মুশরিকরা এবং এই উম্মাহর ভ্রান্ত ও অজ্ঞদের মধ্যে যারা তাদের মতো করে বিশ্বাস করে, এবং এটি শিরক।

দ্বিতীয়টি: যেটি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুপারিশকারী সুপারিশ করে। এটিই তিনি তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য অনুমোদন করেছেন। এ কারণেই সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশকারী, যখন কিয়ামতের দিন সৃষ্টিজীব তাকে সুপারিশের জন্য বলবে, তখন তিনি সিজদায় পড়বেন। তিনি বলেছেন: "আমি আমার রবের এমন প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন, যা আমি এখন জানি না। বলা হবে: 'হে মুহাম্মাদ, তোমার মাথা উঁচু করো! কথা বলো, তোমার কথা শোনা হবে; চাও, তোমাকে দেয়া হবে; সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'" যখন তাকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন যাদের জন্য আল্লাহ চান তিনি সুপারিশ করুন। যারা এ মত পোষণ করেন তারা বলেন: তাঁর মাধ্যমে তাওয়াস্সুল ও ইস্তিশফার অনুমোদন—অর্থাৎ তিনি যিনি মাধ্যমকারী হিসেবে দোয়া করছেন—এই অনুমোদন তাঁর অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুর পর প্রযোজ্য নয়, যখন তিনি দোয়া করেননি তাদের

জন্য, যারা তাঁকে মাধ্যম করেছে; বরং সে ব্যক্তি তাঁকে শপথ করে ডেকেছে বা তাঁর সত্তার মাধ্যমে চেয়েছে, অথচ সাহাবায়ে কেরাম এই দুটি বিষয়ে পার্থক্য করেছেন। কারণ, জীবিত অবস্থায় তিনি তাঁর মাধ্যমে তাওয়াস্সুলকারীর জন্য দোয়া করতেন, আর তাঁর দোয়া আল্লাহর নিকট সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম, কারণ তিনি সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। অতএব, তিনি যার জন্য দোয়া করেছেন এবং সুপারিশ করেছেন, তার জন্য তাঁর দোয়া সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম দোয়া। আর যাঁর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেননি বা সুপারিশ করেননি, তার সঙ্গে এই তুলনা কীভাবে করা যেতে পারে? যে ব্যক্তি তাঁর জন্য দোয়া করা হয়েছে, তার সঙ্গে যাকে জন্য দোয়া করা হয়নি তাকে এক করে দেখে এবং এই তাওয়াস্সুলকে ঐ তাওয়াস্সুলের মতো মনে করে, সে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভ্রান্ত। আরও যুক্তি হলো, তাঁর মাধ্যমে দোয়া চাওয়া, তাঁর দোয়া, এবং তাঁর দোয়ার মাধ্যমে তাওয়াস্সুল—এসব বিষয়ে কোনো ক্ষতি নেই; বরং এতে শুধু কল্যাণ আছে, কোনো বিপদ বা ফিতনা নেই। কারণ কোনো নবীকেই জীবদ্দশায় তাঁর উপস্থিতিতে ইবাদত করা হয়নি, তারা যেকোনো ধরণের শিরক—এমনকি ছোট শিরকও—বাধা দিয়েছেন; যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে তাঁর সামনে সেজদা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছেন: "বলো না: 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ যা চান', বরং বলো: 'আল্লাহ যা চান, তারপর মুহাম্মাদ যা চান।'" অনুরূপ আরো বহু বর্ণনা রয়েছে। আর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে ফিতনা ও শিরকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যেমন 'ঈসা ইবনু মারিয়াম, উযায়ের এবং অন্যান্যদের কবরকে কেন্দ্র করে লোকেরা তাদেরকে শরিক বানিয়েছিল। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমাকে এমনভাবে প্রশংসা করো না, যেমন খ্রিস্টানরা 'ঈসা ইবনু মারিয়ামকে প্রশংসা করেছে; আমি তো কেবল একজন বান্দা, তাই বলো: 'আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল।'" এটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে। তিনি বলেন: "হে আল্লাহ, আমার কবরকে পূজার প্রতিমূর্তি বানিও না।" এবং বলেন: "আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন; তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে," তিনি তাদের কাজ থেকে সতর্ক করেছেন।

সারসংক্ষেপে, আমাদের দুটি মহান ভিত্তি আছে: প্রথমত: আমরা কেবল আল্লাহকেই ইবাদত করব। দ্বিতীয়ত: আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ যেভাবে ইবাদত করতে বলেছেন, সেই পন্থায় ইবাদত করব; কোনো বিদআত দিয়ে ইবাদত করব না। এই দুই ভিত্তিই "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল"—এই সাক্ষ্যদানের বাস্তবায়ন। যেমন তিনি বলেন: "...যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম আমল করে।" (আল-মুলক: ২)। ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "সবচেয়ে

খাঁটি এবং সবচেয়ে সঠিক।" তাঁকে বলা হয়: "হে আবা আলী, খাঁটি ও সঠিক বলতে কী বোঝানো হয়েছে?" তিনি বলেন: "যদি কোনো আমল খাঁটি হয় কিন্তু সঠিক না হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি সঠিক হয় কিন্তু খাঁটি না হয়, তবুও তা গ্রহণযোগ্য নয়—যতক্ষণ না তা খাঁটি ও সঠিক হয়। খাঁটি অর্থ হলো আল্লাহর জন্য এবং সঠিক অর্থ হলো সুন্নাহ অনুযায়ী।" এটাই তাঁর বাণীর বাস্তবায়ন: "সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।" (আল-কাহফ: ১১০)। মু'মিনদের আমির উমর ইবনু খাত্তাব তাঁর দোয়ায় বলতেন: "হে আল্লাহ, আমার সমস্ত কাজকে সৎকর্ম বানিয়ে দাও, কেবল তোমার মুখমণ্ডলের জন্য নির্ভেজাল করো, এবং এতে অন্য কারো কোনো অংশ রেখো না।" তিনি বলেন: "তাদের কি এমন অংশীদার রয়েছে যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন বানিয়েছে যা আল্লাহ অনুমতি দেননি?" (আশ-শুরা: ২১)। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে 'আয়িশাহ থেকে বর্ণিত: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কেউ আমাদের এ বিষয়ে এমন কিছু সংযোজন করবে যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যার ওপর আমাদের আদেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" সহীহ হাদীস ও অন্যান্য উৎসে এসেছে যে, আল্লাহ বলেন: "আমি অংশীদারদের মধ্যে সবচেয়ে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যাতে আমার সঙ্গে অন্যকে অংশীদার করে, আমি তা থেকে মুক্ত, তা তার জন্যই—যাকে সে অংশীদার করেছে।" এজন্য ফকিহগণ বলেন: ইবাদতের বিষয়গুলো توقيف (প্রমাণের ওপর স্থির) ভিত্তিক। যেমন সহীহ বুখারীতে এসেছে, উমর ইবনু খাত্তাব কালো পাথর চুম্বন করে বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম, আমি জানি তুমি একটি পাথর; তুমি কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারো না। যদি আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।" আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে, তাঁর আনুগত্য করতে, তাঁকে ভালোবাসতে, এবং যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের কাছে সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হন। তিনি আমাদের গ্যারান্টি দিয়েছেন, তাঁর আনুগত্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ভালোবাসা ও মর্যাদা অর্জন করব। তিনি বলেন: "বলুন: 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ও তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন।'" (আলে ইমরান: ৩১)। এবং বলেছেন: "...আর যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করো, তবে তোমরা সৎপথে চলবে।" (নূর: ৫৪)। এবং বলেছেন: "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তাদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; এটাই মহাসাফল্য।" (নিসা: ১৩)। কুরআনে এজাতীয় অনেক উদাহরণ রয়েছে।

এই বিষয়ে কারও উচিত নয় যে, সুন্নাহ যা প্রমাণ করেছে, শরিয়াহ যা এনেছে, কুরআন ও সুন্নাহ যা নির্দেশ

দিয়েছে এবং সালাফে সালিহীন যেভাবে ছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হওয়া। যে কিছু জানে, সে তা বলবে; যা জানে না, সে তা থেকে বিরত থাকবে। সে যেন এমন বিষয়ে অনুসরণ না করে যার কোনো জ্ঞান তার নেই, এবং যেন আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু না বলে যা সে জানে না; কারণ আল্লাহ তা নিষিদ্ধ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদীসে এসেছে, তিনি আল্লাহর কাছে কীভাবে চেয়েছেন, যেমন: "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি এই বলে যে, সমস্ত প্রশংসা তোমার, তোমার ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তুমি অনুগ্রহকারী, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, মহিমা ও সম্মানের অধিকারী, চিরঞ্জীব ও আত্মনির্ভর।" আবু দাউদ ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনায়: "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি এই বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি আল্লাহ, এক, নির্ভরযোগ্য, না তুমি কাউকে জন্ম দিয়েছ, না তোমার জন্ম হয়েছে, এবং তোমার কোনো সমকক্ষ নেই।" আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

উলামাগণের ইজমা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করলে সে শপথ বাধ্যতামূলক নয়। কেউ যদি কা'বাহ, ফিরিশতা, নবীগণ, কোনো শায়খ অথবা বাদশার নামে শপথ করে, তবে তার শপথ বাধ্যতামূলক নয়। তার জন্য এটি শরিয়তসম্মত নয়; বরং সে এ থেকে নিষিদ্ধ—চাই তা হারামের নিষেধাজ্ঞা হোক, কিংবা নাফরমানির নিষেধাজ্ঞা। এ বিষয়ে উলামাদের মধ্যে দুই মত রয়েছে। সঠিক মত হলো, এটি হারামের নিষেধাজ্ঞা। সহীহ হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে শপথ করবে, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা নীরব থাকে।" তিরমিজীতে এসেছে, তিনি বলেছেন: "যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে শিরক করেছে।" প্রাথমিক যুগের কোনো আলেম বলেননি যে, নবী ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করলে তা কার্যকর হবে; তবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইমাম আহমদের থেকে দুটি রিওয়ায়াত আছে। তাঁর কিছু সাহাবী—যেমন ইবনু আকীল—এই ইখতিলাফ কে অন্যান্য নবীগণের দিকেও সম্প্রসারণ করেছেন, কিন্তু এটি দুর্বল। এই মতের ভিত্তি দুর্বল, বিচ্ছিন্ন, এবং আমাদের জানা মতে কোনো ইমাম একে গ্রহণ করেননি। অধিকাংশ ইমামের—যেমন মালিক, শাফেয়ী, ও আবু হানিফার মত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামেও শপথ করলে তা বাধ্যতামূলক নয়, এবং এটি ইমাম আহমদের এক রিওয়ায়াত, এবং এটাই সঠিক মত। তদ্রূপ, আশ্রয়ও কেবল আল্লাহ ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে চাওয়া হয়; সৃষ্টির মাধ্যমে নয়।

এই কারণেই সালাফগণ—যেমন আহমাদ ও অন্যান্যরা—আল্লাহর বাণী অসৃষ্ট, এই বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী উল্লেখ করেছেন: “আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করি।” তারা বলেছেন: তিনি এগুলোর আশ্রয় চেয়েছেন, আর কোনো সৃষ্ট বস্তুর আশ্রয় নেওয়া বৈধ নয়। সহীহ হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যতক্ষণ না তাতে শিরক থাকে,

রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক) করতে কোনো অসুবিধা নেই।” তিনি সে সমস্ত রুকইয়াহ নিষিদ্ধ করেছেন যাতে শিরক রয়েছে, যেমন জিনদের আশ্রয় চাওয়ার মতো রুকইয়াহ, যেমন তিনি, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন: "আর মানুষের কিছু লোক এমন ছিল, যারা জিনদের কিছু লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত, ফলে তারা তাদের ভার বৃদ্ধি করত" (সূরা আল-জিন: ৬)।

এই কারণেই আলেমগণ কিছু লোকের ব্যবহৃত রুকইয়াহ ও শপথকে নিষিদ্ধ করেছেন, যা অপসৃষ্ট বা জিন দ্বারা আক্রান্তদের জন্য ব্যবহার করা হতো এবং যাতে শিরক বিদ্যমান। বরং তারা এমন সব বাক্যও নিষিদ্ধ করেছেন যেগুলোর অর্থ অজানা, কারণ এতে শিরক থাকার আশঙ্কা রয়েছে। আর শরীয়াহ্ প্রণীত রুকইয়াহ যেহেতু বৈধ, তাই তা অনুমোদিত।

সুতরাং, শপথ গ্রহণ বৈধ নয়—না সম্পূর্ণ শপথ, না অন্য কারো প্রতি শপথ—কেবলমাত্র আল্লাহ, মহান ও মহিমান্বিত, এর নামে শপথ নেওয়া বৈধ। আশ্রয়ও কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া অন্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, সে হয় আল্লাহর উপর শপথ করে অথবা ওই মাধ্যমে কোনো প্রার্থনা করছে, যেমন গুহার তিন ব্যক্তি যারা তাদের আমলকে ওসীলা বানিয়ে প্রার্থনা করেছিল, অথবা নাবী ও সৎ ব্যক্তিদের দোয়ার মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করে।

যদি তা আল্লাহর উপর অন্য কিছুর মাধ্যমে শপথ হয়ে থাকে, তবে তা বৈধ নয়। আর যদি তা এমন কোনো মাধ্যমের মাধ্যমে চাওয়া হয়, যা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনতে সক্ষম, যেমন রাসুলের প্রতি ঈমান, তার প্রতি ভালোবাসা, তার আনুগত্য—এ ধরনের আমলের মাধ্যমে চাওয়া হয়—তাহলে তা বৈধ। আর যদি তা কেবল নাবী ও সৎ ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই হয়, তবে তা শরীয়াহ্ সম্মত নয়, এবং অনেক আলেম একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কেউ কেউ তা ছাড় হিসেবে বৈধ বলেছেন, তবে পূর্বোক্ত দলিল অনুযায়ী প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী। এটি এমন মাধ্যম যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া নিশ্চিত নয়, বিপরীতে যারা এমন মাধ্যমে প্রার্থনা করে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার বা উত্তর পাওয়ার কারণ, যেমন সৎ আমল বা সৎ ব্যক্তির দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা—এটি বৈধ। কারণ, সৎ ব্যক্তির দোয়া ও সৎ আমল আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাওয়ার কারণ। আমরা যখন তাদের দোয়া ও আমাদের আমলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ওসীলা গ্রহণ করি, তখন আমরা আল্লাহর নিকট ওসীলা গ্রহণ করি, যেমন তিনি বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর দিকে পৌঁছার উপায় অনুসন্ধান কর" (সূরা আল-মায়েদা: ৩৫)। ওসীলা হলো সৎ আমল। আর তিনি বলেন: "তারা যাদেরকে ডাকে, তারাও তাদের রবের কাছে পৌঁছার উপায় অনুসন্ধান করে" (সূরা

আল-ইসরা: ৫৭)।

কিন্তু যদি আমরা তাদের দোয়া বা নিজেদের আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ওসীলা গ্রহণ না করি, বরং তাদের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করি, তবে তাদের ব্যক্তিত্ব এমন কোনো কারণ নয় যার মাধ্যমে প্রার্থনার উত্তর প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। এভাবে আমরা ওসীলা ছাড়াই ওসীলা গ্রহণ করছি। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে এটি প্রমাণিত নয়, এবং সালাফদের মাঝেও এটি সুপরিচিত ছিল না। মারওয়াজীর মানাসিক গ্রন্থে আহমাদ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে প্রার্থনার একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে। এটি তার থেকে বর্ণিত দুটি মতের মধ্যে একটি, যেখানে রাসুলের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ বৈধ বলা হয়েছে। অধিকাংশ আলেম এই উভয় মতই নিষিদ্ধ করেছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা আল্লাহর কাছে মহান মর্যাদা সম্পন্ন—যেমন আল্লাহ মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রসঙ্গে বলেছেন, যা আগেই আলোচনা হয়েছে—কিন্তু এই মর্যাদা ও অবস্থান তাদের জন্য, এবং আমরা এ থেকে উপকৃত হই তাদের অনুসরণ ও ভালোবাসার মাধ্যমে। যদি আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান, তার প্রতি ভালোবাসা, তার আনুগত্য ও সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করি, তবে সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ওসীলা। কিন্তু যদি কেবল তার ব্যক্তিত্বকে ওসীলা বানানো হয় অথচ ঈমান বা আনুগত্য না থাকে, তবে তা বৈধ নয়।

কেউ যদি অন্য কারো মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করতে চায়, সে হয়তো তাকে ওই ব্যক্তির কাছে সুপারিশ করতে বলে, যেমন কেউ তার পিতার বা বন্ধুর বা সম্মানিত ব্যক্তির মাধ্যমে বলে: “তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।” এটি বৈধ। অথবা সে কারো উপর শপথ করে, যেমন বলে: “অমুকের জীবনের কসম,” “অমুক পিতার ধুলোর কসম,” “অমুক শায়েখের সম্মানের কসম”—এইসব। আল্লাহর নামে তাঁর কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে শপথ করা বৈধ নয়, যেমনভাবে কোনো সৃষ্টির উপর অন্য কোনো সৃষ্টিকে দিয়ে শপথ করানোও বৈধ নয়। অথবা কেউ এমন কোনো মাধ্যমের মাধ্যমে চায় যা ফলাফল অর্জনে কার্যকর, যেমন আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট দাবি কর, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে" (সূরা আন-নিসা: ১)। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসবে।

এটা স্পষ্ট হয়েছে যে আল্লাহর উপর অন্য কিছু দিয়ে শপথ গ্রহণ বৈধ নয় এবং কোনো সৃষ্টির মাধ্যমেও শপথ বৈধ নয়। তবে যাদের শাফাআত অনুমোদিত, তাদের শাফাআতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ওসীলা গ্রহণ

বৈধ। অন্ধ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দোয়ার অনুরোধ করেছিল, যেমন সাহাবাগণ তাঁর নিকট ইস্তিসকার জন্য অনুরোধ করতেন। তার উক্তি: "হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতি আপনার নবী মুহাম্মদ, দয়ার নবীর মাধ্যমে মুখ ফিরাই"—এর অর্থ হলো, তার দোয়া ও শাফাআতের মাধ্যমে। এই হাদীসের শেষাংশ: "হে আল্লাহ! তার শাফাআত আমার পক্ষে কবুল করুন।" এটি বৈধ এবং এ নিয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই। এটি কেবল ব্যক্তিত্বকে ওসীলা বানানোর আলোচনা নয়।

আল্লাহ বলেন: "...আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে চাও, এবং আত্মীয়তা সম্পর্ককে" (সূরা আন-নিসা: ১)। অধিকাংশ ক্বারির মত অনুযায়ী (নসাব শব্দটি ফাতহ সহ), তারা কেবলমাত্র আল্লাহর মাধ্যমে একে অপরকে কিছু চায়, আত্মীয়তার মাধ্যমে নয়। এদের চাওয়ার মধ্যে আল্লাহর নামে শপথ ও প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত। আর যারা 'নসাব' শব্দটিকে জার সহ পাঠ করেন, তাদের মধ্যে কিছু সালাফ বলেছেন: তারা বলে, "আমি আল্লাহর ও আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে তোমার নিকট কিছু চাচ্ছি।" এটি তাদের চাওয়ার বর্ণনা, এবং একে বৈধতার প্রমাণ বলা যায় না। যদি এটি বৈধতার প্রমাণ হয়, তাহলে "আমি আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে তোমার নিকট চাচ্ছি"—এর অর্থ শপথ নয়, বরং আত্মীয়তার কারণে, অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আছে। এটি তিন ব্যক্তির ন্যায় যারা সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট চেয়েছিল, অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার মাধ্যমে চাওয়া।

এক্ষেত্রে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন তার ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর তাকে "জাফরের হকের দোহাই দিয়ে" কিছু চাইতেন, তখন তিনি তাকে দিতেন। এটি শপথের ধরনে নয়, বরং আত্মীয়তার হকের ভিত্তিতে। কারণ, আলীর উপর এই হকটি জাফরের মাধ্যমেই আবশ্যক হয়েছে, এবং জাফরের উপর আলীর জন্য একটি হক ছিল।

এখান থেকেই হাদীসটি আসে, যা ইবনে মাজাহ আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই সেই সব প্রার্থনাকারীর হকের মাধ্যমে যারা আপনার নিকট প্রার্থনা করে, এবং আমার এই চলার হকের মাধ্যমে। আমি অহংকার, আত্মপ্রশংসা, লোক দেখানো বা খ্যাতির জন্য বের হইনি; বরং আপনার রাগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে এবং আপনার সন্তুষ্টি পেতে বের হয়েছি। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যেন আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন এবং আমার গুনাহ মাফ করে দেন; নিঃসন্দেহে আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন না।" এই হাদীসের সনদে 'আতিয়্যাহ আল-আউফী রয়েছেন, যার মধ্যে দুর্বলতা আছে। যদি এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা হয়ে থাকে, তবে তা এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত, দুটি কারণে:

প্রথমত: এতে আল্লাহর নিকট চাওয়া হয়েছে প্রার্থনাকারীদের হক ও তাঁর আনুগত্যে চলার হকের মাধ্যমে। প্রার্থনাকারীদের হক হলো তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন, আর চলার হক হলো তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন। এই হক আল্লাহ তাঁর সত্য প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নিজ উপর আবশ্যক করেছেন—জ্ঞানীদের মতে, এবং একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তিনি তা নিজ উপর আবশ্যক করেছেন। যেমন তিনি বলেন: "তোমার প্রতিপালক তাঁর প্রতি দয়া আবশ্যক করেছেন" (সূরা আল-আন'আম: ৫৪), এবং "মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের উপর আবশ্যক ছিল" (সূরা আর-রূম: ৪৭), এবং "...তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে সত্য প্রতিশ্রুতি হিসেবে যা তিনি নিজের উপর আবশ্যক করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষা কে করতে পারে?" (সূরা আত-তাওবাহ: ১১১)। সহীহ হাদীসে মু'আয থেকে বর্ণিত: "আল্লাহর বান্দাদের উপর হক হলো তিনি যেন তাঁর ইবাদত করেন এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করেন; আর বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হলো যদি তারা তা পালন করে, তবে তিনি তাদের শাস্তি দিবেন না।"

সহীহ হাদীসে আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন: "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও একে অপরের উপর জুলুম হারাম করেছি, সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না।"

যদি প্রার্থনাকারী ও ইবাদতকারীদের হক হয় জবাব ও পুরস্কার, তবে এই মাধ্যমে প্রার্থনা করা হলো আল্লাহর কাজের মাধ্যমে প্রার্থনা করা, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমি আপনার রাগ থেকে আপনার সন্তুষ্টিতে, আপনার শাস্তি থেকে আপনার মাফে, এবং আপনার কাছে আপনার দ্বারাই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার প্রশংসা করতে অক্ষম; আপনি যেমন নিজেকে প্রশংসিত করেছেন, তেমনই আছেন।"

মাফের মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়া যেমন আল্লাহর কাজ, তেমনি পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে চাওয়া-ও তাঁর কাজ। তাবারানী তাঁর 'কিতাব আদ-দু'আ' গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেন: "হে আমার বান্দা! এগুলো চারটি বিষয়: একটি আমার জন্য, একটি তোমার জন্য, একটি আমার ও তোমার মাঝে, এবং একটি তোমার ও আমার সৃষ্টির মাঝে। আমার জন্য যেটি তা হলো, তুমি আমার ইবাদত করো, আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। তোমার জন্য যেটি, তা হলো, আমি তোমাকে তখন পুরস্কৃত করবো যখন তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমার ও তোমার মাঝে যা, তা হলো: তোমার পক্ষ থেকে দোয়া আর আমার পক্ষ থেকে উত্তর। আর তোমার ও আমার সৃষ্টির মাঝে যা, তা হলো: তুমি মানুষদের সঙ্গে

এমন আচরণ করো যেমনটা তুমি তাদের কাছ থেকে কামনা করো।" এই হাদীসে আল্লাহর উক্তি: "একটি আমার জন্য, একটি তোমার জন্য"—এটি সেই হাদীসের মতো, যেখানে সূরা আল-ফাতিহা সম্পর্কে তিনি বলেন: "আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছি; এর অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই যা সে চেয়েছে।"

বান্দা উভয় ভাগ থেকেই উপকৃত হয়, আর আল্লাহ উভয় ভাগকেই ভালোবাসেন। তবে তিনি ইবাদতকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তিনি বান্দাকে যে সাহায্য ও পথনির্দেশ দেন, তা ইবাদতের জন্য উপায়—এবং তিনি তা ভালোবাসেন, কারণ এটি তাঁর ইবাদতের পথ। প্রথমে বান্দা যা চায় তা হলো সাহায্য, আর সে ইবাদতের জন্য সাহায্য ও সঠিক পথে চলার জন্য দোয়া করে; এর মাধ্যমেই সে ইবাদতের স্তরে পৌঁছে...

[এর পরের আলোচনা দীর্ঘ হবে, আর এই জায়গা এটির আলোচনার স্থান নয়, যদিও আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে কিছুটা সরে এসেছি।]

দ্বিতীয়ত: তাঁর প্রতি দোয়া করা এবং তাঁর জন্য আমল করা, আল্লাহ মহিমাময় ও সর্বোচ্চ, বান্দার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি কারণ। এটি এমন যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের সৎকর্মশীলদের দোয়াকে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করা। পূর্বে বলা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের মাধ্যমে দোয়া করার অর্থ হয় তাদের শপথ করে বলা অথবা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণের মাধ্যমে চাওয়া। যদি কোনো ব্যক্তি বলে: 'প্রার্থনাকারীদের প্রতি তোমার হকের দ্বারা'—এটি যদি শপথ হয়, তাহলে শপথ কেবলমাত্র আল্লাহরই মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর যদি এটি কোনো কারণ হয়, তবে সেটি এমন একটি কারণ যা আল্লাহ, যিনি পবিত্র ও মহান, নিজেই কারণ বানিয়েছেন—যেমন দোয়া ও ইবাদত। এ সমস্ত বিষয় একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, এবং এর কোনোটিই এমন নয় যে, কোনো সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করে তার পক্ষ থেকে কোনো দোয়া বা আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সৎকর্ম ছাড়া আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয়।

যদি প্রার্থনাকারী বলে: "আমি তোমার কাছে ফিরিশতাদের হকের দ্বারা চাই" অথবা "নবীগণ ও সৎকর্মশীলদের হকের দ্বারা চাই", অথচ সে অন্য কাউকে এভাবে বলবে না: "আমি তোমার ওপর শপথ করছি এ সকলের হকের দ্বারা"—তাহলে যদি তার জন্য কোনো সৃষ্টিকে শপথ করার অনুমতি না থাকে, তবে

কিভাবে সে সৃষ্টিকে শপথ করে স্রষ্টার প্রতি শপথ করে? যদি সে শপথ না করে বরং তাদেরকে একটি ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করে, তবে এইসব ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বে এমন কিছু নেই যা সরাসরি তার উদ্দেশ্য পূরণের কারণ হয়। বরং তার পক্ষ থেকে কোনো কারণ থাকতে হবে, যেমন ফিরিশতা ও নবীদের প্রতি বিশ্বাস; অথবা তাদের পক্ষ থেকে কিছু, যেমন তাদের দোয়া।

তবে অনেক মানুষ এ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, যেমন তারা তাদেরকে শপথ করার বিষয়েও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলে: "আল্লাহর ওপর তোমার হকের দ্বারা", কিংবা "এই সাদা দাঁড়ির হকের দ্বারা আল্লাহর ওপর"। আর কেউ যদি বলে: "আমি অমুক ব্যক্তির হকের দ্বারা চাই" অথবা "তার মর্যাদার দ্বারা চাই"—এতে যদি তার উদ্দেশ্য হয়: "আমি তোমার কাছে চাই আমার তার প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার দ্বারা", তবে এটি সর্বোত্তম ওসীলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়ে থাকে: যে এই অর্থই বোঝে, তা সঠিক অর্থ। তবে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য এটা নয়। যে বলে: "আমি তোমার কাছে চাই তোমার প্রতি এবং তোমার রাসুলের প্রতি আমার ঈমানের দ্বারা", অথবা "আমি তোমার রাসুলের প্রতি আমার ভালোবাসার দ্বারা চাই", ইত্যাদি—সে উত্তমভাবে প্রার্থনা করেছে।

যেমন তিনি, মহান ও পবিত্র, মু'মিনদের দোয়ার বর্ণনায় বলেন: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি যে বলছে, 'তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো', অতঃপর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও, আমাদের থেকে আমাদের দোষসমূহ দূর করে দাও, এবং আমাদের সৎকর্মশীলদের সঙ্গে মৃত্যু দাও" (আলে ইমরান: ১৯৩)। তিনি আরও বলেন: "যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমরা তো ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো'" (আলে ইমরান: ১৬)। এবং তিনি বলেন: "আমার বান্দাদের একটি দল ছিল, যারা বলেছিল, 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি রহম করো, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'" (আল-মু'মিনূন: ১০৯)। এবং তিনি বলেন: "হে আমাদের রব! আমরা যা তুমি নাজিল করেছ তা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসুলের অনুসরণ করেছি, অতএব আমাদের সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করো" (আলে ইমরান: ৫৩)।

ইবনু মাসউদ বলতেন: "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ, আমি তা পালন করেছি; তুমি আমাকে আহ্বান করেছ, আমি সাড়া দিয়েছি; এখন সাহারার সময়, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত

হাদীস হচ্ছে সেই তিনজন ব্যক্তির ঘটনা, যাদের ওপর বৃষ্টি নেমে আসে, এবং তারা একটি গুহায় আশ্রয় নেয়, কিন্তু একটি পাথর এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন তারা তাদের সৎকর্মের দ্বারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে, এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের মুক্ত করে দেন। এই হাদীস সহীহাইন-এ প্রমাণিত।

আবু বাকর ইবনু আবি আদ-দুনিয়া বর্ণনা করেন: খালিদ ইবনু খিরাশ আল-ইজলানি ও ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহিম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেন: সালেহ আল-মুররী আমাদেরকে সাবিত থেকে, আর তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেন: "আমরা আনসারদের একজন লোকের কাছে প্রবেশ করলাম যিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। আমরা বের হওয়ার আগেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। আমরা তাঁকে তাঁর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। তাঁর মাথার পাশে তাঁর এক বৃদ্ধা মা ছিলেন। আমাদের একজন তাঁকে বলল: 'হে মহিলা! আল্লাহর কাছে তোমার বিপদে সওয়াব কামনা করো।' তিনি বললেন: 'কী হয়েছে, আমার ছেলে কি মারা গেছে?' আমরা বললাম: 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'তোমরা যা বলছ তা কি সত্যি?' আমরা বললাম: 'হ্যাঁ।' তিনি তাঁর হাত আল্লাহর দিকে উঠিয়ে বললেন: 'হে আল্লাহ! তুমি জানো যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, এবং তোমার রাসুলের কাছে হিজরত করেছি, এই আশায় যে তুমি আমাকে প্রতিটি দুঃখের পর স্বস্তি দেবে; অতএব আজকের এই বিপদে আমাকে কষ্ট দিও না।' আনাস বলেন: তিনি তাঁর চেহারার কাপড় সরিয়ে দিলেন, এবং আমরা বের হওয়ার আগেই তাঁর সাথে খানা খেলাম।"

আবু নু'আইম তাঁর 'আল-হিলইয়াহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন: দাউদ বলেন: "আমার পিতা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব—তাঁদের হকের দ্বারা তোমার কাছে চাই।" তখন আল্লাহ, যিনি সর্বোচ্চ, দাউদকে ওহি করলেন: "হে দাউদ! তোমার পিতৃপুরুষদের আমার ওপর কী হক রয়েছে?"

যদিও এটি শরঈ দলিলের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে ইসরাইলিয়াত সমর্থনের জন্য ব্যবহারযোগ্য, দলিলের ভিত্তি হিসেবে নয়।

সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে জীবিত ব্যক্তি থেকে দোয়া চাওয়া যায়, যেমন তাকে অন্যান্য সক্ষম বিষয়েও চাওয়া যায়। কিন্তু অনুপস্থিত বা মৃত সৃষ্টির নিকট কিছুই চাওয়া যায় না। এ বিষয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে, তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল এবং তাঁর দিকে মুখ ফিরানো—এটি সাধারণ ও প্রচলিত এক অভিব্যক্তি। সাহাবাদের ভাষায় এর অর্থ হলো তাঁকে দোয়া ও সুপারিশ করতে বলা, সুতরাং তাঁরা তাঁর দোয়া ও সুপারিশের মাধ্যমে

ওসীলা গ্রহণ করতেন। তাঁর দোয়া ও সুপারিশ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ওসীলাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু বহু মানুষের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বের শপথ করে বলা। অথচ আল্লাহর প্রতি কোনো সৃষ্টির দ্বারা শপথ করা বৈধ নয়; বরং কোনো অবস্থাতেই কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে শপথ করা বৈধ নয়। যেমন কেউ বলে না: "হে আল্লাহ! আমি তোমার ফেরেশতাদের দ্বারা শপথ করছি" অথবা "তোমার কা'বা দ্বারা" বা "তোমার সৎ বান্দাদের দ্বারা", যেমন করে কোনো মানুষের জন্য এসব বিষয়ের দ্বারা শপথ করা বৈধ নয়। বরং শপথ কেবল আল্লাহরই নামে ও গুণাবলির মাধ্যমে বৈধ। এজন্যই সুন্নাহ হলো আল্লাহর গুণাবলি ও নামসমূহের দ্বারা দোয়া করা। যেমন বলা: "আমি তোমার কাছে চাই, কারণ যাবতীয় প্রশংসা তোমার, তোমার ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তুমি দানকারী, আসমান-জমিনের স্রষ্টা, মহিমান্বিত ও সম্মানিতের মালিক, চিরঞ্জীব, স্থায়ী।" অথবা: "আমি তোমার কাছে চাই, কারণ তুমি আল্লাহ, একমাত্র, অমুখাপেক্ষী, না জন্ম দিয়েছ, না জন্ম নিয়েছ, এবং তোমার কোনো সমকক্ষ নেই।" অথবা: "আমি তোমার কাছে চাই তোমার সব নামের দ্বারা, যেগুলো তুমি নিজেকে দিয়েছ..."—যেমন হাদীসে এসেছে।

তবে আল্লাহর কাছে তাঁর সৃষ্টির শপথ দিয়ে কিছু চাওয়া ইসলামে ভিত্তিহীন। তেমনি এ কথাও যে: "হে আল্লাহ! আমি তোমার আরশের গাঁথুনির দ্বারা, তোমার কিতাবের চূড়ান্ত দয়ার দ্বারা, তোমার সর্বোচ্চ নামের দ্বারা, তোমার সর্বোচ্চ মর্যাদার দ্বারা, তোমার পূর্ণ বাণীর দ্বারা চাই"—এ সম্পর্কেও ইখতিলাফ রয়েছে।

এ তৃতীয় প্রার্থনা সম্পর্কে ফুকাহাগণের মধ্যে দুইটি মত রয়েছে। শাইখ আবুল হাসান কুদুরী তাঁর 'শরহুল কারখী' কিতাবে বলেন: বিশর ইবনু ওয়ালিদ বলেন: আমি আবু ইউসুফকে বলতে শুনেছি: আবু হানিফা বলেছেন: "আল্লাহ ছাড়া কারো দ্বারা দোয়া করা ঠিক নয়। আমি অপছন্দ করি যে কেউ বলুক: 'আমি তোমার কাছে চাই তোমার আরশের গাঁথুনির দ্বারা' বা 'তোমার সৃষ্টির হকের দ্বারা।'" এটাই আবু ইউসুফের মতও। তিনি বলেন: "আরশের গাঁথুনি অর্থ আল্লাহ, তাই এটাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি অপছন্দ করি কেউ বলুক: 'তোমার নবী ও রাসুলদের হকের দ্বারা', 'তোমার ঘর ও পবিত্র স্মারকের হকের দ্বারা।'"

আল-কুদুরী বলেন: "সৃষ্টির মাধ্যমে চাওয়া বৈধ নয়, কারণ সৃষ্টির আল্লাহর ওপর কোনো হক নেই, সুতরাং তা হারাম।" এটি আবু হানিফা, আবু ইউসুফ প্রমুখের মতানুসারে সবার ইজমা। আমি অপছন্দ করি যে কেউ বলে: "আপনার আরশের মর্যাদাপূর্ণ গাঁটের শপথে" অথবা "আপনার সৃষ্টির হকের শপথে"। আবু ইউসুফের মতও

এটিই। আবু ইউসুফ বলেন: "আরশের মর্যাদার গাঁট" দ্বারা আল্লাহই উদ্দেশ্য, তাই আমি এটি অপছন্দ করি না। কিন্তু আমি অপছন্দ করি যে কেউ বলে: "আপনার নবী ও রাসুলদের হকের শপথে", "বাইতুল্লাহ ও পবিত্র নিদর্শনের হকের শপথে"। কুদূরী বলেন: "আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে দোআ করা বৈধ নয়, কারণ সৃষ্টির আল্লাহর ওপর কোনো হক নেই, অতএব এটি নিষিদ্ধ"— অর্থাৎ, ইজমা অনুযায়ী। আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও অন্যান্যদের নিকট থেকে বর্ণিত এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কিছুর মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ।

যদি বলা হয়: প্রভু, যিনি পবিত্র ও মহান, তিনি তাঁর ইচ্ছামতো সৃষ্টির শপথ করেন; কিন্তু আমরা তাঁর ওপর শপথ করতে পারি না, কেবল তাঁকে দিয়েই। তবে কেন বলা হবে না: আমরা তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর ওপর শপথ করতে পারি, কিন্তু সৃষ্টির ওপর শপথ করা যায় না, কেবল স্রষ্টার মাধ্যমেই? উত্তরে বলা হয়: কারণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টির শপথ গ্রহণ একটি প্রশংসা, মর্যাদা বৃদ্ধি ও তাঁর নিদর্শনসমূহের উল্লেখ। কিন্তু আমরা যখন সেগুলোর মাধ্যমে শপথ করি অন্যকে বাধ্য করার জন্য, কোনো কিছু থেকে বিরত রাখার জন্য, কোনো সংবাদকে নিশ্চিত করার জন্য, অথবা তা অস্বীকার করার জন্য—তাহলে তা শিরক।

যে ব্যক্তি অন্যকে বলে: "আমি তোমার কাছে এই এই বিষয়ের মাধ্যমে প্রার্থনা করছি", সে যদি শপথ করে, তবে এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে শপথ হওয়ায় নিষিদ্ধ; এবং এ ক্ষেত্রে কাফফারা শপথকারীর ওপর আবশ্যক, যার ওপর শপথ করা হয়েছে তার ওপর নয়—যেমনটি ফিকহবিদগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন। আর যদি এটি শপথ না হয়, তবে এটি দোআর একটি ধরন, এবং এতে উভয়ের ওপর কোনো কাফফারা নেই।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কেউ যদি আল্লাহর কাছে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে কিছু প্রার্থনা করে, তবে সে হয় সৃষ্টির মাধ্যমে শপথ করছে—যা নিষিদ্ধ, অথবা তাঁর মাধ্যমে দোআ করছে, যার বিস্তারিত আগেই বলা হয়েছে। কেউ যদি বলে: "আল্লাহর শপথ, আমি এই কাজ করব", তাহলে তা শপথ হলেও উভয়ের ওপর কোনো কাফফারা নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে: "আমি তোমার ওপর আল্লাহর শপথ করি, যে তুমি অবশ্যই এই কাজ করবে" অথবা "আল্লাহর শপথ, তুমি অবশ্যই এটা করবে", এবং সে ব্যক্তি শপথ পালন না করে, তাহলে শপথকারীর ওপর কাফফারা আবশ্যক।

যে ব্যক্তি দোআর রূপে কিছু চায়, সে তখন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রার্থনা করছে। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর ওপর শপথ করে, যেমন বলে: "হে প্রভু, আমি আপনার ওপর শপথ করছি যে আপনি অবশ্যই এই কাজ করবেন"—যেমনটি সালাফদের মধ্যে আল-বারা ইবনে মালিক ও অন্যরা করতেন—তাহলে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হয়তো এমন একজন লোক, যার চুল এলোমেলো, গায়ে ধূলিময়, দুইটি পুরোনো কাপড় পরিহিত, দরজার সামনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়—সে যদি আল্লাহর ওপর শপথ করে, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করেন।" এবং সহীহ হাদীসে আছে, আনাস ইবনে আন-নাযর যখন বললেন: "সে সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নিয়ে প্রেরিত করেছেন, রুবাইয়্যির দাঁত ভাঙ্গা হবে না!" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "হে আনাস, আল্লাহর কিতাবে কিসাস বিধান রয়েছে।" পরে লোকেরা ক্ষমা করে দিল। তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যে যদি আল্লাহর ওপর শপথ করে, তিনি তা পূর্ণ করেন।"

এটি এমন শপথের অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়: "হে আল্লাহ, আপনি অবশ্যই এই কাজ করবেন"—এটি আল্লাহর ওপর শপথ, আল্লাহর মাধ্যমেই; কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে নয়।

সৃষ্টির উচিত কিতাব ও সুন্নাহয় বর্ণিত শরীয়তপ্রদত্ত দোআগুলো দ্বারা প্রার্থনা করা, কেননা সেগুলোর ফজিলত ও কল্যাণ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং সেগুলোই সরল পথ—সেই পথ, যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিরা। আর কত উত্তম সঙ্গী তারাই।

এটি পূর্বেই বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যা বলে থাকে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি তোমার কোনো প্রয়োজন হয়, তবে আমার মর্যাদার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাও"—এই হাদীসটি মিথ্যা, কোনো আলেমই এটি বর্ণনা করেননি, বরং এটি কোনো হাদীস গ্রন্থেই নেই। বরং যা শরীয়তপ্রদত্ত, তা হল দোআর মধ্যে তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করা। এ কারণেই যখন আলেমরা ইস্তিসক্বা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দোআর কথা বলেন, তাঁরা দরুদ পাঠের উল্লেখ করেন; কিন্তু তাঁদের কেউ বলেননি যে, এ অবস্থায় তাঁর মর্যাদার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা শরীয়তসম্মত।

তেমনি কোনো আলেম বলেননি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দোআ করা, বা তাঁর নিকট সর্বতোভাবে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ; যদিও এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে (কারো মাধ্যমে চাইলে এক জিনিস, আর

তাকে চাওয়া আরেক জিনিস)। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দোআ করা কুফর। এ কারণেই নবী বা অন্য যে কোনো মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট দোআ করা—এটা সালাফ বা ফিকহবিদ ইমামদের কেউ করেননি। এটি কেবল পরে আসা কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যারা ইজতিহাদী আলেম ছিলেন না।

তবে "আমি আমাদের নবীর মর্যাদার মাধ্যমে আপনাকে চাই" বা "তাঁর হকের মাধ্যমে" বলা হয়েছে—এটি সালাফদের কিছু থেকে বর্ণিত হলেও, এটি তাঁদের মাঝে প্রচলিত ছিল না, এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে কোনো সুন্নত নেই। বরং সুন্নত তা নিষিদ্ধ করেছে, যেমনটি আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আমি ফকীহ আবু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সালামের ফাতওয়ায় দেখেছি, তিনি বলেন: "আল্লাহর কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর নিকট তাওয়াসসুল করা বৈধ নয়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত, যদি অন্ধ ব্যক্তির হাদীস সহীহ হয়"—তাঁর কাছে এ হাদীসের সহীহতা জানা ছিল না। তারপর আমি আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও অন্যান্য আলেমদের থেকে দেখেছি, তাঁরা বলেন: "নবীদের মাধ্যমেও আল্লাহর ওপর শপথ করা বৈধ নয়।"

আমি ইমাম আহমদের বক্তব্যে দেখেছি যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বিষয় ব্যতিক্রম করেন, তবে তা সম্ভবত তাঁর দুটি মতামতের একটি, যাতে তাঁর মাধ্যমে শপথ বৈধ বলা হয়েছে।

এটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধ ব্যক্তির হাদীস কেবল তাঁর দোআর মাধ্যমে তাওয়াসসুল প্রমাণ করে; এটি সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর ওপর শপথ বা রাসুলের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রার্থনার মধ্যে পড়ে না, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

যারা রাসুলের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে দোআ কবুলের জন্য তাওয়াসসুল করে, তারা যা করতে বলা হয়েছে ও যা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ, তা ছেড়ে অন্য পথে চলে গেছে—যা তাদের জন্য ততটা উপকারী নয়। অথচ রাসুলের ওপর দরুদ পাঠ করা দোআ কবুলের অন্যতম বড় মাধ্যম, এবং আল্লাহ এটি আদেশ করেছেন। দোআর মধ্যে তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করা—এটিই কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ, যিনি পবিত্র ও মহান,

বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি রহমত চাও ও সালাম পাঠাও" (আল-আহযাব: ৫৬)।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।" ফাদালাহ ইবনে উবাইদ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, বলেন: "তিনি এক ব্যক্তিকে নামাজে দোআ করতে শুনলেন, সে আল্লাহর প্রশংসা করল না এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে।' এরপর তিনি তাকে অথবা অন্য কাউকে ডেকে বললেন: 'তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ে, সে যেন আগে তার রবের প্রশংসা করে, তারপর নবীর ওপর দরুদ পাঠ করে, এরপর যা ইচ্ছা তা দোআ করে।'" আহমদ, আবু দাউদ (এটি তাঁর বর্ণনা), তিরমিজি ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেন: "এটি সহীহ হাদীস।"

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে শুনো, তখন তার কথার পুনরাবৃত্তি করো; তারপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করো, কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। এরপর আমার জন্য আল-ওয়াসীলাহ চাও, কেননা এটি জান্নাতে এমন একটি মর্যাদা, যা কেবল আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনের জন্য উপযুক্ত, আর আমি আশা করি আমিই সে হব। যে ব্যক্তি আমার জন্য আল-ওয়াসীলাহ চায়, কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফাআত বৈধ হবে।'"

সুনান আবু দাউদ ও নাসাঈতে আছে, এক ব্যক্তি বলল: "হে আল্লাহর রাসুল, মুয়াজ্জিনরা আমাদের ছাড়িয়ে যায় (সওয়াবে)।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা তাদের মতো বলো, তারপর শেষ হলে দোআ করো, তা কবুল হবে।"

মুসনাদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আহ্বান শুনে বলে: 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও কল্যাণময় সালাতের রব, মুহাম্মাদের (সা) এর উপর ওপর দরুদ এবং তাঁর প্রতি এমন সন্তুষ্টি দান করুন, যার পর কোনো অসন্তুষ্টি না থাকে'—আল্লাহ তার দোআ কবুল করেন।"

আনাস ইবনে মালিক বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আযান ও ইকামতের মাঝের দোআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।" আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেন:

“এটি হাসান হাদীস।“

সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুই সময় আছে যখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, আর প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়: আযানের সময় এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধের সারির সময়ে।" একে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। আর আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুসনাদে, তিরমিজি এবং অন্যান্যরা তুফায়ল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "রাতের এক-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বলতেন: 'হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো! রাজিফাহ (প্রথম শিঙ্গার শব্দ) এসে গেছে, এরপর আসবে রাদিফাহ (দ্বিতীয় শব্দ)। মৃত্যুও তার সবকিছু নিয়ে এসে গেছে।'"

উবাই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার প্রতি বেশি দরূদ পাঠ করি, তাহলে আমার দোয়ার কতটুকু আপনাকে নিবেদিত করব?" তিনি বললেন: "যত ইচ্ছা।" আমি বললাম: "চতুর্থাংশ?" তিনি বললেন: "যত ইচ্ছা, আর যদি বাড়াও, তবে তা তোমার জন্য ভালো।" আমি বললাম: "অর্ধেক?" তিনি বললেন: "যত ইচ্ছা, আর বাড়ালে তা তোমার জন্য ভালো।" আমি বললাম: "দুই-তৃতীয়াংশ?" তিনি বললেন: "যত ইচ্ছা, আর বাড়ালে তা তোমার জন্য ভালো।" আমি বললাম: "আমি কি আমার পুরো দোয়াই আপনার জন্য নিবেদিত করব?" তিনি বললেন: "তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের সব চিন্তা দূর করে দেবেন।" অন্য বর্ণনায় আছে: "তাহলে তোমার চিন্তামুক্তি হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

প্রশ্নকারীর বক্তব্য: "আমি কি আমার দোয়া থেকে আপনার জন্য নিবেদিত করব?" এর অর্থ: দোয়ার অংশ; কেননা, لغةًসালাত অর্থই দোয়া। আল্লাহ বলেন: "তাদের জন্য দোয়া করো, তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তি।" (সূরা তাওবা: ১০৩)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারকে দোয়া দাও।" এক নারী বললেন: "আমাকে ও আমার স্বামীকে দোয়া দিন, হে আল্লাহর রাসুল!" তিনি বললেন: "আল্লাহ তোমাকে ও তোমার স্বামীকে দোয়া দিন।" সুতরাং প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল: হে আল্লাহর রাসুল! আমি একটি দোয়া করি, যাতে আমি কল্যাণ কামনা করি এবং অকল্যাণ প্রতিহত করি, তাহলে এই দোয়ার কত অংশ আপনাকে নিবেদিত করব? তিনি বললেন: "যত ইচ্ছা।" যখন তিনি বললেন: "আমি কি সবটাই আপনাকে নিবেদিত করব?" তখন তিনি বললেন: "তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং

গুনাহ মাফ হবে।" অপর বর্ণনায় আছে: "তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন।" এটিই মানুষের দোয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য—কল্যাণ অর্জন ও অনিষ্ট প্রতিহত করা। যেমনটি অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

ইসলামের আলেমগণ এবং দ্বীনের ইমামগণ শরীয়াহ্‌ সম্মত দোয়াগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বিদআতি দোয়া থেকে বিরত থেকেছেন, সুতরাং সে অনুযায়ী আমল করা উচিত। এ বিষয়ের স্তর তিনটি:

প্রথম স্তর: কেউ আল্লাহ ছাড়া মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের, হোক তারা নবী, সৎকর্মশীল অথবা অন্য কেউ, উদ্দেশ্য করে বলে: "হে আমার মাওলা অমুক, আমাকে সাহায্য করুন", অথবা "আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই", বা "আপনার সাহায্য চাই", বা "আমার শত্রুর উপর জয়ের দোয়া করুন"—এ জাতীয় কথা। এটি আল্লাহর সাথে শিরক। যিনি মাখলুকের কাছে সাহায্য চায়, শয়তান তার চাহিদা পূরণ করতে পারে, আংশিক হলেও। এমনকি সেই ব্যক্তির রূপ ধরে তার সামনে আসতেও পারে, যাতে সে মনে করে যে, সে যার সাহায্য চেয়েছিল তার অলৌকিকতা এটি। অথচ তা শুধু এক শয়তান, যে তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে যখন সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেছিল। যেমন শয়তান মূর্তির মধ্যে কথা বলে, অথবা কারো দেহে প্রবেশ করে কথা বলে। এমন ঘটনা আমাদের সময়ে এবং অন্য সময়েও অনেক ঘটেছে। এমনকি আমি এমন কিছু জানি, যা বর্ণনা করলে দীর্ঘ হয়ে যাবে, যারা আমার নিকট সাহায্য চেয়েছে অথবা অন্য কারো নিকট, এবং বলেছে যে, আমার রূপ ধারণকারী অথবা অন্য কারো রূপ ধারণকারী একজন এসে তাদের প্রয়োজন পূরণ করেছে। তারা মনে করেছিল, এটি আমার সাহায্য চাওয়ার বরকত। অথচ এটা ছিল শয়তানের প্রতারণা। এটাই মূর্তি পূজা এবং পূর্ব যুগের লোকদের আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করার মূল কারণ ছিল। এ ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করেছে—আমরা আল্লাহর কাছে এর থেকে পানাহ চাই।

এর চেয়েও গুরুতর হলো, কেউ বলে: "আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার তাওবা কবুল করো", যেমন কতিপয় জাহিল মুশরিকরা করে। এর চেয়েও বড় হলো, কারো কবরের সামনে সেজদা করা এবং তার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা, এমনভাবে যে, তারা এটিকে কিবলার চেয়েও উত্তম মনে করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলে: "এটি বিশেষ শ্রেণির কিবলা, আর কা'বা সাধারণ মানুষের কিবলা।" এর চেয়েও বড় হলো, তার উদ্দেশ্যে সফর করাকে হজের মত মনে করা, এমনকি কেউ কেউ বলে যে, বহুবার সেখানে যাওয়া একটি হজের সমতুল্য। আর কট্টরপন্থীরা বলে: "একবার যাওয়া বহু হজের চেয়েও উত্তম", এবং এর অনুরূপ। এসবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যদিও অনেক মানুষ এ ধরণের কাজের কিছু অংশে জড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় স্তর: কেউ মৃত অথবা অনুপস্থিত নবী কিংবা সৎ ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলে: "আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন", অথবা "আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন", অথবা "আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন", যেমন খ্রিষ্টানরা মরিয়ম (আলাইহাস সালাম) এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে করে। এ ব্যাপারেও কোনো আলেমের সন্দেহ নেই যে, এটি নিষিদ্ধ এবং বিদআতের অন্তর্ভুক্ত, যা উম্মাহর সালাফ কেউই করেননি। যদিও কবরবাসীদের সালাম দেওয়াটা বৈধ, তাদেরকে সম্বোধন করাও বৈধ, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন যখন তারা কবর জিয়ারত করত, যেন তারা বলে: "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে বসবাসকারীগণ—মুমিন ও মুসলিমগণ। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ চাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না, তাদের পর আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না এবং আমাদের ও তাদেরকে ক্ষমা করো।"

আবু উমর ইবনে আব্দুল বার (রাহিমাহুল্লাহ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যদি এমন কারো কবরের পাশ দিয়ে যায় যাকে সে দুনিয়াতে চিনত এবং তাকে সালাম দেয়, তাহলে আল্লাহ তার রূহ ফিরিয়ে দেন যাতে সে সালামের জবাব দিতে পারে।" আবু দাউদের সুনানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে: "কোনো মুসলিম আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তাকে জবাব দিতে পারি।"

তবে মৃতের কাছে কিছু চাওয়া বৈধ নয়—না দোয়া চাওয়া, না অন্য কিছু। মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এর মুওয়াত্তায় আছে: ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন: "তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর রাসুল। তোমার উপর শান্তি হে আবু বকর। তোমার উপর শান্তি হে আমার পিতা।" এরপর তিনি চলে যেতেন। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমি ইবনে উমরকে দেখেছি, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে রাসুলের জন্য দোয়া করতেন, আর আবু বকর ও উমরের জন্য প্রার্থনা করতেন। একইভাবে আনাস ইবনে মালিক এবং অন্যদের থেকেও এসেছে যে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিতেন। যখন তারা দোয়া করতে চাইতেন, তখন তারা কিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন—কক্ষের দিকে মুখ করে দোয়া করতেন না।

যদিও কিছু ফকীহ, সুফি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে বিচ্যুতি আছে, তবে কোনো অনুসৃত ইমাম বা সমগ্র উম্মাহর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির মত অনুযায়ী তা নয়।

চার ইমামের মাজহাব—ইমাম মালিক, আবু হানিফা, আশ-শাফিয়ী ও আহমাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ)—এবং অন্যান্য ইমামদের মতে, কেউ যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেয় এবং নিজের জন্য দোয়া করতে চায়, সে কিবলার দিকে মুখ করে। তাঁরা সালাম দেওয়ার সময় নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনজন—মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ)—বলেছেন: তিনি কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে রাসুলের চেহারার দিকে মুখ করে সালাম দিবেন। আর আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: সালাম দেওয়ার সময় কক্ষের দিকে মুখ করবে না, যেমন দোয়ার সময়ও কক্ষের দিকে মুখ করে না—এতে সকলের একমত। তাঁর মাজহাবে দুইটি মত রয়েছে: কেউ বলেছেন, সে পিঠ ফিরিয়ে দেবে; আবার কেউ বলেছেন, বাম দিকে রেখে দেবে। এটি সালামের সময়ের মতানৈক্য। কিন্তু দোয়ার সময় তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেননি—সেখানে কেবল কিবলার দিকেই মুখ করা যাবে, কক্ষের দিকে নয়।

ইমাম মালিকের সঙ্গে মানসুরের ঘটনা, যেখানে তিনি নাকি কক্ষের দিকে মুখ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন: "তিনি তোমার এবং তোমার পিতা আদামের ওয়াসিলা"—এটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। তাঁর সহচরদের বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে যা এসেছে, তা এর বিরোধী। যেমন, ইসমাঈল ইবনে ইসহাক আল-কাজী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যরা বলেছেন, তাঁকে যখন এমন লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যারা কক্ষের দিকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় দোয়া করে, তিনি তা অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, এটি বিদআত—যা সাহাবী ও তাবেঈগণ করেননি। তিনি বলেন: "এই উম্মাহর শেষ অংশকে শুধুমাত্র সেই জিনিসই সংশোধন করতে পারবে যা প্রথম অংশকে সংশোধন করেছিল।"

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমাম মালিকের কথাই সঠিক। কেননা সাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতে প্রমাণিত যে, তাঁরা কখনো এভাবে দোয়া করেননি। যদি কক্ষের দিকে দোয়া করাটা শরীয়াহ্ সম্মত হতো, তবে তাঁরা তা জানতেন এবং আমাদের পূর্বেই তা করতেন। দোয়া একমাত্র আল্লাহর কাছেই করা হয়। কক্ষের দিকে মুখ করে দোয়া করা নিষিদ্ধ, যেমন কবরের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করাও নিষিদ্ধ—সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে আবু মারসাদ আল-ঘানাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে প্রমাণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কবরের উপর বসো না এবং তার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ো না।" সুতরাং কোনো কবরের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা বৈধ নয়—না নবীগণের, না অন্য কারো—এই সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে।

মুসলিমদের মধ্যে এই বিষয়ে কোন ইখতিলাফ নেই যে, কবরের দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় করার নিয়ত করাকে শরীআত সম্মত বলা যায় না; বরং এটি নিকৃষ্ট বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, কোনো

কবরের দিকে, বিশেষত নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবরের দিকে দোয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করাও শরীআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি কবরের দিকে ফিরে আল্লাহর (তাআলা) নিকট দোয়া করার নিয়ত করাও বৈধ না হয়, তবে মৃত ব্যক্তিকেই দোয়া করা তো আরও বড় হারাম। যেমন সালাত কবরের দিকে ফিরেই আদায় করা বৈধ নয়, তদ্রূপ কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করাও বৈধ নয়, বরং তা আরও বড় গোনাহ। সুতরাং, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মৃত ব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়া বৈধ নয়—তাকে বলা যায় না যেন সে আল্লাহর নিকট দোয়া করে, বা অন্য কিছুই চাওয়া যায় না। দুনিয়াবি বা দ্বীনী কোনো বিপদাপদের কথা তাকে বলা যায় না। তার জীবদ্দশায় এমন কিছু বলা যদি বৈধও হতো, তবু জীবিত অবস্থায় বললে শিরক সৃষ্টি হতো না, অথচ মৃত্যুর পরে তা শিরকে পরিণত হয়। কেননা জীবিত অবস্থায় সে প্রার্থনাকারীর অনুরোধে সাড়া দিতে বাধ্য, কারণ তাতে তার জন্য সওয়াব রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পর সে আর বাধ্য নয়; বরং সে আল্লাহর যিকির, দোয়া ও অন্যান্য আমল যা করে, তা সে করে আল্লাহ (তাআলা) যেভাবে তার জন্য সহজ করেন এবং তাকদিরে রাখেন—যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম) কবরের মধ্যে দোয়া করেন, এবং যেমন নবীগণ মিরাজের রাতে বাইতুল মাকদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সালাত আদায় করেন, এবং জান্নাতবাসী ও ফেরেশতাগণ যেভাবে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেন। তারা এগুলো উপভোগ করেন এবং তা আল্লাহ তাদের জন্য সহজ করে দেন। এটি কোনো বিধানভুক্ত কর্তব্য নয়, যার মাধ্যমে বান্দাদের পরীক্ষা করা হয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করা তার উপর কোনো প্রভাব ফেলে না; বরং আল্লাহ তাকে যা করতে বলেন, সে তাই করে, যদিও বান্দা তাকে কিছু না বলে। যেমন ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশেই কাজ করে, কোনো সৃষ্টির আদেশে নয়। যেমন তিনি, মহান ও মহিমান্বিত, বলেন: "আর তারা বলে, 'রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র! বরং তারা সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর কথার আগে কিছু বলেন না এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করেন" (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৬-২৭)। তারা শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশেই কাজ করেন, তিনি পবিত্র ও মহিমান্বিত। জীবিত অবস্থায় কিছু বৈধ ছিল বলেই মৃত্যুর পরও তা বৈধ হবে—এ কথা বলা যায় না। যেমন তাঁর ঘরে সালাত পড়া বৈধ ছিল, এবং তা মসজিদে পরিণত করাও বৈধ ছিল। কিন্তু যখন তাঁকে তাতে দাফন করা হলো, তখন তা মসজিদে পরিণত করা হারাম হয়ে গেল; যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর লানত করেছেন; তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছিল"—এতে তিনি তাদের পথ অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করেছেন। "এ জন্যই তাঁর কবরকে প্রকাশ্যে রাখা হয়নি; তিনি অপছন্দ করেছেন তা যেন ইবাদতের স্থান বানানো হয়।" সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসে এসেছে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকেরা কবরগুলোকে ইবাদতের স্থান বানিয়ে

ফেলেছিল। জানো! তোমরা কবরগুলোকে ইবাদতের স্থান বানিও না; আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি।" তাঁর জীবিত অবস্থায় মানুষ তাঁর পেছনে সালাত আদায় করত, এবং তা ছিল সর্বোত্তম আমলসমূহের একটি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের পেছনে সালাত আদায় করা বৈধ নয়। তেমনি জীবিত অবস্থায় তাঁকে হুকুম দিতে বলা হতো, ফতোয়া দিতে বলা হতো, বিচার করতে বলা হতো; কিন্তু মৃত্যুর পর তা বৈধ নয়। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমামদের নিকট এটি অপছন্দনীয় ছিল যে কেউ বলবে: "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত করেছি"—কারণ এই বাক্যটি সহীহভাবে বর্ণিত হয়নি। তাঁর কবর জিয়ারতের বিষয়ে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা সবই দুর্বল, বরং কিছু কিছু তো জাল। এই শব্দটি পরবর্তী যুগের সাধারণ মানুষের ব্যবহারে প্রচলিত হয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় সেই বিদআতী জিয়ারত, যার অর্থ শিরকের ন্যায়, যেমন কেউ কবর জিয়ারতে যায় যেন কবরবাসীর নিকট কিছু চাইবে, অথবা কবরবাসীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কিছু চাইবে, অথবা কবরের পাশে বসে আল্লাহর নিকট চাইবে।

শরীয়তের মতে, সঠিক জিয়ারত হলো, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর কবর জিয়ারত করা, তাঁর জন্য দোয়া করা ও সালাম দেয়া, যেমন কেউ জানাযার সালাত আদায় করে। এই দ্বিতীয় ধরণের জিয়ারতই শরীয়তের অনুমোদিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 'জিয়ারত' বললে কেবল প্রথম অর্থই বোঝে। তাই ইমাম মালিক বলতেন না "আমি তাঁর কবর জিয়ারত করেছি", কারণ এতে এমন একটি সন্দেহপূর্ণ অর্থ রয়েছে, যা বিদআতি ও মুশরিকদের উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়ত: কেউ বলে: "হে আল্লাহ! আমি অমুকের ওসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি", অথবা "তোমার নিকট অমুকের মর্যাদার ওসীলায়", ইত্যাদি—যা পূর্বে আবু হানিফা, আবু ইউসুফ এবং অন্যান্যদের থেকে নিষিদ্ধ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, সাহাবাদের মধ্যে এটি পরিচিত ছিল না; বরং তারা আল-আব্বাস প্রমুখের দোয়ার মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করতেন। সাহাবাগণ যেটা করতেন ও যেটা করতেন না, সে বিষয়ে 'ওসীলা' ও 'তাওজ্জুহ' শব্দের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে। সাহাবাগণের পরিভাষায় ও ভাষায় 'তাওজ্জুহ' ও 'ওসীলা' বলতে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া ও শাফাআতের মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ বোঝানো হতো। এজন্য প্রত্যেক মু'মিনের দোয়ার মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ বৈধ। যদিও কিছু অনুসৃত শায়েখ এই হাদীসকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করেন: "যখন তোমাদের জন্য বিষয় কঠিন হয়ে পড়ে, তখন কবরবাসীদের কাছে যাও", অথবা "কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাও"—এই হাদীস মিথ্যা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জাল করা হয়েছে—এ বিষয়ে হাদীসবিদগণের সর্বসম্মত মত রয়েছে। কোনো

আলেম এটি বর্ণনা করেননি, এবং তা কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে নেই।

তিনি, মহান ও মহিমান্বিত, বলেন: "আর আপনি নির্ভর করুন সেই চিরঞ্জীবের উপর, যিনি কখনো মারা যান না, এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। আর তাঁরাই যথেষ্ট যিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত" (সূরা আল-ফুরকান: ৫৮)। এটি দ্বীনে ইসলাম থেকে আবশ্যিকভাবে জানা যে, এমন কিছু শরীয়তসম্মত নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি এর চেয়েও লঘু কিছু থেকেও নিষেধ করেছেন—যেমন কবরকে ইবাদতের স্থান বানানো—এবং যারা তা করেছে তাদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন, যেন তাদের মতো না হওয়া হয়; কারণ সেটাই মূর্তি পূজার মূল। যেমন তিনি, মহান ও মহিমান্বিত, বলেন: "আর তারা বলেছিল: 'তোমরা নিজেদের উপাস্যদেরকে কখনো ত্যাগ করো না, এবং ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূস, ইয়াঊক ও নাসরকে ছেড়ো না'" (সূরা নূহ: ২৩)। এরা ছিল নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের নেককার ব্যক্তি। যখন তারা মৃত্যুবরণ করল, তখন তারা তাদের কবরের পাশে আসা-যাওয়া করতে লাগল, অতঃপর তাদের মূর্তি নির্মাণ করল, পরে তাদের ছবি অনুসারে মূর্তি তৈরি করল; যেমন পূর্বে ইবনে আব্বাস ও সালাফের অন্যান্য আলেমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই বাক্যের অর্থ বুঝে: "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই" (সূরা আল-ফাতিহা: ৫), সে জানে যে ইবাদতের পূর্ণ সাহায্য একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন, এবং কোনো সৃষ্টির নিকট কেবল সে সাহায্যই চাওয়া যায়, যা তার ক্ষমতার মধ্যে। তদ্রূপ, প্রকৃত সাহায্য একমাত্র আল্লাহরই নিকট থেকে চাওয়া যায়, এবং তাওয়াক্কুল কেবল তাঁরই উপর। "আর বিজয় তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই" (সূরা আল-আনফাল: ১০)। পূর্ণ বিজয়—যা শত্রুকে পরাজিত করে এমন কিছু সৃষ্টি করা—এটি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। এইটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট সেই ব্যক্তির জন্য, যাকে আল্লাহ পথ দেখান। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এই শিরক, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন, অন্যান্য নবীদের শরীয়তে একইভাবে নিষিদ্ধ। তাওরাতে মূসা (আলাইহিস সালাম) বনী ইস্রাঈলকে মৃতদেরকে আহ্বান করা এবং অন্যান্য শিরক থেকে নিষেধ করেছেন, এবং উল্লেখ করেছেন যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির একটি কারণ। কারণ, সকল নবীর দ্বীন এক, যদিও তাদের শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল; যেমন সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমরা নবীগণ, আমাদের দ্বীন এক।"

তিনি, মহান ও মহিমান্বিত, বলেন: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের যে বিষয় নির্ধারণ করেছেন, তা হচ্ছে, যেটি তিনি নূহকে আদেশ করেছিলেন এবং যা আমরা আপনার প্রতি ওহি করেছি, এবং যা আমরা ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে আদেশ করেছিলাম—যে তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভক্ত হয়ো না। যে বিষয়ের দিকে

আপনি আহ্বান করছেন, তা মুশরিকদের জন্য কঠিন।" (সূরা আশ-শূরা: ১৩)। আবার তিনি বলেন: "হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে খাও এবং সৎকাজ কর; নিশ্চয় আমি তোমাদের কাজ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। এবং তোমাদের এই দ্বীন এক দ্বীন, এবং আমিই তোমাদের রব; অতএব আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।" (সূরা আল-মুমিনূন: ৫১-৫৩)। আবার তিনি বলেন: "অতএব আপনি আপনার মুখমণ্ডল একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের দিকে ফেরান—এটাই আল্লাহর ফিতরা, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। তাঁরই দিকে ফিরে আসো, আর তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সালাত কায়েম কর, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং দলাদলিতে বিভক্ত হয়েছে; প্রত্যেক দল যা কিছু তাদের কাছে আছে, তা নিয়ে খুশি।" (সূরা আর-রূম: ৩০-৩২)। এটাই ইসলাম ধর্ম, যার ব্যতীত আল্লাহ প্রথম ও শেষ কাউকেই গ্রহণ করেন না, যেমন অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ

যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ করেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন তা স্পষ্ট হয়ে যায়—সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ, আদম সন্তানদের নেতা, নবীদের ও রাসুলদের সমাপ্তকারী, প্রথম ও শেষদের মধ্যে সর্বোত্তম, শাফায়াতকারীদের মধ্যে মর্যাদায় সর্বোচ্চ এবং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকারের ক্ষেত্রে—তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর নিচে অবস্থানকারীরা, অর্থাৎ অন্য নবী ও সৎকর্মশীলগণ, তাদের সাথেও শরিক না করা আরও অধিক হকসন্মত; যেন তাদের কবরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ না করা হয়, তাদেরকে আল্লাহর বিকল্পরূপে আহ্বান না করা হয়, জীবিত অবস্থায়ও নয়, মৃত্যুর পরও নয়।

এমন কোনো অনুপস্থিত বা মৃত শায়েখের নিকট সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়, যেমন বলা: "হে আমার শায়েখ অমুক, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে বিজয় দিন, আমাকে রক্ষা করুন", অথবা "আমি আপনার আশ্রয়ে রয়েছি", ইত্যাদি। বরং এগুলোর সবই শিরক, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, এবং যার নিষিদ্ধতা ইসলাম ধর্ম থেকে জানা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। যারা অনুপস্থিত ও মৃত ব্যক্তিদের, কবর বা অন্যত্র, সাহায্যের জন্য ডাকে, তারা মূলত মূর্তিপূজকদের মতোই; শয়তান যেমন মূর্তিপূজকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, তেমনি তাদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। শয়তান তাদেরকে সাহায্য প্রার্থিত ব্যক্তির রূপে উপস্থিত হয় এবং তাদের সাথে এমন কিছু কথা বলে যা "কাশফ" বা অতিপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটা শয়তানরা গায়েবখবরদাতাদের সাথেও করে। এর কিছু সত্য হলেও তাতে মিথ্যার প্রাধান্য বেশি থাকে।

শয়তানরা তাদের কিছু চাহিদা পূর্ণ করে দেয় এবং তাদের অপছন্দনীয় কিছু বিষয় দূর করে দেয়, ফলে তারা মনে করে শায়েখ অদৃশ্য থেকে এসে তা করেছেন, অথবা ভাবে যে, আল্লাহ একজন ফেরেশতা তাঁর রূপে তৈরি করেছেন এবং তিনিই তা করেছেন। কেউ কেউ বলে: "এটাই শায়েখের গোপন ক্ষমতা ও তাঁর অবস্থা", অথচ আসলে এটি শয়তান, যে তাঁর রূপ ধারণ করে সেই শিরককারী ও সাহায্য প্রার্থীকে বিভ্রান্ত করেছে। যেমন শয়তানরা মূর্তির মধ্যে প্রবেশ করে, তার উপাসকদের সাথে কথা বলে এবং তাদের কিছু চাহিদা পূর্ণ করে, আরব মুশরিকদের মূর্তিগুলোর সাথেও এমন ঘটেছে, এবং আজও তা তুর্কি, ভারত ও অন্যান্য মুশরিকদের মধ্যে বিরাজমান। আমি এ ধরনের বহু ঘটনা জানি, যেখানে কেউ আমার বা অন্য কারো সাহায্য

চেয়েছে, অথচ আমরা তাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম না। তারা আমাকে বা সেই ব্যক্তিকে আকাশ দিয়ে উড়ে এসে তাদেরকে রক্ষা করতে দেখেছে। তারা যখন তা আমাকে বলেছে, আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি যে, এটা শয়তান ছিল, যে আমার বা অন্যান্য শায়েখদের রূপ ধারণ করে এসেছে, যাতে তারা মনে করে এটি শায়েখের কারামত, এবং এতে তারা মৃত ও অনুপস্থিত শায়েখদের নিকট সাহায্য চাওয়ার প্রতি আরও দৃঢ় হয়। এটি অন্যতম প্রধান কারণ, যার মাধ্যমে মুশরিকরা ও মূর্তিপূজকেরা শিরকে লিপ্ত হয়েছে।

তেমনি, খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা তাদের বুজুর্গদের, যাদের তারা "আলামি" বলে ডাকে, তাদের নিকট সাহায্য চায়, তারাও দেখে যে, সেই খ্রিষ্টান বুজুর্গের রূপে কেউ এসে তাদের কিছু চাহিদা পূর্ণ করছে। যারা মৃত নবী, সৎকর্মশীল, শায়েখ ও আহলে বাইতের নিকট সাহায্য চায়—তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ যা ঘটে, তা হলো—এই ধরনের কিছু ঘটনা তাদের সাথে ঘটে বা তাদের কাছে বর্ণিত হয়, এবং তারা ভাবে এটি কোনো কারামত বা অলৌকিকতা, যা সেই কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু আছে যারা সেই শায়েখের কবরের নিকট আসে, যার মাধ্যমে সে শিরক করছে এবং সাহায্য চাইছে, এবং খাদ্য, অর্থ, অস্ত্র বা অন্যান্য চাওয়া জিনিস আকাশ থেকে তার নিকট অবতরণ করে। সে ভাবে এটি শায়েখের কারামত, অথচ এসব কিছুই শয়তানদের পক্ষ থেকে। এটি মূর্তি পূজার অন্যতম বড় কারণ। ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন: "আর আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তারা অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে" (সূরা ইবরাহিম: ৩৫-৩৬)। যেমন নূহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন।

এটি জানা কথা যে, কোনো পাথর এমনভাবে বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে না, যতক্ষণ না তার পেছনে এমন কোনো কারণ থাকে, যা তাদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। কোনো মূর্তিপূজকই বিশ্বাস করত না যে, সেই মূর্তি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে; বরং তারা তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী ও সুপারিশকারী মনে করেই গ্রহণ করেছিল: তাদের কেউ কেউ নবী ও সৎকর্মশীলদের রূপে মূর্তি বানিয়েছিল; কেউ জ্যোতিষ্ক, সূর্য ও চন্দ্রের উদ্দেশ্যে মূর্তি বা তাবিজ বানিয়েছিল; কেউ জিনদের উদ্দেশ্যে, আবার কেউ ফেরেশ্তাদের উদ্দেশ্যে। অতএব, তাদের উপাসনার উদ্দেশ্য ছিল মূলত ফেরেশতা, নবী, সৎকর্মশীল ব্যক্তি বা সূর্য বা চন্দ্র—কিন্তু বাস্তবে তারা শয়তানদের ইবাদত করেছে, কারণ তারাই চায় মানুষ তাদের উপাসনা করুক এবং এমন কিছু প্রদর্শন করে, যা মানুষকে তার দিকে আহ্বান করে। তিনি, মহিমান্বিত ও মহান আল্লাহ বলেন: "আর স্মরণ করুন সেই দিন, যখন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং বলবেন ফেরেশতাদেরকে: 'এই লোকেরা কি তোমাদেরই ইবাদত করত?' তারা বলবে: 'আপনি পবিত্র! আপনি আমাদের অভিভাবক, এদের নয়। বরং তারা জিনদের ইবাদত করত; তাদের অধিকাংশই ছিল জিনদের প্রতি বিশ্বাসী'" (সূরা সাবা: ৪০-৪১)।

যদি কোনো উপাসক শয়তানের ইবাদতকে বৈধ মনে না করে, শয়তান তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে কেবল নবী, সৎকর্মশীল, ফেরেশতা বা অন্য যে কাউকে ডেকে নিচ্ছে যাদের সম্পর্কে তার ভালো ধারণা রয়েছে। আর যদি সে জিনদের ইবাদত বৈধ মনে করে, তাহলে তারা তাকে বলে দেয় যে, তারা জিন। কখনো শয়তান মানুষরূপে এসে তাকে সিজদা করতে বলে, তার সাথে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে বলে, মৃত পশুর মাংস খেতে বলে, মদ পান করতে বলে, কিংবা মৃত পশু উৎসর্গ করতে বলে। তাদের অধিকাংশ জানে না যে, যারা তাদেরকে এসব বলে, তারা আসলে ফেরেশতা নয়, বরং তারা হল এমন জিন, যারা মানুষরূপে এসেছে বা অন্য কোনো অদৃশ্য রূপে দৃশ্যমান হয়েছে। তিনি, মহান আল্লাহ বলেন: "আর ছিল কিছু মানুষ, যারা জিনদের কিছু পুরুষের আশ্রয় নিত, ফলে তারা (জিনরা) তাদের অহংকারে বাড়িয়ে দেয়" (সূরা আল-জিন: ৬)। কোনো মানুষ কোনো উপত্যকায় থেমে তার অধিবাসীদের ভয় পেত, তখন সে বলত: "আমি এই উপত্যকার বড়জনের আশ্রয় নিচ্ছি এর মূর্খদের থেকে"। মানুষ জিনদের আশ্রয় নিত, এবং সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল জিনদের দম্ভের কারণ; তারা বলত: "মানুষ আমাদের আশ্রয় চাইছে।"

তেমনি বিচ্ছিন্ন রুকইয়াহ ও ঝাড়ফুঁকসমূহ: এগুলোতে এমন কিছু জিনের নাম থাকে, যাদেরকে আহ্বান করা হয়, যাদের সাহায্য চাওয়া হয়, এবং যাদের প্রতি শপথ করা হয় তাদের শ্রদ্ধায়। শয়তানরা কিছু বিষয়ে তাদের সেই শপথের কারণে তাদের আনুগত্য করে। এটি জাদু ও শিরকেরই একটি ধরন। তিনি, মহান আল্লাহ বলেন: "তারা শয়তানদের অনুসরণ করেছিল, যারা সুলায়মানের রাজত্বকালে জাদু করত। সুলায়মান কুফরি করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল, তারা মানুষকে জাদু শিখাত, এবং যা দুটি ফেরেশতার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল—হারূত ও মারূত—বাবিল নগরে। আর সেই দুই ফেরেশতা কাউকে শিক্ষা দিত না, যতক্ষণ না বলত: 'আমরা পরীক্ষা, সুতরাং কুফরি করো না'। এরপরও মানুষ তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখত, যার দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা কাউকে তাতে ক্ষতি করতে পারত না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। এবং তারা যা শিখত, তা ছিল কেবল তাদের জন্য ক্ষতিকর, উপকারী নয়। আর তারা অবশ্যই জানত, যে কেউ তা গ্রহণ করে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট বস্তু, যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করেছে, যদি তারা জানত!" (সূরা আল-বাকারা: ১০২)।

এই ধরণের বহু লোক আছে, যারা আকাশে উড়ে বেড়ায়, শয়তান তাদের বহন করে মক্কা বা অন্য কোথাও নিয়ে যায়। অথচ সে হতে পারে এমন একজন ভ্রষ্ট, যে নামায ও অন্যান্য ফরজ অস্বীকার করে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হারাম করেছেন, তা হালাল মনে করে। শয়তানরা কেবল তার কুফরি, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার কারণেই তার সান্নিধ্যে থাকে। কিন্তু সে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে

ঈমান আনে, তাওবা করে এবং আনুগত্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তবে শয়তানরা তাকে ছেড়ে যায়, এবং সে শয়তানী অবস্থা, যা দ্বারা সে তথ্য পেত বা প্রভাব সৃষ্টি করত, তা বিলীন হয়ে যায়। আমি শাম, মিশর, হিজাজ ও ইয়ামান-এ এরকম বহু লোককে চিনি। আর জাযিরা, ইরাক, খুরাসান ও রূম (আনাতোলিয়া)-এ এই ধরণের ঘটনা শাম ও অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশি প্রচলিত। অবিশ্বাসীদের দেশ—মুশরিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যে—এতে আরও বেশি পরিমাণে বিরাজমান। নিঃসন্দেহে এই শয়তানী অবস্থা, যার উৎস কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতা, তা কেবল তখনই দেখা দেয় যখন তার কারণ ব্যাপক হয়ে পড়ে। অতএব, যেখানে ঈমান, তাওহীদ, ফুরকানের আলো ও নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রভাব দৃঢ় ও স্পষ্ট, সেখানে এই শয়তানী অবস্থা দুর্বল হয়। আর যেখানে কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতা দেখা দেয়, সেখানে তা প্রবল হয়। যে একক ব্যক্তির মধ্যে উভয় অবস্থা বিদ্যমান—একদিকে ঈমানের আকর্ষণ এবং অন্যদিকে মুনাফিকির আকর্ষণ—সে উভয় অবস্থারই প্রভাব অনুভব করবে।

আর যারা ইসলাম কবুল করেনি এমন মুশরিকদের মধ্যে যেমন বখশিয়্যাহ, তূনিয়্যাহ, বুদ্ধা ও এ জাতীয় মুশরিক আলেম ও শায়েখরা, যারা তুর্কদের অবিশ্বাসী ও তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের সেবা করে—তাদের মধ্যে এই শয়তানী অবস্থা বেশি প্রচলিত। তাদের একজন আকাশে উড়ে যায়, গায়েবি খবর দেয়, তাদের জন্য বাজনা বাজানো হয় যা বাতাসে ভেসে চলে এবং কোনো একজন তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হলে তার মাথায় আঘাত করে, অথচ কেউ তা করছে না, এমনটি তারা দেখে; তাদের পানীয়ের পাত্র ঘুরে বেড়ায়, অথচ কেউ তা বহন করছে না; তাদের একজন কোনো স্থানে অবস্থান করলে, তার নিকট যারাই আসে, তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার পরিবেশন করে, বিভিন্ন রকমের খাবার এনে দেয়। আর এই সবকিছুই শয়তানদের পক্ষ থেকে; তারা তা কোনো কাছাকাছি শহর থেকে চুরি করে এনে দেয়।

এইসব ঘটনা তুর্কি ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যারা মুশরিক বা ঈমানে দুর্বল, তাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। আর তাতারদের মধ্যে এই ধরণের বহু ধরণ রয়েছে।

যারা ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তাওহীদ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য অনুধাবন করে না; বরং অনুপস্থিত পীরদের আহ্বান করে এবং তাদের সাহায্য কামনা করে, তারা শয়তানের যে বিষয়গুলিকে সে পছন্দ করে সেগুলোর পরিমাণ অনুযায়ী শয়তানী অবস্থা লাভ করে। এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা ইবাদত ও ধার্মিকতা রাখে, কিন্তু এক ধরনের অজ্ঞতা সহ। এদের মধ্যে একজনকে হজ্বের নির্ধারিত স্থানসমূহ পার হওয়ার সময় ইহরাম গ্রহণ না করেই হাজীদের সঙ্গে আরাফাত ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করে না এবং তাওয়াফে ইফাদাহ সম্পাদন করে না। সে মনে করে, এর

দ্বারা সে একটি সৎ কাজ ও অলিয়াদের এক মহান কারামাত অর্জন করেছে, অথচ সে জানে না যে, এটি শয়তানের ধোঁকা। কারণ, এমন হজ্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয় এবং মুসলিম আলেমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি এটি ইবাদত বা অলিয়ার কারামাত মনে করে, সে পথভ্রষ্ট এবং অজ্ঞ। এ কারণেই নবী ও সাহাবীদের কারো সাথেই এমন কিছু ঘটেনি, কারণ তারা এমন অবস্থার চেয়ে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

এমন একটি ঘটনা ঘটে, যেখানে একজন ব্যক্তি ও তার সঙ্গে থাকা কিছু লোককে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আরাফাহর ময়দানে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। সে দেখতে পায় ফেরেশতাগণ নেমে এসে হাজীদের নাম লিখছেন। সে বলল: "তোমরা কি আমার নাম লিখেছো?" তারা বলল: "তুমি তো হজ্ব করনি যেমন অন্যরা করেছে। তুমি কষ্ট করোনি, ইহরামে প্রবেশ করোনি, এবং সেই হজ্বের কোন প্রতিদান পাওনি যা অন্যান্য হাজীরা পেয়েছে।"

এক পীরকে এই ধরনের লোকেরা অনুরোধ করে যেন তিনি তাদের সাথে আকাশপথে হজ্ব করেন। তিনি বলেন: "এই হজ্ব তোমাদের জন্য ফরয আদায় করে না, কারণ তোমরা হজ্ব করনি যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আদায় করতে বলেছেন।"

ইসলাম দুইটি মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: এক, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা; দুই, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে প্রেরিত শরীয়ত অনুযায়ী ইবাদত করা। এই দুইটি সাক্ষ্যদানের প্রকৃত অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।"

ইলাহ সেই সত্তা যাঁর প্রতি অন্তর ইবাদতের মাধ্যমে, সাহায্য চেয়ে, ভালবাসা, মহত্ত্ব প্রদান, ভয়, আশা, ভক্তি ও সম্মান সহ আনুগত্য প্রকাশ করে। এই অধিকার একমাত্র আল্লাহর এবং এতে তাঁর সাথে কেউ শরীক নয়। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত করা যাবে না, ডাকা যাবে না, ভয় করা যাবে না, এবং একমাত্র আল্লাহকেই নিঃশর্তভাবে আনুগত্য করা হবে।

রাসুল হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ, নিষেধ, হালাল, হারাম ও বিধান মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। হালাল হলো যা তিনি হালাল করেছেন, হারাম হলো যা তিনি হারাম করেছেন, এবং দ্বীন হলো যা তিনি বিধান করেছেন। রাসুল হলেন আল্লাহর ও মানুষের মধ্যে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম।

যথা: আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা, ভয়ভীতি, হালাল-হারাম এবং অন্যান্য বাণী যা তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু

দোয়া কবুল, বিপদ দূর, হিদায়াত দান এবং প্রয়োজন পূরণ – এসব আল্লাহর একক ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়। তিনি শুনেন, দেখেন এবং তাঁর বান্দাদের অবস্থা, গোপন কথা সব জানেন। তিনি এমন, যিনি কারো সংবাদ বা সহযোগিতা ছাড়াই রিজিক বণ্টন করেন, অনুগ্রহ নাজিল করেন, এবং কষ্ট দূর করেন।

এইসব কার্য সম্পাদনের জন্য যে উপায়-উপকরণ, তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং সহজ করেছেন। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন। তিনি এক, সমর্থনপ্রার্থী, যিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং কাউকে তাঁর থেকে জন্ম নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। “যে কেউ আসমান ও জমিনে আছে, সে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে; প্রতিদিন তিনি এক নতুন কাজে লিপ্ত” (সূরা আর-রহমান: ২৯)।

আসমানের বাসিন্দারাও তাঁকে প্রার্থনা করে, জমিনের বাসিন্দারাও। তিনি, পবিত্র ও মহান, এক ব্যক্তির কথার কারণে অন্যজনের কথা শোনা থেকে বিরত হন না, কিংবা বিভিন্ন ভাষা ও স্বরভেদে বিভ্রান্ত হন না। বরং তিনি বহু ভাষায় বহু প্রয়োজনে উচ্চারিত সকল দোয়া শোনেন। বারবার প্রার্থনা করলেও তিনি বিরক্ত হন না; বরং তিনি দোয়ায় আগ্রহী হন।

যখন সাহাবারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বিভিন্ন মাসআলা জানতে চাইতেন, তখন আল্লাহ তাঁকে উত্তর দিতে বলতেন, যেমন: “তারা তোমার নিকট চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, বল, ‘এগুলি মানুষের জন্য ও হজের জন্য সময় নিরূপণকারী’” (বাকারা: ১৮৯)। “তারা জিজ্ঞেস করে কী খরচ করবে, বল, ‘অতিরিক্ত যা বাকি থাকে’” (বাকারা: ২১৯)। “তারা জিজ্ঞেস করে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা কেমন, বল, ‘তাতে যুদ্ধ করা বড় অপরাধ’” (বাকারা: ২১৭) এবং অন্যান্য প্রশ্ন।

কিন্তু যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে জানতে চায়, তিনি বলেন: “আর যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (বল) আমি নিকটে আছি; আমি প্রার্থনাকারীর দোয়া কবুল করি যখন সে আমাকে ডাকে” (বাকারা: ১৮৬)। এখানে তিনি বলেননি “তাদের বল”, বরং সরাসরি বলেছেন “আমি নিকটে আছি”। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা এমন কারো নিকট দোয়া করছো না, যিনি বধির বা অনুপস্থিত, বরং এমন সত্তার নিকট, যিনি শোনেন এবং নিকটে আছেন। যে সত্তার নিকট তোমরা দোয়া করছো, তিনি তোমাদের প্রত্যেকের উটের ঘাড়ের চেয়েও নিকটবর্তী।”

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে যেন নিজের সামনে থুতু না ফেলে, কারণ তার সম্মুখে আল্লাহ রয়েছেন; ডানে না ফেলে, কারণ তার ডান পাশে

একজন ফেরেশতা রয়েছে; বরং তার বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে ফেলে।"

এই হাদীস সহীহ্ হাদীস এবং একাধিক সনদে বর্ণিত। তিনি, পবিত্র ও মহান, তাঁর আসমানসমূহের উপরে আরশে আছেন, সৃষ্টির থেকে পৃথক। তাঁর সত্তার কিছুই সৃষ্টির মধ্যে নেই এবং সৃষ্টির কিছুই তাঁর সত্তার মধ্যে নেই। তিনি আরশ ও সকল সৃষ্টির থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি কিছুই প্রয়োজন করেন না; বরং তিনি তাঁর কুদরতে আরশ ও তার বাহকদের ধারণ করেন। তিনি সৃষ্টিকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং ওপরের স্তরকে নিচের স্তরের মুখাপেক্ষী করেননি। আসমান বাতাসের মুখাপেক্ষী নয়, বাতাসও ভূমির মুখাপেক্ষী নয়।

সর্বোচ্চ, মহান, আসমান-জমিন এবং তাদের মাঝে যা আছে, তার রব, যিনি বলেন: "তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা দেয়নি; কিয়ামতের দিনে জমিন থাকবে তাঁর মুঠোর মধ্যে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র ও মহান, তারা যাকে তাঁর সাথে শরীক করে তা থেকে অনেক উর্ধ্বে" (সূরা যুমার: ৬৭)। তিনি এত মহান, এত আত্মনির্ভরশীল, এত উর্ধ্বে, যে তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনিই এক, সমর্থনপ্রার্থী, যিনি কাউকে জন্ম দেন না, এবং কাউকে তাঁর থেকে জন্ম নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

তাঁর ব্যতীত সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, আর তিনি সব কিছুর মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত।

এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনাও অন্যান্য স্থানে এসেছে, যেখানে তাওহীদকে শব্দ ও কর্মের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাচনিক তাওহীদের উদাহরণ হলো সূরা ইখলাস: "বল, তিনি আল্লাহ, এক" এবং ব্যবহারিক তাওহীদের উদাহরণ হলো সূরা কাফিরূন: "বল, হে কাফিরগণ…"। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত এবং তাওয়াফের দুই রাকাতে এই দুই সূরা পড়তেন।

তিনি ফজরের দুই রাকাত ও তাওয়াফের দুই রাকাতে এ আয়াতও পড়তেন: "বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহতে ও যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে…" (বাকারা: ১৩৬) এবং দ্বিতীয় রাকাতে: "বল, হে কিতাবীদের, এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান…" (আলে ইমরান: ৬৪)। এই দুই আয়াতে ইসলামের সারাংশ এবং বাচনিক ও ব্যবহারিক ঈমান রয়েছে। তাঁর বাণী: "আমরা

ঈমান এনেছি আল্লাহতে এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে…” থেকে শেষ পর্যন্ত — তাতে রয়েছে বাচনিক ঈমান ও ইসলাম। আর “বল, হে কিতাবীদের…” এই আয়াতে রয়েছে ব্যবহারিক ঈমান ও ইসলাম।

আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো ইসলাম ও ঈমান, আর এই দুইটি এই দুই আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে।

আর আল্লাহই ভালো জানেন।

এই প্রশ্ন ও উত্তরের এখানেই সমাপ্তি, যেটি আমি এর শব্দচয়নসহ উল্লেখ করতে চেয়েছি, কারণ এতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ ও উপকারী নীতিমালা এই বিষয়ে, এবং এতে রয়েছে সংক্ষিপ্ততা। কেননা, তাওহীদ হলো কুরআনের রহস্য এবং ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু। এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে এই বিষয় ব্যাখ্যা করা দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দাদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহকে এক ব্যক্তির এই কথার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো:

“আমি আপনাকে জিজ্ঞাসুদের আপনার ওপর যে হক রয়েছে তা দ্বারা প্রার্থনা করছি”—এবং এর অনুরূপ কথাগুলোর অর্থ কী?

উত্তর

যে ব্যক্তি বলে, “আমি আপনাকে জিজ্ঞাসুদের আপনার ওপর যে হক রয়েছে তা দ্বারা প্রার্থনা করছি”—নিশ্চয়ই এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যা ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এর বর্ণনাশৃঙ্খল দলীল হিসেবে যথেষ্ট নয়।

আর যদি এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ্ হতো, তাহলে এর অর্থ হতো: জিজ্ঞাসুদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে হক হলো যে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন, আর বান্দাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে হক হলো যে তিনি তাদেরকে প্রতিদান দেন। আর তিনি এটি নিজেই নিজের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন: “আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, (তখন বলো,) আমি তো নিকটেই রয়েছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই যখন সে আমাকে ডাকে” (আল-বাক্বারাহ: ১৮৬)।

তাহলে এটি আল্লাহর নিকট তাঁরই নিজের উপর আবশ্যক করা বিষয়ের মাধ্যমে চাওয়া, যেমন যারা বলে: “হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দান কর সেই প্রতিশ্রুতি যা তুমি আমাদেরকে তোমার রাসুলদের মাধ্যমে দিয়েছ” (আল ইমরান: ১৯৪)। আর যেমন তিন ব্যক্তি যারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারা নিজেদের সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিল, যার প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ

আর যখন শায়খ দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তখন উপরের মিশরের তিনজন সন্ন্যাসী তাঁর নিকট প্রবেশ করে। তখন তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করলেন এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করলেন যে, তারা কুফরী অবস্থায় রয়েছে এবং তারা সেই পথের উপর নেই, যেটির উপর ছিলেন ইবরাহিম ও মাসীহ। তারা তাঁকে বলল: "আমরা তো তোমাদের মতোই করি—তোমরা সাইয়্যিদা নাফিসার নিকট দুয়া করো, আর আমরা সাইয়্যিদা মরিয়ামের নিকট দুয়া করি। আর আমরা ও তোমরা একমত হয়েছি যে, মাসীহ ও মরিয়াম আল-হুসাইন ও নাফিসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমরা পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিকট সাহায্য চাও, আমরাও তাই করি।"

তখন তিনি তাদের বললেন: "যে কেউ এমন করে, তার মধ্যে তোমাদের সাদৃশ্য রয়েছে, আর এটি ইবরাহিমের দীন নয় যার উপর তিনি ছিলেন। বরং ইবরাহিমের দীন হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত করবো না—যাঁর কোনো অংশীদার নেই, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কোনো সঙ্গিনী নেই, কোনো সন্তান নেই। আর আমরা তাঁর সাথে কোনো ফেরেশতা, সূর্য, চাঁদ, তারা কিংবা কোনো নবী বা নেক লোককেও শরিক করবো না। 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট দাস হিসেবে উপস্থিত হবে না' (মরিয়ম: ৯৩)। আর এও যে, যেসব বিষয়ের উপর আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই—যেমন বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদ জন্মানো, বিপদ থেকে মুক্তি প্রদান, পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াত দান এবং গুনাহ মাফ করা—এসব কিছুর জন্য অন্য কারো নিকট কিছু চাওয়া বৈধ নয়। কারণ এই সব বিষয়ে সমগ্র সৃষ্টির কেউ কোনো ক্ষমতা রাখে না; কেবলমাত্র আল্লাহই তা করতে সক্ষম।

আর নবীগণ—আমরা তাঁদের প্রতি ঈমান রাখি, তাঁদের সম্মান করি, তাঁদের মহিমান্বিত জ্ঞান করি, তাঁদের অনুসরণ করি, তাঁদের যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন তা বিশ্বাস করি এবং তাঁদের আনুগত্য করি। যেমন নূহ, সালিহ, হূদ ও শু'আইব বলেছিলেন: 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো' (নূহ: ৩)। অতএব, তারা ইবাদত ও তাকওয়া নির্ধারিত করেছেন একমাত্র আল্লাহর জন্য, আর আনুগত্য নির্ধারিত করেছেন নিজেদের জন্য। কেননা তাঁদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যেরই অংশ। অতএব, কেউ যদি সমস্ত নবীকে বিশ্বাস করে কিন্তু একটি নবীর প্রতি কুফরী করে, তাহলে তার ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যতক্ষণ না সে ঐ নবীর প্রতিও ঈমান আনে। একইভাবে, যদি কেউ সমস্ত

কিতাবকে বিশ্বাস করে কিন্তু একটি কিতাবে কুফরী করে, তবে সে কাফির থাকবে যতক্ষণ না সে সেই কিতাবেও ঈমান আনে। একই কথা ফেরেশতা ও আখিরাতের দিন সম্পর্কেও প্রযোজ্য।"

তখন তারা যখন এ কথা শুনল, তারা বলল: "আপনি যে দীনটির কথা বললেন, তা আমাদের ও এদের দীনের চেয়ে উত্তম।" অতঃপর তারা তাঁর নিকট থেকে চলে গেল।

অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন

তাঁকে (রাহিমাহুল্লাহ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

এক ব্যক্তি মাটি চুম্বন করে—সে কি গুনাহগার হবে? আর কেউ যদি জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে এমনটি করে এবং তাতে বাধ্য হয়ে পড়ে, তার ব্যাপারেই বা কী হুকুম?

উত্তর

তিনি জবাব দিয়েছেন:

যে সকল কাজ সেজদার মতো অবনত হয়ে করা হয়—যেমন মাটি চুম্বন করা, মাথা নিচু করা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ—যা কিছু শাইখ বা বাদশাহদের সামনে করা হয়ে থাকে, তা বৈধ নয়। বরং রুকূর মতো নত হওয়াও বৈধ নয়। কেননা, কিছু লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল: "আমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, তবে কি সে তার প্রতি নত হবে?" তিনি বললেন: "না।" এবং যখন মু'আয আশ-শাম থেকে ফিরে এলেন, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদা করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "হে মু'আয, এটি কী?" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আশ-শামে দেখেছি যে, তারা তাদের বিশপদের কাছে সেজদা করে এবং তারা এই কাজকে তাদের নবীদের প্রতি সম্পৃক্ত করে।" তিনি বললেন: "তারা তাদের সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। যদি আমি কাউকে অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক থাকার কারণে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীকে সেজদা করার আদেশ দিতাম। হে মু'আয, নিশ্চয়ই সেজদা কেবল আল্লাহর জন্যই শোভনীয়।"

আর যদি কেউ এই কাজ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় করে, তবে এটি সবচেয়ে জঘন্য কুকর্মগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কাজকে নৈকট্যের মাধ্যম ও ইবাদতের অংশ মনে করে, সে বিভ্রান্ত ও বিদআতের প্রবর্তক। বরং তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, এটি দ্বীনের অংশ নয় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমও নয়। যদি সে তবুও তা করতে থাকে, তবে তাকে তাওবার আহ্বান জানানো হবে; যদি সে

তাওবা করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে; আর যদি না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে।

তবে, যদি কেউ এতে বাধ্য হয়—এমনভাবে যে, যদি সে তা না করে, তবে তাকে প্রহার করা হবে, বন্দি করা হবে, তার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হবে, অথবা তার প্রাপ্য জীবিকা যা সরকারি কোষাগার থেকে তার হক, তা কেটে দেওয়া হবে—এবং এরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে অধিকাংশ আলিমের মতে, তা বৈধ। কেননা, অধিকাংশ আলিমের মতে, জবরদস্তি হারাম কাজকে বৈধ করে তোলে, যেমন মদ পান এবং অনুরূপ বিষয়। এটাই ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যদের পক্ষ থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মত। তবে এর সাথে অবশ্যই তার অন্তরে ঘৃণা থাকতে হবে এবং সে যেন যথাসম্ভব তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। আর আল্লাহ যাকে আন্তরিক জানেন, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন এবং তাঁর এই আন্তরিকতার বরকতে হয়তো তাকে এমন আদেশ থেকে বাঁচিয়েও দেন।

এক দল আলিমের মতে, জবরদস্তি কেবল মুখের উচ্চারিত কথার ক্ষেত্রেই বৈধতা দেয়, কর্মের ক্ষেত্রে নয়। এটি ইবনে আব্বাস ও তাঁর মত অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন: “তাকিয়্যাহ কেবল মুখের বাক্যের মাধ্যমেই হয়।” এটি ইমাম আহমাদের অপর রেওয়ায়েতও।

কিন্তু নেতৃত্ব বা সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ যদি এমন কাজ করে, তবে তা বৈধ নয়। আর কেউ যদি এতে বাধ্য হয়ে এমন কাজ করে এবং তার অন্তরে এই নিয়ত থাকে যে, সে কেবল আল্লাহর জন্যই এই অবনততা প্রকাশ করছে, তবে তা উত্তম বলে গণ্য হবে। এটি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ, যে কুফরির বাক্য উচ্চারণে বাধ্য হয়, অথচ তার অন্তরে বৈধ কোনো অর্থের ইচ্ছা থাকে। আল্লাহই ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন

ইমাম, আলেম এবং আলোকিত ফকীহ আবূ আল-আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো:

সম্মানিত ব্যক্তির আগমনের সময় লোকেরা যে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে, তা কি বৈধ বা অবৈধ? যদি কেউ এই আশঙ্কা করে যে, দাঁড়ানো পরিহার করলে আগত ব্যক্তি অপ্রসন্ন হবেন বা মনে কষ্ট পাবেন এবং সম্ভবত এটি বিরক্তি, শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণ হতে পারে, তাহলে কী করণীয়? এছাড়া, বিভিন্ন সভা বা অন্যত্র দেখা-সাক্ষাতের সময় ভূমির দিকে মাথা নত করা ও সামান্য ঝুঁকে সালাম করা কি বৈধ, নাকি নিষিদ্ধ? যদি কোনো ব্যক্তি স্বভাবতই ও অভ্যাসগতভাবে তা করে থাকেন, তবে কি এটি তার জন্য নিষিদ্ধ হবে? নাকি এটি শুধু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও আলেমদের ক্ষেত্রে অবৈধ? এবং কেউ যদি দেখে যে, কোনো ব্যক্তি এসব সম্মান লাভে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তার জন্য এতে কোনো গুনাহ আছে কি না? আর কেউ যদি বলে, 'আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করেছি,' তাহলে কি তা শুদ্ধ হবে?

উত্তর

তিনি উত্তর দিলেন:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঠিক খলিফাদের যুগে সাহাবাগণ তার সামনে বারবার দাঁড়ানোকে অভ্যাসে পরিণত করেননি, যেমনটি অনেক মানুষ করে থাকে। বরং আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি, তবে তারা তাকে দেখলে দাঁড়াতেন না, কারণ তারা জানতেন যে তিনি তা অপছন্দ করেন।" তবে কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এলে তাকে স্বাগত জানাতে দাঁড়ানো বৈধ, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ইকরিমাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এবং আনসারদের উদ্দেশে বলেছিলেন: “তোমাদের নেতা [সা’দ ইবনে মু’আয]-এর জন্য দাঁড়াও,” যখন তিনি বনু কুরাইযার বিষয়ে রায় প্রদানের জন্য এসেছিলেন, কারণ তারা তার রায়কে মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল।

মানুষের জন্য উত্তম হলো সালাফদের অনুসরণ করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের রীতি-নীতি গ্রহণ করা। কেননা, তারাই সর্বোত্তম যুগের লোক। সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশনা হলো মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথনির্দেশনা। সুতরাং, শ্রেষ্ঠ মানবের পথনির্দেশনা এবং সর্বোত্তম যুগের আদর্শ ছেড়ে তার চেয়ে নিম্নতর কিছুর দিকে ঝুঁকবে কেন? এবং যে ব্যক্তি মানুষ দ্বারা অনুসৃত হয়, তার উচিত এই অভ্যাসকে অনুমোদন না করা, যাতে তারা প্রতিবার তাকে দেখলে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে না তোলে, বরং সাধারণ সাক্ষাতের সময় শুধু দাঁড়ানো যথেষ্ট হয়। তবে যদি কোনো ব্যক্তি ভ্রমণ শেষে ফিরে আসেন এবং তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো সমাজের প্রচলিত রীতি হয়, এবং এটি না করলে তিনি মনে করবেন যে তাকে অবহেলা করা হচ্ছে বা তার মর্যাদা হানিকর কিছু করা হয়েছে, এবং তিনি যদি সুন্নাহ-সম্মত রীতিনীতিগুলি না জানেন, তবে উত্তম হবে তার জন্য দাঁড়ানো। কারণ এটি পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান ঘটানোর জন্য উত্তম। কিন্তু যে ব্যক্তি জানেন যে সুন্নাহ-সম্মত রীতি কী, তার জন্য এটি না করা কোনো ক্ষতির কারণ হবে না।

আর এই দাঁড়ানো সেই নিষিদ্ধ শ্রেণির মধ্যে পড়ে না, যা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোকেরা তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, সে যেন দোজখে তার আসন গ্রহণ করে।“ কারণ, এই নিষিদ্ধ রীতি হলো যখন লোকেরা এমন ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, যে নিজে বসে আছে। এটি আগত ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানোর মতো নয়। এজন্য আরবরা ‘আমি তার জন্য দাঁড়ালাম’ এবং ‘আমি তার দিকে দাঁড়ালাম’ এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছে। আগত ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো হলো সমান মর্যাদায় দাঁড়ানো, কিন্তু বসে থাকা ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আলাদা বিষয়।

[এটি সহীহ মুসলিমে এসেছে: যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থেকে ইমামতি করলেন এবং সাহাবারা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে থাকলেন, তখন তিনি তাদের বসতে বললেন। এবং তিনি বলেন: “আমাকে অন্য জাতির মতো সম্মানিত করো না।“[৪]] তিনি তাদের নিষেধ করলেন ইমাম বসা থাকলে দাঁড়িয়ে নামাজ

---

[৪] শাইখ নাসির ইবনে হামাদ আল-ফাহদ বলেছেন (পৃষ্ঠা ১৮):
এই হাদীস এই ভাষায় মুসলিমে নেই। মুসলিমে জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ন্যস্ত ভাষ্য হলো: "এইমাত্র তোমরা পারস্য ও রোমানদের কাজ করতে যাচ্ছিলে; তারা তাদের রাজাদের জন্য দাঁড়ায়, অথচ তারা নিজেরা বসে থাকে। তোমরা তা কোরো না।" এখানে যে ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে তা আহমদ বর্ণনা করেছেন আবু উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এমন এক সনদে যার মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে (ফীহি নজর)। মনে হয়, শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর “সহীহ মুসলিমে প্রমাণিত” কথাটি থেকে “তাদের

পড়া থেকে, যাতে তারা অমুসলিমদের অনুসরণ না করে, যারা তাদের নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো, যখন নেতারা বসে থাকত।

উপসংহারে, যেটি সকল ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ও উপযোগী তা হলো সালাফদের রীতিনীতি অনুসরণ করা এবং যথাসম্ভব তাতে অভ্যস্ত হওয়া। যে ব্যক্তি এটি বোঝে না এবং জানে না যে এটি প্রকৃত আদর্শ, এবং তাকে এভাবে সম্মান না জানালে অধিক ক্ষতি হতে পারে, তাহলে কম ক্ষতি দ্বারা অধিক ক্ষতি প্রতিরোধ করা উত্তম। যেমন, দুই কল্যাণের মধ্যে বড় কল্যাণটি অর্জনের জন্য ছোটটি ত্যাগ করা জরুরি।

বসার নির্দেশ দেন” পর্যন্ত অংশ দ্বারা সালাত সংক্রান্ত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এরপর তিনি আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেন, তা হলো: “তিনি বললেন: ‘তোমরা আমাকে অমুসলিমদের একজন আরেকজনকে মহিমান্বিত করার মতো করে মহিমান্বিত কোরো না।’” এখানে ‘ও বললেন’ (ওয়া ক্বালা) বাক্যাংশের 'ওয়াও' একটি ইস্তিএনাফিয়্যাহ যা আতিফাহ নয়। তবে এটি সমস্যা সৃষ্টি করে, কারণ এই (সংযুক্ত ভাষ্য) ২৭/৯৩ নম্বর স্থানে আবারও পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: “সহীহে প্রমাণিত হয়েছে” —এবং এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদ

অভিবাদনের সময় নত হওয়া (রুকূ করা) নিষিদ্ধ, যেমনটি তিরমিযীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা তাঁকে এক ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল, যখন সে তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে কি তার কাছে নত হবে? তিনি বললেন: “না।” কারণ রুকূ ও সিজদা কেবলমাত্র আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তাঁর জন্যই বৈধ। যদিও এই (সিজদা) আমাদের শরীআত ব্যতীত অন্য শরীআতে অভিবাদনের এক রূপ হিসেবে বৈধ ছিল, যেমন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর কাহিনিতে আছে: "তারা তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে গেল। তিনি বললেন, 'হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা...'" (সূরা ইউসুফ: ১০০)। কিন্তু আমাদের শরীআতে সিজদা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই উপযুক্ত। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইতিমধ্যেই অন্য জাতিগুলোর মত একে অপরের জন্য দাঁড়িয়ে পড়াকে নিষেধ করেছেন; তাহলে রুকূ ও সিজদা কত অধিকভাবে নিষিদ্ধ হবে? একইভাবে, যে নত হওয়া সম্পূর্ণ নয় (অর্থাৎ আংশিকভাবে নত হওয়া), তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ

আর শাইখুল ইসলাম বলেন:

মুশরিকরা নিজেদের ও তাদের সন্তানদের বন্দেগিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গ করত; সুতরাং তারা তাদের কারো নাম রাখত 'আবদুল কাবা (কাবার বান্দা), যেমনটি ছিল আবদুর রহমান ইবনে আওফের পূর্ববর্তী নাম; এবং কারো নাম রাখত 'আবদু শামস (সূর্যের বান্দা), যেমনটি ছিল আবু হুরাইরার পূর্ববর্তী নাম, এবং 'আবদু শামস ইবনে 'আবদ মানাফের নাম; আবার কারো নাম রাখত 'আবদুল লাত, কারো 'আবদুল উজ্জা, কারো 'আবদু মানাত, এবং এমন আরও অনেক নাম, যেগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের বন্দেগিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি সম্পৃক্ত করত—সে হোক সূর্য, মূর্তি, মানুষ কিংবা অন্য কোনো কিছু যা আল্লাহর সাথে শরিক করা হত। এর অনুরূপ হচ্ছে খ্রিষ্টানদের কাউকে 'আবদুল মাসীহ (মসীহের বান্দা) বলে নামকরণ করা।

অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব পরিবর্তন করে তাদের বন্দেগিকে কেবল আল্লাহর দিকে নির্দেশিত করেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান নামে নামকরণ করেন, যেমন তিনি আবদুর রহমান ইবনে আওফসহ অন্যান্যদের এভাবে নাম দেন। আবার আবু মু'আবিয়ার পূর্ববর্তী নাম ছিল 'আবদুল উজ্জা, তিনি তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'আবদুর রহমান। তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের নাম ছিল কাইয়্যুম, তিনি তার নাম রাখেন 'আবদুল কাইয়্যুম।

এ ধরনের আরেকটি বিষয় দেখা যায় রাফেযী গোষ্ঠীর চরমপন্থীদের ও তাদের অনুরূপ যেসব লোক শাইখদের ব্যাপারে চরমপন্থায় লিপ্ত। যেমন বলা হয়: 'এ হচ্ছে শাইখ ইউনুসের খাদেম/মুরিদ', কিংবা 'শাইখ ইউনুসের কাছে সম্পৃক্ত', কিংবা 'ইবনে রিফাঈ বা হারীরীর মুরিদ', ইত্যাদি বাক্যে যা মানুষের ব্যাপারে একধরনের অতিমূল্যায়নের জন্ম দেয়, যেমনটা খ্রিষ্টানদের অন্তরে মসীহ সম্পর্কে বা মুশরিকদের অন্তরে তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে জন্ম নেয়, যার সাথে জড়িয়ে থাকে আশা ও ভয়। এমনকি তারা তাদের কাছে তওবাও করে, যেমন মুশরিকরা কোনো কোনো উপাস্যের কাছে তওবা করত, আর খ্রিষ্টানরা করত মসীহ বা কোনো ওলির কাছে।

আর ইসলামি শরীয়াহ্—যেটি একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি দ্বীন—এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সৃষ্টির বন্দেগিকে তাদের প্রতিপালকের দিকে পরিচালিত করা, যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠা করেছেন; এবং শিরকপূর্ণ নামকে পরিবর্তন করে ইসলামী নাম রাখা, কুফরি নামকে ঈমানী নামে রূপান্তর করা। সাধারণত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নাম রাখতেন 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "বল, তোমরা আল্লাহকে ডাকো অথবা রহমানকে ডাকো, যে নামেই ডাকো—সুন্দরতম নামসমূহ তো তাঁরই।" (সূরা আল-ইসরা: ১১০)। কারণ, এই দুটি নামই আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য নামসমূহের মূল ভিত্তি।

শাইখুল ইসলাম হারাওয়ী তার শহরের লোকদের নামকরণ করেছিলেন সাধারণত আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ অনুসারে। তদ্রূপ আমাদের পরিবারে নামের মধ্যে আল্লাহর প্রতি বন্দেগির প্রাধান্য দেখা যায়, যেমন: 'আবদুল্লাহ, 'আবদুর রহমান, 'আবদুল গণি, 'আবদুস সালাম, 'আবদুল কাহির, 'আবদুল লতীফ, 'আবদুল হাকীম, 'আবদুল আজীজ, 'আবদুর রহীম, 'আবদুল মুহসিন, 'আবদুল আহাদ, 'আবদুল ওয়াহিদ, 'আবদুল কাদির, 'আবদুল করীম, 'আবদুল মালিক, এবং 'আবদুল হক।

এবং সহীহ মুসলিমে নাফি' হতে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম দুটি হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান; সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ নাম দুটি হচ্ছে হারিছ ও হাম্মাম; আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম দুটি হচ্ছে হারব (যুদ্ধ) ও মুররাহ (কষ্ট)।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের যুদ্ধধ্বনি ছিল: "হে বনি 'আবদুর রহমান!", "হে বনি 'আবদুল্লাহ!", "হে বনি 'উবাইদুল্লাহ!"—তারা এ সকল স্লোগান উচ্চারণ করত বদর দিবসে, হুনাইনের যুদ্ধে, বিজয় দিবসে এবং তায়িফ অভিযানে। তাই মুহাজিরদের যুদ্ধধ্বনি ছিল: "হে বনি 'আবদুর রহমান!", খাযরাজদের ধ্বনি ছিল: "হে বনি 'আবদুল্লাহ!", এবং আওসদের ধ্বনি ছিল: "হে বনি 'উবাইদুল্লাহ!"।

এটি মাজমাউল ফাতওয়ার প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদের সমাপ্তি। আল্লাহ তা'আলা যেন আমার পক্ষ থেকে এটি কবুল করেন এবং শয়তান ও আমার দুর্বল সত্তার কারণে অনুবাদে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তা যেন তিনি দূর করে দেন। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোআ করি, তিনি যেন এই কাজটিকে আমার নেক আমলের পাল্লায় ভারী করে দেন এবং আমার পিতা-মাতা, পরিবার, বন্ধুগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই কাজ থেকে উপকৃত হবে, তাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া বানিয়ে দেন।

এই PDF সকল প্রকাশকের জন্য উন্মুক্ত , যেকোনো প্রকাশক বা প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান অনুবাদকের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক এই পিডিএফ মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে পারেন, ইনশা আল্লাহ। আমি কামনা করি এই অমূল্য কিতাব মানুষের ঘরবাড়ি, মসজিদ, লাইব্রেরি এবং অন্যান্য স্থানে সংরক্ষিত হোক, যেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিমগণ এর ফিজিক্যাল কপিগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। আর যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তা স্থায়ী হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করেন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার কষ্ট, কবরের শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন। আমীন!

— ইলম ও ওলামাদের একজন ক্ষুদ্র খাদিম —

মুহারিব আল উসামা